বিদ্যাসাগর রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

দেবকুমার বসু
সম্পাদিত

ভূমিকা
ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

বিদ্যাসাগর রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)

তৃতীয় মুদ্রণ

১লা বৈশাখ ১৩৮১

দ্বিতীয় মুদ্রণ

১২ আশ্বিন ১৩৭৬, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

প্রথম প্রকাশ

১৩ শ্রাবণ ১৩৭৩, ২৯ জুলাই ১৯৬৬।

॥ চোদ্দ টাকা ॥

প্রকাশক * শ্রীসুনীল মণ্ডল ৭৮।১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। প্রচ্ছদ ও অলংকরণ * শ্রীগণেশ বসু। ব্লক নির্মাতা * ব্লকম্যান প্রসেস, স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং। প্রচ্ছদ ও আলোকচিত্র মুদ্রণ * ইম্প্রেসন্ হাউস ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। গ্রন্থন * দীননাথ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস। মুদ্রক * পরাণচন্দ্র রায় সনেট প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯ গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

সূচীপত্র ঃ

চিত্রসূচী ঃ

ভূমিকা

১.

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ এমন কয়েকটি বিদ্যুৎ-গর্ভ ব্যক্তিকে সৃষ্টি করেছিল যাঁদের আশীর্বাদের পুণ্যফল এখনও আমরা ভোগ করছি। প্রাগাধুনিক যুগের গৌড়বঙ্গে বিচিত্র প্রতিভাধর ব্যক্তির যে আবির্ভাব হয় নি, তা নয়। কিন্তু একই শতাব্দীতে সমগ্র দেশের মানস-আকাশ এভাবে আর কোন দিন ফলবান সম্ভাবনায় পূর্ণ হয়ে ওঠে নি। মধ্যযুগের বহ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে পুরাতন বাঙালী-সংস্কৃতির ফিনিক্স্ পাখী আত্মবিসর্জন দেবার সঙ্গে সঙ্গে জাতবেদার দীপ্তি ও দাহ নিয়ে বিশ্বাকাশসঞ্চারী যে সমস্ত মহাগরুড়ের জন্ম হল, তাঁদের মধ্যে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের নাম আজ বাঙালীজীবনের পাতিত্যমোচনের বীজমন্ত্ররূপে পরিগণিত হয়েছে। এঁদের মধ্যে আবার বিদ্যাসাগর নিঃসঙ্গ দেবদ্রুমের মতো বিশাল প্রান্তরে একাকী দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হয়, নিরাভরণ গিরিশৃঙ্গের মতো নিঃসঙ্গতাই তাঁর শোভা। বস্তুতঃ অন্যকালে হলে তাঁকে আমরা বিধাতার দুর্জ্ঞেয় পরিহাস বলেই মনে করতাম। যে বাংলাদেশের সমতলভূমিবাসী এরণ্ডসভা থেকে পাহাড় বহু দূরে পলাতক, সমুদ্রও অদৃশ্যপ্রায়, সেখানে কি করে নগাধিরাজের উচ্চতা এবং সমুদ্রের বিশালতা একটি ব্যক্তি-চরিত্রকে আশ্রয় করতে পারে, এ এক সমস্যার বিষয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) এমন একটি বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব, যা আজকের দিনে প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ সেই বিস্ময়কে ব্যক্ত করে বলেছেন, "মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চার কোটি বাঙালি নির্মাণ করিতেছিলেন সেখানে হঠাৎ দুই-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন।" বিধাতার সেই আশ্চর্য ব্যতিক্রম এই খর্বদেহ ও ক্ষীণতনু ব্যক্তিটি একই সঙ্গে এত প্রেম, এত করুণা, এত জ্ঞান, এত বীর্য—এত মহৎ মনুষ্যত্বের অকৃপণ আশীর্বাদ কোথা থেকে পেলেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। তাই আজ তিনি পুণ্যশ্লোক, অদীনপুণ্য; তাই আজ তাঁর জীবনকথা বাংলার ঘরে ঘরে প্রবাদে পরিণত হয়েছে। "দগ্ধাস্থিপঞ্জরময় ভারতের এই মহাশ্মশানে এই মৃত জাতির শবদেহে নূতন জীবন সঞ্চার করিবে কে?" আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর প্রশ্ন করেছিলেন। জীবন সঞ্চার করবে বিদ্যাসাগরের চরিত্রাদর্শ, সংস্কারমুক্ত নির্মোহ দৃষ্টি, আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ যুক্তি ও মানবপ্রেম। তাঁর বিশাল, বিচিত্র, কর্মব্যাকুল জীবনকথা আমাদের বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। তাঁর গ্রন্থ ও

অন্যান্য রচনা এবং বাংলাভাষা ও বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর রচনার যে সম্পর্ক, সেই প্রসঙ্গেই এখানে দু-চার কথার অবতারণা করা যাচ্ছে।

২.

একদা বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হত। কেউ কেউ সে গৌরব রামমোহনকে দিতে চাইতেন; যিনি এ বিষয়ের অনুসন্ধানে আর একটু অগ্রসর হয়েছেন, তিনি আরও কিছু পিছিয়ে গিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুন্সী এবং তাঁদের সঞ্চালক উইলিয়ম কেরীকেই সে গৌরবের অংশভাগী করতে চাইতেন। কিন্তু একটু সতর্ক হয়ে ভেবে দেখলেই এ বিষয়ে অনেক ভুল ধারণার নিরসন হবে। একথা অবশ্যই সত্য যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুন্সী, রামমোহন বা বিদ্যাসাগর—কেউ-ই বাংলা গদ্য সৃষ্টি করেন নি। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা ভাষা শেখাবার জন্য কয়েকখানি গদ্যনিবন্ধ ও কাহিনী-সংক্রান্ত পুস্তিকা রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল—একথা সত্য বটে, এবং এর আগে বাংলা গদ্যে লেখা কোন কাহিনী-বিষয়ক পুস্তিকা রচিত হয় নি, প্রবন্ধ গ্রন্থও রচিত হয় নি। কিন্তু পর্বত-গহ্বরবন্দী জলকুণ্ডেরও উৎস আছে; ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পূর্বেও বাংলা গদ্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে বাংলা গদ্যে লেখা চিঠিপত্র পাওয়া যাচ্ছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতেও চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, মনুষ্য-ক্রয়বিক্রয়পত্র, চুক্তিপত্র, বিবাদ-মীমাংসা এবং সহজিয়া বৈষ্ণবদের পুঁথিপত্রে বাংলা গদ্যের যে ব্যবহার দেখা যাচ্ছে তা যেমন পরিচ্ছন্ন, তেমনি সরল। তার অন্বয়ও পুরো সাধুভাষার রীতি অনুসরণ করেছে। অবশ্য একথা ঠিক যে প্রাগাধুনিক যুগে চিঠিপত্রের মতো নিতান্ত 'কেজো' ব্যাপারে বাংলা গদ্যের ব্যবহার থাকলেও সাহিত্যকর্মে গদ্যের প্রয়োগ হত না। শুধু কাব্য সমাপ্তিতে পুষ্পিকায় পুঁথি রচনা বা নকলের সংবাদাদি গদ্যেই দেখা হত। যথা—"লিখিতং শ্রী পিতমলাল স্থকুল। সাকিম সামপুর পরগণে জাহানাবাদ। পঠানার্থে শ্রীরঘুনাথ ভকত সাং বদনগঞ্জ পরগণে জাহানাবাদ। সন ১২৪০ বার শত চল্লিশ সাল তারিখ ২৮ আঠাস্যা কার্তিক রোজ মঙ্গলবার বেলা তিন প্রহরের সমএ সমাপ্ত হইল।"[১]

মধ্যযুগে গদ্যাত্মক ব্যাপারেও পয়ার-ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহৃত হত। আজকাল হলে মঙ্গল-কাব্য গদ্যেই লেখা হত। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত,-এর কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তার বিখ্যাত গ্রন্থের অনেকটা গদ্যে লিখলে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। কিন্তু

১. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের একখানি পুঁথির পুষ্পিকা-পুঁথি সংখ্যা—১৫।

সে যুগের লেখকেরা ব্যবহারিক কর্মে গদ্যের ব্যবহার জানলেও সাহিত্যকর্মে কেন গদ্যের ব্যবহার করেন নি, তার কারণ অনুমান করা যেতে পারে।

সে যুগের বাংলা সাহিত্য প্রধানতঃ ছিল গীতাত্মক ও আবৃত্তিমূলক। সব কাব্যই হয় গান করা হত, আর না হয় সুর করে পাঁচালীর ঢঙে আবৃত্তি করা হত। উপরন্তু দেবলীলা বা দেবপ্রভাবিত মর্ত্যলীলাই ছিল কাব্যরচনার প্রধান *motif* ; সে ক্ষেত্রে ছন্দোবদ্ধ বাক্‌নির্মিতিই ছিল প্রশস্ত। উপরন্তু চৌদ্দ মাত্রার পয়ার ছন্দটি অতিশয় স্থিতি-স্থাপক—এতে গদ্যাত্মক কাজও দিব্যি চলে যায়। বোধ হয় এই জন্য সাহিত্যকর্মে বাংলা গদ্যের ব্যবহার হতে বিলম্ব হয়েছিল। তবে এই গদ্যরীতির মূলে এই প্রভাবগুলি কার্যকরী হয়েছিল বলে মনে হয় : সংস্কৃত গদ্যরীতির, কথক ঠাকুরদের বচনবিন্যাস এবং সরল পয়ারের বিলম্বিত তাল। কালক্রমে পয়ারছন্দের লয় বর্ধিত হয় এবং অন্ত্যানুপ্রাস উঠে গিয়ে মুখের কথার প্রভাবে গদ্যরীতির উদ্ভব হয়। অবশ্য প্রাচীন বাংলা গদ্যের ছাঁদটি বিশুদ্ধ সাধুভাষার ছাঁদ হলেও মুখের কথার বিন্যাসপদ্ধতি যে গদ্যরীতিকে প্রভাবিত করবে তাতে আর আশ্চর্য কি! গদ্ ধাতুর তো মানেই হল কথা বলা।[২] কিন্তু প্রাচীন বাংলায় পয়ার-ত্রিপদীর মূল ছাঁদটি যেমন প্রায়শই সাধুরীতিকে অনুসরণ করেছে, তেমনি খুব পুরনো কাল থেকেই বাংলা গদ্যে সাধুরীতি অনুসৃত হয়ে আসছে। অনেকের ধারণা, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতের দলই বাংলা গদ্যের কৃত্রিম সাধু-রীতি তৈরী করেছিলেন। একথা যে ঠিক নয়, তার প্রমাণ প্রাগাধুনিক পর্বের এই গদ্য পত্রগুলি :

> ১. "এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার-আমার সন্তোষ-সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে।" (১৪৭৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৫৫ খৃঃ অব্দে কুচবিহার রাজের অহোমরাজকে লেখা পত্রাংশ)।[৩]
>
> ২. "অতঃপর তারা প্রভৃতি দেবদারা সকল শিবের তরে প্রহেলিকা প্রবন্ধে গৌরীকে সমর্পণ করিয়া কথোপকাল পালন করি বা হবেক ইঙ্গিত করিতেছেন অবধান করহ।"[৪] (সপ্তদশ শতাব্দীর কবি রামকৃষ্ণ রায়ের শিবায়ন, এতে মাঝে মাঝে দু'চার ছত্র গদ্য আছে)।

২. 'সাহিত্যদর্পণে' গদ্যের সংজ্ঞা—"বৃত্তগন্ধোজ্‌ঝিতং গদ্যম্"—অর্থাৎ ছন্দোলেশবর্জিত পঙ্‌ক্তিকে গদ্য বলে। দণ্ডী 'কাব্যাদর্শে' বলেছেন, "অপাদঃ পদসন্তানো গদ্যম্"—যাতে চতুষ্পদীবৎ পদাবিভাগ নেই তাকে গদ্য বলে।

৩. *দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত—বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ২য়, পৃ. ১৬৭২।*

৪. **দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র রচিত 'শিবায়ন', পৃ. ১৪৬।**

৩. "আপনে আমার জ্ঞানদাতা শ্রীগুরু আপনি আমার জ্ঞান জন্মাইয়াছেন কিনা তাহার বুঝিবার কারণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহাতে আপনি আমাকে যে প্রকার জ্ঞান জন্মাইয়াছেন তাহাতে আমি যে প্রকার বুঝিয়াছি তেমত কহিলাম।"[৫] (১১৫৮ বঙ্গাব্দ বা ১৭৫০ খৃঃ অব্দে নকল করা 'জ্ঞানাদি সাধনা' শীর্ষক সহজিয়া গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)।

৪. "আমরা স্বকীয়ার দস্তখত বিনা বিচারে পারিব না আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতাবলম্বী অতএব বিচারে যে ধর্ম স্থায়ী হয় তাহাই লইবে এই মত করার হইল বিচার মানিলাম তাহাতে পাতসাই শুভা শ্রীযুত নবাব জাফর খাঁ সাহেব নিকট দরখাস্ত হইল তিঁহো কহিলেন ধর্মাধর্ম বিনা তজবিজ হয় না অতএব বিচার কবুল করিলেন।"[৬] (১২০৫ বঙ্গাব্দে বা ১৭১৭ খৃঃ অব্দে প্রস্তুত বৈষ্ণব পরকীয়া মত স্থাপনের দলিল)

৫. "সবিশেষ পত্রার্থে জ্ঞাত হইবে ১১ মাঘ রটন্তি চতুর্দ্দশীতে শ্রীশ্রী৺ দুই প্রতিমার স্থাপনা করাইবে তাহার পরে শ্রীযুত দীননাথ রায়কে এথা পাঠাইবে। ফিতরত আলি খাঁ এথা পহুঁচে নাজ্ঞি দাখিল হইলে তাহার চলন মাফিক ব্যবহার হবেক শ্রীযুত মেস্তর মেদলটীন সাহেবকে জে খত এ পত্রের মধ্যে পাঠাইতেছি তাহাতে গোন্ধ না দিয়া মহুর করিযা পাঠাইলাম পাঠ করিয়া গোন্ধ দিয়া বন্ধ করিয়া তাঁহাকে দিয়া তথাকার রোয়দাদ লিখিবা আপনার মঙ্গলবার্তা লিখিয়া স্থির রাখিবা।"[৭] (১১৭৮ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৭৭২ খৃঃ অব্দে পুত্র গুরুদাসকে লেখা মহারাজ নন্দকুমারের চিঠি)।

এই উদ্ধৃতি থেকে দেখা যাবে, ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে সমস্ত গদ্যের দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে তার সাহিত্যগুণ ধর্তব্যের মধ্যে না হলেও এর অন্বয়বিন্যাস ও বাচনরীতি মোটামুটি সাধুভাষাকেই অনুসরণ করেছে। অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দী থেকে চিঠিপত্র, ক্রয়বিক্রয়, দলিলদস্তাবেজ-সংক্রান্ত গদ্য রচনাগুলিতে সে যুগের রেওয়াজ মতো অজস্র ফারসী-আরবী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। হলহেড্ তাঁর *The*

৫. দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৬৩৭।

৬. দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৩৩৮।

৭. নিখিলনাথ রায়ের 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' থেকে উদ্ধৃত।

Grammar of the Bengal Language-এ জগতধির রায়ের যে চিঠিখানিকে[৮] বাংলা গদ্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থাপিত করেছেন তাতে ইসলামি শব্দের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। সুতরাং সাধারণ কাজকর্মে ও আদালতের বাংলায় কতটা আরবী-ফারসীর প্রভাব ছিল তা সহজেই অনুমান করতে পারা যায়। এখনও কি ধর্মাধিকরণের প্রাঙ্গণ থেকে সেমেটিক ভাষায় অকারণ প্রাচুর্য উঠে গেছে? সে যাই হোক, শাসনকার্য ও আইন-আদালতের প্রয়োজনেই সে যুগের গদ্যে এত আরবী-ফারসীর ছড়াছড়ি ঘটেছিল এমন কি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে' (১৮০১)-ও ইসলামি শব্দের বাড়াবাড়ি হাস্যকর হয়ে পড়েছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আর এক বিখ্যাত অধ্যাপক ও পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার অসাধারণ ভাষাকুশলী হলেও তাঁর 'রাজাবলি-তে' (১৮০৮) মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস বর্ণনায় প্রচুর ইসলামি শব্দ (যথা—জিম্বা, কিল্লা, দখল, জবান, দমা, ওগররহ, তক্ত, তমসুক, জলুস, মোক্তিয়ার, সলাই, সিক্কা, খোতবা, জিন্নতুল, বিলায়েই, বিরাদরি, দরমাদি, চুগল, খেদমত, গুজারি ইত্যাদি) ব্যবহারে কৃপণতা করেন নি। ১৭৮৮ সালে টমাস বাইবেলের যে সামান্য অনুবাদ করেছিলেন তাতেও ইসলামি শব্দ স্থান পেয়েছিল। যথা—"খোদার মাহিনা মির্তু কিন্তু খোদার চিরকালই জিছছ্ ক্রাইষ্ট হইতে।" কিন্তু কেরী ও হলহেড বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দের বাড়াবাড়ি আদৌ পছন্দ করতেন না। বোধ হয় কেরীর নির্দেশেই রামরাম বসু তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'লিপিমালা'র (১৮০২) ভাষা থেকে ইসলামি শব্দের বহর একেবারে কমিয়ে দেন। কেরীর বাইবেল অনুবাদের ভাষাভঙ্গিমা অনভ্যস্ত ও কৃত্রিম হলেও তিনি সাধুভাষার ওপর ভিত্তি করেই বাইবেল অনুবাদে অগ্রসর হয়েছিলেন। এখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত বলে গৃহীত একটু পরিচ্ছন্ন গদ্যের নমুনা উদ্ধৃতা হচ্ছে:

> বিক্রমাদিত্য কহিতে লাগিল। কন্যার খাটের সঙ্গে কথা কহিতে-ছিলাম। কন্যা তাহা গোষা করিয়া ফিরিয়া দিলেন। এ ঘরে আর কেহ আছহ। তালবিতাল উত্তর দিলেক। কেনো মহারাজ। পরে রাজা কহিলেন। কে তুমি। তালবিতাল কহিলেক। আমি রাজকন্যার পরিধেয় বস্ত্র…বল শুনি কন্যার কাপড। সে কন্যা কে পাইবে। তালবিতাল কহিলেক। যে ফিরা ঘরে গিয়াছে সেই

---

৮. এই ব্যাকরণ সাহেব কর্মচারীদের জন্য ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে ইংরেজীতে ছাপা হয়, শুধু দৃষ্টান্তগুলি বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত হয়েছিল। উক্ত চিঠির একাংশ: "আমার জমিদারি পরগণে কাকজোল তাহার দুই গ্রাম দারিয়াশীকিশতী হইয়াছে সেই দুই গ্রাম পয়শতী হইয়াছে চাকলে একবরপুরের শ্রীহরেকৃষ্ণ চৌধুরী আজ জবরদস্তী দখল করিয়া ভোগ করিতেছে আমি মালগুজারির শরন্বাহত মারা পড়িতেছি…।"

পাইবেক। কন্যা একথা শুনিয়া কাপড় ফেলিতে পারেন না। হাসিয়া উঠিলেন। কথা কহিলেন।"[৯]

এখানে দেখা যাচ্ছে তালবেতালের গল্পে যেমন পরিহাসরস জমেছে, তেমনি সাধু ভাষার ছাঁদটিও প্রায় আধুনিক কালের মতোই মনে হচ্ছে।

৩.

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যের বিবর্তনে দেখা যাচ্ছে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুন্সীরা স্বয়ং রামমোহন এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩) প্রকাশের পূর্ববর্তী সাময়িক পত্রে বাংলা গদ্যের অনভ্যস্ত জড়তা অনেকটা হ্রাস পেতে থাকে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুন্সীদের অনেকেরই ভাষার জড়তা ঘোচে নি, কারও অন্বয় ঠিক হয় নি। এঁদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যভাষায় বেশ দক্ষতা ছিল; তিনি নানা ধরনের গদ্যরীতি নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন; গুরুগম্ভীর সংস্কৃতগন্ধী সাধুভাষা, পরিচ্ছন্ন সরল সাধুভাষা এবং ভদ্রেতর সমাজের সংলাপ থেকে পাওয়া 'স্ল্যাং' ধরনের কথ্যভাষা—প্রতিটি বিভাগেই তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর 'প্রবোধ-চন্দ্রিকায়' (আনুমানিক ১৮১৩ সালে রচিত, ১৮৩৩ সালে প্রকাশিত) কিছু কিছু উৎকট পঙ্‌ক্তি আছে বলে কেউ কেউ মনে করেন, কটমট ধরনের দুর্বোধ্য গদ্য লিখতেই তিনি অভ্যস্ত ছিলেন।[১০] কিন্তু একথা সত্য নয়। 'প্রবোধচন্দ্রিকায়' নানা ধরনের গদ্যরীতির উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি সংস্কৃত শ্লোকের মূলানুগ অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর নিজের ভাষা অনেক সহজ অথচ ক্লাসিক গাম্ভীর্যপূর্ণ। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর এই রীতিটিকে মার্জিত করে যাবতীয় মননকর্মের বাহন করে তুলেছিলেন। ভাষাশিল্পী হিসেবে মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের কিছু সাদৃশ্য আছে। লৌকিক বাগ্‌বিন্যাসের রীতি মৃত্যুঞ্জয় কতটা সাফল্য ও ঔদার্যের সঙ্গে অনুসরণ করেছিলেন, এখানে তার একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে .

"ইহা দেখিয়া গতিক্রিয়া কহিল খাও এখন পিঠা খাও যেমন মতি তেমনি গতি। অনন্তর তৎপতি গালে হাত দিয়া অধোমুখ হইয়া

৯. সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ২৯শ ভাগ ('ব্রিটিশ মিউজিয়মের কাগজপত্র'—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়)।

১০. রামগতি ন্যায়রত্ন এবং দীনেশচন্দ্র মৃত্যুঞ্জয়ের একছত্র তুলে তাঁকে নিন্দা করেছেন। সেটি হল এই —"কোকিল কুল-কলালাপ-বাচাল যে মলয়াচলানিল যে উচ্ছলচ্ছী করাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।" (দ্র. রঞ্জন পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত 'মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী', পৃ. ২৪৪) এটি কিন্তু তাঁর মৌলিক রচনা নয়। একটি সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ। 'বৈষম্য দোষরহিত' এবং সাম্যগুণবৎ বাক্যে'র উদাহরণ হিসেবে তিনি এই পঙ্‌ক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন।

> কিঞ্চিৎ কাল থাকিয়া কহিল যা যা তুই আর পোড়াস্নে যার যেমন কপাল তার তেমনি সকলি মিলে। কিন্তু যা হউক বেটা ভাল বটে, আমি বিশ্ববঞ্চক আমাকেও বঞ্চনা করিল বাপের বেটা বটে। এ ব্যক্তি যেখানে থাকুক সেখানে গিয়া তাহাকে খুঁজিয়া তাহার সঙ্গে বন্ধুয়ালি করিতে হইল।[১১]

উইলিয়ম কেরীও এই ধরনের চল্‌তি বুলিব সহায়তায় 'কথোপকথন' (ইংরাজী আখ্যা—*Dialogues, intended to facilitate the acquiring of the Bengalee Language—1801*) লিখেছিলেন।[১২] এ ভাষার কাঠামো সাধুভাষার হলেও এতে সংলাপের বাক্‌রীতিটি অনুসৃত হয়েছে :

> ১ মা—ওলো তোর ভাতার কারে কেমন ভালবাসে তাহা বল শুনি।
> ২ য়া—আহা তাহাব কথা কহ কেন এখন আর আমাদের কি আদর আছে। নূতনের দিকে মন ব্যতিরেকে পুরাণের দিগে কে চাহে।
> ১মা—তাহা হউক। তুই সকলেব বড তোর ছাল্যপিল্য হইয়াছে।
> ২য়া—কালিকে ভাই দুপরবেলা কচকচি লাগালে মাঝ্যবিটি তাহা কি বলিব।
> ১মা—কি জন্য কচকচি হইল।
> ২য়া—দূব কব ভাই। তাহা কহিলে আর কি হবে লোকে শুনিলে মন্দ বলিবে। আমাব বাডী ভরা শত্রু এই জন্য ভয় করি।[১৩]

বাজা রামমোহন রায়কে (১৭৭৪-১৮৩৩) বাংলা গদ্যের একজন প্রধান লেখক বলা হয়ে থাকে। বলতে গেলে তিনি বাঙালীকে হাতে ধরে বাংলা গদ্য লিখতে পড়তে শিখিয়েছেন।[১৪] তাঁর আগে কেরী এবং তাঁর অনুচরবর্গ বাংলা গদ্যকে সাহিত্যকর্মে ব্যবহার করলেও মননশীল ও বিতর্কের বিষয়কে গদ্যের যুক্তিবন্ধের মধ্যে আনবার প্রথম গৌবব বামমোহনেব প্রাপ্য অবশ্য তাঁব গদ্যকে ঠিক সাহিত্য-

১১. ঐ গ্রন্থ, পৃ. ২৬১।

১২. এর সবটা তাঁর লেখা নয় বলে মনে হচ্ছে—মৃত্যুঞ্জয়ের বিশেষ প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়।

১৩. রঞ্জন পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'দুষ্প্রাপ্যগ্রন্থমালা'র তেব সংখ্যক পুস্তিকা উদ্ধৃত।

১৪. 'বেদান্ত গ্রন্থে'র "অনুষ্ঠানে' বামমোহন লিখেছিলেন, "বাক্যেব প্রাবম্ভ আব সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষমতে কবিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্বের সহিত অন্বিত করিযা বাক্যেব শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন।" (সাহিত্য-পরিষদ প্রকাশিত 'বামমোহন গ্রন্থাবলীর'-র অন্তর্ভুক্ত "বেদান্ত গ্রন্থ", পৃ. ৯)

গুণোপেত ভাষা বলা যায় না। প্রমথ চৌধুরী তাঁর গদ্যরীতি সম্বন্ধে বলেছেন, "এ গদ্য, আমরা যাহাকে modern prose বলি, তাহা নয়। পদে পদে পূর্বপক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রসর হওয়া আধুনিক গদ্যের প্রকৃতি নয়।"[১৫] নৈয়ায়িক বাংলার উত্তর সাধক রামমোহনের ভাষা হয় অধিকাংশ স্থলে বিতর্কের ভাষা হয়েছে, নয়তো "সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাষ্যকারদিগের রচনা পদ্ধতি অনুসরণে" (প্রমথ চৌধুরী) পর্যবসিত হয়েছে। তাঁর মতো অমিতবলশালী জ্ঞানযোদ্ধা ও অতন্দ্র কর্মযোগী বাংলা গদ্যের শিল্পরূপ দিতে পারেন নি, বড়ই আক্ষেপের বিষয়। অবশ্য কয়েক স্থলে তিনি অতি চমৎকার সরল গদ্য লিখেছিলেন। তাঁর 'পাদরি ও শিষ্য সম্বাদ'-এর (১৮২৩) তীক্ষ্ণ পরিহাস ছেড়ে দিলেও এর বাগ্‌ভঙ্গিমার লঘু ধরন বাস্তবিক প্রশংসার যোগ্য। অতি সহজ, পরিচ্ছন্ন সরস গদ্য লেখার সামর্থ্যও যে তাঁর প্রচুর ছিল তা এই দৃষ্টান্ত থেকেই প্রতিভাত হবে :

> "বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন ; যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকল পত্নী দাস্যবৃত্তি করে……স্ত্রীলোক সকল গোসেবাদি কর্ম করেন, এবং পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘসি স্বহস্তে দেন, বৈকালে পুষ্করিণী অথবা নদী হইতে জলাহরণ করেন, রাত্রিতে শয্যাদি করা যাহা ভৃত্যের কর্ম, তাহাও করেন, মধ্যে মধ্যে কোনো কর্মে কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।…দুঃখ এই, যে এই পর্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধন পূর্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।"[১৬] ('প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ')

১৮৪৭ সালে বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হলে সাহিত্য-রসসিক্ত গদ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠা হল। রামমোহন বাংলা গদ্যকে সর্ববিধ মননকর্মের বাহন করে তুললেও তাতে রসসৃষ্টির অবকাশ ছিল না, যদিও তাতে বিচার-বিতর্ক খুব ভালো-ভাবেই সমাধা হতে পারে।[১৭] দেখা গেছে রামমোহনের সমকালেই অনেকের

১৫. বিশ্বভারতী প্রকাশিত প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধসংগ্রহ', ১ম, পৃ. ৮০

১৬. সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'রামমোহন গ্রন্থাবলী'র অন্তর্ভুক্ত "সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ", ১৮১৯ সালে প্রথম প্রকাশিত, পৃ. ৪৮

১৭. রামমোহন ভক্ত কবি ঈশ্বর গুপ্ত এ বিষয়ে যথার্থ বলেছেন, "তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাবসকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকেরা

লেখাতেই সাধু ছাঁদের পরিচ্ছন্ন রূপটি ক্রমেই একটা বিশিষ্ট রীতিরূপে ফুটে উঠেছিল। এখানে আমরা রামমোহনের সমকালীন কয়েকজন লেখকের রচনার যৎসামান্য দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে সে কথার প্রমাণ দেবার চেষ্টা করব।

১. "এই সকল কথা শুনিয়া হাসিও পায় দুঃখও হয়। ভাল, জিজ্ঞাসা করি যদি এই সকল গর্হিত কর্ম্ম করিলেই লোক ব্রহ্মজ্ঞানী হয়, তবে হাড়ি ডোম চাঁড়াল ও মুচি ইহারা কি অপরাধ করিয়াছে, ইহারদিগকেও কেন ব্রহ্মজ্ঞানী না কহা যায়, তাহারা ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়সকল হইতেও এই সকল কর্ম্মে বরং অধিকই হইবেক, ন্যূন কোন মতেই হইবেক না..."।[১৮] (রামমোহনের প্রতিযোগী কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পাষণ্ড পীড়ন'—১৮২৩ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত)

২. "তালধ্বজ পুরীতে বিক্রম নামে রাজার পুত্র মাধব এক দিবস সৈন্য-সামন্ত সহিত মৃগ মারিতে কোন মহাবনে গিয়া সৈন্যসামন্ত রাখিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া অতিশীঘ্র মৃগের পাছে পাছে গিয়া আপন সেনাগণের অদৃশ্য হইলেন। অতি নির্জ্জন বনে মৃগের অন্বেষণে প্রবেশ করিয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, সে বনে চন্দ্রকলার মত চন্দ্রকলা নামে পরমাসুন্দরী ষোড়শ বর্ষীয়া এক কন্যা জল লইতে সরোবরে যাইতেছে।"[১৯] (গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক'—১৮২৪)

৩. "বহু অন্বেষণ করিয়া যশোহরনিবাসী এক মুনসী সমভিব্যাহারে লইয়া আগমন করিলেন। কর্ত্তা কহেন শুন মুনসী আমার সন্তান-দিগকে পারসী পড়াইবা এবং বহির্দ্বারে থাকিবা। সে দিবস বাবুরা কোন স্থানে নিমন্ত্রণে যানারূঢ় হইয়া গমন করিবেন সঙ্গে যাইবা। মায় খোরাকি তিনটঙ্কা পাইবা।" (১৮২৩ সালে রচিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে প্রমথনাথ শর্ম্মার 'নববাবুবিলাস' থেকে উদ্ধৃত।)

৪. "কথক মাস হইল শ্রীরামপুরের ছাপাখানা হইতে এক ক্ষুদ্র পুস্তক

অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পরিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না।" সংবাদ প্রভাকর, ১৮৫৪, ১৩ই মার্চ, (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাময়িক পত্র' (পৃ. ৫২) থেকে উদ্ধৃত।)

১৮. 'রামমোহন গ্রন্থাবলী'র (সা. প. সংস্করণ) অন্তর্ভুক্ত পুস্তিকা ('পাষণ্ডপীড়ন') থেকে উদ্ধৃত।

১৯. বাংলা ১২৩১ অব্দে স্কুলবুক সোসাইটির জন্য (মুদ্রিত তৃতীয় সংস্করণ), পৃ. ৩১।

প্রকাশ হইয়াছিল ও সেই পুস্তক মাস মাস ছাপাইবার কল্পও ছিল তাহার অভিপ্রায় এই যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের নিকটে সকল প্রকার বিদ্যা প্রকাশ হয় কিন্তু সে পুস্তকে সকলের সম্মতি হইল না এই প্রযুক্ত যদি সে পুস্তক মাস মাস ছাপা যাইত তবে কাহারো উপকার হইত না অতএব তাহার পরিবর্ত্তে এই সমাচারের পত্র ছাপাইতে আরম্ভ করা গিয়াছে। ইহার নাম সমাচার দর্পণ।"[২০]
—(১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণে'র প্রথম সংখ্যা)

৫. এতদ্দেশীয় বিশিষ্ট বংশোদ্ভব অনেক মহাশয়েরা লোকের প্রপঞ্চ বাক্যেতে প্রতারিত হইতেছেন তাহাতে তাঁহারদিগের কোনরূপেই ভাল হইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া খেদিত হইয়া বিবেচনা করিলাম যে নানা দেশ প্রচলিত বেদবেদান্ত মনুমিতাক্ষরা প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা দ্বারা তাঁহাদিগের ভ্রান্তি দূর করিতে চেষ্টা করিব।"[২১]

(১৮৩১ সালে প্রকাশিত 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের প্রথম সংখ্যা)

৬. "মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা এইক্ষণে সাধারণের অপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং অনেকে তাহার মর্ম্ম জানিতে বাসনা করেন। অতএব সেই সকল গ্রন্থ এবং অন্য যে কোন গ্রন্থ, যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসঙ্গ আছে তাহা এই পত্রিকাতে উদ্ধৃত হইবে।"[২২] (১৭৬৫ শকে ১লা ভাদ্র প্রকাশিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যা)

৭. "পারি যুবরাজ হইয়াও গোরক্ষক ছিলেন, এবং সেই পর্ব্বতে আপন পিতার পশুগণ চরাইতেছিলেন; তিনি সেই স্থানে ঐ তিন দেবী কর্ত্তৃক সৌন্দর্যের বিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়া কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করিয়া বলিলেন যে, বিনস দেবী অতি সুন্দরী; তাহাতে যুনো ও মিনর্বা এই উভয় দেবী বড় বিমর্ষা হইয়া ও ক্রোধ করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার প্রাচীন পিতাকে শাস্তি করিতে উদ্যত হইলেন।"
(কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে ১৮৩০ সালে প্রকাশিত 'সত্যইতিহাসসার' পৃ. ৯)

২০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাময়িক পত্র', পৃ. ১৬
২১. ঐ, পৃ. ৫৬
২২. বিনয় ঘোষ সম্পাদিত 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র' (২য় খণ্ড), পৃ. ৮৩

এই উদ্ধৃতিগুলি থেকে দেখা যাবে, রামমোহনের সমকালে এবং বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের আগেই সাধু ছাঁদের বাংলা গদ্য শিক্ষিতসমাজে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল—এ বিষয়ে সাময়িক পত্রের দানও কম নয়। কিন্তু তখনও সুরতালের সামঞ্জস্য ও বাক্যগঠনের স্থিতিস্থাপকতা অনেকের কানে ধরা পড়ে নি। বিদ্যাসাগর তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ ('বেতালপঞ্চবিংশতি') থেকেই বাংলা গদ্যের মেদমাংসে লাবণ্য সঞ্চার করতে থাকেন। গদ্যভাষারও যে একটা বিশিষ্ট রচনাপদ্ধতি আছে, তারও কবিতার মতো সুর-তাল-যতি আছে—সর্বোপরি গদ্যেও বিশেষ ব্যক্তিমনের প্রতিফলন হতে পারে, সাহিত্যে যাকে 'স্টাইল' বলে, একথা তাঁর গ্রন্থগুলি থেকে সর্বপ্রথম অবলীলাক্রমে ফুটে উঠল। অতঃপর অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করব।

৪

বিদ্যাসাগরকে কেউ কেউ শুধু স্কুলপাঠ্য পুস্তিকা ও অনূদিত গ্রন্থের রচনাকার বলে গদ্যশিল্পী হিসাবে তাঁর কৃতিত্বকে লঘু করতে চাইতেন। কিন্তু ভাষা ও সাহিত্যের গঠনের কালে অনুবাদকর্মের দ্বারাই সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়। তা ছাড়াও বিদ্যাসাগরের যে সমস্ত স্বাধীন রচনা আছে, তাতেও তাঁর মৌলিক রচনাশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক সময় লেখকের কৃতিত্বের গুণে অনূদিত গ্রন্থও মৌলিক গ্রন্থের মতোই চিত্তাকর্ষী হয়। অনুবাদক বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব বিষয়ে আমরা দ্বিতীয়খণ্ডে সবিস্তারে আলোচনা করব।

'বেতালপঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) বিদ্যাসাগরের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ হলেও, তাঁর জীবনচরিত-কারদের মতে তিনি তারও আগে 'বাসুদেব চরিত' নামে একখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন, যেটি ভাগবতের কৃষ্ণলীলার অন্তর্ভুক্ত কিয়দংশের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নি, এবং তার পাণ্ডুলিপিও নষ্ট হয়ে গেছে। এ বিষয়ে কয়েকটি তথ্য উপস্থাপিত করা যাচ্ছে।

বিদ্যাসাগরের দু'জন জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিহারীলাল সরকার বলেছেন যে 'বাসুদেব চরিতে'র জীর্ণ পাণ্ডুলিপি তাঁরা স্বচক্ষে দেখেছিলেন।[২৩] এবং সেই পাণ্ডুলিপি

২৩, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় - বিদ্যাসাগর (১৮৯৫), পৃ. ১৩৪

বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর (৪র্থ সংস্করণ, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ), পৃ ১৮০

এই আলোচনায় চণ্ডীচরণ ও বিহারীলাল রচিত জীবনচরিত দুখানির উল্লিখিত সংস্করণ থেকেই উপাদান গৃহীত হয়েছে, পৃষ্ঠাঙ্কও ঐ সংস্করণের।

থেকে তাঁরা স্ব স্ব গ্রন্থে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। পাণ্ডুলিপির কোন পত্রাঙ্ক থেকে উদাহরণগুলি নেওয়া হয়েছে তাঁরা তাও জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিদ্যাসাগরের 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র পূর্বেই 'বাসুদেব চরিত' রচিত হয়েছিল। বোধ হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-কর্তৃপক্ষের অনুরোধে।[২৩]

সম্প্রতি একটি সংবাদে দেখা যাচ্ছে যে, এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে ঊনবিংশ শতাব্দীতে লেখা একখানি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গদ্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আছে। লেখকের নাম হেনরি সার্জ্যান্ট। এটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাগজপত্রের অন্তর্ভুক্ত।[২৪] সাদা কাগজের খাতায় লেখা ভাগবত-অবলম্বী এই পাণ্ডুলিপির আখ্যাপত্র এই ধরনের : শ্রীমদ্ভাগবত / শ্রীশ্রীনারায়ণের অষ্টমাবতার / শ্রীশ্রীকৃষ্ণ তাহার জন্ম ও বাল্যলীলা / এবং কংসবধের উপাখ্যান / ভাষা সংগ্রহঃ / হেনেরি সারজ্যান্ট সাহেবের ক্রিয়তে। হেনেরি সার্জ্যান্ট বোধহয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং বাংলা শিখে ভাগবতের কিয়দংশের চমৎকার অনুবাদ করেন। পাণ্ডুলিপিতে পেন্সিল দিয়ে ভ্রমসংশোধনের অস্পষ্ট চিহ্ন আছে, হাতের লেখা অতি চমৎকার, কোন বাঙালী লিপিকারের হওয়াই অধিকতর সম্ভাবনা। এই সম্পর্কে কেউ কেউ অনুমান করেছেন, বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক ছিলেন,[২৫] তখন তিনি বোধ হয় কোন সিভিলিয়ান ছাত্রের লেখার ভাগবতের কিছু কিছু সংশোধন করে দেন। পরে যখন কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে সরল বাংলায় বিদেশী ছাত্রের উপযোগী কোন আখ্যান লিখতে বললেন,[২৬] তখন তিনি 'বাসুদেব চরিত' রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে কেউ কেউ মনে করেন যে, বিদ্যাসাগর 'বাসুদেব চরিত' নামে বাস্তবিক কোন

২৩. বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, পৃ. ১৫৯

২৪ এশিয়াটিক সোসাইটির ৭৬ পাণ্ডুলিপির সংখ্যা – বঙ্গ ৬১। তালিকায় এইভাবে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ঃ
Substance—country-made paper, 11 × 7 inches, Folio 66, written in prose, character Bengali of the 19th century. Appearance fresh. This is one of the Mss. of Fort William College Collections.

২৫. ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বিদ্যাসাগর দু'বার শিক্ষকতা করেছিলেন। প্রথমবার সেরেস্তাদারের (শিক্ষক) পদে বহাল ছিলেন ১৮৪১ সাল থেকে ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত, তার পর সংস্কৃত কলেজে এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করেন, কিন্তু সেক্রেটারী রসময় দত্তের সঙ্গে বনিবনা না হওয়াতে তিনি সে পদে ইস্তফা দিয়ে পুনরায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রবেশ করে হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হলেন (১৮৪৯)। অবশ্য এর কিছুদিন পরে তিনি পুনরায় সংস্কৃত কলেজে আহূত হন, এবং অধ্যক্ষের পদে বৃত হন (১৮৫০)।

২৬. পূর্বে বিহারীলাল সরকারের গ্রন্থে (পৃ. ১৫৯) তার উল্লেখ আছে।

আখ্যানগ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে মনে হয় না। উক্ত হেনরি সার্জ্যান্টের ভাগবত অনুবাদের কথা কিংবদন্তীর আকারে বিদ্যাসাগরের রচনা বলে প্রচারিত হয়েছে, প্রচার করেছেন তাঁর জীবনচরিতকারদ্বয়। কিন্তু এ অনুমানের পক্ষে কোন যুক্তি নেই। বিদ্যা-সাগরের চরিতকারেরা যদি নির্জলা মিথ্যা বলে থাকেন তো আলাদা কথা। অন্য কোন বিরোধী প্রমাণ না পেলে 'বাসুদেব চরিত'কে বিদ্যাসাগরের প্রথম গদ্যগ্রন্থ বলে স্বীকার করে নিতে হবে।

অবশ্য উক্ত সার্জ্যান্ট সায়েবের বাংলা গদ্যের রীতি সে যুগের যে-কোন বাঙালীর পক্ষে শ্লাঘনীয় হতে পারত, "অনেক দিন পরে ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী তিথীতে বুধবারে অর্দ্ধরাত্রিতে যখন পৃথিবী অনেক দুরাচার ও অধর্ম দ্বারা অনাথার ন্যায় হইলেন তখন স্বর্গ হইতে ঈশ্বরীয়ইহিত (?) প্রকাশিত আশ্চর্য সন্তান উৎপন্ন হইলেন যে সময়ে বসুদেব সেই বালককে সন্দর্শন করিয়া দিব্যচক্ষু পাইলেন তখন বুঝিলেন যে ইনি নিশ্চয় ঈশ্বর বটেন দেবকীরও তদ্রূপ জ্ঞান হইল ......।"[২৭] এ ভাষা বিদেশীর রচনা বলে মনেই হয় না।

মনে হয় এ আখ্যানে হিন্দুর ধর্মগ্রন্থের কাহিনী গৃহীত হয়েছিল বলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্তৃপক্ষ এটি কলেজের পাঠ্য গ্রন্থরূপে গ্রহণ ও প্রকাশ করতে সম্মত হন নি।[২৮] পাণ্ডুলিপির আকারে এ গ্রন্থ বহুদিন বিদ্যাসাগরের কাছে ছিল, পরে যখন তিনি মুদ্রণের জন্য সচেষ্ট হন, তখন পাণ্ডুলিপিটি খুঁজে পাওয়া যায় নি। সুতরাং তাঁর জীবিত-কালে এর মুদ্রণ সম্ভব হয় নি। তাঁর লোকান্তর প্রাপ্তির পরে তাঁর পুত্র নারায়ণ চন্দ্র অনেক কষ্টে এই পাণ্ডুলিপি কীটদষ্ট অবস্থায় খুঁজে পান এবং বিদ্যাসাগরের জীবনীকার দু'জনকে তিনি এ পাণ্ডুলিপি দেখতে দেন। তাঁরা এ পাণ্ডুলিপি (বিশেষতঃ বিহারীলাল) অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পড়েছিলেন।[২৯] মনে হয় এই গ্রন্থ বিদ্যাসাগরের প্রথম বার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেরেস্তাদার পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময় এবং 'বেতালপঞ্চবিংশতি'-র রচনার পূর্বেই রচিত হয়। বিহারীলাল সরকার মনে করেন, ১৮৪২ থেকে ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দের কোন এক সময়ে এ গ্রন্থ রচিত হয়ে থাকবে।[৩০]

বিদ্যাসাগরের এ অনুবাদ যে অতি সুললিত তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি এই গ্রন্থে অনুবাদ-কর্মের প্রথম পরীক্ষা করেছেন, রচনার গুণে অনুবাদ বলে মনেই হয় না। জীবন-

২৭. এশিয়াটিক সোসাইটির পাণ্ডুলিপির (বঙ্গ—৪১) ৭ ফোলিও।

২৮. বিহারীলাল সরকারের 'বিদ্যাসাগর', পৃ. ১৭৯

২৯. ঐ, পৃ. ১৮০

৩০. ঐ, পৃ. ১৮০

চরিতকারের একথা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত : "ইহা অবলম্বন বা অনুবাদ হউক ; লিপিচাতুর্য ও ভাষাসৌন্দর্যে মূল সৃষ্টিসৌন্দর্যের সমীপবর্তী" (বিহারীলাল)। এর বিষয়বস্তু হল শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের কয়েকটি আখ্যান ; ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ নয় কোথাও ভাবানুবাদ, কোথাও-বা কিঞ্চিৎ আক্ষরিক অনুবাদ। একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে :

> "একদিবস কৃষ্ণবলরাম ও অন্য অন্য গোপবালকেরা একত্রে মিলিয়া খেলা করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে বলরাম প্রভৃতি গোপনন্দনেরা নন্দমহিষীর নিকট গিয়া কহিল, ওগো, কৃষ্ণ মাটি খাইয়েছে। আমরা বারণ করিলাম, শুনিল না। তখন পুত্রবৎসলা যশোদা ব্যস্তেব্যস্তে আসিয়া কৃষ্ণের গণ্ড ধরিলেন এবং তর্জন করিয়া কহিলেন, রে দুষ্ট তুই মাটি খাইয়াছিস! রহ, আজ আমি তোকে মাটি খাওয়া ভাল করিয়া শিখাইতেছি।"[৩১]

এই অনুবাদ যে কত সবল, তা পঞ্চানন তর্করত্ন অনূদিত এবং শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ সম্পাদিত অধুনা প্রচলিত ভাগবতের অনুবাদ (পৃ ৬২৮) মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে। বিহারী-লাল সরকার বলেছেন, "তবে 'বাসুদেব চরিতে'র অনুবাদের ভাষা ও লিপিভঙ্গী অপেক্ষা তাঁহার পরবর্তী অনুবাদ ও প্রবন্ধাদির লিপিভঙ্গী যে অধিকতর পরিমার্জিত ও বিশুদ্ধীকৃত হইয়াছে তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।"[৩২] কিন্তু এ বিষয়ে আমরা ভিন্ন মত পোষণ করি। 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র প্রথম সংস্করণের ভাষা 'বাসুদেব চরিতে'র ভাষার চেয়ে অনেক অনভ্যস্ত। কিন্তু 'বাসুদেব চরিতে'র ভাষা প্রথম রচনা বলে মনেই হয় না। পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যাওয়াতে বাংলা গদ্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

৫.

বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বেতালপঞ্চবিংশতি' ১৮৪৭ সালে (সংবৎ ১৯০৩) প্রকাশিত হয়। এই আখ্যানগ্রন্থ থেকে সে যুগের বাঙালী-সমাজ সর্বপ্রথম গল্পরসের আস্বাদ লাভ করে। বেতালের অদ্ভুতরস এবং বুদ্ধির চমক সে যুগের সাধারণ পাঠকের বিশেষ কৌতূহল জাগিয়েছিল। শিরীষ বৃক্ষে প্রলম্বমান বেতালের প্রশ্নে রাজা বিক্রমাদিত্যের বিচক্ষণ জবাব সহজ বুদ্ধিকেই আশ্রয় করেছে, কোন কুটিল, জটিল বা দুরূহ-দুরধিগম্য বিষয় বেতাল অবতারণা করেনি। যে প্রশ্নের সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি ও যুক্তির দ্বারা জবাব দেওয়া যায় বিক্রমাদিত্যের অবলম্বন সেই সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি। রাজা বেতালের আখ্যানঘটিত চব্বিশটি

৩১. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর (পৃ. ১৬৪)

৩২. বিহারীলাল সরকার বিদ্যাসাগর (পৃ. ১৭৮)

প্রশ্নেরই যুক্তিসঙ্গত জবাব দিয়েছেন, কেবল শেষ আখ্যানের (পঞ্চবিংশতি আখ্যান) জবাব দিতে না পেরে মৃদু হেসে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেছেন। সে আখ্যান ও তৎসংলগ্ন প্রশ্নটি এখানে সংক্ষেপে বলা যাচ্ছে :

দাক্ষিণাত্যের ধর্মপুর নগরের রাজা মহাবল রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে মহিষী ও কন্যাকে নিয়ে অরণ্যে পালিয়ে যান। একদা আহার সংগ্রহের ইচ্ছায় অন্যত্র যাবার সময়ে তিনি অরণ্যে একস্থানে মহিষী ও কন্যাকে বসিয়ে রেখে যান। বহুক্ষণ হয়ে গেলেও রাজা ফিরলেন না। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হল। তখন মাতা-কন্যা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে রোদন করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে কুণ্ডিনের অধিপতি চন্দ্রসেন এবং তাঁর পুত্র ঐ অরণ্যে মৃগয়াব্যাপদেশে হাজির হন। তাঁরা মাতা ও কন্যাকে সান্ত্বনা দিয়ে রাজধানীতে নিয়ে এলেন এবং "কিছুদিন পরে, রাজা রাজকন্যার, রাজকুমার রাজমহিষীর পাণিগ্রহণ করিলেন।" এই আখ্যানটি বিবৃত করে বেতাল জিজ্ঞাসা করল, "মহারাজ ! এই দুই নারীর সন্তান জন্মিলে তাহাদের পরস্পর কি সম্বন্ধ হইবে, বল।" এ উদ্ভট প্রশ্নের জবাব দেওয়া দুরূহ। এখনকার বেতাল একটু ঘুরিয়ে প্রশ্ন করতে পারত, এদের সন্তান পরস্পবকে কি বলে ডাকবে। এ হেঁয়ালির যথার্থ জবাব হয় না। তাই "বিক্রমাদিত্য, ঈষৎ হাসিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।" অবশ্য আমাদের পিতৃ-অনুগামী সমাজ বলে এ প্রশ্নেরও জবাব দেওয়া যায়। তাদেব মধ্যে খুড়ো-ভাইপোর সম্বন্ধ হবে। অর্থাৎ রাজা চন্দ্রসেন এবং মহাবলের কন্যাব সন্তান হবে খুল্লতাত, এবং বাজপুত্র হবে ভ্রাতুষ্পুত্র। এই আখ্যান থেকে মনে হচ্ছে, শিরীষবৃক্ষে দোদুল্যমান বেতালের বাসর-ঘরের জামাই-ঠকানো প্রশ্ন বিলক্ষণ জানা ছিল।

এ আখ্যান অবক্ষয়ী হিন্দুযুগে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল। ফলে এতে নরনারীর শঠতা বঞ্চনা, চরিত্রভ্রষ্টতা, কামুকতা এবং উপপতি-উপপত্নীর বাহুল্য অধিকতর প্রাধান্য পেযেছে। এর সঙ্গে সে যুগের সমাজজীবনের কিছু সংযোগ থাকা কিছু বিচিত্র নয়। কারণ অধঃপতিত ভ্রষ্ট সমাজ না হলে ভ্রষ্ট-ভ্রষ্টার গল্প সেযুগে এত মুখরোচক হত না। 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি'-র মূল হচ্ছে সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর', তাতে এটি "বেতালপঞ্চবিংশতিকা" নামে উল্লিখিত হয়েছে। 'কথাসরিৎসাগরে' এবং ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী'-তে বেতালের আখ্যান পুরাতন আকারেই ছিল—যদিও মূল গল্পগুলির উৎস অন্য কোন বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে মনে হয়। পরে অনেকেই এই আখ্যানগুলিকে পদ্যে এবং গদ্যে-পদ্যে ('চম্পূ') পুনর্লিখনে উৎসাহিত হয়েছিলেন। শিবদাস ভট্ট জম্ভলদত্ত এবং বল্লভদাসের নামে 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র নানা সংস্কৃত পুঁথি পাওয়া গেছে। কেউ কেউ বলেন, গল্পগুলি নাকি পূর্বে ছন্দেই লেখা হয়েছিল। এর মধ্যে বল্লভদাসের গল্পগুলি আকারে সংক্ষিপ্ত।[৩৩]

৩৩. A. B. Keith—*History of Sanskrit Literature* (1941), p 288.

এ পর্যন্ত সংস্কৃত 'বেতাল পঞ্চবিংশতির' তিনটির নির্ভরযোগ্য সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে কলকাতা থেকে জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় জম্ভলদত্তের বেতাল নাগরী অক্ষরে ছাপা হয়। বেতালের এই হচ্ছে এই অঞ্চলের প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ। এরপর লাইপ্‌জিগ্‌ থেকে ১৯১৫ সালে শিবদাস ভট্টের মূল সংস্কৃত বেতাল জার্মান টীকা সহ প্রকাশিত হয়—*Die Vetala Pancavimsatike*, এবং ১৯৩৪ সালে American Oriental Series-এর চতুর্থ খণ্ডে জম্ভলদত্তের বেতাল প্রকাশিত হয়েছে।[৩৪] প্রাদেশিক ভাষাতেও এর অনুবাদ খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে রাজা জয়-সিংহের আদেশে সুবত কবীশ্বর 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র ব্রজ্‌ ভাখায় অনুবাদ করেন। গিলক্রাইস্টের প্রবর্তনায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য উক্ত কলেজের মুন্সী মুজাহার আলি খাঁ (ইনি 'বিলা' নামে হিন্দুস্থানী সাহিত্যে পরিচিত) এবং 'প্রেমসাগর'-এর কবি লাল্লু লাল কব্‌ ব্রজ্‌ ভাখা থেকে হিন্দী-হিন্দুস্থানীতে অনুবাদ করেন (১৮০৫)। এর নাম দেওয়া হয়েছিল 'বৈতাল পচ্চীসী'। ১৮৫২ সালে বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় এর একটি নতুন সংস্করণ এবং ১৮৫৮ সালে হরিশচন্দ্র তর্কালঙ্কারের দ্বারা বিদ্যাসাগরের সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয়।[৩৫] বিদ্যাসাগরের 'বেতালপঞ্চবিংশতি' সংস্কৃত থেকে নয়, 'বৈতাল পচ্চীসী' শীর্ষক হিন্দুস্থানী গ্রন্থ থেকেই অনূদিত হয়েছিল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ (সেক্রেটারী) জি, টি, মার্শেলের নির্দেশে বিদ্যাসাগর "বৈতাল পচীসী নামক প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক অবলম্বন" (দ্বিতীয় সংস্করণ বেতালের বিজ্ঞাপন) করে অনুবাদ করেন এবং নাম দেন 'বেতালপঞ্চবিংশতি'। এর প্রথম থেকে নবম সংস্করণ পর্যন্ত তিনি বিরামচিহ্ন হিসেবে শুধু দাঁড়ি চিহ্ন ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু দশম সংস্করণে (১৯৩৩ সংবৎ—১৮৭৭ খ্রীঃ অঃ) থেকে ইংরেজী গ্রন্থের কমা-সেমি-কোলন প্রভৃতি বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছিল।[৩৬] সংস্কৃত থেকে অনুবাদ না করে তিনি

৩৪. Edited by M. B. Emenneaw.

৩৫. এটির আখ্যাপত্র এইরূপ : *The Bytal-Pacheesee* or The Twentyfive Tales of the Demon (Vidyasagara's edition), Printed by Harish Chandra Tarkalankar (1858), Pubilshed by W. Nassan Lees.

৩৬. দশম সংস্করণের বিজ্ঞাপন, "এই পুস্তক, এত দিন, বাঙ্গালা ভাষার প্রণালী অনুসারে মুদ্রিত হইয়াছিল, সুতরাং ইঙ্গরেজী পুস্তকে যে সকল বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে, পূর্ব পূর্ব সংস্করণে সে সমুদয় পরিগৃহীত হয় নাই। এই সংস্করণে সে সমস্ত সন্নিবেশিত হইল।"

হিন্দুস্থানী ‘বৈতাল পচ্চীসী’ থেকে কেন অনুবাদ করলেন তার কারণ দুর্জ্ঞেয় নয়। প্রথম বার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সেরেস্তাদারের (অর্থাৎ প্রথম পণ্ডিত) পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময়ে তাঁকে বিদেশী ছাত্রদের বাংলা পড়াতে হত, বাংলা ও হিন্দীতে লেখা উত্তর পত্র পরীক্ষা করতে হত। কার্যানুরোধে তাঁকে বেশ ভালো করে ইংরেজী শিখতে হয়েছিল। একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত প্রতিদিন তাঁকে হিন্দী শেখাতেন। এইভাবে তিনি অল্পকালের মধ্যে হিন্দী-হিন্দুস্থানী ভাষায় বিশেষ অধিকার অর্জন করেন। হিন্দী ভাষাজ্ঞান তাঁর কিরকম আয়ত্তে এসেছে তার পরীক্ষা করবার জন্যই বোধহয় তিনি হিন্দী ‘বৈতাল পচ্চীসী’ অবলম্বনে ‘বেতালপঞ্চবিংশতি’ রচনা করেন। অবশ্য এর কিছু কিছু উগ্র আদি-রসের বর্ণনা (যা মূল সংস্কৃতেও ছিল), তিনি দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে ত্যাগ করে-ছিলেন।

একদা ‘বেতালপঞ্চবিংশতি’-র গ্রন্থকর্তৃত্ব সম্বন্ধে কিছু অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটেছিল। বিদ্যাসাগরের সতীর্থ, সহকর্মী ও বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার বিদ্যাসাগরের সর্ববিধ মঙ্গলকর্মে যথাসাধ্য সাহায্য করতেন—এ বিষয়ে তাঁর মন আশ্চর্য ধরনের আধুনিক ছিল। তার জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে ‘বিদ্যাভূষণ’) ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত ‘কবিবর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত ও তদগ্রন্থ আলোচনা’ পুস্তিকার দু’ এক স্থলে এমন মন্তব্য করেছিলেন যে বিদ্যাসাগরের ক্ষুব্ধ হবার কারণ ঘটেছিল। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের ‘বেতালপঞ্চবিংশতি’ সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, যদিও ও গ্রন্থ বিদ্যাসাগরের রচনা বলে চলে, তবু ওতে তাঁর শ্বশুর মদনমোহনেরও যথেষ্ট দান আছে :

> “বিদ্যাসাগর প্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতি-তে নূতনভাব, ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এতদূর সংশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়াছিল যে, বোমান্ট ও ফ্লচরের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।” (ঐ পুস্তিকা, পৃ ৪২)

একথা সত্য হলে এ গ্রন্থের যশোভাগ দুজনকেই ভাগ করে নিতে হবে এবং প্রকা-রান্তরে বিদ্যাসাগরের ওপর অনৃতাচারের অভিযোগ এসে পড়ে। যিনি সারাজীবন ‘পিরামিডের’[৩৭] মতো মাথা উঁচু করে চলেছিলেন, অন্যায় অসত্যকে বিষবৎ পরিহার

৩৭. কবি মানকুমারী বসু বিদ্যাসাগরের শেষকৃত্যের সময়ে শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন। মহাপুরুষের নশ্বর দেহের ভস্মীভূত হতে দেখে শোকাহত মানকুমারী এইভাবে নিজের মনোভাব প্রকাশ করেন “ঐ জাহ্নবী বক্ষে ধূ ধূ করিয়া চিতার আগুন জ্বলিতেছে। ঐ আগুনে বাঙ্গালার সর্বনাশ হইতেছে। বাঙ্গালীর পিরামিড ভস্মসাৎ হইতেছে” (শোকোচ্ছ্বাস)

করে চলতেন, তিনি প্রিয়বন্ধু মদনমোহনের পরিশ্রমের গৌরব আত্মসাৎ করবেন এ কখনও সম্ভব নয়।[৩৮] আসল ব্যাপার বিদ্যাসাগর 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র দশম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে বেতালের রচিতাংশ শুনিয়ে তাঁদের অভিমত চাইতেন। 'জীবনচরিত'-এর বিজ্ঞাপনেও তিনি মদনমোহনের নিকট অনুবাদকর্মের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছিলেন। বেতাল-সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি বলছেন:

> "আমি বেতালপঞ্চবিংশতি লিখিয়া, মুদ্রিত করিবার পূর্বে, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে[৩৯] শুনাইয়াছিলাম। তাঁহাদিগকে শুনাইবার অভিপ্রায় এই যে কোনও স্থল অসঙ্গত ও অসংলগ্ন বোধ হইলে, তাঁহারা স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন; তদনুসারে আমি সেই সেই স্থল পরিবর্ত্তিত করিব। আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে, কোন কোন উপাখ্যানে একটি স্থলও তাঁহাদের অসঙ্গত বা অসংলগ্ন বোধ হয় নাই; সুতরাং সেই সেই উপাখ্যানের কোনও স্থলেই কোনও প্রকার পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যকতা ঘটে নাই। আর, যে সকল উপাখ্যানে, স্থানে স্থানে, দুই একটি শব্দ মাত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। বিদ্যারত্ন ও তর্কালঙ্কার ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই করেন নাই" (বেতালের দশম সংস্করণের বিজ্ঞাপন)

তখন মদনমোহন পরলোক গমন করেছেন, সুতরাং এ বিষয়ে তাঁর সাক্ষ্য পাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন তখনও সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বিদ্যাসাগরকে লিখে পাঠালেন: "এতদ্বিষয়ে প্রকৃত

৩৮. বরং তিনি নিজের রচনা অপরের নামে প্রকাশ করতে কখনও দ্বিধা বোধ করেন নি। তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকার সময়ে *Moral Class Book* অবলম্বনে 'নীতিবোধ' রচনা আরম্ভ করেন। খানিকটা রচনার পর এ গ্রন্থ রচনা ত্যাগ করে কার্যান্তরে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর অনুমতিক্রমে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও কিছু লিখে বিদ্যাসাগরের রচনাগুলি সহ 'নীতিবোধ' নিজ নামে প্রকাশ করেন।

৩৯. মদনমোহন বিদ্যাসাগরের সহচর হলেও চরিত্রের দিক দিয়ে নরম প্রকৃতির ছিলেন, শনৈশ্চরের ধূম্রবলয়ের মতো বিদ্যাসাগরের চারিদিকে আবর্তিত হতেন। তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য যথার্থ বলেছেন, "বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে তর্কালঙ্কার-বিদ্যাসাগর দুইজনেই বোধহয় কাছাকাছি ছিলেন, কিন্তু চরিত্র অংশে আসমান-জমিন প্রভেদ। যাহাকে back-bone কহে, বিদ্যাসাগরের তাহা পূর্ণমাত্রায় ছিল, কিন্তু সে বিষয়ে তর্কালঙ্কার হয়ত vertebrate শ্রেণীর অন্তর্গত হবেন কিনা সন্দেহ।" —বিপিনবিহারী গুপ্তের 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম, পৃ. ১০৬

বৃত্তান্ত এই—আপনি, বেতালপঞ্চবিংশতি রচনা করিয়া, আমাকে ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে শুনাইয়াছিলেন। শ্রবণকালে আমরা মধ্যে মধ্যে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতাম। তদনুসারে স্থানে স্থানে দুই একটি শব্দ পরিবর্তিত হইত। বেতাল পঞ্চবিংশতি বিষয়ে আমার অথবা তর্কালঙ্কারের, এতদতিরিক্ত কোন সংস্রব বা সাহায্য ছিল না।"[৪০] এই সমস্ত উল্লেখ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, 'বেতালপঞ্চবিংশতি'-র গ্রন্থকর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে বিদ্যাসাগরের, তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু মদনমোহন এবং অনুচর গিরিশচন্দ্রকে তিনি কিছু কিছু অংশ শুনিয়েছিলেন, তাঁদের অভিমতও চেয়েছিলেন। কিন্তু তাই বলে বোমণ্ট ও ফ্লেচারের নাটকের মতো 'বেতালপঞ্চবিংশতি' দু বন্ধুর মিলিত রচনা—একথা যুক্তিসঙ্গত নয়।

'বেতালপঞ্চবিংশতি'-র প্রথম সংস্করণের ভাষায় কিছু জড়তা ছিল, এবং দু-চারটি আদিরসের উগ্র বৃত্তান্তও ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি ভাষার জড়তা অনেকটা কাটিয়ে ওঠেন এবং অপ্রচলিত দুরূহ শব্দের স্থলে প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেন। অবশ্য ভূরুহ,[৪১] প্রাড্বিবাক, মলিম্লুচ, বৈয়র্থ্য, মহানস প্রভৃতি দুচারটি অপ্রচলিত শব্দ থাকলেও বিদ্যাসাগর বেতালের ভাষাবিন্যাস ও শব্দযোজনায় অতি সরল অথচ গম্ভীর

৪০. মদনমোহন বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও উভয়ের মধ্যে নানা কারণে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়েছিল। এ বিষয়ে 'বিদ্যাসাগরের নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস' পুস্তিকায় কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। মদনমোহনের লোকান্তরের বেশ কয়েক বৎসর পরে তাঁর জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ শ্বশুরের জীবনচরিত রচনাপ্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের প্রতি কয়েকটি প্রচ্ছন্ন কটু ইঙ্গিত করেছিলেন। তার মধ্যে কিছু অর্থনৈতিক, কিছু বেতালপঞ্চবিংশতির গ্রন্থকর্তৃত্ব সম্বন্ধে মদনমোহনের দান সম্পর্কিত। 'নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস' ও আলোচনাপ্রসঙ্গে পরবর্তী খণ্ডে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা যাবে। তবে এই ঘটনাটি নাকি যোগেন্দ্রনাথ তারানাথ তর্কবাচস্পতির কাছে শুনেছিলেন। (দ্রষ্টব্য বিহারীলালের বিদ্যাসাগর পৃ ১৭৪)

৪১. প্রথম সংস্করণের ভাষা দ্বিতীয় সংস্করণ থেকেই সরল হতে আরম্ভ করে। প্রথম সংস্করণে ছিল, "উত্তাল তরঙ্গমালাসঙ্কুল। উৎফুল্ল ফেনিলচয়চুম্বিত ভয়ঙ্কর তিমিমকরনক্রচক্র ভীষণ স্রোতস্বতীপতি প্রবাহ মধ্য হইতে সহসা এক দিব্যতরু উদ্ভূত হইল।" পরবর্তী সংস্করণে এর গুরুভার হ্রাস পেল "সমুদ্রের প্রবাহ মধ্য হইতে অকস্মাৎ এক স্বর্ণময় ভূরুহ বিনির্গত হইল" (বিদ্যাসাগর রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫) 'বৈতাল পচ্চীসী'র রূপান্তর "সাগরমে সে এক, সোনেকা তরবর নিকলা, উস্ জমুর‍্রদকে পাত, পুখরাজকে ফুল, মুক্তোকে ফাল্ঁ লাগে। ..." বেতালের প্রথম সংস্করণে মূল 'বৈতাল পচ্চীসী'র অনাবশ্যক আলঙ্কারিক বাহুল্য তিনি কিছু রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে বর্ণনার ঘনঘটা অনেকটা অনেকটা পরিত্যাগ করেন। শুধু লাল্লুলাল যেখানে 'সোনেকা তরবর' বলেছেন, সেখানে বিদ্যাসাগর একটু অপ্রচলিত 'ভূরুহ' শব্দ প্রয়োগ করেছেন।

রীতি ব্যবহার করেছেন। যাকে সাহিত্যের সাধুভাষা বলে, তার প্রথম পরিচয় 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'-র ভাষায় পাওয়া গেল। এখানে এই ধরণের দুটি একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে :

> ১ "এই মায়াময় সংসার অতি অকিঞ্চিৎকর। ইহাতে লিপ্ত থাকিলে, কেবল জন্মমৃত্যু পরম্পরারূপ দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিতে হয়, প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান পদার্থ মাত্রই মায়াপ্রপঞ্চ, বাস্তবিক কিছুই নহে। কে কাহার পিতা, কে কাহার পুত্র। সকলই ভ্রান্তিমূলক"।[৪২] (বিদ্যাসাগর-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৬)
>
> ২ "তথায় এক অতি মনোহর সরোবর ছিল। তিনি তাহার তীরে গিয়া দেখিলেন, কমল সকল প্রফুল্ল হইয়া আছে, মধুকরেরা মধুপানে মত্ত হইয়া, গুনগুন রবে গান করিতেছে, হংস, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি জলবিহঙ্গগণ তীরে ও নীরে বিহার করিতেছে, চারিদিকে, কিশলয় ও কুসুমে সুশোভিত নানাবিধ পাদপসমূহ বসন্তলক্ষ্মীর সৌভাগ্য বিস্তার করিতেছে, সর্বতঃ শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার হইতেছে।" (বি বচনাবলী, পৃ ৮৮)
>
> ৩. "সখি! আমি এই বিষম বিপদে পড়িয়াছি, কি উপায় করি, বল। গৃহে গিয়া কেমন করিয়া, পিতামাতার নিকট মুখ দেখাইব। তাঁহারা কারণ জিজ্ঞাসিলে, কি উত্তর দিব। বিশেষতঃ আজ আবার সেই সর্বনাশিয়া আসিয়াছে, সেই বা, দেখিয়া শুনিয়া কি মনে করিবেক। সখি তুমি আমায় বিষ আনিয়া দাও, খাইয়া প্রাণত্যাগ করি, তাহা হইলেই সকল আপদ ঘুচিয়া যায়।" (ঐ, পৃ ৪৪)

এই তিনটি দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাবে, প্রথমটিতে ক্লাসিক গাম্ভীর্য, দ্বিতীয়টিতে রোমান্টিক বর্ণনার জন্য ভাষা ভঙ্গিমায় কিছু লঘুতা এবং তৃতীয়টিতে সাধুভাষার মারফতে নাটকীয় ধরণের মেয়েলি বাক্‌রীতি অনুসৃত হয়েছে।

শোনা যায় গোড়ার দিকে নাকি বেতালের ততটা জনপ্রিয়তা হয় নি। প্রথম দিকে ভাষার অনভ্যস্ততাই বোধ হয় তার কারণ। কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে ভাষা সরল ও মার্জিত হলে এটি একটি আদর্শ আখ্যানগ্রন্থরূপে সর্বত্র সমাদৃত হয়। এমন কি, সে যুগে

৪২. এখানে পৃষ্ঠাসংখ্যা আমাদের এই গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা নির্দেশ করছে। অন্য উল্লেখ না থাকলে বিদ্যাসাগরের রচনা উদ্ধৃতিতে যে পৃষ্ঠাঙ্ক থাকবে তা আমাদের এই গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক বুঝতে হবে।

যুগে "অনেকে বেতালের অনেক অংশ মুখস্থ করিয়া রাখিতেন।"[৪৩] পল্লীগ্রামের অন্তঃপুরিকারাও এ গ্রন্থ শুনতে খুব ভালোবাসতেন।[৪৪]

অনুবাদে বিদ্যাসাগর লাল্লুজীর হিন্দু-হিন্দুস্থানী গ্রন্থকে রেখায় রেখায় অনুসরণ করেন নি, অনেক স্থান বাদ দিয়েছিলেন (দ্বিতীয় সংস্করণে আদিরসের গল্পগুলির উত্তাপ হ্রাস করা হয়), অনেক দীর্ঘ বর্ণনা সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছিলেন। এখানে শিবদাস ভট্টের 'বেতালপঞ্চবিংশতি', লাল্লুজীর 'বৈতাল পচ্চীসী' এবং বিদ্যাসাগরকৃত বাংলা 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' থেকে একই অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত হচ্ছে:

> ১. "অন্যদা শ্মশানে নিশীথসময়ে রুদন্তঃ সকরুণং শব্দং রাজা শৃণোতি। রাজ্ঞোক্তম্ দ্বারে কস্তিষ্ঠতি। বীরবরেণোক্তম্ দেবাহমস্মি। রুদন্ত্যা নার্যাঃ শব্দং শৃণোসি। তেনোক্তম্। তস্যাঃ সমীপে গত্বা শীঘ্রমেব স্বরূপং সমানয়। ততো বীরবরো রুদন্ত্যাঃ শব্দলগ্নোগতঃ।" (শিবদাস ভট্ট)
>
> ২. "অলকিস্সঃ একরোজ কা জিক্রহৈ কি ইত্তিফাকন রাতকে বক্ত মরঘটমে রংডীকে রোনেকী আবাজ আই। রাজা সুনকে পুকারা কোই হাজীর হৈ। বীরবর সুনতে হী বোলা হাজীর জী হুকম, রাজনে যো হুকম কিয়া, জহা সে ঔরতকী রোনেকী আবাজ আতী হৈ, বহাঁ জাও; ঔর উসসে রোনেকা খবর পুছকর জলদ আও...।" (১৮৪৮ সালে মুদ্রিত 'বৈতাল পচ্চীসী'র নব সংস্করণ)
>
> ৩. "একদিন নিশীথ সময়ে, অকস্মাৎ ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণগোচর করিয়া রাজা বীরবরকে আহ্বান করিলে, সে তৎক্ষণাৎ সম্মুখবর্তী হইয়া কহিল, মহারাজ! কি আজ্ঞা হয়। রাজা কহিলেন, দক্ষিণদিকে স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি শুনা যাইতেছে; ত্বরায় ইহার তথ্যানুসন্ধান করিয়া আমায় সংবাদ দাও। বীরবর, যে আজ্ঞা মহারাজ, বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল।" (বিদ্যাসাগর রচনাবলী, ১ম, পৃ. ৩১)

লাল্লুজী ব্রজ্‌ভাখা থেকে অনুবাদ করলেও শিবদাস ভট্টের সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে এর বিশেষ পার্থক্য নেই। অবশ্য জম্ভল দত্ত ও শিবদাস ভট্টের মধ্যে ভাষাগত কিছু পার্থক্য আছে। বিদ্যাসাগর মূলকে যথাসম্ভব অনুসরণ করেছেন। গ্রন্থ রচনার পর এটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের উপযুক্ত হয়েছে কিনা তার বিচারের ভার পড়ে রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর। তিনি প্রতিকূল মত প্রকাশ করেন। তখন বিদ্যাসাগর

৪৩. বিহারীলাল—বিদ্যাসাগর, পৃ. ১২৯

৪৪. দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক (সৈরিন্ধ্রীর উক্তি— "ছোট বউ, বসিস, আমি আসচি, বিদ্যাসাগরের বেতাল শুনব।")

শ্রীরামপুরের মার্শম্যান সাহেবের অনুকূল মত সংগ্রহ করে এ গ্রন্থকে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করেন এবং কলেজ-কর্তৃপক্ষ 'বেতালপঞ্চবিংশতি'-কে কলেজ-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করতে সম্মত হন।[৪৫] কিন্তু বেতাল সম্বন্ধে কৃষ্ণমোহনের আপত্তির কারণ বোঝা যাচ্ছে না। বেতালের প্রথম সংস্করণের ভাষার কিছু জড়তা ছিল বটে, কিন্তু কৃষ্ণমোহনের 'বিদ্যাকল্পদ্রুমে'র তুলনায় এ ভাষা কোনও দিক দিয়েই কঠিন নয়। আর তা ছাড়া খ্রীষ্টানধর্মাবলম্বীদের অরুচিকর হতে পারে এমন বিশেষ কোন ধর্মীয় ব্যাপারেও (কালিকার কাছে বলি দেওয়ার প্রসঙ্গ বাদ দিলে) উল্লেখ নেই। তবে রুচির স্থূলতার জন্য (সংস্কৃত 'বেতালপঞ্চবিংশতি' ও হিন্দী 'বৈতাল পচ্চীসী'-তে প্রচুর অশ্লীল উপাখ্যান আছে) হয়তো কৃষ্ণমোহন এ আখ্যানের প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন। তবে সংস্কৃত সাহিত্যের আখ্যানে এরকম আদিরসের গল্প হামেসাই পাওয়া যাবে, আধুনিক কালের রুচি যাকে প্রসন্ন মনে মেনে নিতে পারবে না। বিদ্যাসাগর ১৮৫২ সালে লাল্লুজীর 'বৈতাল পচ্চীসী'র যে নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন তার ভূমিকায় তিনি সংস্কৃতে লেখা মূল গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেছিলেন, "The work contains no traces of art or genious in its composition, but on the contrary exhibits the clumsy attempts at the wonderful, some a times bordering on childishness, which are so general in the Legends of a dark age". সে যাই হোক সরস অনুবাদের গুণে 'বেতালপঞ্চবিংশতি' একদা অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল—গোটা ঊনবিংশ শতাব্দী ধরেই সে জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ ছিল। বাংলা গদ্যের বিবর্তন ইতিহাসের দিক থেকেই 'বেতালপঞ্চবিংশতি' অধিকতর মূল্যবান, কারণ এই গ্রন্থেই সাহিত্যের গদ্যের প্রথম সার্থক ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে।

৭

জন ক্লার্ক মার্শম্যান সাহেবের *Outlines of the History of Bengal for the use of Youths in India* গ্রন্থের শেষ নয় অধ্যায় (একাদশ—ঊনবিংশ অধ্যায়) অবলম্বনে বিদ্যাসাগর 'বাঙ্গালার ইতিহাস'—দ্বিতীয় ভাগ (১৮৪৮) রচনা করেন। এতে ১৭৫৬ সাল অর্থাৎ সিরাজের সিংহাসন লাভের পর থেকে শুরু করে

৪৫ এই বই ছাপাতে খরচ হয়েছিল তিন শ টাকা। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারী মার্শাল সাহেব একশ খানি কপি (প্রত্যেকখানির দাম তিন টাকা) কলেজের জন্য কিনে নিলে বিদ্যাসাগরের মুদ্রণব্যয় সঙ্কুলান হয়। বাকি কপিগুলি বন্ধুবান্ধবদের উপহার দিতেই ফুরিয়ে যায়। কাজেই প্রথম সংস্করণে এর থেকে বিদ্যাসাগরের বিশেষ কিছুই প্রাপ্তি ঘটে নি। দ্রষ্টব্য চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' (পৃ ১৬৭)।

১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে—লর্ড বেন্টিঙ্কের শাসনকাল পর্যন্ত মোট উনআশি বৎসরের বাংলার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে মার্শম্যানের ইংরাজী গ্রন্থ দীর্ঘকাল ছাত্রসমাজের পাঠ্যপুস্তক বলে পরিগণিত হয়েছিল, এ ছাড়া স্টুয়ার্টের ইতিহাসও কিছু জনপ্রিয় ছিল। তবে মার্শম্যানের গ্রন্থ অধিকতর বিস্তারিত ও তথ্যবহ—যদিও শ্বেতাঙ্গ অহমিকা বর্জিত নয়। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শ্রীরামপুরেব মিসনারীদের, বিশেষতঃ মার্শম্যান সায়েবের বেশ প্রীতির সম্পর্ক ছিল। মিসনারীদের প্রতি তাঁব কোন বিরাগ ছিল না।[৪৬] 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি'-র ব্যাপারে মার্শম্যানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়।

মার্শম্যানের ইংরেজী গ্রন্থটি মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ বলে বিদ্যাসাগর এই গ্রন্থের কয়েকটা অধ্যায় প্রায় অনুবাদ করলেন। এর রচনার গুণে গ্রন্থটি ছাত্রসমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে আর একটা কৌতূহলজনক সংবাদ দেওয়া যেতে পারে। ১৮৫০ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারী মেজর জি. টি. মার্শেল বিদ্যাসাগরের 'বাঙ্গালাব ইতিহাসে'ব টীকাটিপ্পনীসহ ইংরেজী অনুবাদ পকাশ করেন। গ্রন্থটিব আখ্যাপত্র এইরূপ: *A Guide to Bengal* being a close translation of *Ishwar Chandra Sharma's*, Bengalee Version of that portion of *Marshman's History of Bengal*, which comprizes the rise and progress of the British Dominion with notes and observations, By *Major G. T. Marshall*, Secretary and Examiner to the Fort William-এর ভূমিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বঙ্গসরকার ১৮৪৬ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেব ছাত্রদের জন্য দুখানি বাংলা পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠপোষকতা করবার জন্য দুটি বিষয় নির্দিষ্ট কবে দেন—কোন পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক যুগের হিন্দুরাজার বর্ণনা এবং ভারত বা বাংলাদেশেব ইংরেজ রাজত্বকালীন ইতিহাস। "Accordingly two works were prepared by Iswar Chandra Sharma, namely, 'Betala Panchabingshati' being a translation of Hindee work 'Bytal Pachisi', containing legends of Raja Vikramaditya and 'Banglar Itihas' being a free translation of that portion of Marshman's History of Bengal which comprehends the rise and progress of the British Dominion in Bengal". মার্শেল

৪৬ অনেক মিসনারীর সঙ্গে বিদ্যাসাগবেব বেশ সদ্ভাব ছিল। বোস্টনেব ইউনিটেরিয়ান খ্রীস্টান সোসাইটির সদস্য পাদরি ডল সাহেব এদেশে এসে ধর্মতলায় Useful Arts School খুলেছিলেন। বিদ্যাসাগব তাঁকে খুব ভালোবাসতেন, ডল সাহেবও বিদ্যাসাগরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। (বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর, পৃ ৪৯৩)।

সায়েব মার্শম্যানের সম্মতিক্রমে বিদ্যাসাগরের 'বাঙ্গালার ইতিহাসে'র ইংরেজী অনুবাদ করে নাম দেন *A Guide to Bengal.* তিনি বাংলাভাষা বেশ ভালই জানতেন, সুতরাং তাঁর অনুবাদ মূলকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছিল।[৪৭] উপরন্তু তিনি বিদেশী ছাত্রদের জন্য এতে বাংলাদেশের পথঘাট, লোকজন, আচারব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধেও কিছু কিছু টীকা যোগ করে দিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের 'বঙ্গালার ইতিহাস' শিক্ষা-বিভাগের কর্ণধারদের মধ্যেও কতটা খ্যাতিলাভ করেছিল—এটাই তার বড় প্রমাণ। এর সুললিত ভাষা ও পরিচ্ছন্ন ভঙ্গিমার জন্য সে যুগের কেউ কেউ এর অনেকস্থল আবৃত্তি করতে পারতেন।[৪৮]

এ গ্রন্থ রচনার পর বিদ্যাসাগরের নির্দেশ ও উপদেশে তাঁর স্নেহভাজন পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মার্শম্যানের ইংরেজী গ্রন্থের প্রথমাংশ অনুবাদ করে 'বাঙ্গালার ইতিহাস—প্রথম ভাগ' (১৮৫৯) রচনা করেন। এতে তিনি '।হন্দু রাজাদিগের চরমাবস্থা অবধি নবাব আলিবর্দীখাঁর অধিকার কাল পর্যন্ত" সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। উক্ত পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তিনি মার্শম্যান ও স্টুয়ার্টের নাম উল্লেখ করেছিলেন।

বাংলার ইতিহাস পুনরুদ্ধারের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র যেমন কৌতূহলী ছিলেন, বিদ্যাসাগর তেমনি ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে কৌতূহলী ছিলেন এ বিষয়ে একখানি বিস্তারিত গ্রন্থ লিখিবার জন্য বহু উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে ভারত ও বাংলার ইতিহাস-সংক্রান্ত দশীয় ও ইংরেজীভাষায় লেখা বহু গ্রন্থ ও তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল।[৪৯] কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য তার মনস্কামনা সিদ্ধ হল না। এ জন্য তিনি অসুস্থ অবস্থাতেও পরিচিত জনের কাছে নিত্যই ক্ষোভ প্রকাশ করতেন।[৫০] শেষজীবনে শয্যাগত হয়েও বাংলার তথা ভারতের ইতিহাস রচনার

৪৭ তিনি যে বাংলা ভাষা বেশ ভালোই আয়ত্ত করেছিলেন তা তাঁর উক্তি থেকেই বোঝা যাবে : 'My principal objects in this undertaking have been, to give a specimen of close and accurate translation into, and to illustrate by notes the etemology and idiomatic peculiarities of the Language translated from " (*A Guide to Bengal*—Preface)

৪৮. জীবনচরিতকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'আমরা বাল্যকালে বিদ্যালয়ে এই পুস্তক পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিলাম। এখনও তাহার সুমিষ্ট পদাবলীপূর্ণ স্থান সকল কণ্ঠস্থ আছে।" ('বিদ্যাসাগর', পৃ. ১৬৮)

৪৯. তাঁর গ্রন্থাগারে সিরাজদ্দৌলা সংক্রান্ত এত তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল যে, শুধু সেই উপাদান অবলম্বনেই বিহারীলাল সরকার 'ইংরেজের জয়' গ্রন্থ লিখেছিলেন। (বিহারিলালের 'বিদ্যাসাগর', পৃ ১৯৯)

৫০, বিহারীলাল—বিদ্যাসাগর (পৃ, ১৯৯)

অভিলাষের কথা ভুলতে পাবেন নি। সেই সময় নীলাম্বব মুখোপাধ্যায়কে বলেছিলেন, "ভাবতবর্ষেব একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিবার সমস্ত সংগ্রহ কবিয়া বাখিয়াছি, কেবল শরীব ভাল নয বলিয়া আজ কাল কবিয়া বিলম্ব হইয়া পড়িতেছে।"[৫১]

সে যুগে বাংলাভাষায় লেখা ছাত্রপাঠ্য বাংলাব ইতিহাস বলতে প্রায় কোন গ্রন্থই ছিল না। বেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়েব 'বিদ্যাকল্পদ্রুমে' বোম ও মিশব দেশ সম্বন্ধে অনেকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও তাঁব ভাষা অত্যন্ত জড়তাগ্রস্ত, স্কুলপাঠ্য হওযাব অনুপযোগী। ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যাযেব 'গ্রীকদেশীয ইতিহাস' (১৮৫৩), ফেলিক্স কেবীব 'ব্রিটনদেশীয বিববণসঞ্চয' (১৮১৯-২০) মার্শম্যানেব 'পুবাবৃত্তেব সংক্ষেপ বিববণ' (১৮৩৩), পীযার্সনেব 'প্রাচীন ইতিহাসসমুচ্চয' (১৮৩০) প্রভৃতি গ্রন্থগুলিব সঙ্গে বাংলাদেশেব ইতিহাসেব বড একটা যোগাযোগ ছিল না কাবণ এগুলি অন্যদেশেব ইতিবৃত্ত। একমাত্র ক্ষেত্রমোহনকে বাদ দিলে, অন্যলোকদেব বচনাভঙ্গিমাব জডতাব জন্য তাঁদেব গ্রন্থ আদৌ জনপ্রিয হয নি। অবশ্য বাজা বাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' ভাবতেব বাজপুতকাহিনী (১৭৭৩ শকেব ২য সংখ্যা), চন্দ্রগুপ্তেব বিববণ (ঐ সংখ্যা), ইস্ট ইণ্ডিযা কোম্পানী, সম্রাট অশোক প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রামাণিক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ বচনা কবেছিলেন। নীলমণি বসাকেব 'ভাবতবর্ষেব ইতিহাস' (১৮৫৭) স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ হলেও এতেই সবপ্রথম ভাবতীয দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবতেব হিন্দু, পাঠান ও মুঘল যুগেব ইতিহাস আলোচনাব চেষ্টা দেখা যায। উক্ত ইতিহাসেব প্রথম ভাগেব বিজ্ঞাপনে নীলমণি বসাক যা বলেছিলেন বিদ্যাসাগবেব অভিমতেব সঙ্গে তাব কোন বিবোধ নেই:

এই দেশেব যে পুবাবৃত্ত আছে, তাহা ইংবাজী ভাষাতে লিখিত, বাঙ্গালা ভাষাতে এই পুবাবৃত্ত প্রায নাই। যে ভাষাতে যে দুই একখানা পুস্তক দেখা যায, তাহা ইংবাজী হইতে ভাষান্তবিত, তাহাতে হিন্দুদিগেব প্রাচীন বৃত্তান্ত কিছুই নাই, এবং তাহা এমত নীবস যে, কোন ব্যক্তি তাহা পাঠ কবিতে ইচ্ছা কবেন না, এবং পাঠ কবিলেও তৃপ্তিবোধ হয না। অধিকন্তু এই সকল পুস্তক বালকদিগেব পাঠেব উপযোগী নহে, এই জন্য তাহা কোন পাঠশালাতে পঠিত হয না, সুতবাং বালকেবা ভাবতবর্ষেব ভালমন্দ কিছুই জানিতে পাবে না, এবং ইংবাজী পুস্তক পাঠ কবিয়া অনেক বালকেব এমত সংস্কাব জন্মে যে, এদেশেব ধর্ম্মকর্ম্ম সকলি মিথ্যা এবং হিন্দুবা পূর্বকালে অতি মূঢ ছিলেন, অপর বালকেবা অন্যদেশেব ইতিহাস কণ্ঠস্থ কবিয়া বাখে, কিন্তু জন্মভূমিব কোন বিববণ বলিতে পাবে না।"

৫১. চণ্ডীচরণ—বিদ্যাসাগর (পৃ. ১৮৯)

বিদ্যাসাগর স্কুলপাঠ্য পুস্তকের জন্যই মার্শম্যানের গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন বটে, কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্যই এই গ্রন্থের প্রথম পরিকল্পনা হয়।[৫২] সে যাই হোক এর ভাষাও বর্ণনাভঙ্গিমা এত চমৎকার যে, একে প্রায় মৌলিক গ্রন্থ বলেই মনে হয়। কিন্তু কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন (যথা বিহারীলাল সরকার), বিদ্যাসাগর মার্শম্যানের শ্বেতাঙ্গসুলভ অ-ভারতীয় মনোভাবকেও অবিকল অনুবাদ করেছেন কেন? উপরন্তু অন্ধকূপহত্যা সম্বন্ধে তিনি নিঃস্পৃহভাবে মার্শম্যানের বিবৃত ঘটনাই মেনে নিয়েছেন, তার সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করেন নি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে, এমন কি এই শতাব্দীতেও অনেকে সিরাজের প্রতি অতিশয় ভক্তিমান। ইংরেজের শত্রু আমাদের মিত্র, এই সূত্রানুসারে সিরাজকে ভাবাবেগের দৃষ্টিতে প্রায় শহীদের পর্যায়ে তুলে ধরা হয়। সে যুগে কেউ কেউ মনে করতেন, গবেষণার সাহায্যে সিরাজকে মার্শম্যানের আঁকা চিত্রের বিপরীতভাবেও দাড় করানো যেতে পারে।[৫৩] কিন্তু বিদ্যাসাগর সিরাজকে যে অতি অপদার্থ জঘন্যচরিত্রের ব্যক্তি মনে করতেন তা তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস'-এর 'বিজ্ঞাপন' থেকেই জানা যায়—"এই পুস্তকে, অতি দুরাচার নবাব সিরাজ উদ্দৌলার সিংহাসনারোহণ অবধি, চিরস্মরণীয় লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক মহোদয়ের অধিকার সমাপ্ত বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।" অবশ্য অন্ধকূপহত্যার অপরাধ থেকে তিনি সিরাজকে মুক্তি দিয়েছেন, "কিন্তু তিনি পরদিন—প্রাতঃকাল পর্যন্ত, এই ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ জানিতেন না। সে রাত্রিতে সেনাপতি মাণিকচাঁদের হস্তে দুর্গের ভার অর্পিত ছিল; অতএব, তিনিই এই সমস্ত দোষের ভাগী।" সিরাজের নারীর প্রতি অত্যাচার ও ধনসম্পত্তির ওপর লোভ (পৃ. ১০৭),[৫৪] মূঢ়ের মতো ক্রোধোন্মত্ততা (পৃ ১১৪), অব্যবস্থিতচিত্ততা (পৃ. ১১৫), দুর্দান্ত প্রকৃতি (পৃ. ১১৫), নিষ্ঠুরতা ও স্বেচ্ছাচারিতা (পৃ. ১১৫) প্রভৃতি দোষগুলি বর্ণনায় তিনি মার্শম্যানকেই অনুকরণ করেছেন। মার্শম্যান সিরাজকে "A Monster of Cruelty"; বিদ্যাসাগর বলেছেন "নৃশংস রাক্ষস।"[৫৫] অবশ্য দু-এক স্থলে তিনি মার্শম্যানের মন্তব্যের সঙ্গে কিছু নিজ

৫২. G. T. Marshall—*A Guide to Bengal* (Prefece). ইতিপূর্বে মার্শালের সেই উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে।

৫৩. বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর (পৃ. ১৯৯)

৫৪. বন্ধনীর মধ্যে পৃষ্ঠাঙ্কগুলি এই গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক।

৫৫. সিরাজের একমাত্র বিদেশী (ফরাসী) শুভানুধ্যায়ী ল'ও বলতে বাধ্য হয়েছেন, the "character of Siraj-ud-daulah was reputed to be one of the worst ever known...Every one trembled at the name of Siraj-ud-daulah." (স্যর যদুনাথ সরকার সম্পাদিত *History of Bengal* [Vol. II, P. 469] থেকে উদ্ধৃত)।

মন্তব্যও জুড়ে দিয়েছেন। মার্শম্যান লিখেছেন, "There can be no doubt that Nanda Koo nar was one of the most infamous characters among the natives" কিন্তু বিদ্যাসাগর এর সঙ্গে আর একটি পঙ্‌ক্তি যোগ করে দিয়েছিলেন, "নন্দকুমার দুরাচার ছিলেন যথার্থ বটে, কিন্তু, ইম্পি ও হেষ্টিংস তার অপেক্ষা অধিক দুরাচার, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

ইতিপূর্বে হিন্দী থেকে বাংলা অনুবাদে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। ইংরেজী থেকে বাংলা অনুবাদেও যে তিনি অসাধারণ কুশলী ছিলেন, এখানে মার্শম্যান ও তার রচনা পাশাপাশি রেখে তার প্রমাণ দেওয়া যাচ্ছে :

মার্শম্যান—"There was in the fort at this time a room, eighteen feet long by fourteen, with only one window at each end to admit air, in which turbulent soldiers used to be confined Into this small chamber, the Mahomedans thurst all the European prisoners in the hottest month of the year Gradually one after another sank down dead on the floor, and remainder, standing on this heap of bodies, had more room to breathe in, and thus a few survived" (১৮৫৮ সালের সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত)

বিদ্যাসাগর—"তৎকালে দুর্গের মধ্যে, দীর্ঘে বার হাত, প্রস্থে দশ হাত, এরূপ এক গৃহ ছিল। বায়ুসঞ্চারের নিমিত্ত, ঐ গৃহের এক এক দিকে এক একমাত্র গবাক্ষ থাকে। ইংরেজেরা কলহকারী দুর্বৃত্ত সৈনিকদিগকে ঐ গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিতেন। নবাবের সেনাপতি, দারুণ গ্রীষ্মকালে, সমস্ত য়ুরোপীয় বন্দীদিগের ঐ ক্ষুদ্র গৃহে নিক্ষিপ্ত করিলেন এক এক জন করিয়া ক্রমে ক্রমে, অনেকে পঞ্চত্ব পাইয়া ভূতলশায়ী হইল। অবশিষ্ট ব্যক্তিরা শবরাশির উপর দাঁড়াইয়া, নিশ্বাস আকর্ষণের অনেক স্থান পাইল, এবং তাহাতেই কয়েকজন জীবিত থাকিল।"
(এই সংগ্রহের ১০৭-১০৮ পৃষ্ঠা)

এ অনুবাদ মূলানুগ, অথচ মৌলিক রচনার লক্ষণযুক্ত। ইংরেজী থেকে অনুবাদে তিনি কতটা পারঙ্গম ছিলেন, তা তার 'ভ্রান্তিবিলাস' পড়লেই বোঝা যাবে। অথচ তিনি ভালো করে ইংরেজী শেখার প্রথম প্রয়োজন বোধ করেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সেরেস্তাদারের পদ গ্রহণের পর। সেকালে গোড়ার দিকে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী

শেখাবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। এদিকে সংস্কৃত কলেজের দেবভাষানুরাগী ছাত্রগণও বাস্তব জগতে চলবার জন্য ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করতে লাগল। ১৮২৭ সালে এই ছাত্রেরা সর্বপ্রথম ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ লাভ করল। অবশ্য ইংরেজী ভাষার শিক্ষা প্রবর্তিত হলেও এ তখনও অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় হয় নি। ব্যাকরণশ্রেণী থেকে ছাত্রগণ ইচ্ছা করলে ইংরেজী শ্রেণীতে ইংরেজী শিক্ষার জন্য যোগ দিতে পারত। বিদ্যাসাগর ১৮৩০ সালে ব্যাকরণের মুগ্ধবোধ শ্রেণীতে পড়তে পড়তে ইংরেজী ক্লাসে যোগ দিয়েছিলেন। ১৮৩৩-৩৪ খ্রীস্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরেজীর পঞ্চমশ্রেণীর ছাত্ররূপে তিনি পারিতোষিক পেয়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের কালে তিনি মোটামুটি ইংরেজী জ্ঞান সংগ্রহ করেছিলেন, এবং সেই বয়সেই তিনি "বহুল পরিমাণে ইংরাজী ভাব ও ইংরাজী চিন্তার সংস্পর্শে" (চণ্ডীচরণ—পৃ. ৬৯) আসেন।
১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে কিন্তু সংস্কৃত কলেজ থেকে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে উক্ত কলেজের ছাত্রেরা পুনরায় ইংরেজী চালু করার জন্য সেক্রেটারী জি টি মার্শালের নিকট আবেদন করেন, স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র শর্মার নামও ছিল। সংস্কৃত কলেজ থেকে ইংরেজী তুলে দেওয়া হলেও মাদ্রাসা থেকে কিন্তু ইংরেজী লুপ্ত হয় নি, বরং তার উন্নতিই হচ্ছিল। এইজন্য সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা সেক্রেটারীর নিকট এই মর্মে আবেদন করেন: "অতএব এইক্ষণে প্রার্থনা যে, অনুগ্রহপূর্বক রীত্যনুসারে আমাদিগের ইংরাজিভাষাভ্যাসের অনুমতি প্রকাশ হয় তাহা হইলে ক্রমে রাজকীয় কার্য্য ও শিল্পাদি বিদ্যা জানিয়া লৌকিক কার্য্য নির্ব্বাহে সমর্থ হইতে পারি।" এর ফলে ১৮৪২ সালে সংস্কৃত কলেজে আবার ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত হয়, কিন্তু এবারেও এ বিভাগের বিশেষ উন্নতি হয় নি। অতঃপর উত্তরকালে স্বয়ং বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে (১৮৫১) ইংরেজী শিক্ষার অধিকতর সুষ্ঠ ব্যবস্থা করেন—১৮৫৩ সাল থেকে রীতিমতো এবং নিয়মানুগভাবে ইংরেজী শিক্ষা পুনঃ প্রবর্তিত হয়। এর পূর্বে তিনি নিজের চেষ্টায় ইংরেজী ভাষায় মোটামুটি জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সেরেস্তাদারের পদে যোগ দিয়ে প্রয়োজনের অনুরোধে তিনি ইংরেজী ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করবার জন্য সচেষ্ট হলেন। রসময় দত্ত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে সরে গেলে (১৮৫০) শিক্ষাপরিষদ বঙ্গীয় সরকারকে সেই পদে বিদ্যাসাগরকে নিযুক্ত করতে সুপারিশ করলেন এবং তিনি যে ইংরেজী ভাষায় বিজ্ঞ একথাও তাঁরা জানালেন, "একদিকে তিনি ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ, অন্যদিকে সংস্কৃত-শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিত।"[৫৬]

৫৬ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরে' (সাহিত্য সাধক চরিতমালা) এই সুপারিশ পত্রের অনুবাদ উদ্ধৃত হয়েছে। পৃ. ২৮

যাই হোক বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শিক্ষকতা কার্যে যোগ দিয়ে ইংরেজী শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করলেন। পরবর্তীকালে ভারতীয় রাজনীতির জনকস্থানীয় সুরেন্দ্রনাথের পিতা ডঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ সরকার, রামরতন মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ গুপ্ত, আনন্দকৃষ্ণ বসু, অমৃতলাল মিত্র উৎকৃষ্ট জ্ঞান অর্জন এবং শ্রীনাথ ঘোষের কাছে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর শিক্ষকেরা কেউ তাঁর ছাত্রস্থানীয় কেউ-বা বন্ধু। ইংরেজী ভাষায় তিনি কতটা অভিজ্ঞ হয়েছিলেন, তার নানা প্রমাণ ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। ইংরেজী থেকে বাংলা অনুবাদেও তিনি বাংলা ভাষার মূল বৈশিষ্ট্য বাজায় রাখবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। একবার অক্ষয়কুমার দত্তের ইংরেজী থেকে বাংলা অনুবাদ পড়ে তিনি বলেছিলেন; "লেখা বেশ বটে; কিন্তু অনুবাদের স্থানে স্থানে ইংরেজী ভাব আছে।"[৫৭] এরপর তিনি অক্ষয়কুমারের বাংলা অনুবাদের ইংরেজী ভাব সংশোধন করে দিতেন। তিনি শেকস্‌পীয়রের নাটক অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পড়েছিলেন। শোভাবাজারের আনন্দকৃষ্ণ বসুর কাছে তিনি প্রত্যহ রাত্রিতে শেকস্‌পীয়র পড়তে যেতেন।[৫৮] সুতরাং 'বাঙ্গালার ইতিহাস' যে একখানি সুললিত অনুবাদগ্রন্থ হবে তাতে আর সন্দেহ কি? তবু এ গ্রন্থ স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ, কোন মৌলিক রচনা নয়। এবং মৌলিক রচনা নয় বলে, তিনি মার্শম্যানের মূল গ্রন্থকে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছিলেন—অবশ্য কোন কোন উপাদান তিনি অন্য স্থান থেকেও নিয়েছিলেন। উপরন্তু এটি পাঠ্যপুস্তক বলে ইতিহাস সম্পর্কে কোন বিতর্ক ব্যাপারের অবতারণা তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। বিস্তারিত আকারে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করবেন বলে বিদ্যাসাগর অনেক উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। দুঃখের বিষয় নানা কারণে, শারীরিক অসুস্থতার জন্যই, এ কার্যে তিনি হস্তক্ষেপ করতে পারেন নি। যদি তিনি এই বিপুল পরিশ্রমসাধ্য কর্মে সফল হতেন তা হলে বাঙালীর লেখা একখানি মৌলিক ইতিহাস-গ্রন্থ বাঙালীর গৌরব বৃদ্ধি করত; বাংলায় ইতিহাস-সাহিত্যেরও শ্রীবৃদ্ধি হত।

৫৭. বিহারীলাল—বিদ্যাসাগর, পৃ ১২৪

৫৮. বিহারীলালের উক্ত গ্রন্থ (পৃ ১২৩) দ্রষ্টব্য। ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ করা যে কঠিন সে সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর বলেছেন, "বাঙ্গালায় ইংরেজীর অবিকল অনুবাদ করা অত্যন্ত দুরূহ কর্ম, ভাষাদ্বয়ের রীতি ও রচনা পরস্পর নিতান্ত বিপরীত; এই নিমিত্ত অনুবাদক অত্যন্ত সাবধান ও যত্নবান হইলেও অনুবাদগ্রন্থে রীতিবৈলক্ষণ্য, অর্থপ্রতীতির ব্যতিক্রম ও মূলার্থের বৈকল্য ঘটিয়া থাকে।" ('জীবনচরিত'-এর বিজ্ঞাপন)

৮.

১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে (১৭৭১ শকাব্দ) চেম্বার্স প্রণীত "*Exemplary Biography*-র কয়েক জন পাশ্চাত্য মনীষার জীবনকথা অবলম্বনে বিদ্যাসাগরের 'জীবনচরিত' প্রকাশিত হয়। এর সবটাই মূলের অনুবাদ। "এতদ্দেশীয় বিদ্যার্থিগণের পক্ষে বিশিষ্টরূপ উপকার দর্শিতে পারে" -এই মনোভাবের বসে তিনি চেম্বার্সের স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ থেকে বেছে নিয়ে কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন, হর্শেল, গ্রোশ্যস, লিনিয়স, ডুবাল, উইলিয়ম জোন্স ও টমাস জেঙ্কিন্স-এর জীবনচরিত সঙ্কলন করেন। তখন এদেশে ছাত্রদের জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাবার উপযোগী এবং চরিত্রগঠনের অনুকূল বিশেষ কোন বাংলা পাঠ্য-পুস্তক প্রচলিত ছিল না। স্কুলবুক সোসাইটি, ভার্নাকুলার লিটারেচর সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কয়েকখানি বালপাঠ্য পুস্তক রচিত হয়েছিল বটে, কিন্তু তার ভাষা শিক্ষার্থী বালকদের উপযোগী ছিল না, বিষয়গুলিও চরিত্রগঠনের ততটা অনুকূল বলে বিবেচিত হয় নি। বিদ্যাসাগর এই জন্য জনপ্রিয় ইংরেজী পাঠ্যপুস্তক চেম্বার্সের উক্ত 'বায়োগ্রাফি'-র অন্তর্ভুক্ত কয়েকজন পাশ্চাত্য মনীষার জীবনচরিতের সরল অনুবাদ করেন। এই জীবনচরিতগুলির অধিকাংশই কোন বৈজ্ঞানিকের জীবনকথা। জ্যোতির্বিদ, উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞ, ভিষকশাস্ত্রজ্ঞ, শিক্ষাব্রতী, ভাষাতত্ত্ববিদ্ -বিবিধ পাশ্চাত্য মনীষার কাহিনী অনুবাদ করে তিনি বালক-বালিকাদের চরিত্রগঠনের উপযোগী পাঠ্য গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন। এর সমস্ত চরিত্রই য়ুরোপীয়, শুধু টমাস জেঙ্কিন্স আফ্রিকার নিগ্রো রাজকুমার ছিলেন। তিনি নিগ্রো হয়েও শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে অধ্যাপকরূপে শ্বেতাঙ্গের মতোই সম্মান লাভ করেছিলেন। অবশ্য এই নিগ্রো রাজকুমার য়ুরোপ থেকে বিদ্যা অর্জন করেছিলেন বটে, কিন্তু দেশে ফিরে গিয়ে অনুন্নত কাফ্রি সমাজে শিক্ষা বিস্তার না করে য়ুরোপে রয়ে যান বলে বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনকথা লেখার পর এই মন্তব্য করেন, "বোধ হয় কোন লোকহিতৈষী সমাজের সাহায্যে জেঙ্কিন্সের স্বদেশে প্রতিপ্রেরিত হওয়াই উচিত ছিল। তাহা হইলে তিনি তথায় পৈতৃক প্রজাগণের সভ্যতাসম্পাদন ও তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতে পারিতেন।" (বিদ্যাসাগর-রচনাবলী পৃ. ২২৯)

এই জীবনচরিতগুলিতে দেখা যাবে, বিদ্যাসাগর মূলতঃ বৈজ্ঞানিক ধরনের চরিত্রই বেছে নিয়েছিলেন এবং যাঁরা অদৃষ্টের ওপর নির্ভর না করে নিজের চেষ্টার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর তাঁদের জীবনকথা অতি যত্নের সঙ্গে সংগ্রহ করেছিলেন। এই গ্রন্থে পদার্থবিদ্যা, বলবিজ্ঞান, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব ও জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত অনেক শব্দের পরিভাষার প্রয়োজন হয়েছিল। গ্রন্থের শেষে তিনি কয়েকটি ইংরাজী শব্দের বাংলা পরিভাষা তৈরি করে নিয়েছিলেন। যথা—Heraldry—কুলাদর্শ,

Museum—চিত্রশালিকা, Numismatics—টঙ্কবিজ্ঞান, Optics—দৃষ্টি বিজ্ঞান, Mineralogy—ধাতুবিদ্যা, Astrology—নক্ষত্রবিদ্যা, Perspective—পরিপ্রেক্ষিত, Ticket—প্রবেশিকা, Reflecting Telescope—প্রাতিফলিক দূরবীক্ষণ, Metaphysics—মনোবিজ্ঞান, State—মণ্ডল, Revolution—রাজবিপ্লব, Index—শঙ্কু, Elasticity—স্থিতিস্থাপক। এই পরিভাষার অনেকগুলি এখনও ব্যবহৃত হয়। পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা-সংক্রান্ত পরিভাষাগুলি তৈরি করতে গিয়ে তিনি বহু চিন্তা করেছিলেন। তবে "সঙ্কলিত শব্দ সকল বিশুদ্ধ ও অবিসম্বাদিত হইয়াছে কিনা" সে বিষয়ে তিনি কিছু সংশয়যুক্ত ছিলেন।

এ ধরনের জীবনচরিত রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—পরিশ্রম, অধ্যবসায়, উৎসাহ, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি মানসিক, গুণের সহায়তায় সাধারণ লোকও কতটা অসাধারণত্ব লাভ করতে পারে ছাত্রসমাজের কাছে তার আদর্শ তুলে ধরা। দ্বিতীয়তঃ বিদেশী মহাপুরুষদের জীবনী বর্ণনা প্রসঙ্গে "আনুষঙ্গিক তত্তৎ দেশের রীতি, নীতি, ইতিহাস ও আচার পরিজ্ঞান হয়।" ছাত্রসমাজ বিদেশ সম্বন্ধেও জ্ঞান সংগ্রহ করুক—এও তাঁর অভিপ্রায় ছিল।

অনুবাদ করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর দেখলেন, "বাঙ্গালা ভাষার ইঙ্গরেজী পুস্তকের অনুবাদ করিলে প্রায় সুস্পষ্ট ও অনায়াসে বোধগম্য হয় না" ('জীবনচরিতে'র ২য় সংস্করণে বিজ্ঞাপন)। তাই তাঁর মনে হয়েছিল, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তাযুক্ত ইংরেজী গ্রন্থের সরল বাংলায় অনুবাদকর্মের তখনও সময় হয় নি। এই জন্য এই 'জীবনচরিত' অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি সিদ্ধান্ত করেন, তিনি আর কোন ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ করবেন না। অবশ্য এর পরেও তিনি একাধিক ইংরেজী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন।

'জীবনচরিতে'র চরিত্রগুলি সাধারণ ছাত্রের কাছে কিছু নীরস মনে হবে, বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গেও সেযুগের অধিকাংশ পাঠার্থীর কিছুমাত্র যোগ ছিল না; উপরন্তু এতে যে সমস্ত স্থান, জনপদ ও ব্যক্তির প্রসঙ্গ ছিল তাও স্কুল-পাঠশালার ছাত্রের নিকট কিছু দুর্জ্ঞেয় মনে হয়েছিল। এই জন্য 'জীবনচরিতে'র ভাষা ঈষৎ গুরুভার বলে মনে হয় এবং সে সম্বন্ধে স্বয়ং অনুবাদক অতিশয় অবহিত ছিলেন।

আরও একটা কথা—প্রথম সংস্করণের গ্রন্থগুলি ছ' মাসের মধ্যে নিঃশেষিত হলেও তিনি এ গ্রন্থের ভাষাগত অনভ্যস্ততার জন্য এর পুনর্মুদ্রণ করবেন না বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন। তখন তিনি "বাঙ্গালায় এক নূতন জীবনচরিত পুস্তক সঙ্কলন" করবার বাসনা ও উদ্যোগ করেছিলেন। এই "নূতন জীবনচরিত" যথার্থতঃ কোন্ কোন্ ব্যক্তির চরিত্র অবলম্বন করে লেখবার সংকল্প করেছিলেন তা বোঝা যাচ্ছে না।

'জীবনচরিত' প্রকাশিত হলে কেউ কেউ মনে করেছিলেন, এ গ্রন্থ পাঠ করে আমাদের দেশের বালকেরা বিদেশী মনীষীদের শ্রদ্ধা করতে শিখবে বটে, কিন্তু যাতে তারা স্বদেশের মহাপুরুষদেরও শ্রদ্ধা করতে পারে সে সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর কিছু লেখেন নি।[৫৯] অবশ্য তিনি দেশীয় ব্যক্তিরও গুণগ্রাহী ছিলেন, কর্মবীর মতিলাল শীল এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনচরিত লিখবেন সিদ্ধান্ত করেছিলেন ; কিন্তু সময়াভাবে তা কার্যে পরিণত করতে পারেন নি।[৬০] শোনা যায়, তাঁর বন্ধু, শোভাবাজারের রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র আনন্দকৃষ্ণ বসু বিদ্যাসাগরকে স্বদেশীয় ব্যক্তির জীবনচরিত লিখতে অনুরোধ করেছিলেন (বিহারীলাল সরকার, পৃ. ২৪৩)। বিদ্যাসাগর এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে কিছু কিছু উপাদান, তথ্য ও গ্রন্থ সংগ্রহও করেছিলেন। এটাই কি তাঁর 'নূতন জীবনচরিত'-এর উপাদান ? তাঁর বন্ধু ও পারিবারিক চিকিৎসক ডাঃ অমূল্যচরণ বসুও এইজন্য তাঁকে অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু নানা ব্যাপারে ব্যস্ত থাকার জন্য তাঁর এই ইচ্ছা কার্যে পরিণত হয় নি। তিনি যদি তাঁর সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ বাঙালীদের সম্বন্ধে কিছু লিখে যেতেন, তাহলে বাংলার চরিতসাহিত্য যে অধিকতর বলশালী হত তাতে সন্দেহ নেই।[৬১]

---

৫৯. বিহারীলাল সরকারের 'বিদ্যাসাগর' (পৃ. ২৩৪) দ্রষ্টব্য। বিহারীলাল ও সুবলচন্দ্র মিত্র (*Iswar Chanda Vidyasagar—Story of his Life and Works*) বিশুদ্ধ হিন্দু আদর্শের দ্বারা বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা বিচার করতে গিয়ে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়েছিলেন। তাঁদের অভিযোগ, বিদ্যাসাগর জীবন ও কর্মে হিন্দু আচার-আদর্শের অনুগমন করতেন না। 'জীবনচরিতে'ও তিনি হিন্দুর জীবনাদর্শের অনুকূল কোন আখ্যান সংযোজিত করেন নি। শুধু পাশ্চাত্যের কয়েকজন কর্মে-সফল বিশেষব্যক্তির জীবনী লিখেছিলেন এদের মতে, 'চরিতকথা'র অনেকটা নাকি, "হিন্দু-সন্তানের শিক্ষণীয় বা অনুকরণীয়" নয়। (বিহারীলাল—পৃ. ২৩৪)

৬০. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর, পৃ. ১৯০

৬১. বিদ্যাসাগরের তৃতীয় ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন বোধহয় সেই ক্ষোভ নিবারণেই 'চরিতমালা' (১ম—১৩০০, ২য়—১৩০১) গ্রন্থে বিশিষ্ট বাঙালীর জীবনচরিত লিখেছিলেন। এই চরিত্রের মধ্যে রাধাকান্ত দেব, বিদ্যাসাগর, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ, মদনমোহন, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, দ্বারকানাথ মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, রামগোপাল ঘোষ, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সমসাময়িক বিখ্যাত বাঙালীর নাম উল্লেখ করা যায়। শম্ভুচন্দ্র এর সঙ্গে আবার মধ্যযুগের বাঙালী এবং দু-একজন অবাঙালীরও (যথা—রামশাস্ত্রী ও কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ) জীবনকথা লিখেছিলেন।

৯

১৮৫১ সালে 'বোধোদয়' প্রকাশিত হয়। প্রথমে এর নাম ছিল 'শিশুশিক্ষা—৪র্থ ভাগ' তাঁর অভিন্নহৃদয়-বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার তিনভাগ 'শিশুশিক্ষা' রচনা করেছিলেন। (১ম—২য়—১৮৪৯, ৩য়—১৮৫০) বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের (তখন নাম ছিল হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়) বালিকাদের জন্য।[৬২] তারই আদর্শে ও ধারাবাহিকতা বজায় রেখে তিনি প্রথমে 'বোধোদয়'-কে 'শিশুশিক্ষা ৪র্থ ভাগ' রূপেই চিহ্নিত করেছিলেন। মদনমোহনের 'শিশুশিক্ষা' বেশ সুললিত ও সরস। একদা এই পুস্তিকাগুলি বালক-বালিকাদের একমাত্র স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ ছিল। কিন্তু 'বোধোদয়ের'র ভাব, ভাষা ও বর্ণনার নীতি ঠিক শিশুর উপযোগী নয়। বিদ্যাবুদ্ধি একটু পরিপক্ক না হলে 'বোধোদয়ে'র বিষয়বস্তু বালকবালিকার ঠিক বোধগম্য হয় না। বলা বাহুল্য এ গ্রন্থও তিনি বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের জন্যই রচনা করেছিলেন। কারণ দীর্ঘকাল ধরে তিনি বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদকরূপে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বালিকাদের মনঃপ্রণালী গঠনের প্রয়োজনীয়তা তাঁর চেয়ে কে বেশী বুঝতে পারতেন ?

বাল্যশিক্ষা-সংক্রান্ত গ্রন্থ নির্বাচন ব্যাপারে তিনি উইলিয়ম ও রবার্ট চেম্বার্স ভ্রাতৃদ্বয়ের রচিত ও সঙ্কলিত ইংরেজী গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেন। ফ্রেডারিক জে. হ্যালিডে ছোটলাটপদে যোগ দেবার (১৮৫৪) পূর্বে কিছুকাল শিক্ষা-পরিষদের সদস্য ছিলেন। বাংলা ভাষায় কীভাবে অতি দ্রুত শিক্ষা বিস্তার করতে পারা যায় এ বিষয়ে তিনি (১৮৫৪, মার্চ) একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। সে রিপোর্টের মূল হচ্ছে বিদ্যাসাগর প্রদত্ত তথ্য (১৮৫৪, ফেব্রুয়ারি)। বিদ্যাসাগর বাংলা শিক্ষা প্রচার ও বাংলা স্কুল-পাঠশালার ছাত্রদের জন্য পাঁচভাগে শিশুশিক্ষাবিষয়ক প্রাথমিক পুস্তক প্রচলনের কথা বলেন। 'শিশুশিক্ষা' তিনভাগে আছে—বর্ণপরিচয়, বানান এবং পঠনশিক্ষা ; চতুর্থভাগে জ্ঞানোদয় সম্পর্কিত একখানি ছোট বই এ খানাই 'বোধোদয়'। পঞ্চমভাগে ছিল Chembers Educational Course-এর অন্তর্গত কয়েকটি নীতিপাঠের অনুবাদ।

'বোধোদয়' চেম্বার্সের *Rudiments of Knowledge* অবলম্বনে রচিত হলেও

৬২. ১৮৫০ সালের ২৯ মার্চ বীঠন সাহেব এই বিদ্যালয় সম্পর্কে গভর্নর জেনারেল ডালহৌসীকে যে পত্র দিয়েছিলেন তাতে মদনমোহনের এই পুস্তক সম্বন্ধে বলেছিলেন, "Pundit Madun Mohun Tarkalunkar...has employed his leisure time in the compilation of series of elementary Bengali books expressly for their (অর্থাৎ উক্ত বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য) use." (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ১৩ সংখ্যক পুস্তিকা) ,

বিদ্যাসাগর অন্য গ্রন্থ থেকেও এর উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন।[৬৩] এতে পদার্থ মানব-জাতি, ভাষা, কাল, গণনা-অঙ্ক, বর্ণ, বস্তুর আকার-পরিমাণ ক্রয়বিক্রয় মুদ্রা নানা ধাতু, নদী-সমুদ্র, উদ্ভিদ, জন্তু, খনিজপদার্থ, শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি বালকদের অবশ্য জ্ঞাতব্য বস্তুর সমাবেশ করা হয়েছিল। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকবালিকারা যাতে একখানি প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক থেকেই জগৎ সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান সংগ্রহ করতে পারে, এই ছিল বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য। এটি যে কত জনপ্রিয় হয়েছিল—তার প্রমাণ এর অসংখ্য সংস্করণ। তাঁর জীবিতকালের মধ্যেই এর প্রায় এক শ' সংস্করণ হয়েছিল।

এই নিতান্ত বালপাঠ্য স্কুলের পুস্তক সম্বন্ধেও একদা মতভেদের অবকাশ ঘটেছিল। এতে বিজ্ঞানবিষয়ক যে সমস্ত তথ্য আছে, তাতে নাকি কিছু তথ্যগত ভুলভ্রান্তি ছিল। পাঠকেরা সেই ভুলগুলি বিদ্যাসাগরকে দেখিয়ে দিলে তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে তা সংশোধন করে দিয়েছিলেন। ত্রিপুরা জেলার কুম্পা গ্রামের বোর্ডিং স্কুলের সম্পাদক মহম্মদ রেয়াজ উদ্দিন আহম্মদ, ডাঃ চন্দ্রমোহন ঘোষ, 'শ্রীমন্ত সদাগর' পত্রিকার সম্পাদক—এঁরা যেখানে যে ভুল দেখিয়ে দিয়েছেন, বিদ্যাসাগর তার পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি শুদ্ধ করে এঁদের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ গ্রন্থের একটি বিষয় নিয়ে সে যুগে পাঠকমহলে কিঞ্চিৎ বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল।

'বোধোদয়ে'র প্রথম সংস্করণে বহির্জগৎ ও মানবজীবনসম্বন্ধে অনেক তথ্য সঙ্কলিত হলেও ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন উল্লেখ ছিল না। এতে নাকি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁকে বলেন, "মহাশয়, ছেলেদের জন্য এমন সুন্দর একখানি পাঠ্যপুস্তক রচনা করিলেন, বালকদের জানিবার সকল কথাই তাহাতে আছে কেবল ঈশ্বর বিষয়ে কোন কথা নাই কেন?" বিদ্যাসাগর তখন একটু হেসে বললেন, "যাহারা তোমার কাছে এরূপ বলেন, তাঁহাদিগকে বলিও এইবার যে বোধোদয় ছাপা হইবে তাহাতে ঈশ্বরের কথা থাকিবেক।'[৬৪] পরবর্তী সংস্করণে তিনি প্রথমে পদার্থের সংজ্ঞাদি বর্ণনা করে দ্বিতীয় প্রস্তাবে 'ঈশ্বর' বিষয়ে লিখলেন, "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহাকে কেহ দেখিতে

---

৬৩ বিহারীলাল বলেছেন 'বিদ্যাসাগর মহাশয় চেম্বর সাহেবের Rudiments of kuowledge' নামক গ্রন্থের অনুবাদ প্রচার করেন" (ঐ গ্রন্থ, পৃ. ১৭৮)। কিন্তু চণ্ডীচরণ এ বিষয়ে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করে লিখেছিলেন "১৮৫১ খৃষ্টাব্দে চেম্বার্স রুডিমেন্টস অব নলেজ নামক গ্রন্থের ছায়াবলম্বন বালকদিগের পাঠোপযোগী করিয়া 'শিশুশিক্ষা চতুর্থভাগ বা বোধোদয়' রচনা করেন।" (ঐ গ্রন্থ পৃ. ১৬৯) বিদ্যাসাগর বোধোদয়ের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লিখেছিলেন "বোধোদয় ইংরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইল। পুস্তকবিশেষের অনুবাদ নহে।"

৬৪. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই গল্পটি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মুখেই শুনেছিলেন সুতরাং এ ঘটনার সত্যতায় অবিশ্বাস করবার কারণ নেই।

পায় না, কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন।" পরে এর পাঠ আরও সংশোধিত হয়ে এই আকার ধারণ করে: "ঈশ্বর, কি প্রাণী, কি উদ্ভিদ্, কি জড়, সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ নিমিত্ত ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বলে। ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে পায় না; কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। আমরা যাহা করি তাহা তিনি দেখিতে পান, আমরা যাহা মনে ভাবি, তিনি তাহা জানিতে পারেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু; তিনি সমস্ত জীবের আহার-দাতা ও রক্ষাকর্তা।" (বিদ্যাসাগর রচনাবলী, পৃ. ২৫৩)[৬৫]। 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ'—১৮৪১ সালে প্রদত্ত বক্তৃতায় দেবেন্দ্রনাথ নাকি এই উক্তি করেছিলেন।[৬৬] যাঁরা ব্রহ্মমতানুকূল ছিলেন না (যথা—চরিতকার বিহারীলাল সরকার) তাঁরা এ পঙ্‌ক্তিটি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিরূপতা প্রকাশ করেছেন।[৬৭] বিদ্যাসাগর এই বাল্যপাঠ্য পুস্তকটিকে কোন দার্শনিক ও জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকথা পরিবেশন করতে চান নি, তর্কের কচকচি অলসের আরাম; কর্মযোগী ও শিক্ষা প্রচারক বিদ্যাসাগর এ সমস্ত দার্শনিক তর্কাতর্কির ঘোর শত্রু ছিলেন। অনেকটা 'প্রাগম্যাটিকে'র মতো বস্তুর উপযোগের দ্বারা তিনি বস্তুর মূল্য নির্ণয় করতেন। তা না হলে সংস্কৃত ঐতিহ্যের কর্ণধার হয়েও তিনি "বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্তদর্শন, এ সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নাই"[৬৮]—এ রকম সাংঘাতিক কথা অবলীলাক্রমে বলতে

৬৫. তাঁর জীবিতকালের ষণ্ণবতিতম (১২৯৩) সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত। তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্র পিতার মৃত্যুর পর 'বোধোদয়ে'র কিছু পাঠসংস্কার করেছিলেন। হয়তো তিনিই এই পরিবর্তন করে থাকবেন। দ্রষ্টব্য—বিহারীলালের গ্রন্থ, পৃ. ২৪৮ (পাদটীকা)

৬৬. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বরচিত জীবনচরিতে'র সম্পাদক (৩য় সংস্করণ) বলেছেন, "১৮৪. সালে প্রদত্ত কোন বক্তৃতায় দেবেন্দ্রনাথের 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ' এই মহাবাক্য কয়েক বৎসর পরে (১৮৫১) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক তাঁহার 'বোধোদয়' পুস্তকে গৃহীত হয়।" (পৃ ৬৭)

৬৭. এঁদের মধ্যে বিহারীলাল সরকার ('বিদ্যাসাগর') এবং তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সুবলচন্দ্র মিত্র ('Iswar Chandra Vidyasagar' etc.) বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার শিক্ষাবিস্তার ধর্মবোধ প্রভৃতির মধ্যে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের সমর্থন দেখতে পান নি বলে তাঁর ক্রিয়াকর্মকে মাঝে মাঝে কিছু তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছিলেন। বিহারীলাল 'বোধোদয়ে'র অনেক ভুলত্রুটি দেখিয়েছিলেন (তাঁর গ্রন্থ পৃ ২৪৮-২৪৯)। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'পঞ্চানন্দ' নাম নিয়ে বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়ে'র তথাকথিত অসঙ্গতির ব্যঙ্গরসাশ্রিত আলোচনা করেছিলেন (দ্রষ্টব্য বঙ্গবাসী, ১২৯৩ ১৬ই জ্যৈষ্ঠ)। বিহারীলালের মতে "বোধোদয় হিন্দুসন্তানের সম্যক পাঠোপযোগী নহে। বোধোদয়ে বুদ্ধির অনেক স্থলে বিকৃতি ঘটিবারও সম্ভাবনা। 'পদার্থ তিনপ্রকার—চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ' আর 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ' ইহা বালক তো বালক কয়জন বিজ্ঞতম বৃদ্ধের বোধগম্য হয় বল দেখি।" (বিদ্যাসাগর পৃ. ২৪৮)

৬৮. সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাবিষয়ক চিঠিখানি ইংরাজীতে রচিত। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'Iswar Chandra Vidyasagar as an Educationist' প্রবন্ধে (*Modern Review* October 1927) এর

পারতেন না। শিক্ষাবিভাগের সম্পাদক (কাউন্সিল অব এডুকেশনের সেক্রেটারী) এফ. জে. ময়েট সায়েব সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাপ্রকরণকে আধুনিক করবার অভিপ্রায়ে বিদ্যাসাগরকে একটি রিপোর্ট দিতে অনুরোধ করলে তিনি সেই প্রসঙ্গে (১৮৫০, ১৬ ডিসেম্বর) হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে বলেন, "ইহা অতি সত্যকথা যে, হিন্দুদর্শনশাস্ত্রের অধিকাংশের সহিত আধুনিক সময়ের উন্নত চিন্তার সেই সাদৃশ্য অল্পই লক্ষিত হয়।... যুবকেরা এই পদ্ধতি অনুসারে (অর্থাৎ ইংরেজী শিখে পাশ্চাত্যদর্শন অধিগত করলে) শিক্ষিত হইলে সহজেই প্রাচীন হিন্দুদর্শন-শাস্ত্রের ভ্রমপ্রমাদাদি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে।"[৬৯] এই উল্লেখ থেকে বোঝা যাচ্ছে, আধুনিক বিশ্ববোধের পটভূমিকায় তিনি হিন্দুদর্শনকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন। তাঁর ব্যক্তিগত আচার-আচরণে রক্ষণশীল মতের কেউ কেউ তাঁর ওপর প্রচ্ছন্নভাবে বিরূপ হয়েছিলেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে বন্ধুমহলে তিনি যে সমস্ত অভিমত প্রকাশ করতেন তার জন্যও কেউ কেউ তাঁকে হিন্দু আচারের কোটর থেকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। সুতরাং 'বোধোদয়ে'র প্রথম পৃষ্ঠায় পদার্থ সম্বন্ধে কয়েক পঙ্ক্তি লেখার পর স্বল্প কয়েক ছত্রে ঈশ্বরের কথা—তাও আবার পৌরাণিক দেবসঙ্ঘ নয়, একেবারে ব্রাহ্মসমাজঘেঁষা 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ'—ব্রাহ্মবিদ্বেষী রক্ষণশীল হিন্দুর পক্ষে এ উক্তি পরিপাক করাও কিছু আয়াসসাধ্য। কিন্তু 'বোধোদয়ে'র কয়েক স্থলেই ঈশ্বরের উল্লেখ আছে। যেমন—"ঈশ্বর কেবল প্রাণীদিগকে চেতনা দিয়াছেন। তিনি ভিন্ন আর কাহারও চেতনা দিবার ক্ষমতা নাই"। (বিদ্যাসাগর রচনাবলী, পৃ. ২৫৪) "ঈশ্বর কি অভিপ্রায়ে কোন বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন আমরা তাহা অবগত নহি···বিশ্বকর্তা ঈশ্বরের সন্নিধানে, সকল বস্তুই সমান।" (ঐ, পৃ. ২৫৬) আসলকথা, "সুকুমারমতি বালক-বালিকারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেক, এই আশায় অতি সরলভাষায় লিখিবার নিমিত্ত" বিদ্যাসাগর চেষ্টা করেছিলেন তাই এতে অনাবশ্যক, জটিল ব্যাপার পরিত্যাগ করেছেন। এতে তিনি "ইতস্ততঃ পরিদৃশ্যমান বস্তু সমুদয়কে" পদার্থ বলেছেন বলে বিহারীলাল সরকার দার্শনিক তত্ত্ব উত্থাপন করে এ কথার বিরুদ্ধে বলেছেন, "পদার্থ শব্দের এরূপ অর্থগ্রহ বড় অর্থহীন। সংস্কৃত দর্শনে যাহা কিছু শব্দবাচ্য, তাহাই পদার্থ। জাতি, গুণ, অধিক কি—অভাবও পদার্থ"।

উল্লেখ করেছেন। তাঁর 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' পুস্তিকায় (সা সা-চরিতমালা, পৃ. ৩৯) তার অনুবাদ আছে। সেখানে শিক্ষাসংস্কার প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর হিন্দু ষড়দর্শনের অন্তর্ভুক্ত অলস দার্শনিক চিন্তাকে কার্যোপযোগী শিক্ষার প্রতিকূল মনে করেছিলেন। সেই পত্রে তিনি স্পষ্টই বলেছেন, "একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, হিন্দুদর্শনে এমন অনেক, অংশ আছে, যাহা ইংরেজীতে সহজবোধ্যভাবে প্রকাশ করা যায় না, তাহার কারণ সে-সব অংশের মধ্যে পদার্থ কিছু নাই।" (ব্রজেন্দ্রনাথ অনুদিত)।

৬৯. বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর, পৃ. ২২৫-২২৬

ভারতীয় দর্শনে অতিশয় অভিজ্ঞ বিদ্যাসাগর পদার্থের দার্শনিক অর্থ যথেষ্ট অবগত ছিলেন। কিন্তু দার্শনিক জ্ঞানের চেয়ে আর একটি জ্ঞান তাঁর আরও বেশী অধিগত হয়েছিল—তার নাম কাণ্ডজ্ঞান। তাঁর প্রখর কাণ্ডজ্ঞান ছিল বলে তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকার মাথায় 'ঘটত্ব-পটত্বে'র পাষাণভার চাপাতে চান নি। বাস্তব জীবনে চলবার জন্য তাদের যেটুকু সাধারণ জ্ঞান দরকার, তিনি তাদের তাই দিতে চেয়েছিলেন। সেদিক থেকে 'বোধোদয়' আদর্শ গ্রন্থ।

১০.

বাঙালী ছাত্রকে সহজে সংস্কৃত ব্যাকরণ শেখাবার জন্য বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে আসীন থাকাকালে 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' (সংক্ষেপে 'উপক্রমণিকা') রচনা ও সঙ্কলন করেন (১৮৫১)। উক্ত পুস্তিকার বিজ্ঞাপনে তিনি বিস্তারিতভাবে এই ব্যাকরণ রচনার কারণ ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লিখে গেছেন। সংস্কৃত কলেজের বালকদের মুগ্ধবোধ, ধাতুপাঠ ও অমরকোষ পড়তে হত। তারা অর্থ না বুঝে গ্রন্থগুলির পাঠ্যাংশ কণ্ঠস্থ করার চেষ্টা করত। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আয়ত্ত করা বড় দুঃসাধ্য, আয়ত্ত করলেও এর দ্বারা খুব বেশী উপকৃত হওয়া যায় না। তাই ছাত্র সমাজের সুবিধার জন্য তিনি জটিল সংস্কৃত ব্যাকরণকে এমনভাবে সরল করলেন যাতে অতি সাধারণ স্তরের বালকও দেবভাষা শিখতে কিছুমাত্র আয়াস বোধ না করে। এই 'উপক্রমণিকা' প্রকাশিত হবার পর শুধু সংস্কৃত কলেজে নয়, সারা বাংলাদেশের ছাত্র-সমাজ প্রাথমিক সংস্কৃত শিখবার জন্য একমাত্র এই বইখানাকে অবলম্বন করেছিল। 'উপক্রমণিকা'র রচনাসম্পর্কে একটি কাহিনী তাঁর কোন কোন জীবনচরিতে পাওয়া যায়। তাঁর বন্ধুস্থানীয় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় একটু বেশী বয়সে তাঁর কাছে সংস্কৃত শিক্ষার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। "রাজকৃষ্ণবাবুর বয়োধিক্য নিবন্ধন প্রচলিত প্রথার ধৈর্যচ্যুতির সম্ভাবনা ভয়ে তিনি এই দুর্বোধ্য ও বহুকালব্যাপী মুগ্ধবোধ শিক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে অল্প আয়াসসাধ্য কোন নূতন উপায় উদ্ভাবন" করার জন্য চিন্তিত হলেন এবং "বাঙ্গালা অক্ষরের বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া......" সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মাবলী সরলভাবে উপস্থাপিত করলেন। "পরিশেষে ইহাকেই মূল ভিত্তি করিয়া 'উপক্রমণিকা'র সৃষ্টি হইয়াছিল।"[৭০] বোধ হয় গোড়ার দিকে তিনি এইভাবে স্বহস্তে সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণের নিয়মাবলী লিখে তার সাহায্যে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংস্কৃত শিক্ষাদানে অগ্রসর হয়েছিলেন। কারণ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের দ্বারা সেকাজ সম্ভব নয়, তা তিনি আগেই বুঝেছিসেন।

---

৭০. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর, পৃ. ৭৭-৭৮

ছাত্রজীবনে তিনি ন'বৎসর বয়সে (১৮২৯, জুন মাস) সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবেশ করেন, তার দেড় বৎসর পরে (১৮৩১, মার্চ) বিদ্যাসাগর পাঁচ টাকা করে বৃত্তি পান এবং ১৮৩৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত—মোট তিন বৎসর ছ' মাস তিনি ব্যাকরণের শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন (দ্রষ্টব্য : 'শ্লোকমঞ্জরী'র বিজ্ঞাপন)। নয় থেকে বারো বছর পর্যন্ত মোট তিন বৎসরে তাঁকে গোটা 'মুগ্ধবোধ' পড়তে হয়েছিল, শেষ ছ' মাসে 'অমরকোষ' (মনুষ্যবর্গ) এবং 'ভট্টিকাব্যে'র পঞ্চম সর্গ পর্যন্ত অধ্যয়ন করতে হয়েছিল। এই তিন বৎসর ব্যাকরণ পড়তে গিয়ে বালক বিদ্যাসাগরকে 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণ নিয়ে যে হিমসিম খেতে হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য কুমারহট্ট নিবাসী গঙ্গাধর তর্কবাগীশের শিক্ষাগুণে তিনি 'মুগ্ধবোধ' ভালই আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু এ ব্যাকরণ বালকের পক্ষে কত দুরূহ তা তিনি নিজেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাই ১৮৫১ সালে যখন তাঁর নেতৃত্বে সংস্কৃত কলেজের পাঠসংস্কার শুরু হল, তখন অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীর জন্য উপক্রমণিকা এবং বয়স্ক ছাত্রের জন্য ব্যাকরণ কৌমুদী নির্দিষ্ট হল। তিনি নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছিলেন যে, মুগ্ধবোধ-অমরকোষাদি কিছু অধিগত করতে গেলেও ন্যূনপক্ষে পাঁচ বৎসর সময় লাগে। কিন্তু যতটা পরিশ্রম ব্যয় করতে হয় সেই পরিমাণে লাভ হয় নামমাত্র। তাই সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যতালিকা থেকে মুগ্ধবোধ, ধাতুপাঠ ও অমরকোষ তুলে দিয়ে সেখানে সিদ্ধান্ত কৌমুদী নির্দিষ্ট হল। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের প্রথম পাঠার্থীরা "নিতান্ত শিশু ; শিশুগণের পক্ষে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সংস্কৃত ব্যাকরণপাঠ কোনক্রমেই সহজ ও সুসাধ্য নয়" ('উপক্রমণিকা'র বিজ্ঞাপন)। উপরন্তু "যাঁহারা ইঙ্গরেজী অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিতে অত্যন্ত উৎসুক ও অত্যন্ত অভিলাষী হইয়া থাকেন। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ অত্যন্ত দুরূহ ও অত্যন্ত নীরস বলিয়া সাহস করিয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না" (ঐ)।[৭১] তাই তিনি বাংলাভাষায় সংস্কৃতভাষার মোটামুটি শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ সঙ্কলন করেন। "ছাত্রেরা প্রথমতঃ অতি সরল বাঙ্গালাভাষায় সঙ্কলিত সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অতি সহজ সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিবেক ; তৎপরে সংস্কৃতভাষায় কিঞ্চিৎ বোধাধিকার জন্মিলে সিদ্ধান্ত কৌমুদী ও রঘুবংশাদি পাঠ করিতে আরম্ভ করিবেক" (ঐ)।

এরপর অধিক অগ্রসর ছাত্রদের জন্য তিনি 'মুগ্ধবোধ' ও 'লঘুকৌমুদী' অবলম্বনে 'ব্যাকরণ কৌমুদী' রচনা করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ শ্রেণীকে তিনি এমনভাবে ঢেলে সাজিয়েছিলেন যে, ছাত্রদের "চারি পাঁচ বৎসরে ব্যাকরণে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও সংস্কৃত ভাষাতেও বিলক্ষণ বোধাধিকার জন্মিতে পারিবে" (ঐ)।

৭১. এখানে বোধহয় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্কৃত শিখবার কথা হচ্ছে।

দ্বাদশ বৎসরেব চেষ্টা ব্যতিবেকে ব্যাকবণ অধিগত হয না—রক্ষণশীল পণ্ডিতসমাজ এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু "সংস্কৃত ব্যাকবণ বড খল শাস্ত্র, চিবকাল উপাসনা কবিলেও, প্রসন্ন হন না।"[৭২] তাই কাব্যেব শর্কবামণ্ডন দিযে ব্যাকবণ শেখাবাব প্রচেষ্টা (ভট্টিকাব্য), আদ্যবন্তে চ হবিধ্বনি কবে 'হবিনামামৃত ব্যাকবণ' (জীবগোস্বামী) লিখে একই সঙ্গে ব্যাকবণ শিক্ষা ও পুণ্যার্জনেব সুলভ উপায় আবিষ্কৃত হযেছে। তবু এব মন পাওযা ভাব। বিদ্যাসাগব সে দুঃসাধ্য কর্ম সহজ কবলেন। বাংলাদেশে আধুনিককালে ব্যাকবণ শিক্ষাকে সহজ কববাব জন্য এবং ইংবেজী শিক্ষিত সমাজেব ব্যাকবণ-ভীতি দূব কবাব জন্য বিদ্যাসাগবেব 'উপক্রমণিকা' বিশেষভাবে সহাযক হযেছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

১১.

এই প্রসঙ্গে এই খণ্ডেব অন্তর্ভুক্ত আবও দু একটি বচনা সম্বন্ধে আমবা সংক্ষিপ্ত মন্তব্য কবে এ প্রস্তাব সমাপ্ত কবব। নানা পত্রপত্রিকাব সঙ্গে বিদ্যাসাগব জডিত ছিলেন, বীতিমতো প্রবন্ধাদি দিযে সাহায্য কবতেন। বিশেষতঃ প্রগতিশীল ব্যাপাবে তিনি ছিলেন সহযোগিতাব উদাবহস্ত। 'সর্বশুভকবী' (১৮৫০, ভাদ্র) নামে একটি মাসিকপত্রেব সঙ্গে তাঁব কিছু যোগাযোগ ছিল। ঠনঠনেব কযেকজন যুবকে মিলে 'সবশুভকবী' নামে একটি সভা এবং তাব মুখপত্রস্বরূপ 'সবশুভকবী পত্রিকা' প্রতিমাসে প্রকাশ কববাব সংকল্প কবে বিদ্যাসাগবেব দ্বাবস্থ হন। এব সঙ্গে বিদ্যাসাগবেব বান্ধব মদনমোহন তর্কালঙ্কাবেবও খুব যোগাযোগ ছিল। এব সম্পাদক হিসেবে নাম ছিল মতিলাল চটোপাধ্যাযেব। প্রতি সংখ্যাব একটি কবে দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশই এব বৈশিষ্ট্য। এব প্রথম সংখ্যায বিদ্যাসাগবেব 'বাল্যবিবাহেব দোষ' নামে একটি অনতিদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয অবশ্য এতে লেখকেব কোন নাম থাকত না। কিন্তু এই প্রবন্ধটি য বিদ্যাসাগবেবই বচনা তাব নানা প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ এব বিষযবস্তু, ভাবাদর্শ ও যুক্তিব উপস্থাপনা বিদ্যাসাগবেব বৈশিষ্ট্যকেই স্মবণ কবিযে দেয। দ্বিতীযতঃ বিদ্যাসাগবেব তৃতীয সহোদব শম্ভুচন্দ্র বিদ্যাবত্ন ('বিদ্যাসাগব জীবনচবিত ও ভ্রমনিবাস' —সনৎকুমাব গুপ্ত সম্পাদিত নতুন সংস্কবণ, পৃ. ৮০-৮১) এই তথ্যটি বিবৃত কবেছেন।[৭৩] এই প্রবন্ধে বিদ্যাসাগব অতি সবল ভাষায এবং অকাট্য যুক্তি প্রযোগ

৭২. 'অতি অল্প হইল' থেকে উদ্ধৃত, এটি বিদ্যাসাগবেব বচিত বলে পকাশ। এ সম্বন্ধে পরবর্তী খণ্ডেব যথাস্থানে আলোচনা থাকবে৷

৭৩. বাজনাবায়ণ বসু তাঁব 'আত্মচবিতে' এবং বিহাবীলাল সবকার 'বিদ্যাসাগরে' এর উল্লেখ কবেছেন।

করে যেভাবে বাল্যবিবাহের দোষোদ্ঘাটন করে বয়স্ক বিবাহের সমর্থন করেছেন, তাতেই তাঁর বিপ্লবী মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। নৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্য, বংশানুগতি—সব দিক থেকে বিচার করেই তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, "অতএব যে বাল্যবিবাহ দ্বারা আমাদিগের এতাদৃশী দুর্দ্দশা ঘটিয়ে থাকে, সমূলে তাহার উচ্ছেদ করা কি সর্বতোভাবে শ্রেয়স্কর নহে?" এই প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি দেখিয়েছেন, বাল্যবিবাহের আর একটি কুফল বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি। তখনও তিনি বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আন্দোলনে অবতীর্ণ হন নি বটে, কিন্তু বিধবাদের দুঃখদুর্দশা সম্বন্ধে তিনি সহৃদয়তার সঙ্গে বলেছিলেন, "বিধবার জীবন কেবল দুঃখের ভার। এবং এই বিচিত্র সংসার তাহার পক্ষে জনশূন্য অরণ্যাকার। পতির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত সুখ সাঙ্গ হইয়া যায়।··· যে কঠোর ব্রহ্মচর্য ব্রতাচরণ পরিণত শরীর দ্বারাও নির্বাহকরণ দুষ্কর হয়, সেই দুশ্চর ব্রতে কোমলাঙ্গী বালিকাকে বাল্যাবধি ব্রতী হইতে হইলে তাহার সেই দুঃখদগ্ধ জীবন যে কত "দুঃখেতে যাপিত হয়, বর্ণনার দ্বারা তাহার কি জানাইব।" এখানে দেখা যাচ্ছে এই বেদনাবোধ থেকেই পরবর্তীকালে তিনি বিধবাবিবাহকে বৈধীকরণ এবং এর সামাজিক স্বীকৃতির জন্য সর্বস্ব পণ করেছিলেন। আর একটা কথা—এই প্রবন্ধে নর-নারীর বিবাহের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি যে কথা বলেছেন, প্রাচীন স্মার্ত আচার-আচরণে তার সমর্থন পাওয়া যাবে না, তার সমর্থন পাওয়া যাবে আধুনিক মানুষের জীবনপ্রতীতি মধ্যে। শাস্ত্র বলছেন, "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা।" পুন্নামক নরক থেকে পুত্র ত্রাণ করবে—এই হলো শাস্ত্রের নির্দেশ। আর শাস্ত্রই বলছেন 'অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা দান করিলে পিতামাতার গৌরীদান জন্য পুণ্যোদয় হয়; নবম বর্ষীয়াকে দান করিলে পৃথিবী দানের ফললাভ হয়; দশম বর্ষীয়াকে পাত্রসাৎ করিলে পরত্র পবিত্র লোকপ্রাপ্তি হয়।" বিদ্যাসাগর স্মৃতিশাস্ত্র-প্রতিপাদিত এই সমস্ত নির্দেশকে অবহেলাভরে উপেক্ষা করেছেন। স্মৃতির বিধান ও লোকাচার প্রবল হয়ে বাল্যবিবাহের কুফল সম্বন্ধে সাধারণকে "কল্পিত ফলমৃগতৃষ্ণায় মুগ্ধ" করে রেখেছে। কিন্তু বিবাহের মূল উদ্দেশ্য, "সুমধুর পরস্পর প্রণয়"—তা বাল্যবিবাহের ফলে পদে পদে ব্যাহত হয়। বাল্যবিবাহের ফলে এবং অপরিণামদর্শী পিতামাতা কর্তৃক ঝটিতি পুত্রকন্যার বিবাহ দেওয়ার ফলে দাম্পত্য প্রেমের সুমধুর আস্বাদন থেকে অনেকেই বঞ্চিত হয়। বিদ্যাসাগর বলছেন, "মনের ঐক্যই প্রণয়ের মূল।······অস্মদ্দেশীয় বালদম্পতিরা পরস্পরের আশয় জানিতে পারিল না, অভিপ্রায়ে অবগাহন করিতে অবকাশ পাইল না, অবস্থার তত্ত্বানুসন্ধান পাইল না, আলাপ-পরিচয় দ্বারা ইতরেতরের চরিত্র-পরিচয়ের কথা দূরে থাকুক, একবার অন্যোন্য নয়ন-সঙ্ঘটনও হইল না, কেবল একজন উদাসীন বাচাল ঘটকের প্রবৃত্তিজনক বৃথা বচনে

প্রত্যয় করিয়া পিতামাতার যেমন অভিরুচি হয়, কন্যাপুত্রের সেই বিধিই বিধিনিয়োগবৎ সুখ দুঃখের অনুল্লঙ্ঘনীয় সীমা হইয়া রহিল। এই জন্যই অস্মদ্দেশে দাম্পত্যনিবন্ধন অকপট প্রণয় প্রায় দৃষ্ট হয় না, কেবল প্রণয়ী ভর্তাস্বরূপ এবং প্রণয়িনী গৃহপরিচারিকা-স্বরূপ হইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করে।" (বিদ্যাসাগর রচনাবলী, ১ম, পৃ, ২৪৩)

বিবাহবন্ধনকে শাস্ত্রসংহিতার অষ্টপাশ থেকে এবং প্রজাসৃষ্টির যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তি দিয়ে তিনি পরস্পরের মনের মিল ও প্রণয়কেই প্রাধান্য দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর সে যুগের পক্ষে কতটা অগ্রসর হয়েছিলেন তা বোঝা যাবে এই ইঙ্গিতে—প্রাগ্‌বিবাহের কালেও নর-নারী যদি পরস্পরে আশয় জানতে চায়, অভিপ্রায়ে অবগাহন করতে চায়, "আলাপপরিচয় দ্বারা" "নয়নসঙ্ঘটনেও" উদ্যত হয়, তাহলে বিদ্যাসাগরের আপত্তি নেই, বরং তাই-ই তাঁর মনোগত অভিলাষ। এর থেকে তাঁকে সেযুগের পক্ষে যেন গ্রহান্তরের জীব বলে মনে হচ্ছে। যে সমস্ত ব্যাপারে এখনও কারও কারও চক্ষু ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে কুঞ্চিত হয়ে ওঠে, এক শতাব্দী পূর্বে মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর তাকেই বরমাল্য দিয়েছিলেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ('বাল্যবিবাহের দোষ') তাঁর যে যুক্তিবাদ, কাণ্ডজ্ঞান ও ভাবাবেগ দেশাচারকে উপেক্ষা করেছে, পরবর্তীকালে বিধবাবিবাহ প্রচার ও বহুবিবাহ-নিরোধ বিষয়ক পুস্তিকাগুলিতে তার আরও পরিপক্ক প্রকাশ দেখা গেছে।

আমাদের এই সংগ্রহে বিদ্যাসাগরের সম্পাদিত কয়েকখানি সংস্কৃত ও একখানি হিন্দী গ্রন্থের ভূমিকা উদ্ধৃত করা হয়েছে। এর মধ্যে 'ঋজুপাঠে'র (সংস্কৃত-অনুশীলনের পাঠ্যগ্রন্থ) তিনখণ্ডের ভূমিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, সংস্কৃত সাহিত্য বিচারে তিনি যুক্তি-বুদ্ধির আবেদনই বেশী মেনে নিয়েছেন। প্রয়োজন স্থলে দেবভাষার পূজনীয় গ্রন্থকেও সমালোচনা করতে ছাড়েন নি। 'পঞ্চতন্ত্রে'র মধ্যে অশ্লীল উপাখ্যান আছে, উপরন্তু "অধুনাতন গ্রন্থের ন্যায়, রচনার মাধুর্য নাই, কথাযোজনার চাতুর্য নাই। তাই তিনি কয়েকটা মারাত্মক দোষ (পৌনরুক্ত, প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অতিবিস্তৃত বর্ণনা প্রভৃতি) দেখেছেন, এবং বাল্মীকির পরবর্তী নব্য কাব্যগ্রন্থে তিনি অধিকতর কাব্যলক্ষণ দেখেছেন, 'হিতোপদেশ'কেও তিনি কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। এতেও অশ্লীল উপাখ্যানের অসদ্ভাব নেই, অসংলগ্নতার বহু দৃষ্টান্ত আছে। এ গ্রন্থ বালকদের জন্য রচিত, অথচ এতে একাধিক অশ্লীল উপাখ্যান আছে। এই জন্য বিদ্যাসাগর বলেছেন, "অতএব, আশ্চর্য বোধ হইতেছে যে, বালকদিগের নিমিত্ত নীতি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়া, কি-প্রকারে গ্রন্থকর্তার ঐরূপ অশ্লীল উপাখ্যান সঙ্কলন

করিতে প্রবৃত্তি হইল।" (ঋজুপাঠের তৃতীয় ভাগের বিজ্ঞাপন)। ভট্টিকাব্য সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত—কাব্যকার ব্যাকরণের উদাহরণের দিকে লক্ষ্যদৃষ্টি ছিলেন বলে, ভট্টিকাব্যের অধিকাংশই অত্যন্ত নীরস ও অত্যন্ত কর্কশ। ফলতঃ ভট্টিকাব্য কোন মতেই উৎকৃষ্ট কাব্যমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না।" 'বেণীসংহার' রচয়িতা ভট্টনারায়ণ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য, "ভট্টনারায়ণ নাটকের নিয়ম যত প্রতিপালন করিয়াছেন, কবিত্বশক্তি তত প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।" হিন্দী 'বৈতাল পচ্চীসী'র মূল সংস্কৃত 'বেতালপঞ্চবিংশতি' সম্বন্ধে তিনি যথার্থ বলেছেন যে, এতে কোনও প্রকার শিল্পকলার চিহ্ন নেই, এবং ছেলেমানুষীভরা গালগল্পের দিকেই গল্পগুলির প্রবণতা বেশী, সংস্কৃতির অবক্ষয়ের যুগে যা হল সাধারণ লক্ষণ।[৭৪] (বিদ্যাসাগর রচনাবলীর ৩৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে' (১৮৫৩) তিনি সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে 'সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম আধুনিক ভারতীয় ঐতিহাসিক হিসেবে যা বলেছেন, আমরা পরবর্তী খণ্ডে সে বিষয়ে আলোচনা করে তাঁর নির্ভীক সমালোচকের ভূমিকা সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ করব।

প্রথম খণ্ডের ভূমিকা এখানেই সমাপ্ত হল। বিদ্যাসাগরের যথার্থ সাহিত্য-প্রতিভা, গদ্যরীতি এবং বাংলা গদ্যের গঠনে তাঁর দান সম্পর্কে আমরা অন্যান্য খণ্ডে আলোচনা করব। প্রথম খণ্ডে পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত যে পুস্তক-পুস্তিকাগুলি প্রকাশিত হল, তাতে বিদ্যা-সাগরের স্বাধীন রচনার স্বরূপ এবং শিল্পপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য ততটা ফুটে ওঠে নি। পরবর্তী খণ্ডসমূহে তাঁর প্রতিভার যথার্থ স্মারকচিহ্নস্বরূপ বিখ্যাত গ্রন্থগুলির আলোচনা থাকবে। সর্বশেষ খণ্ডে আমরা তাঁর মনোলোকের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলা-বিভাগ
১৩৭৩ ॥ ১৯৬৬

৭৪. ইতিপূর্বে 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র আলোচনায় আমরা ইংরেজিতে লেখা বিদ্যাসাগরের সেই মন্তব্য উদ্ধৃত করেছি।

মুখবন্ধ

সংস্কৃতের কঠিন নিগড় ভেঙে বাংলা ভাষাকে মুক্তি দিয়েছিলেন যে ভগীরথ, তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান কিন্তু আপন তেজে শুধু সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন, সারা বাংলা তথা বাঙালীকে বিস্মিত চমকিত ও স্তম্ভিত করলেন যে তাই নয় উপরন্তু জাতীয় শিক্ষা ও সাহিত্যের নবযুগের প্রবর্তন করলেন। কোথা থেকে সে তেজ, সে বীর্য তিনি লাভ করেছিলেন তার বিচার অনাবশ্যক, তবে বাংলাদেশের যে—'নেতিয়েপড়া কাঁদ-কাঁদ ভিজে সপ্‌সপে ভাব আছে, বিদ্যাসাগর হলেন তার কঠোর প্রতিবাদ। বিদ্যাসাগর হলেন আগুনের শুকনো বীর্য (১)।'

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে যে প্রচণ্ড আলোড়ন নবজাগরণের সূচনা করেছিল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তারই অন্যতম মূল সমিধ। জীবনের হেন ক্ষেত্র নেই যেখানে তাঁর প্রচেষ্টা কার্যকরী ছিল না। রাজনৈতিক উত্থান পতন থেকে শুরু করে, সামাজিক কুসংস্কার দূর করে সমাজকে নতুন করে গড়া, বর্ণপরিচয় থেকে আরম্ভ করে সাহিত্যের বৈয়াকরণিক রূপ মায় তার পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা, প্রাথমিক শিক্ষা স্ত্রী-শিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সব কিছুর পুনর্গঠন, বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের আন্দোলন, বহুবিবাহ নিরোধ, তিন আইনে বিবাহ ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রায় সর্ববিধ শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা। কোথাও তিনি স্বয় নায়ক, কোথাও নায়কের সহকারী, কোথাও আবার উৎসাহী দর্শক তথা সমর্থক। এক কথায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি অন্যতম পথপ্রদর্শক।

বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি—কাজেই বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কিছুটা বিস্মৃতি আসা স্বাভাবিক। কিন্তু তবু তাঁর জীবনী, প্রতিভা, কীর্তিকাহিনী তথা তাঁর কালের মূল্যায়ন সম্বন্ধে আলোচনার বিপুল বিস্তার, আগ্রহী পাঠককে বিস্মিত সচকিত করবে। এইসব রচনার যে সামান্যতম ভগ্নাংশ বর্তমান সম্পাদকের দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। তার একটি তালিকা কৌতূহলী পাঠকদের জন্য রচনাবলীর শেষে মুদ্রিত করা হয়েছে। সে তুলনায় তাঁর সাহিত্যকীর্তি অবহেলিত। বিদ্যালয় পাঠ্য কয়েকটি পুস্তক ছাড়া তাঁর অন্যান্য রচনা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য প্রায় (২)। অথচ রচনাবলী প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা

(১) অবিস্মরণীয় মুহূর্ত (বর্ণপরিচয়)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

(২) অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত 'বিদ্যাসাগর-রচনা সম্ভার' মাধ্যমে তাঁর রচনার আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়।

তাজও অনস্বীকার্য। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়—'আমাদের জাতীয় শিক্ষা-বিস্তারে, চরিত্র-গঠনে এবং সাহিত্যের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠায় যাঁহার অধ্যবসায় অনন্য সাধারণ এবং যাঁহার কীর্ত সর্বাপেক্ষা বিরাট, সেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা ও চিন্তাধারার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ-সূত্র বজায় রাখা, জাতির মঙ্গলের জন্য এখনও প্রয়োজন আছে। এই গ্রন্থাবলীর মধ্য দিয়া তাহা সম্ভব হইবে, এবং অন্ততঃ আরও অর্ধ-শতাব্দী-কাল ধরিয়া, এই যুগের ছেলেরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা ও মনের স্পর্শ পাইয়া, নিজেরা, উপকৃত হইয়া তাঁহার মহত্ত্ব প্রণিধান করিতে পারিবে (৩)।'

উপরিউক্ত মন্তব্যের যথার্থতা স্বীকার করে বিদ্যাসাগর রচনাবলী প্রকাশের আয়োজন করা হয়েছে। বাংলা ও বাঙালীর বর্তমান সঙ্কটকালে জাতীয় চরিত্রগঠন ও শিক্ষার আদর্শ নির্দেশক বাংলা ভাষা ও বাঙালী দরদী, নির্ভীক, তেজস্বী, কর্তব্যপরায়ণ বিদ্যাসাগরের রচনাবলীর পুনঃপ্রচার জাতীয় ঋণ পরিশোধের সামান্য চেষ্টামাত্র।

বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রসার, প্রচার ও উন্নতির জন্য, বাঙালী মাত্রই শিক্ষিত হোক— এই চেষ্টায় এবং বাঙালীর সমাজ ও শিক্ষা ব্যবহার নবরূপায়ণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম অতুলনীয়। তাঁর চরিত্র তথা কর্মক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় আর এক মনীষীর উক্তিতে—

ইহাদের পর সংস্কৃত কালেজের দল। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, তারাশঙ্কর (বাণভট্ট রচিত সংস্কৃত গদ্যকাব্য কাদম্বরীর ভাবানুবাদক তারাশঙ্কর তর্করত্ন), বহুসংখ্যক উত্তম নাটকের প্রণেতা, অনুবাদক শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রভৃতি বহুসংখ্যক লেখক এই সময়ে সংস্কৃত কালেজ হইতে বহির্গত হন। ইঁহারা ইংরেজীভাব বাঙ্গালায় ব্যক্ত করিতেন না। সংস্কৃত হইতে ভাবমালা সংগ্রহ করিয়া ইঁহারা বাঙ্গালীকে উপহার দিতেন। ইঁহাদের কতলোকের নাম করিব? সকলেই পূজ্যপাদ, সকলেরই নিকট বাঙ্গালা নানা কারণে বাধ্য। ইঁহারাই কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের মহাভারত অনুবাদ করিয়া আপনাদিগকে ও সিংহ মহোদয়কে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন, বাঙ্গালী পাঠককে অগাধ রত্নরাশির অধিকারী করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের দলের সর্বাগ্রণী, এমন কি পরিবর্তন সময়ের প্রধান নেতা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম এখনও করা হয় নাই। ইনি একা একশত। ইনি যে বাঙ্গালীকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছেন, বাঙ্গালায় শিক্ষা বিভাগ স্থাপন করিবার সময় যে গবর্ণমেণ্টকে কত বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা সমস্ত খুলিয়া লিখিতে গেলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হয়। ইনি সর্বপ্রথম বাঙ্গালীকে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শিখাইয়াছেন। ইঁহার 'কথামালা' (ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৬ খৃঃ

(৩) বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী (সাহিত্য)—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ভূমিকা।

অব্দ) ও 'চরিতাবলী'র (জুলাই, ১৮৫৩ খৃঃ অব্দ) ভাষা যদি বঙ্গীয় সর্বপ্রধান লেখকও পড়েন, অনেক উপকার লাভ করেন। তাহার পর ইঁহার নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতা, ইঁহার স্বভাব, নির্ভীকতা, স্বাধীনভাব, দেশীয় সমস্ত যুবক বৃন্দের আদর্শস্বরূপ হওয়া উচিত (৪)।'

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তি থেকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের নানাদিক ও চারিত্রিক নানা বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়েছে। বিদ্যাসাগর জীবনের নানা ঘটনা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে স্ফুটতর করেছে। তাদের সবগুলিই বাঙ্গালী মাত্রেরই এতই সুপরিচিত যে, উদাহরণ উল্লেখ অবান্তর।

বিদ্যাসাগরের আর এক পরিচয় সুন্দরভাবে ফুটেছে মধুসূদনের উক্তিতে—

'বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভুবনে
দয়ার সাগর তুমি সেই জানে মনে
দীন যে দীনের বন্ধু।'

বিদ্যাসাগর দয়া, সেবা বা পরোপকার জাতি-কুল-শীল নিরপেক্ষ। কার্মাটাবের দরিদ্র সাঁওতাল থেকে মধুসূদন পর্যন্ত তা একই ভাবে পেয়েছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাই নিশ্চিন্ত ভাবে বলতে পারেন—

'The man to whom I have appealed has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother.'

বাঙালী মায়ের কোমল মনের আড়ালে যে বজ্রাদপি কঠোরানি মনের বসতি ছিল ভাবাবেগে কবি সে কথা বলেন নি, ফলে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কিছুটা একপেশে হয়ে পড়ে। বিদ্যাসাগর চরিত্রের দার্ঢ্য তাঁর পরোপকার প্রবৃত্তির মধ্যে স্বপ্রকাশ। মানবসমাজের কলুষ-গ্লানি-মালিন্য সব কিছুকে তুচ্ছ করে আপন ইচ্ছা পূরণ করা দুর্বলের পরিচায়ক নয়। এ বিষয়ে আধুনিক বিচারকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

'বিদ্যাসাগরের চরিত্র বিচার করিলে আমরা প্রধানতঃ তাঁহার তিনটি মানস-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারি—সংস্কারমুক্ত মন, মানবপ্রেম ও যুক্তিবাদ।……… বিদ্যাসাগরের মানবপ্রেম হইতেই সংস্কারমুক্তি ও যুক্তিবাদের আবির্ভাব হইয়াছে। হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্র সম্প্রদায় হিন্দুর সংস্কার বর্জন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার পশ্চাতে মানব প্রেমের তপ্ত স্পর্শ ছিল না। ইউরোপীয় জীবনধারার উত্তেজক

(৪) হরপ্রসাদ রচনাবলী (প্রথম সম্ভার)—সম্পাদক—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। 'বাঙ্গালা সাহিত্য' (পৃঃ ১৮১—১৮২) শীর্ষক প্রবন্ধটি ১২৮৭ সালের ফাল্গুন মাসের বঙ্গদর্শন-এ মুদ্রিত।

পানীয় পান করিয়া তাহাদের চিত্ত উত্তেজিত হইয়াছিল; তাঁহাদের সে জাগরণ নিতান্তই বহিরঙ্গ-বিলাসী চিত্তের প্রাথমিক উজ্জীবন মাত্র। জীবনের গভীরে অবস্থিত কোন গূঢ়তর এষণা তাঁদের জীবনধর্ম ও সাধনাকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই। ইউরোপীয় শিক্ষা লাভ করিয়া তাঁহারা পৈত্রিক সংস্কারকে জীর্ণ বসনের মতই ত্যাগ করিয়াছিলেন; আত্মার সংকট বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা এই তরুণদের চিত্তপটে বিশেষ কোন সংশয়ের ছায়া সঞ্চার করিতে পারে নাই। কিন্তু বিদ্যাসাগরের চিত্তপটে যে সংস্কারমুক্তির সমুদ্রতরঙ্গ আহত হইয়াছিল, তাহার মূলে স্থানিক ও কালিক পরিবেশের প্রভাব থাকিলেও তাঁহার নিজস্ব চরিত্র-স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিসত্তার একান্ত অভিনবত্বই তাঁহাকে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্য ও বাঙালী-জীবনে এক অনন্য-সাধারণ বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। পূর্বতন সমাজধারা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া এবং তাহাতে নিজ প্রাণধর্মের বিদ্যুৎস্পর্শ সঞ্চার করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা দেশে যে ঐতিহ্যের পদরেখা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা যুগান্তরের পটে এখনও দীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে (৫)।'

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন, কর্মকাণ্ড ও চরিত্র বিশ্লেষণে একটি তথ্যই বারবার মনে উদিত হয়, জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ দৈনন্দিন খুঁটিনাটি থেকে শুরু করে অতি মহৎ প্রেরণার আড়ালে একটি প্রকৃত মানুষের রূপরেখা বর্তমান। সমকালীন বুদ্ধিজীবী কঠোর সমালোচক থেকে আজকের দিনের সমালোচকের আণুবীক্ষণিক দৃষ্টিতেও বিদ্যাসাগর চরিত্র সমান উজ্জ্বল—

'বিংশশতকের পুনর্বিচারে বিদ্যাসাগরের মহিমা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নাই—বরঞ্চ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে (৬)।'

বাংলা ভাষার সংস্কার, শুধু সংস্কার কেন পুনর্গঠন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আর এক অতুলনীয় কীর্তি। নিজেব লেখার মাধ্যমে তিনি ভাষার উন্নতি ঘটালেন, স্থাবর জড় ভাষা প্রথম তাঁর হাতেই সজীব জঙ্গম হয়ে দাঁড়াল। প্রচলিত গদ্যের অহেতুক জটিলতার জট ছাড়ালেন তিনি—বদ্ধ জলে এল নৃত্যের ছন্দ। বিদ্যাসাগরের পূর্বে বাংলাভাষার সাহিত্য রচনায় কমা, সেমিকোলন, ফুলস্টপ ইত্যাদির যথাযথ ব্যবহার ছিল না তিনিই প্রথম বিরাম চিহ্নের যথাযথ প্রয়োগে ভাষাকে সুসংযত ও সহজবোধ্য করলেন।

'আজ পর্যন্ত ঐ সব চিহ্নের সুষ্ঠুতর ব্যবহার কোন বাঙালী লেখকের রচনায় দেখা

(৫) উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য—শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
(৬) বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার (ভূমিকা)—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত।

যায় নি। এখনকার খুব কম লেখকই বিদ্যাসাগরের মতো নিপুণ ভাবে চিহ্নগুলি ব্যবহার করতে পারেন (৭)।'

'বাংলাগদ্যের জনক'-রূপে অভিনন্দিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখাতেই প্রথম সাহিত্যের প্রসাদগুণ দেখা যায়। তাঁর রচনার ভাষা-প্রসঙ্গে বাংলা ভাষার নবরূপদাতা রবীন্দ্রনাথের অভিমত—

'তাঁহার প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা। যদি এই ভাষা কখনো সাহিত্য সম্পদে ঐশ্বর্যশালিনী হইয়া উঠে, যদি এই ভাষা অক্ষয় ভাবজননীরূপে মানব সভ্যতার ধাত্রীগণের ও মাতৃগণের মধ্যে গণ্য হয়—যদি এই ভাষা পৃথিবীর শোকদুঃখের মধ্যে এক নূতন সান্ত্বনাস্থল, সংসারের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থের মধ্যে এক মহত্ত্বের আদর্শলোক, দৈনন্দিন মানবজীবনের অবসাদ ও অস্বাস্থ্যের মধ্যে সৌন্দর্যের এক নিভৃত নিকুঞ্জবন করিতে পারে, তবেই তাঁহার এই কীর্তি তাঁহার উপযুক্ত গৌরব লাভ করিতে পারিবে (৮)।'

ভাষা বিষয়ে বিদ্যাসাগর ছিলেন প্রগতিশীল ও অগ্রবর্তী। সময় ও শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে ভাষার সংস্কার করতেন তিনি। তাঁর জীবৎকালে প্রায় প্রতিটি বইয়ের প্রতিটি সংস্করণেই কিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। ভাষা-সংস্কারক বিদ্যাসাগরের প্রভাব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কিরূপ কার্যকরী হয়েছে—তার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্য হল—

'বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধার মাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন-তেন-প্রকারণে কতকগুলো বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্য সমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে। আজিকার দিনে এ কাজটিকে তেমন বৃহৎ বলিয়া মনে হইবে না, কিন্তু সমাজবন্ধন যেমন মনুষ্যত্ববিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক তেমনি ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সুন্দররূপে সংযমিত না করিলে সে ভাষা হইতে কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না। সৈন্যদলের দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব, কেবলমাত্র জনতার দ্বারা নহে; জনতা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত প্রতিহত করিতে থাকে, তাহাকে চালনা করাই কঠিন। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য ভাষায় উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং

(৭) বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ—শ্রীশ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়।

(৮) বিদ্যাসাগর চরিত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন। এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধাসকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের *নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন—কিন্তু যিনি এই সেনার* রচনাকর্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।'

'বাংলা ভাষাকে পূর্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বরভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া, বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহার-যোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনি সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া, বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্যপণ্ডিত এবং গ্রাম্য বর্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্বে বাংলা গদ্যের যে অবস্থা ছিল তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাষা গঠনে বিদ্যাসাগরের শিল্পপ্রতিভা ও সৃষ্টিক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায় (৯)।'

রবীন্দ্রনাথের উক্তির যথার্থ ও সার্থক প্রমাণ বিদ্যাসাগর রচনাবলী। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কর্মী, প্রথম প্রতিভা, জনশিক্ষার প্রচারে তিনি কর্মযোগী। এ শক্তির পরিচয়েব সূত্রপাত 'বাসুদেব-চরিত' থেকে।

বিদ্যাসাগরের প্রথম অপ্রকাশিত গদ্যগ্রন্থ 'বাসুদেব-চবিত'। রচনাবলীর শেষে বিদ্যাসাগর-রচনাপঞ্জীতে এব উল্লেখ করা হয় নি। কারণ বইটির বচনাপ্রসঙ্গে নানা মতভেদ আছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকুরি করার সময় কলেজের কর্তৃপক্ষের অনুরোধে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে বাসুদেব-চরিত বচনা কবেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এটি অমনোনীত কবেন। সমসাময়িক বিদ্যাসাগব জীবন-চরিতকারেরা এর পাণ্ডুলিপি দেখেছেন বলে তাঁদেব বচনায উল্লেখ কবেছেন। কোন কোনটিতে অংশবিশেষ ছাপাও হযেছে। সেই লেখাব নমুনাস্বরূপ এখানে বিহাবীলাল সরকার প্রণীত বিদ্যাসাগব ১৩১৭ সালে মুদ্রিত তৃতীয় সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত কবা হল।

'এক দিবস দেবর্ষি নারদ মথুরায় আসিয়া কংসকে কহিলেন, মহারাজ! তুমি নিশ্চিন্ত রহিয়াছ, কোনও বিষয়ের অনুসন্ধান কর না; এই যাবৎ গোপী ও যাদব দেখিতেছ, ইহারা দেবতা, দৈত্যবধের নিমিত্ত ভূমণ্ডলে জন্ম লইয়াছে এবং শুনিয়াছি, দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া নারায়ণ তোমার প্রাণসংহার করিবেন, এবং তোমার পিতা

---

(৯) বিদ্যাসাগর চরিত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উগ্রসেন এবং অন্যান্য জ্ঞাতিবান্ধবেরা তোমার পক্ষ ও হিতাকাঙ্ক্ষী নহেন, অতএব, মহারাজ! অতঃপর সাবধান হও, অদ্যাপি সময় অতীত হয় নাই, প্রতিকার চিন্তা কর! এই বলিয়া দেবর্ষি প্রস্থান করিলেন। কংস শুনিয়া অতিশয় কুপিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ সপুত্র বাসুদেব-দেবকীকে আনাইয়া তাঁহাদিগের সমক্ষে পুত্রের প্রাণনাশ করিল এবং তাঁহাদিগকে কারাগারে নিগড় বন্ধনে রাখিল। অনন্তর নিজ পিতা উগ্রসেনকে দূরীকৃত করিয়া স্বয়ং রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিল এবং প্রলম্ব বক, চানুর, তৃণাবর্ত প্রভৃতি দুর্বৃত্ত সৈন্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যদুবংশীয়দের উপরি নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে লাগিল। তাহারা প্রাণভয়ে পলাইয়া কুরু, কেকয়, শাল্ব, পাঞ্চাল, বিদর্ভ, নিষধ আদি নানাদেশে প্রচ্ছন্নবেশে বাস করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ কংসের শরণাপন্ন ও মতানুযায়ী হইয়া মথুরাতে অবস্থান করিলেন।

'অনন্তর অষ্টম মাস পূর্ণ হইলে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমীর অর্ধরাত্র সময়ে ভগবান্ ত্রিলোকনাথ দেবকীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেন। তৎকালে দিক্ সকল প্রসন্ন হইল, গগনমণ্ডলে নির্মল নক্ষত্রমণ্ডল উদিত হইল গ্রামে নগরে নানা মঙ্গল-বাদ্য হইতে লাগিল। সাধুগণের আশয় ও জলাশয় সুপ্রসন্ন হইল। দেবলোকে দুন্দুভি ধ্বনি হইতে লাগিল। সিদ্ধচারণ কিন্নর গন্ধর্বগণ গীতিস্তুতি করিতে লাগিল। বিদ্যাধরীগণ অপ্সরাদিগের সহিত নৃত্য করিতে লাগিল। দেব ও দেবর্ষিগণ হর্ষিত মনে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। মেঘ সকল মন্দ মন্দ গর্জন করিতে লাগিল।'

এই 'বাসুদেব-চরিত'-এর আর এক অংশ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্যাসাগর ১[illegible] ৬ সালে মুদ্রিত তৃতীয় সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত করছি। ইনও [illegible] পাণ্ডুলিপি দেখেছেন।

'এক দিবস কৃষ্ণ বলরাম ও অন্য অন্য গোপগণ কেবল একত্র মিলি[illegible] [illegible] করিতেছিলেন ইতিমধ্যে বলরাম প্রভৃতি গোপনন্দনেরা নন্দ [illegible] নিকটে গিয়া কহিল, হে গো কৃষ্ণ মাটী খাইয়াছে [illegible] যশোদা অস্তব্যস্তে আসিয়া কৃষ্ণের [illegible] [illegible] তুষ্ট তুই মাটী খাইয়াছিস বড় আজ আমি তোকে মাটী খাওয়া ভাল করিয়া শিখাইতেছি। * * * * এইরূপে কৃষ্ণের পরামর্শানুসারে দেবরাজের পূজা পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনবাসীরা গোবর্ধন পর্বতের অর্চনার বিধি সংস্থাপন করিলেন এবং মূর্তিমান দেবদর্শন করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, দেখ ভাই আমরা এতাবৎকাল পর্যন্ত ইন্দ্রের পূজা করিয়াছিলাম কখন দর্শন পাই নাই কিন্তু অদ্য একবার মাত্র অর্চনা

করিয়া গিরিদেবের দর্শন পাইলাম অতএব এতদিন আমরা এমন প্রত্যক্ষ দেবতার উপেক্ষা করিয়া বৃথা কালক্ষেপ করিয়াছি আজ কৃষ্ণ হইতে আমাদের ভ্রম নিবারণ হইল। কৃষ্ণ দেখিতে বালক বটে কিন্তু বুদ্ধিতে আমাদের পিতামহ। এইরূপ নানাবিধ কথোপকথন করিয়া কৃষ্ণ গুণগান করিতে লাগিলেন এবং নিত্যগীতাবসানে পুনরায় পর্বত প্রদক্ষিণ করিয়া কৃষ্ণের সহিত বৃন্দাবন প্রবেশ করিলেন।

ত্যজিয়া ইন্দ্রের পূজা পর্ব্বতে পূজিলে।
শুনিয়া ইন্দ্রের মনে ক্রোধ উপজিল॥'

কিন্তু 'বাসুদেব-চরিত' সম্পর্কে অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয়ের মত হচ্ছে,—ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের জনৈক সিভিলিয়ান ছাত্র হেনরি সারজ্যাণ্টের রচনাকে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্থানে স্থানে সংশোধন করেন। এই সংশোধিত পাণ্ডুলিপিই বিদ্যাসাগর রচিত 'বাসুদেব চরিত' সন্দেহে এযাবৎ প্রচলিত। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে পাওয়া 'বাসুদেব চরিত'-জাতীয় কৃষ্ণলীলা বই-এর পাণ্ডুলিপিটি কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি না পাওয়াতেই এত বিভ্রাট, এত বাকবিতণ্ডা। আমাদের দুঃখ, বিদ্যাসাগর রচিত প্রথম বাংলা গদ্য গ্রন্থের সঙ্গে আমরা পরিচিত হ'তে পারলাম না।

ইতিপূর্বে কোথাও উল্লিখিত বা আলোচিত হয় নি এবং কোনও গ্রন্থাবলী বা রচনাবলীতে মুদ্রিত হয় নি এমন একটি ক্ষুদ্র মুদ্রিত পুস্তিকার কথা উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয়, তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড, উনবিংশ শতাব্দ, পুস্তকে। অধ্যাপক বিজিতকুমার দত্ত পুস্তিকাখানি সংগ্রহ করেন এবং অধ্যাপক সেনকে দেন। পুস্তিকাটির নাম 'অপূর্ব ইতিহাস'। সম্ভবতঃ একান্ত পরিচিতজনের মধ্যে বিতরণার্থে পুস্তিকাটি ছাপা হয়েছিল। এবং এত অল্প সংখ্যক যে, এর সংবাদ প্রচারিত হয় নি। যার ফলে এটি লোকচক্ষুর আড়ালেই ছিল এযাবৎ। যদিও পুস্তিকাটি আমাদের দেখবার সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়নি, তবুও অধ্যাপক সেন-এর বিবৃতি অনুসারে পুস্তিকায় মুদ্রিত সন তারিখ হিসাবে এটি ১২৯২ সালে মুদ্রিত ও প্রচারিত।

বিদ্যাসাগর রচনাবলী চারিখণ্ডে প্রকাশিত। প্রথম খণ্ডে বেতালপঞ্চবিংশতি, বাঙ্গালার ইতিহাস (দ্বিতীয় ভাগ), জীবনচরিত, বোধোদয়, সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা মুদ্রিত হ'ল। রচনাকালের ধারাবাহিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যেই এইভাবে সাজানো হয়েছে। পাঠকের কাছে এই পদ্ধতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা ও রচনা ভঙ্গীর বিবর্তনবোধে সহজ হবে। সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা ব্যাকরণ শিক্ষার্থীর

সাহায্যের জন্য রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। এ ব্যাপারে তিনি যে নূতন রীতির প্রবর্ত্তন করেন তা দেখানোর জন্য এর অন্তর্ভুক্তি। বাল্য বিবাহের দোষ 'সর্বশুভকরী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (১৮৫০) প্রকাশিত।

রচনাবলী প্রকাশ ও মুদ্রণে সবিশেষ সতর্কতা ও যত্ন নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বই মিলিয়ে দেখা হয়েছে। বানান সম্বন্ধে কয়েকটি ক্ষেত্রে বর্তমান চলিত ও পাঠকচক্ষু অভ্যস্ত রীতি গ্রহণ করেছি। যেমন, পূর্ব্ব=পূর্ব, পর্য্যন্ত=পর্যন্ত, কর্ম্ম=কর্ম, অর্দ্ধ=অর্ধ, পরিবর্ত্তন=পরিবর্তন, ইঙ্গরেজী=ইংরেজী প্রভৃতি। কেবলমাত্র প্রতিটি বইয়ের ভূমিকার বানান পরিবর্তন করা হয় নি। তা সত্ত্বেও হয়তো কিছু ভুলত্রুটি থেকে গেল। কোন কৌতূহলী উৎসাহী পাঠক বা সমালোচক আমাদের দৃষ্টিগোচর করলে পরবর্তী সংস্করণ এবং খণ্ডগুলিতে সংশোধনের চেষ্টা করব। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন চিঠি, হস্তলিপি বা কোন পাণ্ডুলিপি আজও যদি কারও কাছে থেকে থাকে আমাদের জানালে ও মুদ্রণে সহযোগিতা করলে কৃতজ্ঞ থাকব।

পরিশেষে জানাই, এ রচনাবলী প্রকাশের আর একটি উদ্দেশ্য আছে। তা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি আমাদের জাতীয় কর্তব্য পালন--এদেশের মানুষকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগরকে নতুন করে চেনানো—

'…বিদ্যাসাগর মানে মাতৃভক্তি নয়, বিদ্যাসাগর মানে বিধবাবিবাহ নয়, বিদ্যাসাগর মানে দয়াদাক্ষিণ্য নয়, বিদ্যাসাগর মানে হলো ইস্পাত, যে ইস্পাত দিয়ে তৈরী হয় জাতীয় চরিত্রের কাঠামো। বিদ্যাসাগর মানে হলো উচ্ছ্বাসহীন বাষ্পহীন বলিষ্ঠ বিপ্লব… বিদ্যাসাগর মানে হলো আত্মপ্রতিষ্ঠ পরুষ পুরুষত্ব, যা দুঃখের, ব্যথার, বিরূপ অবস্থার ঝড়ে ভেঙে দুমড়ে যায় না…বিদ্যাসাগর মানে হলো দেশপ্রেম, যে দেশপ্রেম মাতৃস্নেহের মতন সহজ সত্য, মাতৃস্নেহের মত নীরব, লাভালাভ-উদাসীন, মাতৃস্নেহের মত যা আঁকড়ে ধরে থাকতে জানে সন্তানের কল্যাণ-আয়ুকে (১০)।'

বিদ্যাসাগরের এ পরিচয় পেতে হলে তাঁর জীবন ও রচনাবলীর দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া গতি নেই। আজকের এই প্রচণ্ড সংকটময় মুহূর্তে যে প্রাণসংহারকারী দোটানা আমাদের জাতীয় চরিত্রকে তিল তিল করে ধ্বংস করে দিচ্ছে তাকে দূর করার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরূপ ঋজু ব্যক্তিত্বের একান্ত প্রয়োজন। পূর্বপুরুষের ঠাট না বদলেও অন্যের সৎগুণ আত্মস্থ করার এমন অপূর্ব দৃষ্টান্ত অতি অল্পই নজরে পড়ে। তাঁর রচনাবলীর প্রতিটি ছত্রে লোকশিক্ষক-বিদ্যাসাগর তাঁর চরিত্র বৈশিষ্ট্যে অপূর্ব স্বাতন্ত্র্য-বোধের প্রমাণ রেখে গেছেন। যদি একজনও এ রচনাবলী পড়ে বিদ্যাসাগরকে

(১০) অবিস্মরণীয় মুহূর্ত (বর্ণপরিচয়)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

অনুসরণে উদ্বুদ্ধ হন তো আমাদের পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করব। সংস্কৃত কলেজের *ইতিহাসে বহু বিদ্যাসাগরের নাম থাকলেও 'বিদ্যাসাগর' ঈশ্বরচন্দ্র শর্মার সমার্থবোধক* হয়ে দাঁড়িয়েছে। *শিক্ষাগত যোগ্যতাব* এমন ব্যক্তিসত্তা যে অলৌকিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁবই পুণ্য স্মৃতিতে আমাদের এই সামান্য প্রচেষ্টা নিবেদন করে পূর্বকৃত্য সমাপন করছি।

ঋণ-স্বীকার

বিদ্যাসাগর রচনাবলীর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকালে যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নানাভাবে সহায়তা করেছেন এবং যে সকল সংস্করণ থেকে গ্রন্থাবলী মুদ্রিত হয়েছে তার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল :

১. বেতালপঞ্চবিংশতি। সংবৎ ১৯৪৩, ১৮৮৬ খৃস্টাব্দ। একাদশসংস্করণ। শ্রীসুভদ্রা অধিকারী, গড়পাড়, মানকুণ্ডু, চন্দননগর।

২. বাঙ্গালার ইতিহাস (দ্বিতীয় ভাগ)। সংবৎ ১৯৪২, ১৮৮৫ খৃস্টাব্দ। ষড়্‌বিংশ সংস্করণ।
সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরি, কলিকাতা। বাং. গ. ৫৫২

৩. জীবন চরিত। সংবৎ ১৯০৯, ১৭৭৩ শকাব্দঃ, ১৮৫২ খৃস্টাব্দ। ২য় মুদ্রণ। সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরি, কলিকাতা। বাং. গ. ৫১৭

৪. বাল্যবিবাহের দোষ। 'সর্বশুভকরী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত। ১৮৫০ খৃস্টাব্দ।

৫. বোধোদয়। ১৮৮৯ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত পঞ্চাধিক শততম সংস্করণ ও দেবসাহিত্য কুটীর সংস্করণ।

৬. সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা। সংবৎ ১৯৩১। ত্রয়োদশ সংস্করণ। সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরি, কলিকাতা। ব্যা. ২০

৭. ঋজুপাঠ (প্রথম ভাগ)। সংবৎ ১৯০৮, ১৮৫১ খৃস্টাব্দ। ১ম সংস্করণ।

৮. ঋজুপাঠ (দ্বিতীয় ভাগ)। সংবৎ ১৮৯১। ষষ্ঠ সংস্করণ।

৯. ঋজুপাঠ (তৃতীয় ভাগ)। ১৮৬৯ খৃস্টাব্দ। সপ্তম সংস্করণ।
সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরি, কলিকাতা। কা. ৩০, কা. ৩২, কা. ৩৪

১০. বৈতাল পচ্চীসী (হিন্দী)। ১৮৫৮ খৃস্টাব্দ। দ্বিতীয় সংস্করণ।
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলিকাতা। বি. সং. ৫৬।

১১. রঘুবংশম্। ১৮৫৩ খৃস্টাব্দ। প্রথম সংস্করণ।
সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরি, কলিকাতা। কা. ৩৫৯।

১২. সর্ব্বদর্শনসংগ্রহঃ। ১৮৫৩—১৮৫৮ খৃস্টাব্দ। প্রথম সংস্করণ।
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলিকাতা। বি. সং ২১২।

৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ও ১২ সংখ্যক বইগুলি নাগরী হরফে ছাপা। ভূমিকা কোনোটি ইংরাজী, কোনোটি বাংলায় লেখা। নাগরী, হিন্দী ও ইংরাজীতে ছাপা বইগুলি রচনাবলীতে মুদ্রিত হয় নি, কেবল এইসকল গ্রন্থের ভূমিকাগুলি মুদ্রিত হয়েছে। পুস্তকের বিষয়বস্তুর আভাস এই ভূমিকাগুলিতেই পাওয়া যাবে।

জীবনচরিত, বোধোদয়, সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা পাঠ্যপুস্তক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্যান্য পুস্তক এখনও কিছু কিছু বিভিন্ন পাঠাগারে অনুসন্ধান করলে পাওয়া যায়। পাঠ্যপুস্তকগুলি, বিশেষতঃ তাঁর জীবিতাবস্থায় মুদ্রিত সংস্করণ পাওয়া দুঃসাধ্য-প্রায়। সুতরাং পাঠ্যহিসাবে প্রচলিত সংস্করণের সহায়তা কোথাও কোথাও গ্রহণ করা হয়েছে।

এ ছাড়াও রচনাবলীর সম্পাদনা, মুদ্রণ, প্রুফ সংশোধন, তথ্যসংগ্রহ, চিঠিপত্রাদির নকল; সংস্কৃতের অনুবাদ ও প্রকাশের ব্যাপারে, বিভিন্ন ব্যক্তি ও বহুপ্রতিষ্ঠান নানাভাবে সহায়তা করেছেন। তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা, উৎসাহ ও উপদেশ না পেলে রচনাবলীর আত্মপ্রকাশ সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। সে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামোল্লেখের পূর্বে বন্ধুবৎসল সহৃদয় অধ্যাপক স্বর্গীয় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়ে। তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনাই ছিল এই মহৎ কর্মের প্রধান প্রেরণা।

শ্রীঅপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত
ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীঅনাদি দাশ
অধ্যাপক অমিতাভ ভট্টচার্য
অধ্যাপক অশোক ভট্টাচার্য
শ্রীআনন্দ বসু
শ্রীইন্দ্রনাথ মজুমদার
শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য
শ্রীখগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ
শ্রীগীতা ভৌমিক
শ্রীগণেশ বসু
শ্রীগৌরাঙ্গ ভৌমিক
অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়
শ্রীছন্দা বসু
শ্রীতারাদাস নাগ
দশভুজা সাহিত্য মন্দির (চন্দননগর)
শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়
দেবসাহিত্য কুটীর
শ্রীপ্রবোধকুমার ঘোষ
শ্রীবনবিহারী ভট্টাচার্য
শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার
শ্রীবিজনবিহারী গোস্বামী
শ্রীবিমলকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীবিকাশ বাগচী
শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়
ভদ্রেশ্বর সাধারণ পাঠাগার

শ্রীভোলানাথ ঘোষ
শ্রীমৃণাল হালদার
ডঃ রবি মিত্র
রামকৃষ্ণ প্রেস
শ্রীশচীন্দ্রনাথ দে
ডঃ শিশিরকুমার মিত্র
শ্রীশুক্লা বসু
শ্রীশ্যামল পাল
শ্রীসজল বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসম্রাট সেন্
শ্রীসুভদ্রা অধিকারী
শ্রীসুদর্শন রায়চৌধুরী
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
শ্রীসুধাংশুশেখর চক্রবর্তী
শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীসুনীল মণ্ডল
সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরী
অধ্যাপক হারাণচন্দ্র নিয়োগী

এঁদের সকলকেই আমাব আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সম্পাদক

বিদ্যাসাগর
রচনাবলী
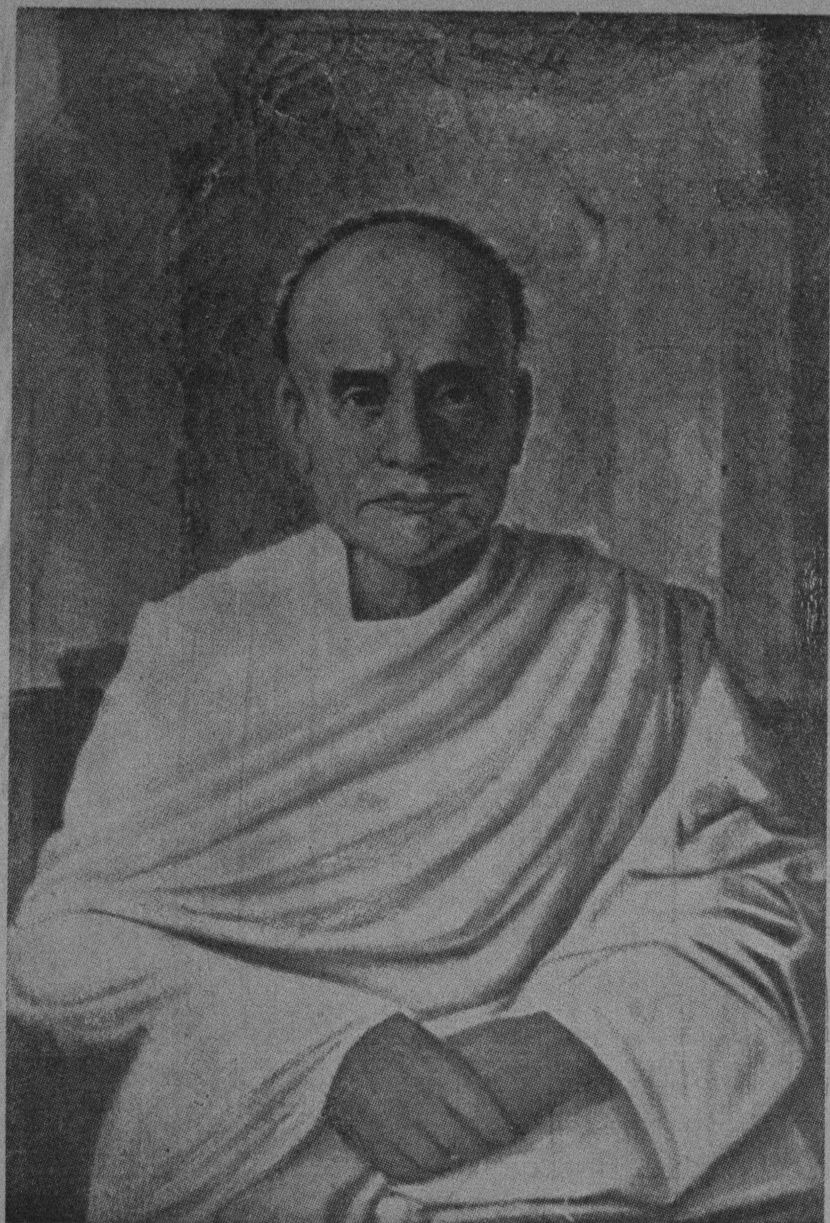
জন্ম—১২ই আশ্বিন ১২২৭ মঙ্গলবার ইং ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০
মৃত্যু—১৩ই শ্রাবণ ১২৯৮ মঙ্গলবার ইং ২৯ জুলাই ১৮৯১

বেতাল পঞ্চবিংশতি

বিজ্ঞাপন

কালেজ অব্ ফোর্ট উইলিয়ম নামক বিদ্যালয়ে, তত্রত্য ছাত্রগণের পাঠার্থে, বাঙ্গালা ভাষায় হিতোপদেশ নামে যে পুস্তক নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহার রচনা অতি কদর্য্য। বিশেষতঃ, কোনও কোনও অংশ এরূপ দুরূহ ও অসংলগ্ন যে কোনও ক্রমে অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ হইয়া উঠে না। তৎপরিবর্ত্তে পুস্তকান্তর প্রচলিত করা উচিত ও আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহামতি শ্রীযুত মেজর জি. টি. মার্শল মহোদয় কোনও নূতন পুস্তক প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। তদনুসারে আমি, বৈতালপচীসীনামক প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক অবলম্বন করিয়া, এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলাম। যৎকালে প্রথম প্রচারিত হয়, আমার এমন আশা ছিল না, বেতালপঞ্চবিংশতি সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইবেক। কিন্তু, সৌভাগ্যক্রমে, বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনকারী ব্যক্তিমাত্রেই আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এতদ্দেশীয় প্রায় সমুদয় বিদ্যালয়েই প্রচলিত হইয়াছে। ফলতঃ, দুই বৎসরের অনধিক কাল মধ্যেই প্রথম মুদ্রিত সমস্ত পুস্তক নিঃশেষ রূপে পর্য্যবসিত হয়।

প্রায় সংবৎসর অতিক্রান্ত হইল, পুস্তকের অসম্ভাব হইয়াছে। কিন্তু, কোনও কোনও কারণবশতঃ, আমি পুনর্ম্মুদ্রাকরণে এ পর্য্যন্ত পরাঙ্মুখ ছিলাম। পরিশেষে, গ্রাহকমণ্ডলীর আগ্রহাতিশয় দর্শনে, দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। যে যে স্থান কোনও অংশে অপরিশুদ্ধ ছিল, পরিশোধিত হইয়াছে, এবং অশ্লীল পদ, বাক্য, ও উপাখ্যানভাগ পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে, বেতালপঞ্চবিংশতি পূর্ব্ববৎ সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইলে, শ্রম সফল বোধ করিব।

কলিকাতা
১০ই ফাল্গুন। সংবৎ ১৯০৬। } শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

দশম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

বেতালপঞ্চবিংশতি দশম বার প্রচাবিত হইল। এই পুস্তক, এত দিন, বাঙ্গালা ভাষার প্রণালী অনুসারে, মুদ্রিত হইয়াছিল; সুতরাং, ইঙ্গরেজী পুস্তকে যে সকল বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে সে সমুদয় পরিগৃহীত হয় নাই। এই সংস্করণে সে সমস্ত সন্নিবেশিত হইল।

১৯০৩ সংবতে, বেতালপঞ্চবিংশতি প্রথম প্রচারিত হয়। ২৫ বৎসর অতীত হইলে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জামাতা, শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ., তদীয় জীবনচরিত প্রচারিত করিয়াছেন। ঐ পুস্তকের ৪২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—

> "বিদ্যাসাগর প্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এত দূর সংশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়াছিল যে বোমাণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।"

যোগেন্দ্র বাবু, কি প্রমাণ অবলম্বন পূর্ব্বক, এরূপ অপ্রকৃত কথা লিখিয়া প্রচারিত করিলেন, বুঝিয়া উঠা কঠিন। আমি, বেতালপঞ্চবিংশতি লিখিয়া, মুদ্রিত করিবার পূর্ব্বে, শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে শুনাইয়াছিলাম। তাঁহাদিগকে শুনাইবার অভিপ্রায় এই যে, কোনও স্থল অসঙ্গত বা অসংলগ্ন বোধ হইলে, তাঁহারা স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন; তদনুসারে, আমি সেই সেই স্থল পরিবর্ত্তিত করিব। আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে, কোনও কোনও উপাখ্যানে একটি স্থলও তাঁহাদের অসঙ্গত বা অসংলগ্ন বোধ হয় নাই; সুতরাং সেই সেই উপাখ্যানের কোনও স্থলেই কোনও প্রকার পরিবর্ত্ত করিবার আবশ্যকতা ঘটে নাই। আর, যে সকল উপাখ্যানে তাঁহারা তদ্রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সেই উপাখ্যানে, স্থানে স্থানে, দুই একটি শব্দ মাত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। বিদ্যারত্ন ও তর্কালঙ্কার ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই করেন নাই। সুতরাং, "বেতালপঞ্চবিংশতি তর্কালঙ্কার দ্বারা এত দূর সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল যে ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে"; যোগেন্দ্র বাবুর এই নির্দ্দেশ, কোনও মতে, সঙ্গত বা ন্যায়ানুগত হয় নাই। শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন। তিনি এক্ষণে সংস্কৃত কালেজে সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রের

অধ্যাপক। এ বিষয়ে, তিনি, আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে, যে পত্র লিখিয়াছেন, ঐ উত্তরপত্র, আমার জিজ্ঞাসাপত্রের সহিত, নিম্নে নিবেশিত হইতেছে।

অশেষগুণাশ্রয়

শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভ্রাতৃপ্রেমাস্পদেষু

সাদরসম্ভাষণমাবেদনম্

তুমি জান কি না বলিতে পারি না, কিছু দিন হইল, সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব ছাত্র শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ., মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত প্রচারিত করিয়াছেন। ঐ পুস্তকের ৪২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, "বিদ্যাসাগর প্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এত দূর সংশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়াছিল যে, বোমাণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।" বেতালপঞ্চবিংশতি সম্প্রতি পুনরায় মুদ্রিত হইতেছে। যোগেন্দ্র বাবুর উক্তি বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হওয়াতে, এই সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তাহা ব্যক্ত করিব, স্থির করিয়াছি। বেতালপঞ্চবিংশতির সংশোধন বিষয়ে তর্কালঙ্কারের কত দূর সংস্রব ও সাহায্য ছিল, তাহা তুমি সবিশেষ জান। যাহা জান, লিপি দ্বারা আমায় জানাইলে, অতিশয় উপকৃত হইব। তোমার পত্রখানি, আমার বক্তব্যের সহিত, প্রচারিত করিবার অভিপ্রায় আছে, জানিবে ইতি।

কলিকাতা
১০ই বৈশাখ, ১২৮৩ সাল।

ত্বদেকশর্ম্ম শর্ম্মণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্রশর্ম্মণঃ

পরমশ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়

জ্যেষ্ঠভ্রাতৃপ্রতিমেষু

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. প্রণীত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত গ্রন্থে বেতালপঞ্চবিংশতি সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "বিদ্যাসাগরপ্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এত দূর সংশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়াছিল যে, বোমাণ্ট ও

ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।" এই কথা নিতান্ত অলীক ও অসঙ্গত ; আমার বিবেচনায়, এরূপ অলীক ও অসঙ্গত কথা লিখিয়া প্রচার করা যোগেন্দ্র বাবুর নিতান্ত অন্যায় কার্য্য হইয়াছে।

এতদ্বিষয়ের প্রকৃত বৃত্তান্ত এই—আপনি, বেতালপঞ্চবিংশতি রচনা করিয়া, আমাকে ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে শুনাইয়াছিলেন। শ্রবণকালে আমরা মধ্যে মধ্যে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতাম। তদনুসারে স্থানে স্থানে দুই একটি শব্দ পরিবর্ত্তিত হইত। বেতালপঞ্চবিংশতি বিষয়ে, আমার অথবা তর্কালঙ্কারের, এতদতিরিক্ত কোন সংস্রব বা সাহায্য ছিল না।

আমার এই পত্রখানি মুদ্রিত করা যদি আবশ্যক বোধ হয়, করিবেন, তদ্বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি ইতি।

কলিকাতা
১২ই বৈশাখ, ১২৮৩ সাল।

সোদরাভিমানিনঃ
শ্রীগিরিশচন্দ্রশর্ম্মণঃ

যোগেন্দ্র বাবু স্বীয় শ্বশুরের জীবনচরিত পুস্তকে, আমার সংক্রান্ত যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই এইরূপ অমূলক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আর একটি স্থল প্রদর্শিত হইতেছে। তিনি ১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

> "সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদ শূন্য হইল। এরূপ শুনিতে পাই, বেথুন তর্কালঙ্কারকে এই পদ গ্রহণে অনুরোধ করেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে ঐ পদের যোগ্য বলিয়া বেথুনের নিকট আবেদন করায়, বেথুন সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই ঐ পদে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইলেন। এই জনশ্রুতি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে তর্কালঙ্কারের ন্যায় সদাশয়, উদারচরিত ও বন্ধুহিতৈষী ব্যক্তি অতি কম ছিলেন। হৃদয়ের বন্ধুকে আপন অপেক্ষা উচ্চতর পদে অভিষিক্ত করিয়া তর্কালঙ্কার বন্ধুত্বের ও ঔদার্য্যের পরকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন।"

গ্রন্থকর্ত্তার কল্পনাশক্তি ব্যতীত এ গল্পটির কিছুমাত্র মূল নাই। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সালে, সংস্কৃত কালেজে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়েন ; ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের নবেম্বর মাসে, মুরশিদাবাদের জজপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া, সংস্কৃত কালেজ হইতে প্রস্থান করেন। তর্কালঙ্কারের নিয়োগ সময়েও, যিনি (বাবু রসময় দত্ত) সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, তর্কালঙ্কারের প্রস্থান

সময়েও, তিনিই (বাবু রসময় দত্ত) সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ফলতঃ, তর্কালঙ্কার যত দিন সংস্কৃত কালেজে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় মধ্যে, এক দিনের জন্যেও, ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষের পদ শূন্য হয় নাই। সুতরাং, সংস্কৃত কালেজে অধ্যক্ষের পদ শূন্য হওয়াতে, বেথুন সাহেব মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে ঐ পদে নিযুক্ত করিতে উদ্যত হইলে, তর্কালঙ্কার, ঔদার্য্য গুণের আতিশয্য বশতঃ, আমাকে ঐ পদের যোগ্য বিবেচনা করিয়া, ও বন্ধুস্নেহের বশীভূত হইয়া, বেথুন সাহেবকে আমার জন্য অনুরোধ করাতে, আমি ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলাম, ইহা কি রূপে সম্ভবিতে পারে, তাহা যোগেন্দ্র বাবুই বলিতে পারেন।

আমি যে সূত্রে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতাপদে নিযুক্ত হই, তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত এই—মদনমোহন তর্কালঙ্কার, জজপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া, মুরশিদাবাদ প্রস্থান করিলে, সংস্কৃত কালেজে সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। শিক্ষাসমাজের তৎকালীন সেক্রেটারি, শ্রীযুত ডাক্তর মোয়েট সাহেব, আমায় ঐ পদে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। (১) আমি, নানা কারণ দর্শাইয়া, প্রথমতঃ অস্বীকার করি। পরে, তিনি সবিশেষ যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করাতে, আমি কহিয়াছিলাম, যদি শিক্ষাসমাজ আমাকে প্রিন্সিপালের ক্ষমতা দেন, তাহা হইলে আমি এই পদ স্বীকার করিতে পারি। তিনি আমার নিকট হইতে ঐ মর্মে একখানি পত্র লেখাইয়া লয়েন। তৎপরে, ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে, আমি সংস্কৃত কালেজে সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হই। আমার এই নিয়োগের কিছু দিন পরে, বাবু রসময় দত্ত মহাশয় সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতাপদ পরিত্যাগ করেন। সংস্কৃত কালেজের বর্ত্তমান অবস্থা, ও উত্তরকালে কিরূপ ব্যবস্থা করিলে, সংস্কৃত কালেজের উন্নতি হইতে পারে, এই দুই বিষয়ে রিপোর্ট করিবার নিমিত্ত, আমার প্রতি আদেশ প্রদত্ত হয়। তদনুসারে আমি রিপোর্ট সমর্পণ করিলে, ঐ রিপোর্ট দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইয়া, শিক্ষাসমাজ আমাকে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতাকার্য্য, সেক্রেটারি ও আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি, এই দুই ব্যক্তি দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছিল; এই দুই পদ রহিত হইয়া, প্রিন্সিপালের পদ নূতন সৃষ্ট হইল। ১৮৫১ সালের জানুয়ারি মাসের শেষে, আমি সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল অর্থাৎ অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলাম।

যোগেন্দ্র বাবুর গল্পটির মধ্যে, "এই জনশ্রুতি যদি সত্য হয়" এই কথাটি লিখিত আছে। যাঁহারা, বহুকাল অবধি, সংস্কৃত কালেজে নিযুক্ত আছেন, অথবা যাঁহারা কোনও রূপে সংস্কৃত কালেজের সহিত কোনও সংস্রব রাখেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কখনও এরূপ

১। এই সময়ে আমি ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে হেড রাইটার নিযুক্ত ছিলাম।

জনশ্রুতি কর্ণগোচর করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না। যাহা হউক, যদিই দৈবাৎ ঐরূপ অসম্ভব জনশ্রুতি কোনও সূত্রে যোগেন্দ্র বাবুর কর্ণগোচর হইয়াছিল, ঐ জনশ্রুতি অমূলক অথবা সমূলক, ইহার পরীক্ষা করা তাঁহার আবশ্যক বোধ হয় নাই। আবশ্যক বোধ হইলে, অনায়াসে তাঁহার সংশয়চ্ছেদন হইতে পারিত। কারণ, আমার নিয়োগ বৃত্তান্ত সংস্কৃত কালেজ সংক্রান্ত তৎকালীন ব্যক্তিমাত্রেই বিলক্ষণ অবগত আছেন। যোগেন্দ্র বাবু সংস্কৃত কালেজের ছাত্র; যে সময়ে তিনি আমার নিয়োগের উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন, বোধ হয়, তখনও তিনি সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়ন করিতেন। যদি সবিশেষ জানিয়া যথার্থ ঘটনার নির্দ্দেশ করা তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে, আমার নিয়োগ সংক্রান্ত প্রকৃত বৃত্তান্ত তাঁহার অপরিজ্ঞাত থাকিত না।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সালে, পূজ্যপাদ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে, সংস্কৃত কালেজে সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। সংস্কৃত কালেজের সেক্রেটারি বাবু রসময় দত্ত মহাশয় আমায় ঐ পদে নিযুক্ত করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। (২) আমি বিশিষ্ট হেতুবশতঃ, অধ্যাপকের পদগ্রহণে অসম্মত হইয়া, মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ অনুরোধ করি। (৩) তদনুসারে, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ঐ পদে নিযুক্ত হয়েন। এই প্রকৃত বৃত্তান্তটির সহিত, যোগেন্দ্র বাবুর কল্পিত গল্পটির, বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দৃশ্যমান হইতেছে।

কলিকাতা
১লা পৌষ, সংবৎ ১৯৩৩।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

২। এই সময়ে, আমি সংস্কৃত কালেজে আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত ছিলাম।

৩। এই সময়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কার কৃষ্ণনগর কালেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

বেতাল পঞ্চবিংশতি

উপক্রমণিকা

উজ্জয়িনী নগরে গন্ধর্বসেন নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার চারি মহিষী। তাঁহাদের গর্ভে রাজার ছয় পুত্র জন্মে। রাজকুমারের সকলেই সুপণ্ডিত ও সর্ব বিষয়ে বিচক্ষণ ছিলেন। কালক্রমে, নৃপতির লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে, সর্বজ্যেষ্ঠ শঙ্কু সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তৎকনিষ্ঠ বিক্রমাদিত্য বিদ্যানুরাগ, নীতিপরতা ও শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা সবিশেষ বিখ্যাত ছিলেন; তথাপি রাজ্যভোগের লোভসংবরণে অসমর্থ হইয়া, জ্যেষ্ঠের প্রাণসংহার পূর্বক, স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইলেন; এবং ক্রমে ক্রমে নিজ বাহুবলে, লক্ষযোজন-বিস্তীর্ণ জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর হইয়া, আপন নামে অব্দ প্রচালিত করিলেন।

একদা, রাজা বিক্রমাদিত্য মনে মনে এই আলোচনা করিতে লাগিলেন, জগদীশ্বর আমায়, নানা জনপদের অধীশ্বর করিয়া, অসংখ্য প্রজাগণের হিতাহিত চিন্তার ভার দিয়াছেন। আমি আত্মসুখে নির্বৃত হইয়া, তাহাদের অবস্থার প্রতি ক্ষণমাত্রও দৃষ্টিপাত করি না; কেবল অধিকৃত বর্গের বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া, নিশ্চিন্ত রহিয়াছি। তাহারা প্রজাগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেছে; অন্ততঃ একবারও পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। অতএব আমি, প্রচ্ছন্ন বেশে পর্যটন করিয়া, প্রজাগণের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিব। অনন্তর তিনি, নিজ অনুজ ভর্তৃহরির হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভারার্পণ করিয়া, সন্ন্যাসীর বেশে, দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

উজ্জয়িনীবাসী এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ, বহুকাল, অতি কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। তিনি, আপন উপাস্য দেবতার নিকট বরস্বরূপ এক অমরফল পাইয়া, আনন্দিত মনে গৃহে আসিয়া, স্বীয় ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, দেখ, দেবতা তপস্যায় তুষ্ট হইয়া, আজ আমায় এই ফল দিয়াছেন; বলিয়াছেন, ইহা ভক্ষণ করিলে, নর অমর হয়। ব্রাহ্মণী শুনিয়া অতিশয় খেদ করিয়া, কহিলেন, হায়! অমর হইয়া আর কতকাল যন্ত্রণাভোগ করিবে। তুমি কি সুখে, অমর হইবার অভিলাষ কর, বুঝিতে পারিতেছি না। বরং, এই দণ্ডে মৃত্যু হইলে, সাংসারিক ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ হয়।

গৃহিণীর এই আক্ষেপবাক্য শুনিয়া, হতবুদ্ধি হইয়া, ব্রাহ্মণ কহিলেন, আমি তৎকালে, না বুঝিয়া, এই দেবদত্ত ফল লইয়াছিলাম; এক্ষণে, তোমার কথা শুনিয়া, আমার চৈতন্য হইল। এখন তুমি যেরূপ বলিবে, তাহাই করিব। ব্রাহ্মণী কহিলেন, এই ফল

রাজা ভর্তৃহরিকে দিয়া, ইহার পরিবর্তে, পারিতোষিক স্বরূপ, কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া আইস, তাহা হইলে, অনায়াসে সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতে পারিবে।

ইহা শুনিয়া, ব্রাহ্মণ রাজার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং যথাবিধি আশীর্বাদ প্রয়োগের পর, দেবদত্ত ফলের গুণব্যাখ্যা ও পূর্বাপর সমস্ত বৃত্তান্তের প্রকৃতরূপ বর্ণন করিয়া, বিনীত বচনে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! আপনি, এই ফল লইয়া, আমায় কিছু অর্থ দেন। আপনি চিরজীবী হইলে, সমস্ত রাজ্যের মঙ্গল। রাজা, ফল গ্রহণ করিয়া, লক্ষমুদ্রা প্রদানপূর্বক, ব্রাহ্মণকে বিদায় করিলেন এবং নিতান্ত স্ত্রৈণতা বশতঃ মনে মনে বিবেচনা করিলেন, যে ব্যক্তির চিরজীবন ও স্থির যৌবন হইলে, আমি যাবজ্জীবন সুখী হইব, তাহাকেই এই ফল দেওয়া আবশ্যক। অনন্তর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, রাজা প্রাণাধিকা মহিষীর হস্তে ফল প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি আমার জীবন-সর্বস্ব ; এই ফল খাও ; চিরজীবিনী ও স্থিরযৌবনা হইবে। রাজ্ঞী, নিরতিশয় আহ্লাদ প্রদর্শন-পূর্বক, ফল গ্রহণ করিলেন। রাজা প্রীত মনে, সভায় প্রত্যাগমন করিয়া, অমাত্যবর্গের সহিত রাজকার্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

উজ্জয়িনীর নগরপাল রাজমহিষীর সাতিশয় প্রিয় পাত্র ছিল ; তিনি, ঐ ফলের গুণ-ব্যাখ্যা করিয়া, তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। নগরপাল এক বারাঙ্গনাকে অত্যন্ত ভালবাসিত , সে, তাহার হস্তে প্রদানপূর্বক, ঐ ফলের সবিশেষ গুণবর্ণন করিল। বারাঙ্গনা, ফল পাইয়া, মনে মনে বিবেচনা করিল, আমি অতি অধম জাতি, কুক্রিয়া দ্বারা উদরপূর্তি করি ; আমার চিরজীবিনী হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব, এই ফল রাজাকে দেওয়া উচিত ; রাজা চিরজীবী হইলে, অসংখ্য লোকের মঙ্গল হইবেক। অনন্তর, রাজার নিকটে গিয়া, বারবনিতা, বিনয়পূর্বক নিবেদন করিল, মহারাজ! আমি এই এক অপূর্ব ফল পাইয়াছি ; ইহা ভক্ষণ করিলে, নর অমর হয় ; এই ফল আপনকার যোগ্য ; আপনি গ্রহণ করুন।

রাজা, অমরফল বারাঙ্গনার হস্তগত দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইলেন ; এবং ফল লইয়া, পুরস্কার প্রদানপূর্বক তাহাকে বিদায় দিয়া, ভাবিতে লাগিলেন, এই ফল রাজ্ঞীকে দিয়াছি ; ইহা কিরূপে বারাঙ্গনার হস্তগত হইল। পরে, সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা, তিনি পূর্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং, সাংসারিক বিষয়ে নিরতিশয় বীতরাগ হইয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন, সংসার অতি অকিঞ্চিৎকর, ইহাতে সুখের লেশমাত্র নাই , অতএব, বৃথা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, আর ইহাতে লিপ্ত থাকা, কোনও ক্রমে শ্রেয়স্কর নহে। অতএব সংসারযাত্রায় বিসর্জন দিয়া, অরণ্যে গিয়া, জগদীশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হই ; চরমে পরম পুরুষার্থ মুক্তিপদার্থ প্রাপ্ত হইতে পারিব।

অন্তঃকরণে এইরূপ আলোচনা করিয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া, রাজা রাজ্ঞীকে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি সে ফল কি করিয়াছ। তিনি কহিলেন, ভক্ষণ করিয়াছি। রাজা, সাতিশয় বিরাগ প্রদর্শন পূর্বক, রাণীকে সেই ফল দেখাইলেন। রাণী, এক কালে, হতবুদ্ধি ও অধোবদন হইয়া রহিলেন, বাক্য নিঃসরণ করিতে পারিলেন না। রাজা ভর্তৃহরি, অবিলম্বে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া, প্রক্ষালনপূর্বক ফলভক্ষণ করিলেন এবং রাজ্যাধিকারে জলাঞ্জলি দিয়া, একাকী অরণ্যে গিয়া যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন শূন্য রহিল। দেবরাজ, উজ্জয়িনীর অরাজকসংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র, এক যক্ষকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। যক্ষ, সাতিশয় সতর্কতাপূর্বক, অহোরাত্র নগরীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যেই, দেশে বিদেশে প্রচার হইল, রাজা ভর্তৃহরি, রাজত্বপরিত্যাগপূর্বক, বনপ্রস্থান করিযাছেন। বিক্রমাদিত্য শ্রবণ মাত্র, অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি, অর্ধরাত্র সময়ে, নগরে প্রবেশ করিতেছে , এমন সময়ে, নগর-রক্ষক যক্ষ আসিযা নিষেধ করিয়া কহিল, তুই কে, কোথায় যাইতেছিস, দাঁড়া তোর নাম কি বল। রাজা কহিলেন, আমি বিক্রমাদিত্য, আপন নগরে, যাইতেছি ; তুই কে, কি নিমিত্তে আমার গতিরোধ করিতেছিস বল।

যক্ষ কহিল, দেবরাজ ইন্দ্র আমায় এ নগরের রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে, আমি তোমায় অসময়ে নগরে প্রবেশ করিতে দিব না। অথবা, যদি তুমি যথার্থ ই রাজা বিক্রমাদিত্য হও, অগ্রে আমার সহিত যুদ্ধ কর, পরে নগরে যাইতে দিব। রাজা শ্রবণমাত্র, বদ্ধপরিকর হইয়া, যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। যক্ষও, তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়া, তাঁহার সম্মুখীন হইল। ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। পরিশেষে, রাজা, যক্ষকে ভূতলে ফেলিয়া, তাহার বক্ষঃস্থলে বসিলেন। তখন যক্ষ কহিল, মহারাজ ! তুমি আমায় পরাভূত করিয়াছ। তোমার প্রভাব ও পরাক্রম দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম তুমি যথার্থ ই রাজা বিক্রমাদিত্য। এক্ষণে আমায় ছাড়িয়া দাও ; আমি তোমায় প্রাণদান দিতেছি।

রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, তুই বাতুল, নতুবা এরূপ অসঙ্গত কথা বলিবি কেন। তুই আমায় প্রাণদান কি দিবি ; আমি মনে করিলে, এখনই তোর প্রাণদণ্ড করিতে পারি। যক্ষ শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিল, মহারাজ ! যাহা কহিতেছ, তাহা সম্পূর্ণ যথার্থ কিন্তু, আমি তোমায় আসন্ন মৃত্যু হইতে বাঁচাইতেছি, এজন্য এরূপ বলিতেছি। যাহা কহি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, তদনুযায়ী কার্য করিলে, দীর্ঘজীবী হইবে, এবং নিরুদ্বেগে অখণ্ড ভূমণ্ডলে, একাধিপত্য করিতে পারিবে। তখন ভূপতি, অতিশয় বিস্মিত ও উৎকণ্ঠিত

হইয়া যক্ষের বক্ষঃস্থল হইতে উত্থিত হইলেন। যক্ষও, ক্ষণ মধ্যে সমরশ্রান্তি পরিহারপূর্বক বিক্রমাদিত্যকে সম্বোধিয়া, তদীয় জীবনসংক্রান্ত গূঢ় বৃত্তান্ত তাঁহার গোচর করিতে আরম্ভ করিল।

মহারাজ! শ্রবণ কর,—

ভোগবতী নগরে চন্দ্রভানু নামে অতি প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন। তিনি, এক দিবস মৃগয়ার অভিলাষে কোনও অটবীতে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, এক তপস্বী অধঃশিবাঃ ও বৃক্ষে লম্বমান হইয়া ধূমপান করিতেছেন। অনেক অনুসন্ধানের পব, তত্রত্য লোকের মুখে অবগত হইলেন, তপস্বী কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না; বহুকাল অবধি একাকী এইভাবে তপস্যা করিতেছেন। রাজা, সন্ন্যাসীর কঠোর ব্রত দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া, নগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন; এবং পর দিন যথাকালে রাজসভায় অধিষ্ঠান করিয়া কহিলেন, হে অমাত্যবর্গ! হে সভাসদ্‌গণ! আমি গতকল্য মৃগয়ায গিয়া, বিপিনমধ্যে এক অদ্ভুত তপস্বী দেখিয়াছি; যদি কেহ তাঁহারে রাজধানীতে আনিতে পারে তাহাকে লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক দিব।

এই রাজবাক্য নগরমধ্যে প্রচারিত হইলে, এক প্রসিদ্ধ বারবনিতা, নৃপতি-সমীপে আসিয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! আজ্ঞা পাইলে, আমি ঐ তপস্বীর ঔরসে পুত্র জন্মাইয়া, ঐ পুত্র তাহার স্কন্ধে দিয়া, আপনকার সভায় আনিতে পারি। রাজা শুনিয়া সাতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং পরম সমাদরপূর্বক, বারনারীর উপর তাপসের আনয়নের ভারার্পণ করিলেন। সে ভূপালের নিয়োগ অনুসারে, যোগীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিল, যোগী যথার্থ ই মুদ্রিতনয়ন, অধঃশিরাঃ ও বৃক্ষে লম্বমান হইয়া, ধূমপান করিতেছেন; নিরতিশয় শীর্ণদেহ, কেহ কোনও প্রশ্ন করিলে উত্তর দেন না। তদ্দর্শনে বারযোষিৎ, সহসা সন্ন্যাসীর সমাধিভঙ্গ করা অসাধ্য জানিয়া তদীয় আশ্রমের অনতিদূরে, এক সুশোভন উপবন ও তন্মধ্যে পরম রমণীয় বাসভবন নির্মিত করাইল এবং নানা উপায় চিন্তিয়া, পরিশেষে যুক্তিপূর্বক মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া ধূমপায়ী তপস্বীর আস্যে অর্পিত করিল। তপস্বী, রসনাসংযোগ দ্বারা মিষ্ট বোধ হওয়াতে ক্রমে ক্রমে সমুদয় ভক্ষণ করিলেন। বারাঙ্গনা পুনরায় দিল; তিনিও পুনরায় ভক্ষণ করিলেন।

এইরূপে, ক্রমাগত কতিপয় দিবস মোহনভোগ উপযোগ করিয়া, শরীরে কিঞ্চিৎ বলসঞ্চার হইলে, সন্ন্যাসী নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিয়া, তরু হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং বারনারীকে জিজ্ঞাসিলেন তুমি কে, কি অভিপ্রায়ে একাকিনী এই নির্জন বনস্থানে আগমন করিয়াছ। সে কহিল, আমি দেবকন্যা, দেবলোকে তপস্যা করি; সম্প্রতি, তীর্থপর্যটন প্রসঙ্গে, পরম পবিত্র কর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে আসিয়া যোগাভ্যাসবাসনায়, অনতিদূরে আশ্রম নির্মাণ করিয়াছি; নিয়ত তথায় অবস্থিতি করি। অদ্য

সৌভাগ্যক্রমে এই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া আপনকার সন্দর্শন ও সম্ভাষণানুগ্রহ দ্বারা, চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইলাম। তপস্বী কহিলেন, আমি, তোমার সৌজন্য ও সুশীলতা দর্শনে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তোমার মধুর মূর্তি সন্দর্শনে আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিতেছি; যেহেতু জন্মান্তরীণ পুণ্যসঞ্চয় ব্যতিরেকে, সাধুসমাগম লব্ধ হয় -না। যাহা হউক, তোমার আশ্রম দেখিবার নিমিত্ত, আমার অতিশয় বাসনা হইতেছে। যদি প্রতিবন্ধক না থাকে, ও অধিক দূরবর্তী না হয়, আমায় তথায় লইয়া চল।

বারবিলাসিনী, তপস্বীর অভ্যর্থনা শ্রবণে কৃতার্থম্মন্য ও অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া, তাঁহাকে আপন আলয়ে লইয়া গেল এবং সাতিশয় যত্ন ও সবিশেষ সমাদর পুরঃসর, নানাবিধ সুস্বাদ মিষ্টান্ন ও সুরস পানীয় প্রদান করিল। তিনি, বারনারীর কপটজালে বদ্ধ হইয়া, তাহার দত্ত সমস্ত বস্তু ভক্ষণ ও পান করিলেন। এইরূপ, তপস্বী, ধূমপান পরিত্যাগ-পূর্বক, যোগাভ্যাসে জলাঞ্জলি দিয়া, বারবনিতার সহিত বিষয়বাসনায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। বারাঙ্গনা গর্ভবতী ও যথাকালে পুত্রবতী হইল। কিছুদিন অতীত হইলে পর, সে সন্ন্যাসীর নিকট নিবেদন করিল, মহাশয়! বহু দিবস অতিক্রান্ত হইল, আমরা নিরন্তর কেবল বিষয়বাসনায় কালহরণ করিলাম; এক্ষণে তীর্থযাত্রা দ্বারা দেহ পবিত্র করা উচিত।

বারবনিতা, এইরূপ প্রবঞ্চনা দ্বারা তপস্বীকে সংজ্ঞাশূন্য করিয়া, তাঁহার স্কন্ধে পুত্রপ্রদান-পূর্বক, চন্দ্রভানুর রাজধানীতে লইয়া চলিল। সে রাজসভার সমীপবর্তিনী হইলে, রাজা তাহাকে চিনিতে পারিয়া এবং সন্ন্যাসীর স্কন্ধে পুত্র দেখিয়া, সামাজিকদিগকে বলিলেন, দেখ দেখ, যে বারনারী যোগীর আনয়ন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছিল, সে আপন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া আসিতেছে। আমি উহার অসম্ভব বুদ্ধিকৌশলে চমৎকৃত হইয়াছি। অধিক আর কি বলিব, এই বুদ্ধিমতী বারবনিতা চিরশুষ্ক নীরস তরুকে পল্লবিত এবং পুষ্পে ও ফলে সুশোভিত করিয়াছে। সামাজিকেরা কহিলেন, মহারাজ! যথার্থ আজ্ঞা করিতেছেন; এ সেই বারাঙ্গনাই বটে।

রাজা ও সভাসদ্‌গণের এইরূপ কথোপকথন শ্রবণে, সহসা বোধসুধাকরের উদয় হওয়াতে, সন্ন্যাসীর মোহান্ধকার অপসারিত হইল। তখন তিনি, পূর্বাপর-পর্যালোচনা করিয়া, যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ প্রাপ্ত হইলেন এবং আপনাকে বারংবার ধিক্কার দিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, দুরাত্মা চন্দ্রভানু, ঐশ্বর্যমদে মত্ত ও ধর্মাধর্মজ্ঞানশূন্য হইয়া আমার তপস্যাভ্রংশের নিমিত্ত এই দুর্বিগাহ মায়াজাল বিস্তারিত করিয়াছিল। আমিও অতি অধম ও অবশেন্দ্রিয়; অনায়াসে স্বৈরিণীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, চিরসঞ্চিত কর্মফলে বঞ্চিত হইলাম। অনন্তর, ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া, স্কন্ধস্থিত পুত্রকে ভূতলে

নিক্ষিপ্ত করিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ; অন্য এক অরণ্যে প্রবেশপূর্বক, পূর্ব অপেক্ষায় অধিকতর মনোযোগ ও অধ্যবসায় সহকারে যোগসাধন করিতে লাগিলেন, এবং, কিয়ৎকাল পরে, ঐ নরেশ্বরের মৃত্যুসাধন করিয়া কৃতকার্য হইলেন।

এইরূপে, আখ্যায়িকার সমাপন করিয়া যক্ষ কহিল, মহারাজ! তুমি ও রাজা চন্দ্রভানু, আর ঐ যোগী এই তিনজন এক নগরে, এক নক্ষত্রে, এক লগ্নে জন্মিয়াছিলে। তুমি, রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর রাজত্ব করিতেছ। চন্দ্রভানু, তৈলিকগৃহে জন্মিয়া ভাগ্যক্রমে ভোগবতী নগরীর অধিপতি হইয়াছিল। আর, যোগী, কুম্ভকারকুলে উৎপন্ন হইয়া যত্নপূর্বক যোগসাধন করিয়া চন্দ্রভানুর প্রাণবধ করিয়াছে, এবং তাঁহাকে বেতাল করিয়া শ্মশানবর্তী শিরীষবৃক্ষে লম্বিত করিয়া রাখিয়াছে ; এক্ষণে, অনন্যকর্মা হইয়া, তোমার প্রাণসংহার করিবার চেষ্টায় আছে ; ইহাতে কৃতকার্য হইলেই, উহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। যদি তুমি তাহার হস্ত হইতে নিস্তার পাও, বহুকাল অকণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে পারিবে। আমি, সবিশেষ সমস্ত কহিয়া, তোমায় সতর্ক করিয়া দিলাম ; তুমি এ বিষয়ে ক্ষণমাত্রও অনবহিত থাকিবে না।

এইরূপ উপদেশ দিয়া, যক্ষ স্বস্থানে প্রস্থান করিল। রাজাও শুনিয়া, ত্রস্ত ও বিস্ময়গ্রস্ত হইয়া নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে রাজবাটীতে প্রবিষ্ট হইলেন। পরদিন প্রভাতে, তিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে, ভৃত্যগণ ও প্রজাবর্গ, বহুদিনের পর, রাজসন্দর্শন প্রাপ্ত হইয়া আনন্দপ্রবাহে মগ্ন হইল। রাজা বিক্রমাদিত্য, রাজনীতির অনুবর্তী হইয়া, রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে, শান্তশীল নামে এক সন্ন্যাসী, শ্রীফল হস্তে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীফলপ্রদানপূর্বক রাজাকে আশীর্বাদ করিয়া, কক্ষস্থিত আসন পাতিয়া, তদুপরি উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিয়া, রাজার নিকট বিদায় লইয়া, সন্ন্যাসী সভা হইতে প্রস্থান করিলে পর, তিনি অন্তঃকরণে এই বিতর্ক করিতে লাগিলেন, যক্ষ যে সন্ন্যাসীর কথা কহিয়াছিল, এ সেই ব্যক্তি কিনা। যাহা হউক, সহসা শ্রীফল ভক্ষণ করা উচিত নহে। রাজা, মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, কোষাধ্যক্ষের হস্তে সমর্পণপূর্বক কহিলেন, তুমি এই শ্রীফল সাবধানে রাখিবে। সন্ন্যাসী প্রত্যহ রাজদর্শন ও শ্রীফলপ্রদান করিতে লাগিলেন।

এক দিবস রাজা, বয়স্যবর্গ সমভিব্যাহারে, মন্দুরাসন্দর্শনার্থ গমন করিয়াছেন, এমন সময়ে সন্ন্যাসী তথায় উপস্থিত হইয়া, পূর্ববৎ শ্রীফলপ্রদানপূর্বক আশীর্বাদ করিলেন। দৈবযোগে, শ্রীফল ভূপতির করতল হইতে ভূতলে পতিত ও ভগ্ন হওয়াতে, তন্মধ্য হইতে এক অপূর্ব রত্ন নির্গত হইল। রাজা ও রাজবয়স্যগণ তদীয় প্রভা দর্শনে চমৎকৃত

হইলেন। রাজা যোগীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আপনি কি জন্য আমায় এই রত্নগর্ভ শ্রীফল দিলেন।

যোগী কহিলেন, মহারাজ! শাস্ত্রে রাজা, গুরু, জ্যোতির্বিদ ও চিকিৎসকের নিকট রিক্ত হস্তে যাইতে নিষেধ আছে; এইজন্যে, আমি এই রত্নগর্ভ শ্রীফল লইয়া আসিয়াছিলাম। আর, এক রত্নগর্ভ শ্রীফলের কথা কি কহিতেছেন, প্রতিদিন আপনাকে যে শ্রীফল দিয়াছি, সকলের মধ্যেই এতাদৃশ এক এক রত্ন আছে। তখন রাজা কোষাধ্যক্ষকে ডাকাইয়া কহিলেন, তোমাকে যত শ্রীফল রাখিতে দিয়াছি, সমুদয় এই স্থানে আন। কোষাধ্যক্ষ, রাজকীয় আদেশ অনুসারে, সমস্ত শ্রীফল তথায় উপস্থিত করিলে, রাজা প্রত্যেক শ্রীফল ভাঙিয়া সকলের মধ্যেই এক এক রত্ন দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত ও চমৎকৃত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ রাজসভায় গমনপূর্বক, এক মণিকারকে ডাকাইয়া, ঐ সমস্ত রত্নের পরীক্ষা করিতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, এই অসার সংসারে ধর্মই সার পদার্থ; অতএব, তুমি ধর্মপ্রমাণ প্রত্যেক রত্নের মূল্য নির্ধারিত করিয়া দাও।

এইরূপ রাজবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া মণিকার কহিল, মহারাজ! আপনি যথার্থ আজ্ঞা করিয়াছেন। ধর্মরক্ষা করিলে, সকল বিষয়ের রক্ষা হয়; ধর্মলোপ করিলে সকল বিষয়ের লোপ হয়। অতএব, আমি ধর্মসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপন জ্ঞান অনুসারে, যথার্থ মূল্য নির্ধারিত করিয়া দিব। ইহা কহিয়া, সে প্রত্যেক রত্নের লক্ষণপরীক্ষা করিয়া কহিল, মহারাজ! বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, সকল রত্নই সর্বাঙ্গসুন্দর; কোটি মুদ্রাও একৈকের প্রকৃত মূল্য নহে। এ সকল অমূল্য রত্ন।

রাজা শুনিয়া সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া, সমুচিত পারিতোষিক প্রদানপূর্বক, মণিকারকে বিদায় করিলেন এবং হস্তদ্বারা সন্ন্যাসীর হস্তগ্রহণ করিয়া, সিংহাসনার্ধে উপবেশন করাইয়া কহিলেন, মহাশয়! আমার সমস্ত সাম্রাজ্যও আপনার প্রদত্ত রত্নসমূহের তুল্যমূল্য হইবেক না। আপনি, সন্ন্যাসী হইয়া এ সকল অমূল্য রত্ন কোথায় পাইলেন, এবং কি অভিপ্রায়েই বা আমায় দিলেন, জানিতে ইচ্ছা করি। যোগী কহিলেন, মহারাজ ঔষধ, মন্ত্রণা, গৃহচ্ছিদ্র, এসকল সর্বসমক্ষে ব্যক্ত করা বিধেয় নহে; যদি অনুমতি হয়, নির্জনে গিয়া নিবেদন করি। মহারাজ! নীতিজ্ঞেরা বলেন, মন্ত্রণা, ষট্ কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে, অপ্রকাশিত থাকে না, তাহাতে কার্যহানির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; চারিকর্ণে হইলে প্রকাশিত হয় না, অথচ কার্যসিদ্ধি করে; আর, দুই কর্ণের মন্ত্রণা, মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্মাও জানিতে পারেন না।

ইহা শুনিয়া, রাজা সন্ন্যাসীকে নির্জনে লইয়া কহিতে লাগিলেন, যোগীশ্বর! আপনি আমায় এত রত্ন দিলেন, কিন্তু একদিনও আমার আলয়ে ভোজন বা জলগ্রহণ করিলেন

না ; এজন্য, আমি আপনকার নিকট অতিশয় লজ্জিত হইতেছি। যদি আপনকার কোনও অভিপ্রায় থাকে, ব্যক্ত করুন ; আমি প্রাণান্তেও তৎসম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইব না। সন্ন্যাসী কহিলেন, মহারাজ! গোদাবরীতীরবর্তী শ্মশানে মন্ত্র সিদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি ; তাহাতে অষ্টসিদ্ধি লাভ হইবেক। অতএব, তোমার নিকট আমার প্রার্থনা এই, তুমি একদিন সন্ধ্যা অবধি প্রভাত পর্যন্ত, আমার সন্নিহিত থাকিবে। তুমি সন্নিহিত থাকিলেই আমার মন্ত্র সিদ্ধ হইবেক। রাজা কহিলেন, আমি অবধারিত যাইব ; আপনি দিন নির্ধারিত করিয়া বলুন। সন্ন্যাসী কহিলেন, তুমি আগামী ভাদ্রকৃষ্ণচতুর্দশীতে, সন্ধ্যাকালে, একাকী আমার নিকটে যাইবে। রাজা কহিলেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন ; আমি, নিঃসন্দেহ, যথাসময়ে, আপনকার আশ্রমে উপস্থিত হইব। এইরূপে রাজাকে বচনবদ্ধ করিয়া বিদায় লইয়া, সন্ন্যাসী স্বীয় আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন।

কৃষ্ণচতুর্দশী উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী সায়ং সময়ে, আবশ্যক দ্রব্যসামগ্রীর সংগ্রহপূর্বক, শ্মশানে যোগাসনে বসিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্যও, প্রতিশ্রুত সময় সমুপস্থিত দেখিয়া সাহসে নির্ভর করিয়া, করে তরবারি ধারণপূর্বক, একাকী সন্ন্যাসীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন ; দেখিলেন, বহুসংখ্যক বিকটাকৃতি ভূত, প্রেত, পিশাচ, শঙ্খিনী, ডাকিনী প্রভৃতি আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া সন্ন্যাসীর চতুর্দিকে নৃত্য করিতেছে ; সন্ন্যাসী যোগাসনে আসীন হইয়া দুই হস্তে দুই নরকপাল লইয়া, বাদ্য করিতেছেন। রাজা, এতাদৃশ ভয়াবহ ব্যাপার দর্শনে, কিঞ্চিন্মাত্র ভীত হইলেন না ; যথোপযুক্ত ভক্তিযোগ সহকারে প্রণাম করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, মহাশয়! ভৃত্য উপস্থিত ; আদেশ দ্বারা চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা হয়। যোগী, আশীর্বাদপ্রয়োগ পূর্বক, সমীপপাতিত আসনের দিকে অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিয়া কহিলেন, এই আসনে উপবেশন কর।

রাজা, তদীয় আদেশ অনুসারে আসন পরিগ্রহ করিয়া, কিয়ৎক্ষণ পরে ; পুনরায় নিবেদন করিলেন, মহাশয়! ভৃত্যের প্রতি কি আজ্ঞা হয়। যোগী কহিলেন, মহারাজ! তোমার বাক্যনিষ্ঠায় নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। বুঝিলাম, সৎপুরুষেরা, প্রাণান্তেও, প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হয়েন না। যাহা হউক, যদি অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছ, এক বিষয়ে আমায় সাহায্য কর। দুই ক্রোশ দক্ষিণে এক শ্মশান আছে ; তথায় দেখিতে পাইবে, এক শিরীষবৃক্ষে শব ঝুলিতেছে ; ঐ শব আমার নিকটে লইয়া আইস। রাজা, যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। এইরূপে, রাজাকে শবানয়নে প্রেরণ পূর্বক যথাবিধি বিবিধ আয়োজন করিয়া সন্ন্যাসী পূজায় বসিলেন।

একে কৃষ্ণচতুর্দশীর রাত্রি সহজেই ঘোরতর অন্ধকারে আবৃতা, তাহাতে আবার, ঘনঘটা দ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া মুষলধারায় বৃষ্টি হইতেছিল ; আর, ভূতপ্রেতগণ চতুর্দিকে

ভয়ানক কোলাহল করিতেছিল। এইরূপ সঙ্কটে কাহার হৃদয়ে না ভয় সঞ্চার হয়। কিন্তু রাজার তাহাতে ভয় বা ব্যাকুলতার লেশমাত্র উপস্থিত হইল না। পরিশেষে, নানা সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, রাজা নির্দিষ্ট প্রেতভূমিতে উপনীত হইলেন; দেখিলেন, কোনও স্থলে অতি বিকটমূর্তি ভূতপ্রেতগণ, জীবিত মনুষ্য ধরিয়া, তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিতেছে; কোনও স্থলে ডাকিনীগণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক ধরিয়া, তদীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চর্বণ করিতেছে। রাজা, ইতস্ততঃ অনেক অন্বেষণ করিয়া পরিশেষে শিরীষ-বৃক্ষের নিকটে গিয়া দেখিলেন, উহার মূল অবধি অগ্রভাগ পর্যন্ত, প্রত্যেক বিটপ ও পল্লব ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে; আর চারিদিকে অনবরত কেবল মার্ মার্, কাট্ কাট্ ইত্যাদি ভয়ানক শব্দ হইতেছে।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়াও রাজা ভয় পাইলেন না; কিন্তু মনে মনে বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, যক্ষ যে যোগীর কথা কহিয়াছিল, এ সেই ব্যক্তি· তাহার সন্দেহ নাই। অনন্তর, তিনি সেই বৃক্ষের সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন, শব রজ্জুবদ্ধ, অধঃশিরাঃ লম্বমান রহিয়াছে। শবদর্শনে শ্রম সফল বোধ করিয়া রাজা সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং, নির্ভয়ে বৃক্ষে আরোহণপূর্বক, খড়্গাঘাত দ্বারা শবের বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করিলেন। শব ভূতলে পতিত হইবামাত্র, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। রাজা, তদীয় কণ্ঠরব শ্রবণে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, এবং ত্বরায় তরু হইতে অবতীর্ণ হইয়া নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে, কি নিমিত্তে তোমার এরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, বল। শব খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। রাজা দেখিয়া শুনিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন ও চিন্তান্বিত হইলেন, এবং এই অদ্ভুত ব্যাপারের মর্মাববোধে অসমর্থ হইয়া, অন্তঃকরণে অশেষপ্রকার কল্পনা করিতে লাগিলেন।

এই অবকাশে শব, বৃক্ষে উঠিয়া পূর্ববৎ রজ্জুবদ্ধ ও লম্বমান হইয়া রহিল। রাজাও তৎক্ষণাৎ বৃক্ষে আরোহণ ও রজ্জুচ্ছেদন পুরঃসর, শবকে কক্ষে নিক্ষিপ্ত করিয়া অবতীর্ণ হইলেন, এবং নিরতিশয় নির্বন্ধ সহকারে, তাহার এরূপ বিপৎপ্রাপ্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সে কিছুই উত্তর দিল না। রাজা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যক্ষের নিকট যে তৈলিকের উপাখ্যান শুনিয়াছিলাম, এ সেই ব্যক্তি; আর যোগীও সেই কুম্ভকার, আপন যোগসিদ্ধির উদ্দেশ্যে; ইহার প্রাণসংহার করিয়া শ্মশানে রাখিয়াছে। অনন্তর তিনি, শবকে উত্তরীয়বস্ত্রে বদ্ধ করিয়া যোগীর নিকটে লইয়া চলিলেন।

অর্ধপথে উপস্থিত হইলে, শবাবিষ্ট বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসিল, অহে বীর পুরুষ! তুমি কে, আমায় কি নিমিত্তে, কোথায় লইয়া যাইতেছ, বল। ভূপতি কহিলেন, আমি রাজা বিক্রমাদিত্য; শান্তশীল নামক যোগীর আদেশ অনুসারে, তোমায় তাঁহার আশ্রমে

লইয়া যাইতেছি। বেতাল কহিল, মহারাজ! মূঢ়, নির্বোধ ও অলসেরা কেবল নিদ্রায়, আলস্যে ও কলহে কালহরণ করে; কিন্তু বুদ্ধিমান, চতুর পণ্ডিত ব্যক্তিরা, সদা সদালাপ, শাস্ত্রচিন্তা ও সৎকর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা আনন্দে কালযাপন করিয়া থাকেন। অতএব, সমস্ত পথ মৌনভাবে গমন করা অপেক্ষা সৎকথার আলোচনা শ্রেয়সী বোধ করিয়া, এক এক প্রসঙ্গ করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রত্যেক প্রসঙ্গের পরিশেষে প্রশ্ন করিব; যদি তুমি তত্তৎ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দাও, তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া যাইব; আর, যদি জানিয়াও যথার্থ উত্তর না দাও, অবিলম্বে তোমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইবেক। রাজা অগত্যা তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহাকে সন্ন্যাসীর আশ্রমে লইয়া চলিলেন, এবং বেতালও উপাখ্যানের আরম্ভ করিল।

প্রথম উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ! শ্রবণ কর,

বারাণসী নগরীতে প্রতাপমুকুট নামে এক প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। তাঁহার মহাদেবী নামে প্রেয়সী মহিষী ও বজ্রমুকুট নামে হৃদয়নন্দন নন্দন ছিল। একদিন রাজকুমার, একমাত্র অমাত্যপুত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া, মৃগয়ায় গমন করিলেন। তিনি নানা বনে ভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ পূর্বক, ঐ অরণ্যের মধ্যবর্তী অতি মনোহর সরোবর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, ঐ সরোবরের নির্মল সলিলে হংস, বক, চক্রবাক প্রভৃতি নানাবিধ জলচর বিহঙ্গমগণ কেলি করিতেছে; প্রফুল্ল কমলসমূহের সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইয়া আছে; মধুকরেরা মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া গুন্ গুন্ ধ্বনি করত, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে; তীরস্থিত তরুগণ অভিনব পল্লব, ফল, কুসুম সমূহে সুশোভিত রহিয়াছে; উহাদের ছায়া অতি স্নিগ্ধ; বিশেষতঃ, শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার দ্বারা, পরম রমণীয় হইয়া আছে; তথায় উপস্থিতি মাত্র, শ্রান্ত ও আতপক্লান্ত ব্যক্তির শ্রান্তি ও ক্লান্তি দূর হয়।

এই পরম রমণীয় স্থানে কিয়ংক্ষণ সঞ্চরণ করিয়া রাজকুমার অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং সমীপবর্তী বকুল বৃক্ষের স্কন্ধে অশ্ববন্ধন ও সরোবরে অবগাহন পূর্বক স্নান করিলেন; অনন্তর, অনতিদূরবর্তী দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশ পূর্বক, দর্শন, পূজা ও প্রণাম করিয়া কিয়ংক্ষণ পরে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় মধ্যে এক রাজকন্যাও স্বীয় সহচরীবর্গের সহিত সরোবরের অপর পারে উপস্থিত হইয়া স্নান ও পূজা সমাপন পূর্বক বৃক্ষের ছায়ায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দৈবযোগে তাঁহার ও বজ্রমুকুটের চারি চক্ষু একত্র হইল। তদীয় নিরুপম সৌন্দর্য সন্দর্শনে, নৃপনন্দন

মোহিত হইলেন। রাজকুমারীও বজ্রমুকুটকে নয়নগোচর করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়া শিরঃস্থিত পদ্ম হস্তে লইলেন; অনন্তর কর্ণসংযুক্ত করিয়া দন্ত দ্বারা ছেদন পূর্বক পদতলে নিক্ষিপ্ত করিলেন; পুনর্বার গ্রহণ ও হৃদয়ে স্থাপন করিয়া বারংবার রাজতনয়ের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, স্বীয় প্রিয়বয়স্যাগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

কুমারী ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে রাজকুমার বিরহবেদনায় অতিশয় অস্থির হইলেন, এবং সর্বাধিকারিকুমারের নিকটে গিয়া, লজ্জানম্র মুখে কহিতে লাগিলেন, বয়স্য! আজ আমি এক পরম সুন্দরী রমণী নিরীক্ষণ করিয়াছি; তাহার নাম ধাম কিছুই জানিতে পারি নাই; কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহাকে না পাইলে প্রাণত্যাগ করিব। সর্বাধিকারিতনয়, সমস্ত শ্রবণগোচর করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গৃহে প্রত্যানীত করিলেন। রাজকুমার, দুঃসহ বিরহবেদনায় নিতান্ত অধীর হইয়া, শাস্ত্রচিন্তা, সদালাপ, রাজকার্যপর্যালোচনা ও স্নান ভোজন প্রভৃতি আবশ্যক ক্রিয়া পর্যন্ত পরিত্যাগ পূর্বক একাকী নির্জনে বিষণ্ন মনে কালযাপন কবিতে লাগিলেন; পরিশেষে চিত্তবিনোদনের কোনও উপায় না দেখিয়া স্বহস্তে সেই কামিনীর প্রতিমূর্তি চিত্রিত করিলেন। দিন যামিনী, কেবল সেই প্রতিমূর্তির সন্দর্শন করেন; কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না; কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেন না। সর্বাধিকারিপুত্র নৃপনন্দনের এতাদৃশী দশা নিরীক্ষণ করিয়া, উপদেশচ্ছলে অশেষপ্রকার ভর্ৎসনা করিলেন।

প্রিয় বয়স্যের উপদেশবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, রাজকুমার কহিলেন, সখে! আমি যখন এ পদবীতে পদার্পণ করিয়াছি, তখন আমার হিতাহিতচিন্তা ও সুখদুঃখ বিবেচনা নাই। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, মনোরথ সম্পন্ন না হইলে জীবনবিসর্জন করিব। রাজকুমারের ঈদৃশ আক্ষেপবাক্য কর্ণগোচর করিয়া, সর্বাধিকারিকুমার মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আর এখন উপদেশ দ্বারা ধৈর্যসম্পাদনের সময় নাই; ইনি নিতান্ত অধীর হইয়াছেন; অতঃপর কোনও উপায় স্থির করা আবশ্যক। অনন্তর, তিনি রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! প্রস্থানকালে, সেই সীমন্তিনী তোমাকে কিছু বলিয়াছিল, কিংবা তুমি তাহাকে কিছু বলিয়াছিলে। রাজপুত্র কহিলেন, না বয়স্য! আমি তাহাকে কিছু বলি নাই; এবং সেই সর্বাঙ্গসুন্দরীও আমায় কোনও কথা বলে নাই। তখন সর্বাধিকারিপুত্র কহিলেন, তবে তাহার সমাগম দুর্ঘট বোধ হইতেছে। রাজপুত্রও কহিলেন, যদি সেই সুলোচনা লোচনানন্দদায়িনী না হয়, আমি প্রাণত্যাগ করিব। তখন তিনি, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পুনরায় কহিলেন, ভাল বয়স্য! জিজ্ঞাসা করি, প্রস্থান সময়ে সে কোনও সঙ্কেত করিয়াছিল কি না।

রাজকুমার কমলবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তখন সর্বাধিকারিপুত্র কহিলেন, সখে! আর চিন্তা নাই; আমি তৎকৃত সঙ্কেতের তাৎপর্যগ্রহ করিয়াছি, এবং তাহার নাম ধাম জানিতে পারিয়াছি। এখন প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অল্প দিনের মধ্যেই, তাহার সহিত তোমার সমাগম সম্পন্ন করিয়া দিব। অধিক ব্যাকুল হইলেই অভীষ্টসিদ্ধি হয় না, ধৈর্য অবলম্বন কর। তখন রাজপুত্র কহিলেন যদি বুঝিয়া থাক, সমুদয় বিশেষ করিয়া বল; শুনিলেও আপাততঃ স্থির হইতে পারি। তিনি কহিলেন, বয়স্য! শ্রবণ কর, পদ্মপুষ্প মস্তক হইতে নামাইয়া কর্ণে সংলগ্ন করিয়াছিল; তদ্দ্বারা তোমাকে ইহা জানাইয়াছে, আমি কর্ণাটনগরনিবাসিনী; দন্ত দ্বারা খণ্ডিত করিয়া, ইহা ব্যক্ত করিয়াছে, আমি দন্তবাট রাজার কন্যা; তৎপরে পদতলে নিক্ষিপ্ত করিয়া, এই সঙ্কেত করিয়াছে, আমার নাম পদ্মাবতী; আর, হৃদয়ে স্থাপন করিয়া এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে, তুমি আমার হৃদয়বল্লভ।

বয়স্যের এই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া রাজকুমার অপার আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন, এবং ব্যগ্র হইয়া বারংবার কহিতে লাগিলেন, বয়স্য! ত্বরায় আমায় কর্ণাটনগরে লইয়া চল। অনন্তর উভয়ে সমুচিত পরিচ্ছদ ধারণ ও অস্ত্রবন্ধনপূর্বক অশ্বে আরোহণ করিলেন। কতিপয় দিবসের পরে, কর্ণাটনগরে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা রাজবাটীর নিকটে গিয়া দেখিলেন, এক বৃদ্ধা আপন ভবনদ্বারে উপবিষ্টা আছে। উভয়ে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাহার নিকটে গিয়া কহিলেন, মা! আমরা বাণিজ্যব্যবসায়ী বিদেশীয় লোক; দ্রব্যসামগ্রী সমগ্র পশ্চাৎ আসিতেছে; বাসার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত আমরা অগ্রসর হইয়াছি; যদি কৃপা করিয়া স্থান দাও তবে থাকিতে পাই। বৃদ্ধা তাঁহাদের মনোহর রূপ দর্শনে ও মধুর আলাপ শ্রবণে প্রীত হইয়া প্রসন্ন মনে কহিল, এ তোমাদের গৃহ, যতদিন ইচ্ছা, সচ্ছন্দে অবস্থিতি কর।

এইরূপে, উভয়ে সেই বর্ষীয়সীর সদনে আবাসগ্রহণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধা, তাঁহাদের সন্নিধানে আগমন করিয়া কথোপকথন আরম্ভ করিলে, সর্বাধিকারিপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! কয়জন তোমার পরিবার, আর কি প্রকারে বা সংসারযাত্রানির্বাহ হয় বৃদ্ধা কহিল, আমার পুত্র রাজ সংসারে কর্ম করে, রাজার অতি প্রিয় পাত্র। আর পদ্মাবতী নামে রাজার এক কন্যা আছেন, আমি তাঁহাব ধাত্রী ছিলাম। এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি গৃহে থাকি; রাজা অনুগ্রহ করিয়া অন্ন বস্ত্র দেন। আর রাজকন্যা আমায় ভালবাসেন; এজন্য প্রতিদিন এক একবার তাঁহাকে দেখিতে যাই। এই কথা শুনিয়া, রাজপুত্র কহিলেন, কল্য যখন রাজবাটীতে যাইবে, আমায় বলিবে; আমি তোমা দ্বারা রাজকন্যার নিকট কোন সংবাদ পাঠাইব। বৃদ্ধা কহিল, যদি প্রয়োজন থাকে বল, আজই আমি রাজকন্যাকে জানাইয়া আসি। রাজকুমার এই কথা শুনিবামাত্র অতিমাত্র

হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, তুমি রাজকন্যাকে বলিবে, শুক্লপঞ্চমীতে সরোবরতীরে, যে রাজকুমারকে দেখিয়াছিলে, সে তোমার সঙ্কেত অনুসারে উপস্থিত হইয়াছে।

এই বাক্য কর্ণগোচর হইবামাত্র, বৃদ্ধা যষ্টিগ্রহণপূর্বক রাজভবনে গমন করিল। সে কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিল রাজকন্যা একাকিনী নির্জনে উপবিষ্টা আছেন। বৃদ্ধা সম্মুখবর্তিনী হইবামাত্র রাজকন্যা সমাদরপূর্বক বসিতে আসন দিলেন। সে উপবিষ্ট হইয়া কহিল, বৎসে। বাল্যকালে অনেক যত্নে, তোমায় মানুষ করিয়াছি। এক্ষণে ভগবানের অনুগ্রহে, তুমি তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ। আমার অন্তঃকরণের একান্ত অভিলাষ এই, অবিলম্বে উপযুক্ত পাত্রের হস্তগতা হও। এইরূপ আড়ম্বর পূর্বক ভূমিকা করিয়া বৃদ্ধা কহিতে লাগিল, শুক্লপঞ্চমীতে, বাপীতটে যে রাজকুমারের মন হরণ করিয়া আনিয়াছিলে, তিনি আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন এবং আমা দ্বারা এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন, কমলসঙ্কেত দ্বারা যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলে তাহা সম্পন্ন কর ; আমি উপস্থিত হইয়াছি। আর আমিও কহিতেছি, এই রাজকুমার সর্বাংশে তোমার যোগ্য পাত্র , তুমি যেরূপ রূপবতী ও গুণবতী, তিনিও সর্বাংশে তদনুরূপ।

রাজকন্যা শ্রবণমাত্র, কোপ প্রকাশ করিয়া হস্তে চন্দন লেপনপূর্বক বৃদ্ধার উভয় গণ্ডে চপেটাঘাত করিলেন এবং কহিলেন, তুমি এই মুহূর্তে আমার অন্তঃপুর হইতে দূর হও। বৃদ্ধা এইপ্রকার তিরস্কার লাভ করিয়া বিরক্ত হইয়া, বিষণ্ণ বদনে সদনে প্রত্যাগমনপূর্বক, পূর্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত রাজকুমারের কর্ণগোচর করিল। তিনি শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র ব্যাকুল ও হতাশ্বাস হইয়া, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক পার্শ্ববর্তী প্রিয় বয়স্যের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, সখে! এখন কি উপায় করি ; নিতান্ত বুঝিলাম বিধি বাম হইয়াছেন , মনস্কামসিদ্ধির কোনও সম্ভাবনা আছে, এরূপ বোধ হইতেছে না , নতুবা সেই বামলোচনা, কি নিমিত্ত তিরস্কার করিয়া বৃদ্ধাকে বিদায় কবিল। অন্তঃকরণে অনুবাগ সঞ্চার হইলে, দূতীর প্রতি এত অনাদর হয় না। তখন তিনি কহিলেন, বয়স্য! মর্মগ্রহ না করিয়া অকারণে এত ব্যাকুল হও কেন। শ্রীখণ্ডরসে অভিষিক্ত দশ করশাখা দ্বারা প্রহারের তাৎপর্য এই যে শুক্ল পক্ষের দশ দিবস অবশিষ্ট আছে ; তদবসানে অর্থাৎ কৃষ্ণ পক্ষে তোমার সহিত সমাগম হইবেক।

শুক্ল পক্ষ অতিক্রান্ত হইল। বৃদ্ধা পুনরায় রাজকুমারীর নিকটে গিয়া রাজকুমারের প্রার্থনা জানাইল। তিনি শুনিয়া সাতিশয় কোপপ্রকাশ করিলেন ; এবং, গলহস্ত প্রদানপূর্বক বৃদ্ধাকে অনন্তঃপুবের খড়্কী দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। সে তৎক্ষণাৎ রাজকুমারের নিকটে গিয়া, এই বৃত্তান্ত জানাইল। তিনি শুনিয়া নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন সর্বাধিকারি পুত্র কহিলেন, বয়স্য! কেন উৎকণ্ঠিত হইতেছ, আর ভাবনা নাই ; এ অনুকূল গলহস্ত, অপ্রশস্ত নহে,

তুমি পূর্ণমনোরথ হইয়াছ। অদ্য রজনীযোগে তোমায় সেই খড়কী দিয়া তাহার অন্তঃপুরে যাইতে সঙ্কেত করিয়াছে। রাজপুত্র আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া নিতান্ত উৎসুক চিত্তে সূর্যদেবের অস্তগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রজনী উপস্থিত হইল। রাজকুমার বিহারযোগ্য বেশ ভূষার সমাধান করিয়া, প্রিয় বয়স্তের সহিত অন্তঃপুরের খড়কীতে উপস্থিত হইলেন। সর্বাধিকারির পুত্র বহির্ভাগে দণ্ডায়মান রহিলেন; তিনি তন্মধ্য দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন রাজকুমারী তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। নয়নে নয়নে আলিঙ্গন হওয়াতে উভয়ে চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইলেন। রাজকুমারী পার্শ্ববর্তিনী বয়স্যার প্রতি দ্বার বন্ধ করিবার আদেশ দিয়া রাজকুমারের করগ্রহণপূর্বক বিলাসভবনে প্রবেশ করিলেন, এবং সুশোভিত স্বর্ণময় পল্যঙ্কে উপবেশনানন্তর, বল্লভের কণ্ঠদেশে স্বহস্তসঙ্কলিত ললিত মালতীমালা সমর্পণ করিয়া, স্বয়ং তালবৃন্তসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন রাজকুমার কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার বদনসুধাকর সন্দর্শনেই আমার চিত্তচকোর চরিতার্থ হইয়াছে, আব এরূপ ক্লেশস্বীকারের প্রয়োজন নাই; বিশেষতঃ তোমার কোমল করপল্লব শিরীষকুসুম অপেক্ষাও সুকুমার, কোনও ক্রমে তালবৃন্তধারণের যোগ্য নহে; আমার হস্তে দাও; আমি তোমার সেবা দ্বারা আত্মাকে চরিতার্থ করি। পদ্মাবতী কহিলেন, নাথ! আমার জন্য তোমায় অনেক ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছে; অতএব, তোমার সেবা করাই আমার উচিৎ হয়।

উভয়ের এইরূপ বচনবৈদগ্ধী শ্রবণগোচর করিয়া পার্শ্ববর্তিনী সহচরী পদ্মাবতীর হস্ত হইতে তালবৃন্ত গ্রহণপূর্বক বায়ুসঞ্চারণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, রাজকুমার ও রাজকুমারী সহচরীদিগকে সাক্ষী করিয়া, গান্ধর্ব বিধানে দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। অনন্তর উভয়ের সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব দেখিয়া সহচরীগণ কার্যান্তরব্যপদেশে বিলাসভবন হইতে বহির্গত হইলে, কান্ত ও কামিনী কৌতুকে যামিনীযাপন করিলেন।

রজনী অবসন্না হইল। রাজকুমার অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তখন রাজকুমারী কহিলেন, নাথ! আমার এ অন্তঃপুরে সখীগণ ব্যতিরেকে অন্যের প্রবেশ করিবার অধিকার নাই; তুমি নির্ভয়ে অবস্থিতি কর। আমি তোমায় বিদায় দিয়া ক্ষণমাত্রও প্রাণধারণ করিতে পারিব না। রাজকুমার, প্রিয়তমার ঈদৃশ প্রণয়রসাভিষিক্ত মৃদু মধুর বচনপরম্পরা শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা লাভ করিয়া তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং তাঁহার সহচর হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে রাজকুমার রাজধানী প্রতিগমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। রাজকন্যা কোনও মতে সম্মত হইলেন না। ক্রমে ক্রমে প্রায় মাস

অতীত হইয়া গেল ; রাজকুমার তথাপি প্রস্থানের অনুমতিলাভ করিতে পারিলেন না। এইরূপে, স্বদেশপ্রতিগমন বিষয়ে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া তিনি একদিন নির্জনে বসিয়া মনে মনে এই আলোচনা করিতে লাগিলেন, আমি নিতান্ত নরাধম ; অকিঞ্চিৎকর ইন্দ্রিয়সুখের পরতন্ত্র হইয়া পিতা মাতা জন্মভূমি প্রভৃতি সকল পরিত্যাগ করিলাম ; আর যে জীবিতাধিক বান্ধবের বুদ্ধিকৌশলে ও উপদেশবলে ঈদৃশ অসুলভ সুখসম্ভোগে কালহরণ করিতেছি, মাসাবধি তাঁহারও কোনও সংবাদ লইলাম না ; বোধ করি বন্ধু আমায় নিতান্ত স্বার্থপর ও যার পর নাই অকৃতজ্ঞ ভাবিতেছেন।

রাজকুমার একাকী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে রাজকন্যা তথায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে সাতিশয় বিষণ্ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, নাথ! আজ কি জন্যে তুমি এমন উন্মনা হইয়াছ। তোমার চন্দ্রবদন বিষণ্ণ দেখিলে আমি দশ দিক শূন্য দেখি। অসুখের কারণ কি বল, ত্বরায় তাহার প্রতিবিধান করিতেছি। বজ্রমুকুট কহিলেন, পিতার সর্বাধিকারির পুত্র আমার সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন। তিনি আমার পরম সুহৃৎ ; মাসাবধি তাঁহার কোনও সংবাদ পাই নাই ; জানি না তিনি কেমন আছেন। তিনি অতি চতুর, সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ও নানা গুণরত্নে মণ্ডিত। তাঁহারই বুদ্ধিকৌশলে ও মন্ত্রণাবলে তোমার সমাগম লাভ করিয়াছি। তিনিই তোমার সমস্ত সঙ্কেতের মর্মোদ্ভেদ করিয়াছিলেন।

পদ্মাবতী কহিলেন, অয়ি নাথ! ঈদৃশ বন্ধুর অদর্শনে চিত্ত অবশ্যই উৎকণ্ঠিত হইতে পারে। এত দিন তাঁহার কোনও সংবাদ না লওয়ায় যৎপরনাস্তি অভদ্রতা প্রকাশ হইয়াছে। রহস্যবিদ বন্ধু প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তুমি তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ অপরাধী হইয়াছ এবং যার পর নাই অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছ। এক্ষণকার কর্তব্য এই, তাঁহার পরিতোষার্থে, আমি স্বহস্তে নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া পাঠাই, এবং তুমিও একবার কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত, তথায় গিয়া সমুচিতসদ্ভাবপ্রদর্শন করিয়া আইস। রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ, সেই খড়কী দিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া, বৃদ্ধার ভবনে উপস্থিত হইলেন এবং বহু দিবসের পর অকপটপ্রণয়পবিত্র মিত্র সহ সাক্ষাৎকারলাভে অশ্রুপূর্ণলোচন হইয়া তাঁহার নিকট পূর্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

রাজপুত্রকে বন্ধুদর্শনে প্রেরণ করিয়া, রাজকন্যা মনে মনে এই আলোচনা করিতে লাগিলেন, এ কেবল বন্ধুর বুদ্ধিকৌশলেই কৃতকার্য হইয়াছে ; অতএব অবশ্যই সকল কথা তাহার নিকট ব্যক্ত করিবেক ; আর সে ব্যক্তিও আপন বান্ধবগণের নিকট সমস্ত প্রকাশ করিবেক সন্দেহ নাই। এইরূপে আমার কলঙ্কঘোষণা, ক্রমে ক্রমে জগদ্ব্যাপিনী হইবার সম্ভাবনা। অতএব এতাদৃশ ব্যক্তিকে জীবিত রাখা কোনও ক্রমে শ্রেয়স্কর

নহে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া পদ্মাবতী অবিলম্বে নানাবিধ বিষমিশ্রিত মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া সখী দ্বারা রাজকুমারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

মিষ্টান্ন উপনীত হইলে সর্বাধিকারিপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! এ সকল কি। রাজপুত্র কহিলেন, মিত্র! আজ আমি তোমার জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম। রাজকন্যা আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, আমি তোমার সবিশেষ পরিচয় দিয়া ও অশেষবিধ প্রশংসা করিয়া বলিলাম, প্রিয়ে! আমি এই বন্ধুর অদর্শনে বিষণ্ণ হইতেছি। রাজকন্যা তোমার সবিশেষ পরিচয় পাইয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং আমায় অগ্রে পাঠাইয়া দিয়া, স্বহস্তে এই সমস্ত প্রস্তুত করিয়া তোমার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। আমায় বলিয়া দিয়াছেন তুমি আপন সমক্ষে তাঁহাকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া আসিবে। অতএব বয়স্য! কিছু ভক্ষণ কর তাহা হইলে পরম পরিতোষ পাই, এবং যাইয়া তাঁহার নিকটে বলিতে চাই আমার বন্ধু মিষ্টান্ন আহার করিয়া, তোমার শিল্পনৈপুণ্যের অশেষপ্রকার প্রশংসা করিয়াছেন।

এই সকল কথা শুনিয়া সর্বাধিকারিপুত্র কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, অনন্তর রাজপুত্রের মুখে পুনর্বার মনোযোগপূর্বক পূর্বাপর সমস্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বয়স্য! তুমি আমার জন্যে কালকূট আনিয়াছ; এ মিষ্টান্ন নহে সাক্ষাৎ কৃতান্ত, জিহ্বাস্পর্শ মাত্রেই প্রাণসংহার করিবেক। আমার পরম সৌভাগ্য এই, তুমি খাও নাই। তুমি নিতান্ত ঋজুস্বভাব, কাহার কি ভাব কিছুই বুঝিতে চেষ্টা কর না। তোমায় এক সার কথা বলি স্বৈরিণীরা স্বভাবতঃ আপন প্রিয়ের প্রিয় পাত্রের উপর অতিশয় বিষদৃষ্টি হয়। অতএব তুমি তাহার নিকট আমার পরিচয় দিয়া, বুদ্ধির কার্য কর নাই।

রাজকুমার কহিলেন, বয়স্য! আমি তোমার এ কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না। তুমি তাহার স্বভাব জান না, এজন্য এরূপ কহিতেছ। এমন সদাশয় স্ত্রীলোক তুমি কখনও দেখ নাই। তাঁহার নাম করিলে আমার রোমাঞ্চ হয়। আর আমি সমবেত সখীগণ সমক্ষে ধর্ম সাক্ষী করিয়া, গান্ধর্ব বিধানে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছি; এমন স্থলে স্বৈরিণীশব্দে তাঁহার নির্দেশ করা, কোনও মতে ন্যায়ানুগত হইতেছে না। সে যাহা হউক তিনি যেমন চারুশীলা, তেমনই উদারশীলা, তিনি তোমার প্রাণসংহারের নিমিত্ত মিষ্টান্নচ্ছলে কালকূট পাঠাইয়াছেন, তুমি কেমন করিয়া এমন কথা মুখে আনিলে বুঝিতে পারিতেছি না। বলিতে কি, তুমি আর বার এ প্রকার কহিলে আমি তোমার উপর যার পর নাই বিরক্ত হইব। ভাল, কথায় প্রয়োজন নাই, আমি তোমার সন্দেহ দূর করিতেছি। এই বলিয়া এক লাড্ডু লইয়া, রাজকুমার বিড়ালকে ভক্ষণ করাইলেন। বিড়াল তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন রাজপুত্র চকিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, এরূপ দুর্বৃত্তার সহিত পরিচয় রাখা কদাচ উচিত নহে। আর আমি জন্মাবচ্ছেদে সে

পাপীয়সীর মুখাবলোকন করিব না। মন্ত্রিপুত্র কহিলেন, না বয়স্য! তাহারে একেবারে পরিত্যাগ করা হইবেক না; কৌশল করিয়া রাজধানীতে লইয়া যাইতে হইবেক। রাজপুত্র কহিলেন, তাহাও তোমার বুদ্ধিসাধ্য।

অমাত্যপুত্র কহিলেন, বয়স্য! এক পরামর্শ বলি, শুন। আজ তুমি, পদ্মাবতীর নিকটে গিয়া, পূর্ব অপেক্ষা অধিকতর প্রণয়প্রদর্শন করিবে, এবং বলিবে, বন্ধু, মিষ্টান্ন ভক্ষণের অব্যবহিত পরক্ষণেই অচেতনপ্রায় হইয়া নিদ্রাগত হইয়াছেন। আমি, তোমায় দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে না পারিয়া চলিয়া আসিয়াছি। আমি এখন তোমায় এক ক্ষণ নিরীক্ষণ না করিলে, দশ দিক শূন্য দেখি। ফলতঃ আর আমি, বন্ধুর অনুরোধে এক মুহূর্তের নিমিত্তেও, তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিব না। এবম্প্রকার মনোহর বাক্যপ্রয়োগ দ্বারা, তাহারে মোহিত করিয়া দিবাযাপন করিবে; অনন্তর, রাত্রিতে সে নিদ্রাগতা হইলে, তদীয় সমস্ত আভরণ হরণ পূর্বক, তাহার বাম জঙ্ঘাতে ত্রিশূলের চিহ্ন দিয়া চলিয়া আসিবে। রাজপুত্র সম্মত হইলেন, এবং পদ্মাবতীর নিকটে গিয়া বিলক্ষণ প্রীতিপ্রদর্শন করিলেন। পরে, রজনীযোগে উভয়ে শয়ন করিলেন রাজকন্যা ত্বরায় নিদ্রাভিভূতা হইলেন। তখন রাজকুমার, মন্ত্রিপুত্রের উপদেশানুরূপ সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া বৃদ্ধার আবাসে উপস্থিত হইলেন।

পরদিন প্রভাতে মন্ত্রিপুত্র, সন্ন্যাসীর বেশধারণপূর্বক এক শ্মশানে উপস্থিত হইলেন, এবং স্বযং গুরু হইয়া রাজপুত্রকে শিষ্য করিয়া কহিলেন, তুমি নগরে গিয়া এই অলঙ্কার বিক্রয় কর। যদি কেহ তোমায় চোর বলিয়া ধরে, তাহারে আমার নিকটে লইয়া আসিবে। রাজপুত্র তদীয় উপদেশ অনুসারে নগরে প্রবেশ করিয়া, রাজসদনের সমীপবাসী স্বর্ণকারের নিকট রাজকন্যার অলঙ্কারবিক্রয়ার্থে উপস্থিত হইলেন। সে দর্শনমাত্র, বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, কিছুদিন হইল আমি রাজকন্যার নিমিত্ত এই সকল অলঙ্কার গড়িয়া দিয়াছি; ইহার হস্তে কি প্রকারে আইল। এ ব্যক্তিকে বৈদেশিক দেখিতেছি। অনন্তর, সাতিশয় সন্দিহান হইয়া স্বর্ণকার কারিকরদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কহিল, হাঁ, এ সমস্ত রাজকন্যার অলঙ্কার বটে। তখন সে রাজকুমারকে চোর স্থির করিয়া কহিল, এ রাজকন্যার অলঙ্কার দেখিতেছি, তুমি কোথায় পাইলে, যথার্থ বল।

স্বর্ণকার ভয়প্রদর্শনপূর্বক, বার বার এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করাতে, রাজপথবাহী বহুসংখ্যক লোক, কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তথায় সমবেত হইল। ফলতঃ, অল্পকাল মধ্যেই ঐ অলঙ্কার লইয়া বিলক্ষণ আন্দোলন হইতে লাগিল। পরিশেষে, নগরপাল এই সংবাদ পাইয়া রাজকুমার ও স্বর্ণকার উভয়কে রুদ্ধ করিল। পরে সে অলঙ্কারের প্রাপ্তিবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা

করিলে রাজকুমার কহিলেন, শ্মশানবাসী গুরুদেব আমায় এই অলঙ্কার বিক্রয় করিতে পাঠাইয়াছেন; তিনি কোথায় পাইয়াছেন, আমি তাহার কিছুই জানি না। যদি তোমাদের আবশ্যক বোধ হয়, শ্মশানে গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর। পরিশেষে নগরপাল গুরুশিষ্য উভয়কে অলঙ্কার সমেত রাজসমক্ষে লইয়া গিয়া পূর্বাপর সমস্ত বিজ্ঞাপন করিল।

রাজা, অলঙ্কার দর্শনে নানাপ্রকারে সন্দিহান হইয়া, যোগীকে নির্জনে লইয়া গিয়া বিনয়বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আপনি এই সমস্ত অলঙ্কার কোথায় পাইলেন। যোগী কহিলেন, মহারাজ! কৃষ্ণচতুর্দশী রজনীতে আমি নগরপ্রান্তবর্তী শ্মশানে ডাকিনীমন্ত্র সিদ্ধ করিয়াছিলাম। মন্ত্রপ্রভাবে ডাকিনী স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, প্রসাদস্বরূপ স্বীয় অলঙ্কার সকল উন্মোচিত করিয়া দিয়াছেন; এবং আমিও তাঁহার বাম জঙ্ঘাতে যোগসিদ্ধিব প্রমাণস্বরূপ ত্রিশূলের চিহ্ন করিয়া দিয়াছি। এ সমস্ত সেই অলঙ্কার। রাজা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া, অবিলম্বে অন্তঃপুরে প্রবেশ কবিলেন, এবং রাজমহিষীকে বলিলেন, দেখ দেখি, পদ্মাবতীর বাম জঙ্ঘাতে কোনও চিহ্ন আছে কি না। রাজ্ঞী সবিশেষ অবগত হইয়া বাজার নিকটে আসিয়া কহিলেন, এক ত্রিশূলেব চিহ্ন আছে।

রাজা এবম্প্রকার অঘটন ঘটনা দর্শনে, হতবুদ্ধি ও লজ্জায় অধোবদন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এতাদৃশী দুশ্চারিণীকে গৃহে রাখা কদাচ উচিত নহে; ইহাতে অধর্ম আছে। অতএব এখন কি কর্তব্য। অথবা পণ্ডিতমণ্ডলী সমবেত করিয়া সবিশেষ কহিয়া জিজ্ঞাসা করি; তাঁহারা ধর্মশাস্ত্র অনুসারে যেরূপ ব্যবস্থা দিবেন, তদনুরূপ কার্য করিব। কিন্তু শাস্ত্রে গৃহচ্ছিদ্র প্রকাশ করিতে নিষেধ আছে। পণ্ডিতমণ্ডলী সমবেত করিয়া ব্যবস্থা জিজ্ঞাসিলে, আমার এই কলঙ্ক ক্রমে ক্রমে দেশে বিদেশে প্রচারিত হইবেক। তদপেক্ষা উত্তম কল্প এই, সেই সন্ন্যাসীকেই ইহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। সন্ন্যাসী সবিশেষ সমস্ত অবগত আছেন; ধর্মতঃ প্রশ্ন করিলে অবশ্যই যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা দিবেন। অনন্তর, রাজা সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! ধর্মশাস্ত্রে দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর বিষয়ে কিরূপ দণ্ড নিরূপিত আছে। সন্ন্যাসী কহিলেন, মহারাজ! ধর্মশাস্ত্রে লিখিত আছে স্ত্রীলোক, বালক, ব্রাহ্মণ ইহারা অত্যন্ত অপরাধী হইলেও বধার্হ নহে; রাজা ইহাদের নির্বাসনরূপ দণ্ডবিধান করিবেন।

রাজা এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া, অন্তঃপুরে গিয়া রাজ্ঞীকে কহিলেন, পদ্মাবতী অতি দুশ্চরিত্রা; এজন্য শাস্ত্রের বিধান অনুসারে আমি উহারে দেশবহিষ্কৃতা করিব। রাজ্ঞী কন্যার প্রতি নিরতিশয় স্নেহবতী ছিলেন; কিন্তু পতিব্রতাত্বগুণের আতিশয্য বশতঃ রাজার মতেই সম্মতিপ্রদর্শন করিলেন। অনন্তর, নরপতি কন্যাকে শিবিকারোহণের আদেশ দিয়া, তাহার অগোচরে বাহকদিগকে আজ্ঞা দিলেন, তোমরা পদ্মাবতীকে

কোনও অরণ্যানীতে পরিত্যাগ করিয়া, ত্বরায় আমায় সংবাদ দিবে। বাহকেরা রাজাজ্ঞা-সম্পাদান করিল। অমাত্যপুত্রও তৎক্ষণাৎ রাজকুমারকে সঙ্গে লইয়া রাজকুমারীর উদ্দেশে চলিলেন; এবং ইতস্ততঃ অনেক অন্বেষণ করিয়া, পরিশেষে সেই অরণ্যানীতে প্রবেশিয়া দেখিলেন, পদ্মাবতী একাকিনী বৃক্ষমূলে বসিয়া, যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায়, বিষণ্ণবদনে রোদন করিতেছেন। অশেষবিধ আশ্বাসপ্রদান দ্বারা তাঁহার শোকাবেগনিবারণ করিয়া, সঙ্গে লইয়া, উভয়ে স্বদেশ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, প্রজাগণ অতিশয় আনন্দিত হইল। রাজা প্রতাপমুকুট, বধূ সহিত পুত্র পাইয়া, আনন্দ প্রবাহে মগ্ন হইয়া নগরে মহোৎসবের আদেশ করিলেন।

এইরূপে আখ্যায়িকার সমাপন করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! রাজা ও মন্ত্রীপুত্র এ উভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি, নিরপরাধে রাজনন্দিনীর নির্বাসন জন্য দুরদৃষ্টভাগী হইবেন। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, আমার মতে, রাজা। বেতাল কহিল, কি নিমিত্তে। রাজা কহিলেন, শাস্ত্রকারেরা আততায়ীর বধে ও বিদ্রোহাচরণে দোষাভাব লিখিয়াছেন। অতএব বিষপ্রদায়িনী রাজতনয়ার প্রতি এরূপ প্রতিকূল আচরণের নিমিত্ত, মন্ত্রিপুত্রকে দোষী বলিতে পারা যায় না। কিন্তু রাজা যে অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তির বাক্যে বিশ্বাস করিয়া প্রমাণান্তর নিরপেক্ষ ও বিচার বহির্মুখ হইয়া অপত্যস্নেহ বিস্মরণপূর্বক অকৃত অপরাধে কন্যাকে নির্বাসিত করিলেন, ইহাতে তাঁহার রাজধর্মের বিরুদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান জন্য, পাপস্পর্শ হইতে পারে।

ইহা শুনিয়া বেতাল পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞা অনুসারে, শ্মশানে গিয়া পূর্ববৎ বৃক্ষে লম্বমান হইল; রাজাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাকে বৃক্ষ হইতে অবতারণপূর্বক স্কন্ধে করিয়া সন্ন্যাসীর আশ্রম অভিমুখে চলিলেন।

দ্বিতীয় উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ! দ্বিতীয় উপাখ্যানের আরম্ভ করি, অবধান কর। যমুনাতীরে জয়স্থল নামে এক নগর আছে। তথায় কেশব নামে এক পরম ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণের, মধুমালতী নামে এক পরমাসুন্দরী দুহিতা ছিল। কালক্রমে মধুমালতী বিবাহযোগ্যা হইলে, তাহার পিতা ও ভ্রাতা উভয়ে উপযুক্ত পাত্রের অন্বেষণে তৎপর হইলেন।

কিয়ৎ দিন পরে, ব্রাহ্মণ যজমান পুত্রের বিবাহ উপলক্ষ্যে গ্রামান্তরে গেলেন; ব্রাহ্মণের পুত্রও অধ্যয়নের নিমিত্ত, গুরুগৃহে প্রস্থান করিলেন। উভয়ের অনুপস্থিতি সময়ে, এক সুকুমার ব্রাহ্মণকুমার কেশবের গৃহে অতিথি হইলেন। কেশবের ব্রাহ্মণী

তাহাকে রূপে রতিপতি ও বিদ্যায় বৃহস্পতি দেখিয়া, মনে মনে বাসনা করিলেন, যদি সৎকুলোদ্ভব হয় ও অঙ্গীকার করে, তবে ইহাকে জামাতা করিব ; অনন্তর, যথোচিত অতিথিসৎকার করিয়া, তাহার কুলের পরিচয় লইলেন, এবং সৎকুলজাত জানিয়া আনন্দিত হইয়া কহিলেন, বৎস ! যদি তুমি স্বীকার কর, তোমার সহিত আমার মধুমালতীর বিবাহ দি। বিপ্রতনয়, মধুমালতীর লোকাতীত লাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, কেশব পত্নীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং ব্রাহ্মণের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায়, তদীয় আবাসে অবস্থিতি করতে লাগিলেন।

কতিপয় দিবস অতীত হইলে, ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পুত্র উভয়ে মধুমালতীপ্রদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, এক এক পাত্র লইয়া, প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। তিন পাত্র একত্র হইল, একের নাম ত্রিবিক্রম, দ্বিতীয়ের নাম বামন, তৃতীয়ের নাম মধুসূদন। তিন জনই রূপ, গুণ, বিদ্যা, বয়ক্রমে তুল্য, কোনও ক্রমে ইতরবিশেষ করিতে পারা যায় না। তখন ব্রাহ্মণ বিলক্ষণ বিপদগ্রস্ত হইয়া, এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক কন্যা, তিন পাত্র উপস্থিত ; কি উপায় করি, তিন জনেই তিন জনেব নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি ; এক্ষণকার কর্তব্য কি।

ব্রাহ্মণ এবম্প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মণী আসিয়া কহিলেন, তুমি এখানে বসিয়া কি ভাবিতেছ, সর্পাঘাতে মধুমালতীর প্রাণত্যাগ হয়। তখন কেশব শর্মা সাতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া, চারি পাঁচ জন বিষবৈদ্য আনাইয়া, অশেষ প্রকারে চিকিৎসা করাইলেন, কিন্তু কোনও প্রকারেই প্রতিকার দর্শিল না। বিষবৈদ্যেরা কহিল, মহাশয় ! আপনকার কন্যাকে কালে দংশন করিয়াছে, এবং বার তিথি নক্ষত্র সমুদয়ের দোষ পাইয়াছে, স্বয়ং ধন্বন্তরি উপস্থিত হইলেও ইহাকে বাঁচাইতে পারিবেন না। এক্ষণকার যাহা কর্তব্য থাকে করুন ; আমরা চলিলাম। এই বলিয়া প্রণাম করিয়া বিষবৈদ্যেরা প্রস্থান করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই, মধুমালতীর প্রাণবিয়োগ হইল। তখন ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের পুত্র এবং তিন বর, পাঁচজন একত্র হইয়া তদীয় মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া গিয়া, যথাবিধি দাহ ক্রিয়া করিলেন। ব্রাহ্মণ, পুত্র সহিত গৃহে আসিয়া, সাতিশয় বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। বরেরা তিনজনেই এতাদৃশ অলৌকিক রূপনিধান কন্যানিধান লাভে হতাশ হইয়া, বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন। তন্মধ্যে, ত্রিবিক্রম চিতা হইতে অস্থি সঞ্চয়ন করিলেন এবং বস্ত্রখণ্ডে বন্ধন পূর্বক কক্ষে নিক্ষিপ্ত করিয়া, দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন. বামন সন্ন্যাসী হইয়া তীর্থযাত্রা করিলেন ; মধুসূদন, সেই শ্মশানের প্রান্তভাগে পর্ণশালানির্মাণ করিয়া, তাহার এক কোণে মধুমালতীর রাশীকৃত দেহভস্ম রাখিয়া, যোগসাধন করিতে লাগিলেন।

একদিন বামন ভ্রমণ করিতে করিতে মধ্যাহ্নকালে, এক ব্রাহ্মণের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ ভোজনকালে সন্ন্যাসী উপস্থিত দেখিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, মহাশয়! যদি কৃপা করিয়া দীনের ভবনে পাদার্পণ করিয়াছেন, তবে অনুগ্রহপূর্বক ভিক্ষাস্বীকার করুন; তাহা হইলে আমি চরিতার্থ হই; পাকের অধিক বিলম্ব নাই। সন্ন্যাসী সম্মত হইলেন এবং পাকান্তে ভোজনে বসিলেন। ব্রাহ্মণী পরিবেশন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মণের পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র, নিতান্ত অশান্তভাবে উৎপাত আরম্ভ করিয়া, পরিবেশনের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণী নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করিলেন; বালক কোনওক্রমে প্রবোধ মানিলেক না। তখন তিনি ক্রোধভরে, পুত্রকে প্রজ্বলিতহুতাশনপূর্ণ চুল্লীতে নিক্ষিপ্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া, নির্বিঘ্নে পরিবেশন করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণীর এইরূপ বিরূপ আচরণ দেখিয়া, নারায়ণ নারায়ণ বলিয়া, তৎক্ষণাৎ ভোজনপাত্র হইতে হস্ত উত্তোলিত করিলেন, ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহাশয়! অকস্মাৎ ভোজনে বিরত হইলেন কেন। সন্ন্যাসী কহিলেন, যে স্থানে এরূপ রাক্ষসের ব্যবহার তথায় কি প্রকারে ভোজন করিতে প্রবৃত্তি হয়, বল। ব্রাহ্মণ ঈষৎ হাস্য করিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সঞ্জীবনী বিদ্যার পুস্তক বহির্গত করিয়া, তন্মধ্য হইতে এক মন্ত্র লইয়া জপ করিতে লাগিলেন। পুত্র অবিলম্বে প্রাণদান পাইয়া, পূর্ববৎ উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল। সন্ন্যাসী চমৎকৃত হইয়া, ভোজন সমাপন করিলেন এবং মনে মনে এই আলোচনা করিতে লাগিলেন, এই পুস্তকে মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র আছে; ঐ মন্ত্র জানিতে পারিলে, প্রিয়াকে পুনর্জীবিত করিতে পারি। অতএব যেরূপে হয়, পুস্তকখানি হস্তগত করিতে হইবেক।

মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণকে কহিলেন, অদ্য-অপরাহ্ন হইল; অতএব আর স্থানান্তরে না গিয়া, তোমার আলয়েই রাত্রিকাল অতিবাহিত করিব। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ পরম সমাদর পূর্বক, স্বতন্ত্র স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। রজনী উপস্থিত হইল। সমুদয় গৃহস্থ ভোজনাবসানে, স্ব স্ব নির্দিষ্ট স্থানে শয়ন করিল। সকলে নিদ্রাভিভূত হইলে, বামন নিঃশব্দপদসঞ্চারে গৃহে প্রবেশপূর্বক সঞ্জীবনী বিদ্যার পুস্তক হস্তগত করিয়া প্রস্থান করিলেন, এবং অল্পদিনের মধ্যেই, জয়স্থলে শ্মশানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মধুসূদন স্বহস্তনির্মিত পর্ণকুটীরে অবস্থিত হইয়া, যোগসাধন করিতেছেন। এই সময়ে দৈবযোগে, ত্রিবিক্রমও তথায় উপস্থিত হইলেন।

এইরূপে তিন বর একত্র হইলে পর, বামন কহিলেন, আমি মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিয়াছি; তোমরা অস্থি ও ভস্ম একত্র কর, আমি প্রিয়াকে প্রাণদান দিব। তাঁহারা মহাব্যস্ত হইয়া অস্থি ও ভস্ম একত্র করিলেন। বামন পুস্তক হইতে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র

বহিষ্কৃত করিয়া, জপ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রের প্রভাবে অনতিবিলম্বে, কন্যার কলেবরে মাংস শোণিত প্রভৃতির আবিষ্কার ও প্রাণসঞ্চার হইল। তখন তিনজনে, মধুমালতীর রূপ ও লাবণ্যের মাধুরী দর্শনে মুগ্ধ হইয়া এই কামিনী আমার আমার বলিয়া, পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিলেন।

ইহা কহিয়া বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! এই তিনের মধ্যে, কোন ব্যক্তি মধুমালতীর পাণিগ্রহণে যথার্থ অধিকারী হইতে পারে। রাজা কহিলেন, যে ব্যক্তি কুটীর নির্মাণ করিয়া এতাবৎকাল পর্যন্ত শ্মশানবাসী হইয়াছিল, আমার বিবেচনায়, সেই এই কামিনীর পাণিগ্রহণে অধিকারী। বেতাল কহিল, যদি ত্রিবিক্রম অস্থিসঞ্চয়ন করিয়া না রাখিত, এবং বামন নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া সঞ্জীবনী বিদ্যার সংগ্রহ করিতে না পারিত, তবে কি প্রকারে মধুমালতীর প্রাণদান পাইত। রাজা কহিলেন, যাহা কহিতেছ উহা সর্বাংশে সত্য বটে; কিন্তু ত্রিবিক্রম অস্থি সঞ্চয়ন দ্বারা, মধুমালতীর পুত্রস্থানীয়; আর বামন জীবনদান দ্বারা, পিতৃস্থানীয় হইয়াছে; সুতরাং তাহারা উহার প্রণয়ভাজন হইতে পারে না। কিন্তু মধুসূদন ভস্মরাশিসংগ্রহ ও উটজ-নির্মাণ পূর্বক শ্মশানবাসী হইয়া, যথার্থ প্রণয়ীর কার্য করিয়াছে। অতএব, সেই, ন্যায়মার্গ অনুসারে এই প্রমদার প্রণয়ভাজন হইতে পারে।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

তৃতীয় উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

বর্ধমান নগরে রূপসেন নামে অতি বিজ্ঞ, গুণগ্রাহী, দয়াশীল, পরম ধার্মিক রাজা ছিলেন। একদিন দক্ষিণদেশনিবাসী বীরবর নামে রজঃপূত, কর্মপ্রাপ্তির বাসনায় রাজদ্বারে উপস্থিত হইল। দ্বারবান তাহার প্রমুখাৎ সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, রাজসমীপে বিজ্ঞাপন করিল, মহারাজ! বীরবর নামে এক অস্ত্রধারী পুরুষ কর্মের প্রার্থনায় আসিয়া, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছে; সাক্ষাৎকারে আসিয়া স্বীয় অভিপ্রায় আপনকার গোচর করিতে চায়; কি আজ্ঞা হয়। রাজা আজ্ঞা করিলেন, অবিলম্বে উহারে লইয়া আইস।

অনন্তর, দ্বারী বীরবরকে নরপতিগোচরে উপস্থিত করিলে, রাজা তদীয় আকার প্রকার দর্শনে তাহাকে বিলক্ষণ কার্যদক্ষ স্থির করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, বীরবর! কত বেতন পাইলে, তোমার সচ্ছন্দে দিনপাত হইতে পারে। বীরবর নিবেদন করিল, মহারাজ! প্রত্যহ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার আদেশ হইলে আমার চলিতে পারে।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন, তোমার পরিবার কত। সে কহিল, মহারাজ! এক স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা, আর স্বয়ং, এই চারি ; এতদ্ব্যতিরিক্ত আর আমার পরিবার নাই। রাজা শুনিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, ইহার পরিবার এত অল্প, তথাপি কি নিমিত্ত এত অধিক প্রার্থনা করে। যাহা হউক, এক ভৃত্যের নিমিত্তে নিত্য নিত্য এবংবিধ ব্যয় যুক্তিসঙ্গত নহে। অথবা এ অর্থব্যয় ব্যর্থ হইবেক না ; অবশ্যই ইহার অসাধারণ গুণ ও ক্ষমতা থাকিবেক। অতএব, কিছুদিনের নিমিত্তে রাখিয়া ইহার গুণের ও ক্ষমতার পরীক্ষা করা উচিত। অনন্তর, কোষাধ্যক্ষকে ডাকাইয়া রাজা আজ্ঞা দিলেন, তুমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে, বীরবরকে সহস্র স্বুবর্ণ দিবে ; কোনও মতে অন্যথা না হয়।

বীরবর রাজকীয় আজ্ঞা শ্রবণে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া, ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল এবং কোষাধ্যক্ষের নিকট হইতে সে দিবসের প্রাপ্য নির্ধারিত স্বুবর্ণ গ্রহণপূর্বক, নৃপনির্দিষ্ট বাসস্থানে গমন করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া, সে প্রথমতঃ সেই স্বুবর্ণকে ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া একভাগ বিপ্রসাৎ করিল ; অবশিষ্ট ভাগ পুনর্বার দ্বিভাগ করিয়া, একভাগ বৈষ্ণব, বৈরাগী, সন্ন্যাসী প্রভৃতিকে দিল ; অপর ভাগ দ্বারা নানাবিধ খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করিয়া শত শত দীন দুঃখীকে অনাথ প্রভৃতিকে পর্যাপ্ত ভোজন করাইল ; অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ স্বয়ং পুত্র, কলত্র, ও দুহিতার সহিত আহার করিল।

প্রতিদিন এইরূপে দিনপাত করিয়া স্বায়ংকালে বর্ম, খড়্গ ও চর্ম ধারণপূর্বক বীরবর সমস্ত রজনী রাজদ্বারে উপস্থিত থাকে। রাজা তাহার শক্তির ও প্রভুভক্তির পরীক্ষার্থে কি দ্বিতীয় প্রহর, কি তৃতীয় প্রহর, যখন যে আদেশ করেন, অতি দুঃসাধ্য হইলেও সে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিয়া আইসে।

একদিন নিশীথ সময়ে অকস্মাৎ স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণগোচর করিয়া, রাজা বীরবরকে আহ্বান করিলে, সে তৎক্ষণাৎ সম্মুখবর্তী হইয়া কহিল, মহাবাজ! কি আজ্ঞা হয়। রাজা কহিলেন, দক্ষিণ দিকে স্ত্রীলোকের ক্রন্দনশব্দ শুনা যাইতেছে, ত্বরায় ইহার তথ্যানুসন্ধান করিয়া আমায় সংবাদ দাও। বীরবর যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া, তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। রাজা বীরবরকে এক মুহূর্তের নিমিত্তেও আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ না দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন ; এক্ষণে তাহার সাহস ও ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত স্বয়ং গুপ্তভাবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

বীরবর সেই ক্রন্দনশব্দ লক্ষ্য করিয়া, অতি প্রসিদ্ধ এক ভয়ঙ্কর শ্মশানে উপস্থিত হইল ; দেখিল, এক সর্বালঙ্কারভূষিতা সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণী শিরে করাঘাত ও হাহাকার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। বীরবর দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইল এবং তাহার সম্মুখবর্তী হইয়া জিজ্ঞাসিল, তুমি কে, কি দুঃখে এই ঘোর রজনীতে একাকিনী শ্মশানবাসিনী হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছ। সে কোনও উত্তর

দিল না; বরং পূর্ব অপেক্ষায় অধিকতর রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর বীরবর সবিশেষ ব্যগ্রতা প্রদর্শনপূর্বক, বারংবার জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, আমি রাজলক্ষ্মী; রাজা রূপসেনের গৃহে নানা অন্যায়াচরণ হইতেছে; তৎপ্রযুক্ত তদীয় আবাসে অচিরাৎ অলক্ষ্মীর প্রবেশ হইবেক; সুতরাং আমি রাজার অধিকার পরিত্যাগ করিয়া যাইব। আমি প্রস্থান করিলে অল্প দিনের মধ্যেই, রাজার প্রাণাত্যয় ঘটিবেক; সেই দুঃখে দুঃখিত হইয়া রোদন করিতেছি।

প্রভুর এবম্ভূত অসম্ভাবিত ভাবি অমঙ্গল শ্রবণে বিষাদসাগরে মগ্ন হইয়া, বীরবর কহিল, দেবি! আপনি যে আজ্ঞা করিলেন তাহাতে কোনও মতে সন্দেহ করিতে পারি না। কিন্তু, যদি এই হৃদয়বিদারণ অমঙ্গল ঘটনার নিবারণে কোনও উপায় থাকে বলুন; আমি রাজার মঙ্গলের নিমিত্ত প্রাণান্ত পর্যন্ত স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, পূর্বদিকে অর্ধযোজনান্তে এক দেবী আছেন। যদি কেহ ঐ দেবীর নিকটে আপনপুত্রকে স্বহস্তে বলিদান দেয়, তবে তিনি প্রসন্ন হইয়া রাজার সমস্ত অমঙ্গলের সম্পূর্ণ নিবারণ করিতে পারেন।

রাজলক্ষ্মীর এই বাক্য শুনিয়া, বীরবর অতিসত্বর ভবনাভিমুখে ধাবমান হইল। রাজাও কৌতুকাবিষ্ট হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বীরবর গৃহে উপস্থিত হইয়া আপন পত্নীকে জাগরিত করিয়া সবিশেষ সমস্ত জ্ঞাত করিলে, সে তৎক্ষণাৎ পুত্রের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া কহিল, বৎস! তোমার মস্তক দিলে রাজার দীর্ঘ আয়ু ও অচল রাজ্য হয়। তখন পুত্র কহিল, মাতঃ! প্রথমতঃ, আপনকার আজ্ঞা; দ্বিতীয়তঃ, স্বামিকার্য; তৃতীয়তঃ, ক্ষণবিনশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহ দেবসেবায় নিয়োজিত হইবেক, ইহা অপেক্ষা আমার পক্ষে প্রাণত্যাগের উত্তম সময় আর ঘটিবেক না। অতএব শুভকর্মে বিলম্ব করা কর্তব্য নহে। আপনারা সত্বর হইয়া কার্যসম্পাদন করুন।

বীরবর পুত্রের এতাদৃশ পরমাদ্ভুত বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে সহধর্মিণীকে কহিল, যদি তুমি সচ্ছন্দ মনে পুত্রপ্রদান কর, তবেই আমি দেবীর নিকটে বলিদান দিয়া রাজকার্য নিষ্পন্ন করি। স্বামিবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া বীরবরের পত্নী নিবেদন করিল, নাথ! ধর্মশাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে, স্বামী মূক, বধির, পঙ্গু, অন্ধ, কুব্জ, কুষ্ঠী যেরূপ হউন, তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে যেরূপ চরিতার্থতা লাভ হয়, শাস্ত্রবিহিত দান, ধ্যান, ব্রত, তপস্যা দ্বারা তদ্রূপ হয় না; আর যদি স্বামীর প্রতি অযত্ন ও অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিয়া পারলৌকিক সুখসম্ভোগের লোভে নিরন্তর শাস্ত্রবিহিত ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করে, সে সকল সর্বতোভাবে বিফল ও অন্তে অবধারিত অধোগতির কারণ হয়। অতএব আমার পুত্র পৌত্রের প্রয়োজন কি; তোমার চিত্তরঞ্জন ও চরণশুশ্রূষা করিলেই, উভয় লোকে নিস্তার পাইব। তাহার পুত্র কহিল, পিতঃ! যে

ব্যক্তি স্বামিকার্যসম্পাদনে সমর্থ তাহারই জন্ম সার্থক এবং সেই স্বর্গলোকে অনন্ত কাল সুখসম্ভোগ করে। অতএব আর কি জন্যে সংশয়ে কালহরণ করিতেছেন, কার্যসাধনে তৎপর হউন। বিলম্বে কার্যহানির সম্ভাবনা।

ইত্যাকার নানাপ্রকার কথোপকথনের পর, বীরবর সপরিবারে দেবীর মন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিল। রাজা এইরূপে বীরবরের, সপরিবারের প্রভুভক্তির প্রবলতা ও অচলতা দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি চমৎকৃত ও আহ্লাদিত হইলেন এবং মনে মনে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদানপূর্বক, গুপ্তভাবে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বীরবর দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইল এবং গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, আদি নানা উপাচারে যথাবিধি পূজা করিয়া, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্বক দেবীর সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, জগদীশ্বরি! তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত, আমি প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে স্বহস্তে বলিদান দিতেছি। কৃপা কর, যেন প্রভুর দীর্ঘ আয়ুঃ ও অচল রাজ্য হয়।

এই বলিয়া খড়্গ লইয়া, বীরবর অকাতরে পুত্রের মস্তকচ্ছেদন করিল। বীরবরের কন্যা এইরূপে জীবিতাধিক সহোদরের প্রাণবিনাশ দেখিয়া খড়্গপ্রহার দ্বারা প্রাণত্যাগ করিল। তাহার পত্নীও শোকে একান্ত বিকলচিত্তা হইয়া, তৎক্ষণাৎ তনয় তনয়ার অনুগামিনী হইল। তখন বীরবর বিবেচনা করিল, প্রভুকার্য সম্পন্ন করিলাম; এক্ষণে আর কি নিমিত্তে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকি; আর কি সুখেই বা জীবনধারণ করি; এই বলিয়া, সেই বিষম খড়্গ দ্বারা স্বীয় শিরচ্ছেদন করিল।

এইরূপে, অল্পক্ষণ মধ্যে চারিজনের অদ্ভুত মরণ প্রত্যক্ষ করিয়া, রাজার অন্তঃকরণে নিরতিশয় নির্বেদ উপস্থিত হইল। তখন তিনি কহিতে লাগিলেন, যে রাজ্যের নিমিত্ত এতাদৃশ প্রভুভক্ত সেবকের সর্বনাশ হইল, আর আমি সেই বিষম রাজ্যের ভোগে প্রবৃত্ত হইব না। আমি অতিশয় স্বার্থপর ও নিরতিশয় নির্বিবেক; নতুবা, কি নিমিত্তে বীরবরকে পুত্রহত্যা হইতে নিবৃত্ত করিলাম না; কি নিমিত্তেই বা তাহাকে আত্মঘাতী হইতে দিলাম, উপক্রমেই এই ঘোরতর অধ্যবসায় হইতে বীরবরকে বিরত করা, সর্বতোভাবে আমার উচিত ছিল। সর্বথা আমি অতি অসৎ কর্ম করিয়াছি। এক্ষণে আত্মহত্যারূপ প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত, চিত্তসন্তোষ জন্মিবেক না।

এই বলিয়া, খড়্গ লইয়া, রাজা আত্মশিরচ্ছেদনে উদ্যত হইবামাত্র, ভগবতী কাত্যায়নী, তৎক্ষণাৎ আবির্ভূতা হইয়া হস্তধারণপূর্বক রাজাকে মরণব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিলেন, কহিলেন বৎস! তোমার সাহস ও সদ্বিবেচনা দর্শনে, যার পর নাই, প্রীত হইয়াছি; অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন, মাতঃ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, এই চারিজনের জীবন দান কর; এক্ষণে ইহা অপেক্ষা আমার আর গুরুতর প্রার্থয়িতব্য নাই। দেবী তথাস্তু বলিয়া, অবিলম্বে পাতাল হইতে অমৃত আনয়নপূর্বক

তাহাদের গাত্রে সেচন করিবা মাত্রে, চারিজনেই তৎক্ষণাৎ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় গাত্রোত্থান করিল। রাজা যথার্থ প্রভুভক্ত বীরবরকে, অপত্য কলত্র সহিত, পুনর্জীবিত দেখিয়া, অপরিসীম হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন, এবং নিরতিশয় ভক্তিযোগ সহকারে, দেবীর চরণারবিন্দে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, গদগদ বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন। রাজার ভক্তিদর্শনে ও স্তবশ্রবণে পরম প্রীতিপ্রাপ্ত হইয়া দেবী প্রার্থনাধিক বরপ্রদান দ্বারা রাজাকে চরিতার্থ করিয়া, অন্তর্হিতা হইলেন।

পরদিন প্রভাত হইবামাত্র রাজা রূপসেন,সভাভবনে সিংহাসনে আসীন হইয়া রাত্রিবৃত্তান্ত-কীর্তন পূর্বক সর্ব সভাজন সমক্ষে, ধর্ম সাক্ষী করিয়া, অদ্ভুত প্রভুপরায়ণ বীরবরকে অর্ধরাজ্যেশ্বর করিলেন।

এইরূপে কথা সমাপ্ত করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! পূর্বাপর সমস্ত শ্রবণ করিলে; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, কাহার ঔদার্য অধিক হইল। বিক্রমাদিত্য উত্তর দিলেন, আমার বোধে রাজার ঔদার্য অধিক। বেতাল কহিল, কেন। রাজা কহিলেন, স্বামীর নিমিত্ত সর্বনাশস্বীকার ও প্রাণদান করা সেবকের কর্তব্য কর্ম। বীরবর রাজকার্যার্থে ঈদৃশ ঔদার্য প্রকাশ করিয়া আত্মধর্মপ্রতিপালন করিয়াছে। কিন্তু রাজা যে সেবকের নিমিত্ত, রাজ্যাধিকার তৃণতুল্য বোধ করিয়া, অনায়াসে প্রাণত্যাগে উদ্যত হইলেন, এতাদৃশ ঔদার্যের কার্য কস্মিন্ কালেও, কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

চতুর্থ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

ভোগবতী নগরীতে, অনঙ্গসেন নামে অতি প্রসিদ্ধ মহীপাল ছিলেন। চূড়ামণি নামে সর্বগুণাকার শুকপক্ষী সর্বকাল তাঁহার সন্নিহিত থাকিত। একদিন রাজা কথাপ্রসঙ্গে চূড়ামণিকে জিজ্ঞাসিলেন, শুক! তুমি কি কি জান। সে কহিল, মহারাজ! আমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, কালত্রয়ের বৃত্তান্ত জানি। তখন রাজা কহিলেন, যদি তুমি ত্রিকালজ্ঞ হও বল, কোন স্থানে আমার উপযুক্ত রমণী আছে। চূড়ামণি নিবেদন করিল, মহারাজ! মগধদেশের অধিপতি রাজা বীরসেনের চন্দ্রাবতী নামে এক কন্যা আছে; সে পরম সুন্দরী ও সাতিশয় গুণশালিনী, তাহার সহিত মহারাজের বিবাহ হইবেক।

রাজা অনঙ্গসেন শুকের সর্বজ্ঞতাপরীক্ষার্থে, চন্দ্রকান্ত নামক সুপ্রসিদ্ধ দৈবজ্ঞকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, মহাশয়! আপনি গণনা দ্বারা নির্ধারিত করিয়া বলুন, কোন কামিনীর সহিত আমার বিবাহ হইবেক। তিনি জ্যোতির্বিদ্যাপ্রভাবে অবগত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! চন্দ্রাবতী নামে এক অতি রূপবতী রমণী আছে; গণনা দ্বারা দৃষ্ট

হইতেছে, তাহার সহিত আপনকার পরিণয় হইবেক। রাজা শুনিয়া শুকের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন; পরে এক সদ্বক্তা, চতুর, বুদ্ধিমান, কার্যদক্ষ ব্রাহ্মণকে আনাইয়া নানা উপদেশ দিয়া, সম্বন্ধস্থিরীকরণার্থে মগধেশ্বরের নিকট পাঠাইলেন।

চন্দ্রাবতীর নিকটেও মদনমঞ্জরী নামে এক শারিকা থাকিত। তাহারও সর্বজ্ঞতাখ্যাতি ছিল। তিনি এক দিবস তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, শারিকে! যদি তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সমুদায় বলিতে পার, আমার যোগ্য পতি কোথায় আছেন, বল। শারিকা কহিল, রাজনন্দিনি! আমি দেখিতেছি, ভোগবতী নগরীর অধিপতি রাজা অনঙ্গসেন তোমার পতি হইবেন। ফলতঃ, অনঙ্গসেন ও চন্দ্রাবতী উভয়েরই, এইরূপে শ্রবণদ্বারা অন্তরে অনুরাগসঞ্চার হইল, এবং সমাগমের অভাব নিবন্ধন উভয়েরই ক্রমে ক্রমে পূর্বরাগ সংক্রান্ত স্মরদশার আবির্ভাব হইতে লাগিল।

কিয়ৎদিন পরে অনঙ্গসেনের প্রেরিত ব্রাহ্মণ, মগধেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় রাজার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং বাগ্দানের দ্রব্য-সামগ্রী সমভিব্যাহারে দিয়া, এক ব্রাহ্মণকে ঐ ব্রাহ্মণের সহিত পাঠাইলেন, কহিয়া দিলেন, তুমি তথা হইতে প্রত্যাগমন না করিলে, আমি কোনও উদ্যোগ করিতে পারিব না। বাগ্দানের দ্রব্যসামগ্রী লইয়া, ব্রাহ্মণেরা অনঙ্গসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া সবিশেষ সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলে, তিনি আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন, এবং সুবিজ্ঞ দৈবজ্ঞ দ্বারা বিবাহের দিন নির্ধারিত করিয়া মগধেশ্বরের প্রেরিত ব্রাহ্মণ দ্বারা, তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। অনন্তর নির্ধারিত দিবসে যথাসময়ে মগধেশ্বরের আলয়ে উপস্থিত হইয়া, অনঙ্গসেন চন্দ্রাবতীর পাণিগ্রহণ পূর্বক নিজ রাজধানী প্রত্যাগমন করিয়া, পরম সুখে কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রাবতী শ্বশুরালয়ে আগমনকালে, মদনমঞ্জরী শারিকারে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে সর্বদা আপন সমীপে রাখিতেন। রাজাও ক্ষণকালের নিমিত্ত চূড়ামণিকে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত করিতেন না। এক দিবস, রাজা ও রাজমহিষী অন্তঃপুরে একাসনে উপবিষ্ট আছেন; এবং পিঞ্জরস্থ শুক শারিকাও তাঁহাদের সম্মুখে আছে, সেই সময়ে রাজা রাজ্ঞীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেখ, একাকী থাকিলে অতি কষ্টে কালযাপন হয়; অতএব আমার অভিলাষ, শুকের সহিত তোমার শারিকার বিবাহ দিয়া, উভয়কে এক পিঞ্জরে রাখি, তাহা হইলে উহারা আনন্দে কালহরণ করিতে পারিবেক। রাজ্ঞী, ঈষৎ হাসিয়া অনুমোদন প্রদর্শন করিলে রাজা শুকের সহিত শারিকার বিবাহ দিয়া উভয়কে এক পিঞ্জরে রাখিয়া দিলেন।

একদিন, রাজা নির্জনে, রাজমহিষীর সহিত, রসপ্রসঙ্গে কালযাপন করিতেছেন, সেই সময়ে শুক শারিকাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিতে লাগিল, দেখ, এই অসার সংসারে

ভোগ অতি সার পদার্থ। যে ব্যক্তি, এই জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া, ভোগসুখে পরাঙ্মুখ থাকে তাহার বৃথা জন্ম। অতএব, কি নিমিত্ত, তুমি ভোগ বিষয়ে নিরুৎসাহিনী হইতেছ। শারিকা কহিল, পুরুষজাতি অতিশয় শঠ, অধর্মী, স্বার্থপর ও স্ত্রীহত্যাকারী; এজন্য, পুরুষ সহবাসে আমার রুচি হয় না। শুক কহিল, নারীও অতিশয় চপলা, কুটিলা, মিথ্যাবাদিনী ও পুরুষঘাতিনী। উভয়ের এইরূপ বিবাদারম্ভ দেখিয়া, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শুক! হে শারিকে! কেন তোমরা অকারণে কলহ করিতেছ। তখন শারিকা কহিল, মহারাজ! পুরুষ বড় অধর্মী, এই নিমিত্তে পুরুষজাতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ নাই। আমি পুরুষের ব্যবহার ও চরিত্র বিষয়ে এক উপাখ্যান কহিতেছি, শ্রবণ করুন।

ইলাপুরে, মহাধন নামে, অতি ঐশ্বর্যশালী এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন। বহুকাল অতীত হইয়া গেল, তথাপি তাঁহার পুত্র হইল না, এজন্য, তিনি সর্বদাই মনোদুঃখে কালহরণ করেন। কিয়ৎ দিন পরে, জগদীশ্বরের কৃপায়, তাঁহার সহধর্মিণী এক কুমার প্রসব করিলেন। শ্রেষ্ঠী, অধিক বয়সে পুত্রমুখনিরীক্ষণ করিয়া, আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন, এবং পুত্রের নাম নয়নানন্দ রাখিয়া, পরম যত্নে তাহার লালন-পালন করিতে লগিলেন। বালক পঞ্চবর্ষীয় হইলে, তিনি তাহাকে, বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত, উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সে, স্বভাবদোষবশতঃ কেবল দুঃশীল, দুশ্চরিত্র বালকগণের সহিত কুৎসিত ক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া, সতত কালযাপন করে, ক্ষণমাত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করে না। ক্রমে ক্রমে যত বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তদীয় কুপ্রবৃত্তি সকল, উত্তরোত্তর ততই উত্তেজিত হইতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে, শ্রেষ্ঠী পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। নয়নানন্দ সমস্ত পৈতৃক ধনের অধিকারী হইয়া দ্যূতক্রীড়া, সুরাপান প্রভৃতি ব্যসনে আসক্ত হইল, এবং কতিপয় বৎসরের মধ্যে দুষ্ক্রিয়া দ্বারা সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করিয়া, অত্যন্ত দুর্দশায় পড়িল। পরে সে, ইলাপুর পরিত্যাগপূর্বক নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে চন্দ্রপুরনিবাসী হেমগুপ্ত শেঠের নিকট উপস্থিত হইয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিল। হেমগুপ্ত তাহার পিতার পরম বন্ধু ছিলেন; উহাকে দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং যথোচিত সমাদর ও সাতিশয় প্রীতিদর্শনপূর্বক, জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তুমি কি সংযোগে অকস্মাৎ এস্থলে উপস্থিত হইলে।

নয়নানন্দ কহিল, আমি কতিপয় অর্ণবপোত লইয়া সিংহল দ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইতেছিলাম। দৈবের প্রতিকূলতা প্রযুক্ত, অকস্মাৎ প্রবল বাত্যা উত্থিত হওয়াতে সমস্ত অর্ণবপোত জলমগ্ন হইল। আমি ভাগ্যবলে এক ফলকমাত্র অবলম্বন করিয়া বহু কষ্টে প্রাণরক্ষা করিয়াছি। এ পর্যন্ত আসিয়া আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিব, এমন

আশা ছিল না। আমার সমভিব্যাহারের লোক সকল কে কোন দিকে গেল, বাঁচিয়াছে, কি মরিয়াছে, কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। দ্রব্যসামগ্রী সমগ্র জলমগ্ন হইয়াছে। এ অবস্থায় দেশে প্রবেশ করিতে অতিশয় লজ্জা হইতেছে। কি করি, কোথায় যাই, কোনও উপায় ভাবিয়া পাইতেছি না। অবশেষে, আপনকার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।

এই সমস্ত শ্রবণগোচর করিয়া হেমগুপ্ত মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আমি অনেক দিন অবধি, রত্নাবতীর নিমিত্ত নানা স্থানে পাত্রের অন্বেষণ করিতেছি ; কোথাও মনে নীত হইতেছে না ; বুঝি, ভগবান কৃপা করিয়া গৃহে উপস্থিত করিয়া দিলেন। এ অতি সদ্বংশজাত, পৈতৃক অতুল অর্থসম্পত্তির ন্যায়, পৈতৃক অতুল গুণসম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী হইয়াছে সন্দেহ নাই। অতএব, ত্বরায় দিনস্থির করিয়া ইহার সহিত রত্নাবতীর বিবাহ দি। মনে মনে এইপ্রকার কল্পনা করিয়া, তিনি শ্রেষ্ঠিনীর নিকটে গিয়া কহিলেন, দেখ, এক শ্রেষ্ঠীর পুত্র উপস্থিত হইয়াছে ; সে সৎকুলোদ্ভব। তাহার পিতার সহিত আমার অতিশয় আত্মীয়তা ছিল। যদি তোমার মত হয়, তাহার সহিত রত্নাবতীর বিবাহ দি।

শ্রেষ্ঠিনী শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, ভগবানের ইচ্ছা না হইলে এরূপ ঘটে না। বিনা চেষ্টায় মনস্কাম সিদ্ধ হওয়া ভাগ্যের কথা। অতএব, বিলম্বের প্রয়োজন নাই ; দিন স্থির করিয়া, ত্বরায় শুভকর্ম সম্পন্ন কর। শ্রেষ্ঠী স্বীয় সহধর্মিণীর অভিপ্রায় বুঝিয়া, মহাধন-নন্দনের নিকটে গিয়া আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। তখন তিনি শুভ দিন ও শুভ লগ্ন নির্ধারিত করিয়া, মহাসমারোহে কন্যার বিবাহ দিলেন। বর ও কন্যা, পরম কৌতুকে কালযাপন করিতে লাগিল।

কিয়ংদিন পরে, নয়নানন্দ মনোমধ্যে কোনও অসৎ অভিসন্ধি করিয়া, আপন পত্নীকে বলিল, দেখ, অনেকদিন হইল, আমি স্বদেশে যাই নাই, এবং বন্ধুবর্গেরও কোন সংবাদ পাই নাই ; তাহাতে অন্তঃকরণে কি পর্যন্ত উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে, বলিতে পারি না। অতএব, তোমার পিতা মাতার মত করিয়া আমায় বিদায় দাও ; যদি ইচ্ছা হয়, তুমিও সমভিব্যাহারে চল। পতিব্রতা রত্নাবতী, জননীর নিকটে গিয়া স্বামীর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল।

শ্রেষ্ঠিনী স্বামীর সন্নিধানে গিয়া কহিলেন, তোমার জামাতা গৃহে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন। শ্রেষ্ঠী শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, সেজন্যে ভাবনা কি ; বিদায় করিয়া দিতেছি। তুমি কি জান না, জন, জামাই, ভাগিনেয়, এ তিন, কোনও কালে, আপন হয় না ও তাহাদের উপর বল প্রকাশ চলে না। জামাতা যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন, তাহাই সর্বাংশে কর্তব্য। তাঁহাকে বল ভাল দিন দেখিয়া, বিদায় করিয়া দিতেছি।

অনন্তর, শ্রেষ্ঠী আপন তনয়াকে হাস্যমুখে জিজ্ঞাসিলেন, বৎসে! তোমার অভিপ্রায় কি, শ্বশুরালয়ে যাইবে, না পিত্রালয়ে থাকিবে।

রত্নাবতী, কিয়ৎক্ষণ, লজ্জায় নম্রমুখী ও নিরুত্তরা হইয়া রহিল; অনন্তর, কার্যান্তর ব্যপদেশে, তথা হইতে অপসৃত হইয়া স্বামীর নিকটে গিয়া কহিল, দেখ, পিতা মাতা সম্মত হইয়াছেন, কহিলেন, তুমি যাহাতে সন্তুষ্ট হও, তাহাই করিবেন। অতএব, তোমায় এই অনুরোধ করিতেছি, কোনও কারণে আমায় ছাড়িয়া যাইও না; আমি, তোমার অদর্শনে, প্রাণধারণ করিতে পারিব না।

পরিশেষে, শ্রেষ্ঠী জামাতাকে অনেকবিধ দ্রব্যসামগ্রী ও প্রচুর অর্থ দিয়া, মহাসমাদর-পূর্বক, বিদায় করিলেন এবং কন্যাকেও, মহামূল্য অলঙ্কার সমূহে ভূষিতা করিয়া, তাহার সমভিব্যাহারিণী করিয়া দিলেন। নয়নানন্দ নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের চরণবন্দনাপূর্বক, পত্নীর সহিত প্রস্থান করিল।

নয়নানন্দ, এক নিবিড় জঙ্গলে উপস্থিত হইয়া শ্রেষ্ঠীকন্যাকে কহিল, দেখ, এই অরণ্যে অতিশয় দস্যুভয় আছে, শিবিকায় আরোহণ ও অঙ্গে অলঙ্কার ধারণ করিয়া যাওয়া উচিত নহে; অলঙ্কারগুলি খুলিয়া আমার হস্তে দাও, আমি বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখি, নগর নিকটবর্তী হইলে পুনরায় পরিবে। আর বাহকেরাও, শিবিকা লইয়া, এই স্থান হইতে ফিরিয়া যাউক, কেবল আমরা দুইজনে দরিদ্রবেশে গমন করি; তাহা হইলে নিরুপদ্রবে যাইতে পারিব।

রত্নাবতী তৎক্ষণাৎ অঙ্গ হইতে উন্মোচিত করিয়া, সমস্ত আভরণ স্বামিহস্তে ন্যস্ত করিল, এবং দাসদাসী ও বাহকদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া, একাকিনী সেই শঠের সমভিব্যাহারিণী হইয়া চলিল। নয়নানন্দ, এইরূপে মহামূল্য অলঙ্কারসমূহ হস্তগত করিয়া ক্রমে ক্রমে অরণ্যের অতি নিবিড প্রদেশে প্রবেশ করিল এবং তাদৃশ পতিপরায়ণা হিতৈষিণী প্রণয়িনীকে অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত করিয়া পলায়নপূর্বক স্বদেশে উপস্থিত হইল। রত্নাবতী কূপে পতিত হইয়া, হা তাত! হা মাতঃ! বলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। দৈবযোগে, এক পথিক, তথায় উপস্থিত হইয়া তাদৃশ নিবিড় অরণ্যমধ্যে অসম্ভাবিত রোদনশব্দ শ্রবণ করিয়া, অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল, এবং শব্দ অনুসারে গমন করিয়া, কূপের সমীপবর্তী হইয়া তন্মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক, অবলোকন করিল, এক পরম সুন্দরী নারী, উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও পরিবেদন করিতেছে। পথিক দর্শনমাত্র, অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া পরমযত্নে সেই স্ত্রীরত্নকে কূপ হইতে উদ্ধৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে, কি নিমিত্তে একাকিনী এই ভয়ঙ্কর কাননে আসিয়াছিলে, কি প্রকারেই বা তোমার এতাদৃশী দুর্দশা ঘটিল বল।

রত্নাবতী, পতিনিন্দা অতি গর্হিত বুঝিয়া, প্রকৃত ব্যাপার গোপন রাখিয়া কহিল,

আমি চন্দ্রপুরনিবসী হেমগুপ্ত শেঠের কন্যা; আমার নাম রত্নাবতী; আপন পতির সহিত শ্বশুরালয়ে যাইতেছিলাম; এইস্থানে উপস্থিত হইবামাত্র, সহসা কতিপয় দুর্দান্ত দস্যু আসিয়া, প্রথমতঃ, অঙ্গ হইতে সমস্ত অলঙ্কার লইয়া, আমায় এই কূপে ফেলিয়া দিল, এবং আমার পতিকে নিতান্ত নির্দয়রূপে প্রহার করিতে করিতে লইয়া গেল। তাঁহার কি দশা ঘটিয়াছে, কিছুই জানি না। পান্থ শুনিয়া অতিশয় আক্ষেপ করিতে লাগিল এবং অশেষবিধ আশ্বাসদান ও অভয়প্রদানপূর্বক, অতি যত্নে রত্নাবতীকে সঙ্গে লইয়া তাহার পিত্রালয়ে পঁহুছাইয়া দিল।

রত্নাবতী পিতা মাতার নিরতিশয় স্নেহপাত্র ছিল। তাঁহারা তাহার তাদৃশ অসম্ভাবিত দুরবস্থা দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন ও একান্ত শোকাক্রান্ত হইয়া গলদশ্রু লোচনে, আকুল বচনে জিজ্ঞাসিলেন, বৎসে! কিরূপে তোমাব এরূপ দুর্দশা ঘটিল, বল। সে কহিল, এক অরণ্যে অকস্মাৎ চারিদিক হইতে অস্ত্রধারী পুরুষেরা আসিযা বলপূর্বক আমার অঙ্গ হইতে সমুদায় অলঙ্কার খুলিয়া লইল, এবং তাঁহাকে যত সম্পত্তি দিযা বিদায় করিয়াছিলে, সে সমুদায়ও কাড়িয়া লইল; অনন্তর, আমাকে এক অন্ধকূপে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে, নিতান্ত নিষ্ঠুর রূপে, যষ্টিপ্রহার করিতে করিতে, কহিতে লাগিল আর কোথায় কি লুকাইয়া রাখিয়াছিস, বাহির করিয়া দে। তখন তিনি নিতান্ত কাতর স্বরে অনেক বিনয় করিযা বলিলেন, আমাদের নিকটে যাহা ছিল, সমস্ত তোমাদের হস্তগত হইয়াছে; আর কিছুমাত্র নাই। তোমাদের প্রহারে প্রাণ কণ্ঠাগত হইতেছে; চরণে ধরিতেছি ও কৃতাঞ্জলি হইয়া ভিক্ষা করিতেছি, আমায় ছাড়িয়া দাও। তিনি বারংবার এইপ্রকার কাতরোক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন; নির্দয় দস্যুরা তথাপি তাঁহাকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া লইয়া গেল; তৎপরে ছাড়িয়া দিল, কি মারিয়া ফেলিল, কিছুই জানিতে পারি নাই। তখন তাহার পিতা কহিলেন, বৎসে! তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না। আমার অন্তঃকরণে লইতেছে, তোমার পতি জীবিত আছেন। চোরেরা অর্থপিশাচ, অর্থ হস্তগত হইলে আর অকারণে প্রাণ নষ্ট করে না। এইরূপে অশেষবিধ আশ্বাস ও প্রবোধ দিয়া তাহার পিতা, অবিলম্বে আর এক প্রস্থ অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিলেন।

এদিকে, নয়নানন্দ, আপন আলয়ে উপস্থিত হইয়া অলঙ্কার বিক্রয় দ্বারা অর্থসংগ্রহ করিয়া, দিবারাত্র দ্যূতক্রীড়া, সুরাপান প্রভৃতি দ্বারা কালক্ষেপ করিতে লাগিল এবং কিয়ৎ দিনের মধ্যেই পুনরায নিঃস্বভাবাপন্ন ও অন্নবস্ত্রবিহীন হইয়া, মনে মনে বিবেচনা করিল, আমি যে কু-ব্যবহার করিয়াছি তাহা শ্বশুরালয়ে কোনও প্রকারেই প্রকাশ পায় নাই। অতএব একটা ছল করিয়া তথায় উপস্থিত হই; পরে, দুই চারিদিন অবস্থিতি করিয়া সুযোগক্রমে কিছু হস্তগত করিয়া পলাইযা আসিব। মনে মনে এই

দুষ্ট অভিসন্ধি করিয়া, সে শ্বশুরালয়ে গমন করিল এবং বাটীতে প্রবেশ করিবামাত্র সর্বাগ্রে স্বীয় পত্নী রত্নাবতীর দৃষ্টিপথে পতিত হইল।

পতিপ্রাণা রত্নাবতী, পতিকে সমাগত দেখিয়া, অন্তঃকরণে চিন্তা করিল, পতি, অতি দুরাচার হইলেও, নারীর পরম গুরু। তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলেই, নারী ইহলোকে ও পরলোকে চরিতার্থতা প্রাপ্ত হয়। আর যে নারী, কুমতিপরতন্ত্র হইয়া, পরম গুরু স্বামীর কদাচিৎ কুব্যবহার অপরাধ গণ্য করিয়া তাঁহার প্রতি কোন প্রকারে অশ্রদ্ধা ও অনাদর প্রদর্শন করে, সে আপন ঐহিক ও পারলৌকিক সকল সুখে জলাঞ্জলি দেয়। আর, উনি কেবল ভ্রান্তি ক্রমেই, সেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। অতএব আমি সেই সামান্য দোষ ধরিয়া উঁহার অপরাধিনী হইব না। যাহা হউক, উনি সবিশেষ না জানিয়াই এখানে আসিয়াছেন; আমায় দেখিতে পাইলেই, নিঃসন্দেহে, পলায়ন করিবেন। অতএব অগ্রে উঁহার ভয়ভঞ্জন করিয়া দেওয়া উচিত।

রত্নাবতী, অন্তঃকরণে এই সকল আলোচনা করিয়া, ত্বরায় তাহার সম্মুখবর্তিনী হইয়া কহিল, নাথ! তুমি অন্তঃকরণে কোনও আশঙ্কা করিও না। আমি পিতা মাতার নিকট কহিয়াছি, চোরেরা অলঙ্কার গ্রহণপূর্বক, আমায় কূপে নিক্ষিপ্ত করিয়া, তোমায় বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে। অতএব, সে সকল কথা মনে করিয়া ভীত হইবার আবশ্যকতা নাই। আমার পিতা মাতা তোমার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎকুণ্ঠিত আছেন; তোমায় দেখিলে যার পর নাই আহ্লাদিত হইবেন। আর তোমার স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন নাই; এই স্থানেই অবস্থিতি কর; আমি যাবজ্জীবন তোমার চরণসেবা করিব। এইরূপে তাহার ভয়ভঞ্জন করিয়া, পরিশেষে রত্নাবতী কহিল, আমি পিতা মাতার নিকট যেরূপ বলিয়াছি, তোমায় জিজ্ঞাসা করিলে, তুমিও সেইরূপ বলিবে।

এইরূপ উপদেশ দিয়া, রত্নাবতী প্রস্থান করিলে পর, সেই ধূর্ত তৎক্ষণাৎ শ্বশুরের নিকটে গিয়া প্রণাম করিল। শ্রেষ্ঠী, আলিঙ্গনপূর্বক আশীর্বাদ করিয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদ্‌গদ বচনে, জামাতাকে সবিশেষ সমস্ত জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। নয়নানন্দ, স্বীয় সহধর্মিণীর উপদেশানুরূপ সমস্ত বর্ণনা করিয়া পরিশেষে কহিল, মহাশয়! যেরূপ বিপদে পড়িয়াছিলাম, তাহাতে প্রাণরক্ষার কোনও সম্ভাবনা ছিল না; কেবল জগদীশ্বরের কৃপায় ও আপনাদের চরণারবিন্দের অকৃত্রিম স্নেহসম্বলিত আশীর্বাদের প্রভাবে এ যাত্রা কথঞ্চিৎ পরিত্রাণ পাইয়াছি। যন্ত্রণার পরিসীমা ছিল না। অধিক আর কি বলিব, শত্রুও যেন কখনও এরূপ বিপদে না পড়ে। ইহা কহিয়া যেন যথার্থই পূর্ব অবস্থার স্মরণ হইল, এরূপ ভান করিয়া, সে রোদন করিতে লাগিল। সবিশেষ সমস্ত শুনিয়া ও তাহার ভাব দেখিয়া হেমগুপ্তের অন্তঃকরণে অতিশয় অনুকম্পা জন্মিল।

রজনী উপস্থিত হইল। পতিপ্রাণা রত্নাবতী, স্বামীসমাগম সৌভাগ্যমদে মত্তা হইয়া,

তদীয় পূর্বতন নৃশংস আচরণ বিস্মরণপূর্বক, তৎসহবাসসুখসম্ভোগের অভিলাষে মনের উল্লাসে, সর্বাঙ্গে সর্বপ্রকার অলঙ্কার পরিধান করিয়া শয়নাগারে প্রবেশ করিল। নয়নানন্দ, কিয়ৎক্ষণ কৃত্রিম কৌতুকের পর নিদ্রাবেশ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন রত্নাবতী কহিল, আজ তুমি পথশ্রান্ত আছ, আর অধিকক্ষণ জাগরণক্লেশ সহ্য করিবার প্রয়োজন নাই। শয়ন কর, আমি চরণসেবা করি। সে কহিল, তুমিও শয়ন কর, চরণসেবা করিতে হইবেক না।

অনন্তর উভয়ে শয়ন করিলে, ধূর্তশিরোমণি নয়নানন্দ, অবিলম্বে কপট নিদ্রার আশ্রয়গ্রহণ-পূর্বক, নাসিকাধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। রত্নাবতীও পতিকে নিদ্রাগত দেখিয়া, অনতিবিলম্বে নিদ্রায় অচেতন হইল। তখন সেই অদ্ভুত দুরাত্মা অবসর বুঝিয়া, গাত্রোত্থান-পূর্বক আপন কটিদেশ হইতে তীক্ষ্ণধার ছুরি বহিষ্কৃত কবিল এবং নিরুপম স্ত্রীরত্ন রত্নাবতীর কণ্ঠনালীচ্ছেদনপূর্বক সমস্ত আভরণ লইয়া পলায়ন করিল।

ইহা কহিয়া, শারিকা বলিল, মহারাজ! যাহা বর্ণিত হইল সমস্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তদবধি, আমার পুরুষজাতির উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, পুরুষের সহিত বাক্যালাপ করিব না এবং সাধ্যানুসারে পুরুষের সংসর্গপরিত্যাগে যত্নবতী থাকিব। পুরুষেরা অতি ধূর্ত, অতি নৃশংস, অতি স্বার্থপর। মহারাজ! অধিক আর কি বলিব, পুরুষ সহবাস সসর্পগৃহে বাস অপেক্ষাও ভয়ানক। এই সমস্ত কারণে, আর আমার পুরুষের মুখাবলোকন করিতে ইচ্ছা নাই।

রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া, শুককে কহিলেন, অহে চূড়ামণি! তুমি স্ত্রী-জাতির উপর কি নিমিত্তে এত বিরক্ত, তাহার সবিশেষ বর্ণনা কর।

তখন শুক কহিল, মহারাজ! শ্রবণ করুণ,

কাঞ্চনপুব নগরে সাগরদত্ত নামে এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁহার শ্রীদত্ত নামে স্বরূপ, সুশীল, শান্তস্বভাব এক পুত্র ছিল। অনঙ্গপুরনিবাসী সোমদত্ত শ্রেষ্ঠীর কন্যা জয়শ্রীর সহিত তাহার বিবাহ হয়। কিয়ৎদিন পরে, শ্রীদত্ত বাণিজ্যার্থে দেশান্তরে প্রস্থান করিল ; জয়শ্রী আপন পিত্রালয়ে বাস করিতে লাগিল। দীর্ঘকাল অতীত হইল, তথাপি শ্রীদত্ত প্রত্যাগমন করিল না।

একদিন, জয়শ্রী আপন প্রিয়বয়স্যার নিকট কহিল, দেখ সখি! আমার যৌবন বৃথা হইল। আজ পর্যন্ত সংসারের সুখ কিছুমাত্র জানিতে পারিলাম না। বলিতে কি, এরূপে একাকিনী কালহরণ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে! তুমি কোনও উপায় স্থির কর। তখন সখী কহিল, প্রিয় সখি! ধৈর্য ধর, ভগবানের ইচ্ছা হয় ত, অবিলম্বে তোমার প্রিয় সমাগম হইবেক। জয়শ্রী, ইচ্ছানুরূপ উত্তর না পাইয়া, অসন্তোষ প্রকাশ করিল এবং তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপসৃতা হইয়া, গবাক্ষদ্বার দিয়া রাজপথ নিরীক্ষণ করিতে

লাগল। দৈবযোগে ঐ সময়ে এক পরম সুন্দর যুবা পুরুষ, অতি মনোহর বেশে ঐ পথে গমন করিতেছিল। ঘটনাক্রমে তাহার ও জয়শ্রীর চারি চক্ষুঃ একত্রে হওয়াতে উভয়েই উভয়ের মন হরণ করিল। জয়শ্রী তৎক্ষণাৎ, আপন সখীকে কহিল, দেখ, যে রূপে পার, ঐ হৃদয়চোর ব্যক্তির সহিত সংঘটন করিয়া দাও। জয়শ্রীর সখী তাহার নিকটে গিয়া, কথাচ্ছলে তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিল, সোমদত্তের কন্যা জয়শ্রী তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান; সন্ধ্যার পর, তুমি আমার আলযে আসিবে। এই বলিয়া সে তাহাকে আপন আলয় দেখাইয়া দিল। তখন সে কহিল, তোমার সখীকে বলিবে, আমি অতিশয় অনুগৃহীত হইলাম; সায়ংকালে তোমার আবাসে আসিযা নিঃসন্দেহ তাঁহাব সহিত সাক্ষাৎ করিব।

তদনন্তর সখী, জয়শ্রীব নিকটে গিযা সবিশেষ সমুদায় তাহার গোচব কবিলে, সে অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইল এবং তাহাকে পারিতোষিক দিযা অশেষ প্রকার প্রশংসা করিযা কহিল, যদি তুমি তাহার সহিত মিলন করিযা দিতে পার, আমায় চিরকালেব মত কিনিয়া রাখিবে, আমি কোনও কালে তোমার এ ধার শুধিতে পাবিব না। এক্ষণে তুমি আপন আলয়ে গিযা অবস্থিতি কর, সে আসিবামাত্র আমায সংবাদ দিবে। এই বলিযা সখীকে বিদায কবিযা জয়শ্রী উল্লাসিত মনে, ইচ্ছানুরূপ বেশভূষা করিতে বসিল।

শুভ সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে সেই যুবা রতিপতিব আদেশানুরূপ বেশপরিগ্রহ কবিয়া, সখীর আলয়ে উপস্থিত হইল। সে, পরম সমাদরে বসিতে আসন দিয়া, জযশ্রীর নিকটে গিয়া প্রিয়তমের উপস্থিতি সংবাদ দিল। জয়শ্রী শুনিয়া, আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া কহিল, সখি! কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা কর; গৃহজন নিদ্রিত হইলেই তোমার সঙ্গে গিয়া প্রাণনাথেব হস্তে আত্মসমর্পণ কবিয়া, জন্ম সার্থক করিব। অনন্তর, পরিবারস্থ সমস্ত লোক নিদ্রাগত হইলে জয়শ্রী, সখির সহিত তদীয় আবাসে উপস্থিত হইয়া, অননুভূতপূর্ব চিরাকাঙ্ক্ষিত মদনরসের আস্বাদন দ্বাবা, যৌবনের চরিতার্থতা সম্পাদন করিয়া নিশাবসান সময়ে, স্বীয় আবাসে প্রতিগমন করিল। সে, এইরূপে প্রত্যহ, প্রিয়সমাগমসুখে কালযাপন কবিতে লাগিল।

কিয়ৎদিন পরে, তাহার স্বামী বিদেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল। জয়শ্রী, শ্রীদত্তের সমাগমনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, এ আপদ আবাব এত দিনের পর, কোথা হইতে উপস্থিত হইল। এখন কি করি, প্রাণনাথের নিকটে যাইবার ব্যাঘাত জন্মিল। কতদিন থাকিবেক, কত জ্বালাইবেক, তাহাও জানি না। এই চিন্তায় মগ্ন ও স্নান, ভোজন প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে বিমুখ হইয়া, বিষণ্ণ মনে সখীর সহিত নানাপ্রকার মন্ত্রণা করিতে লাগিল।

রজনী উপস্থিত হইল। জয়শ্রীর মাতা, জামাতাকে পরম সমাদর ও যত্নপূর্বক ভোজন

করাইয়া, দাসী দ্বারা, শয়নাগারে গিয়া বিশ্রাম করিতে বলিলেন এবং আপন কন্যাকেও পতিশুশ্রূষার্থে গমন করিতে আদেশ দিলেন। জয়শ্রী প্রথমতঃ অসম্মত হওয়াতে, তাহার মাতা নানাবিধ প্রবোধবাক্য ও ভর্ৎসনা দ্বারা তাহাকে নিরুত্তরা করিয়া বলপূর্বক গৃহপ্রবেশ করাইলেন। তখন সে বিবশা হইয়া শয়নাগারে প্রবেশপূর্বক পল্যঙ্কে আরোহণ করিয়া, বিবৃত্ত মুখে শয়ন করিয়া রহিল। শ্রীদত্ত, স্নিগ্ধ সম্ভাষণ করিয়া প্রণয়িনীর প্রতি নানাপ্রকার প্রীতিবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। সে তাহাতে সাতিশয় বিরক্তি প্রকাশ করিয়া মৌন অবলম্বন করিয়া রহিল। শ্রীদত্ত তাহার সন্তোষ জন্মাইবার নিমিত্ত, নিজানীত নানাবিধ বহুমূল্য অলঙ্কার ও পট্টশাটী প্রভৃতি কামিনীজনকমনীয় দ্রব্য প্রদান করিলে, জয়শ্রী সাতিশয় কোপপ্রদর্শনপূর্বক তদ্দত্ত সমস্ত বস্তু দূরে নিক্ষিপ্ত করিল। তখন শ্রীদত্ত নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, ক্ষান্ত রহিল এবং একান্ত পথশ্রান্ত ছিল, তৎক্ষণাৎ নিদ্রাগত হইল।

জয়শ্রী পতিকে নিদ্রায় অচেতন দেখিয়া মনে মনে আহ্লাদিতা হইল, এবং পতিদত্ত বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করিয়া, ঘোরতর অন্ধকারাবৃত রজনীতে একাকিনী নির্ভয়ে প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে চলিল। সেই সময়ে এক তস্কর ঐ দণ্ডায়মান ছিল। সে সর্বালঙ্কারভূষিতা কামিনীকে, অর্ধরাত্র সময়ে, একাকিনী গমন করিতে দেখিয়া, বিবেচনা করিতে লাগিল, এই যুবতী, অসহায়িনী হইয়া, নিশীথ সময়ে নির্ভয়ে কোথায় যাইতেছে। যাহা হউক, সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইল। এই বলিয়া, সে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

এদিকে জয়শ্রীর প্রিয় সখা, সখীর আলয়ে একাকী শয়ন করিয়া, তাহার আগমন-প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করিতেছিল। অকস্মাৎ এক কালসর্প আসিয়া, দংশিয়া তাহার প্রাণসংহার করিয়া গেল। সে মৃত পতিত রহিল। জয়শ্রী, তথায় উপস্থিত হইয়া, মৃত প্রিয়তমকে কপটনিদ্রিত বোধ করিয়া, বারংবার আহ্বান করিতে লাগিল; কিন্তু উত্তর না পাইয়া মনে মনে বিবেচনা করিল, আমার আসিতে বিলম্ব হওয়াতে, ইনি অভিমানে উত্তর দিতেছেন না; অনন্তর, তাহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া বিনয় ও প্রিয় সম্ভাষণপূর্বক, বিলম্বের হেতুনির্দেশ ও ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিল। চোর কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া সহাস্য আস্যে, এই রহস্য দেখিতে লাগিল।

নিকটস্থ বটবৃক্ষবাসী এক পিশাচও এই কৌতুক দেখিতেছিল। সে সাতিশয় কুপিত হইয়া স্থির কবিল, ঈদৃশী দুশ্চারিণীকে সমুচিত দণ্ড দেওয়া আবশ্যক; অনন্তর সে, তদীয় প্রিয়তমের মৃত কলেবরে আবির্ভূত হইয়া দন্ত দ্বারা জয়শ্রীর নাসিকাচ্ছেদন পূর্বক, আপন আবাসবৃক্ষে প্রতিগমন করিল। চোর এই সমস্ত নয়নগোচর কবিয়া নিরতিশয় চমৎকৃত হইল।

জয়শ্রীর জ্ঞানোদয় হইল। তখন, সে, প্রিয়তমকে মৃত স্থির করিয়া, সখীর নিকটে গিয়া পূর্বাপর সমস্ত ব্যাপার তাহার গোচর করিয়া কহিল, সখি! আমি এই বিষম বিপদে পড়িয়াছি; কি উপায় করি, বল। গৃহে গিয়া কেমন করিয়া, পিতামাতার নিকট মুখ দেখাইব। তাঁহারা কারণ জিজ্ঞাসিলে, কি উত্তর দিব। বিশেষতঃ আজ আবার সেই সর্বনাশিয়া আসিয়াছে; সেই বা, দেখিয়া শুনিয়া কি মনে করিবেক। সখি! তুমি আমায় বিষ আনিয়া দাও, খাইয়া প্রাণত্যাগ করি; তাহা হইলেই সকল আপদ ঘুচিয়া যায়। এই বলিয়া জয়শ্রী শিরে করাঘাত করিতে লাগিল। সখী শুনিয়া হতবুদ্ধি ও নিরুত্তরা হইয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে জয়শ্রী, উৎপন্নমতিত্ববলে, এক উপায় স্থির করিয়া কহিল, সখি! আব চিন্তা নাই, উত্তম উপায় স্থির করিযাছি; শুন দেখি, সঙ্গত হয় কিনা। আমি এই অবস্থায় গৃহে গিয়া শয়নমন্দিরে প্রবেশপূর্বক, চীৎকার করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করি। গৃহজন রোদন শব্দে জাগরিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসার্থে উপস্থিত হইলে, বলিব, আমার স্বামী অকারণে, ক্রোধে অন্ধ হইয়া নিতান্ত নির্দয়রূপে বাবংবার প্রহার করিয়া, পরিশেষে নাসিকাচ্ছেদন করিয়া দিলেন। সখী কহিল, উত্তম যুক্তি হইয়াছে; ইহাতে সকল দিক রক্ষা হইবেক। অতএব, অবিলম্বে গৃহে গিয়া এইরূপ কর।

জয়শ্রী সত্বর গৃহে গিয়া, শয়নাগারে প্রবেশপূর্বক, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। গৃহজন, ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে ব্যাকুল হইয়া, জয়শ্রীর শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার নাসিকা নাই; সমস্ত গাত্র ও বস্ত্র শোণিতে অভিষিক্ত হইয়াছে; এবং সে নিজে ভূতলে পতিত হইয়া রোদন করিতেছে। অনন্তর তাহারা ব্যগ্রতাপ্রদর্শন পুরঃসব, বারংবার হেতু জিজ্ঞাসা করাতে, জয়শ্রী আপন স্বামীর দিকে অঙ্গুলীপ্রয়োগ করিয়া কহিল, ঐ দুর্বৃত্ত দস্যু আমার এই দুর্দশা করিয়াছে। তখন সমস্ত পরিবার একবাক্য হইয়া, শ্রীদত্তের অশেষপ্রকার তিরস্কার আরম্ভ করিল।

সুশীল শ্রীদত্ত, পূর্বাপর কিছুই জানে না; অকস্মাৎ এতদৃশ ভয়ঙ্কর কাণ্ড দর্শনে ও নানাপ্রকার তিরস্কারবাক্য শ্রবণে, বিস্ময়াপন্ন হইয়া, মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, আমি, সবিশেষ না জানিয়া শ্বশুরালয়ে আসিয়া, যার পর নাই অবিবেচনার কর্ম করিয়াছি। ইহাকে অতি দুশ্চরিত্রা দেখিতেছি। প্রথমতঃ, শত শত চাটুবচনেও, যে ব্যক্তি আলাপ করে নাই; সেই এক্ষণে অনায়াসে, মুক্তকণ্ঠে, মিথ্যাপবাদ দিতেছে। এই নিমিত্তেই নীতিজ্ঞেরা কহিয়াছেন, মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতারাও স্ত্রীলোকের চরিত্র ও পুরুষের ভাগ্যের কথা বুঝিতে পারেন না। জানি না, পরিশেষে কি বিপদ ঘটিবেক। এইরূপ নানাবিধ চিন্তায় মগ্ন হইয়া মৌন অবলম্বনপূর্বক, সে অধোবদন হইয়া রহিল।

পরদিন, প্রভাত হইবামাত্র, জয়শ্রীর পিতা, রাজদ্বারে সংবাদ দিয়া, জামাতাকে বিচারালয়ে নীত করিল। প্রাড়্বিবাক, বাদী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষকে পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী করিয়া, প্রথমতঃ জয়শ্রীকে জিজ্ঞাসিলেন, কে তোমার এ দুর্দশা করিয়াছে, বল ; আমি সেই দুরাচারের যথোচিত দণ্ডবিধান করিতেছি। জয়শ্রী পতি প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, ধর্মাবতার! ইনি আমার স্বামী; ইঁহা হইতে আমার এই দুর্দশা ঘটিয়াছে। অনন্তর, প্রাড়্বিবাক শ্রীদত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি নিমিত্ত এমন দুষ্কর্ম করিলে। সে কহিল, ধর্মাবতার! আমি এ বিষয়ে ভালমন্দ কিছুই জানি না; ইহাতে আপনকার বিচারে, যেরূপ ব্যবস্থা হয় করুন; এই বলিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া, বিষণ্ণ বদনে দণ্ডায়মান রহিল।

প্রাড়্বিবাক বাদী ও প্রতিবাদীর বাক্যশ্রবণান্তে, সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া ঘাতকদিগকে ডাকাইয়া, শ্রীদত্তকে শূলে দিতে আদেশ করিলেন। চোর কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ব্বাপর সমস্ত ব্যাপার, সবিশেষ সতর্কতাপূর্ব্বক, দেখিতেছিল। সে অকারণে এক ব্যক্তির প্রাণবিনাশের উপক্রম দেখিয়া, প্রাড়্বিবাকের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া নিবেদন করিল, মহাশয়! সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া বিনা অপরাধে আপনি এ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করিতেছেন। আপনি ধর্ম্মাবতার, যথার্থ বিচার করুন; ব্যভিচারিণীর বাক্যে বিশ্বাস করিবেন না।

প্রাড়্বিবাক চকিত হইয়া উঠিলেন, এবং চোরের বাক্য শুনিয়া, বারংবার জিজ্ঞাসা ও তথ্যানুসন্ধানপূর্ব্বক, সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলেন। তদীয় আদেশ অনুসারে, জয়শ্রীর মৃত পতিত উপপতির বক্ত্রমধ্য হইতে, তদীয় ছিন্ন নাসিকা আনীত হইল। তখন তিনি নিরতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া চোরকে যথার্থবাদী ও শ্রীদত্তকে নিরপরাধ স্থির করিয়া, যথোচিত পারিতোষিক প্রদানপূর্ব্বক, উভয়কে বিদায় দিলেন; এবং জয়শ্রীর মস্তকমুণ্ডন ও তাহাতে তক্রসেচন, তৎপরে তাহাকে গর্দভে আরোহণ ও নগরে পরিভ্রমণ করাইয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন।

এইরূপে আখ্যায়িকার সমাপন করিয়া চূড়ামণি কহিল, মহারাজ! নারী ঈদৃশ প্রশংসনীয় গুণে পরিপূর্ণা হয়।

উপক্রান্ত উপাখ্যান সমাপ্ত করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসিল, মহারাজ! জয়শ্রী ও নয়নানন্দ এ উভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি অধিক দুরাচার। রাজা কহিলেন, আমার মতে দুই সমান। ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

পঞ্চম উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

ধারা নগরে, মহাবল নামে, মহাবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার দূতের নাম হরিদাস। ঐ দূতের মহাদেবী নামে এক পরম সুন্দরী কন্যা ছিল। কালক্রমে কন্যা যৌবনসীমায় উপনীত হইলে, হরিদাস মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, কন্যা বিবাহযোগ্যা হইল; অতঃপর, বর অন্বেষণ করিয়া, উহার বিবাহসংস্কার সম্পন্ন করা উচিত। অনন্তর, পরিবারের মধ্যে, মহাদেবীর বিবাহের কথার আন্দোলন হইতে আরম্ভ হইলে, সে, একদিন আপন পিতার নিকট নিবেদন করিল, পিতঃ! যে ব্যক্তির সহিত আমার বিবাহ দিবেন, তিনি যেন সর্বগুণে অলঙ্কৃত হন। হরিদাস, কন্যার এই প্রশংসনীয় প্রার্থনা শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

একদিন, রাজা মহাবল হরিদাসকে কহিলেন, হরিদাস! দক্ষিণদেশে হরিশ্চন্দ্র নামে রাজা আছেন। তিনি আমার পরম বন্ধু। বহুদিন অবধি তাঁহার শারীরিক ও বৈষয়িক কোনও সংবাদ না পাইয়া, বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। অতএব তুমি তথায় গিয়া আমার কুশলসংবাদ দিয়া, ত্বরায় তাঁহার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসংবাদ লইয়া আইস। হরিদাস রাজকীয় আদেশ অনুসারে কতিপয় দিবসের মধ্যে রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার নিকট নিজ প্রভুর সন্দেশ জানাইল। হরিশ্চন্দ্র দূতমুখে মিত্রের মঙ্গলবার্তা প্রাপ্ত হইয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন; এবং সমুচিত পুরস্কার প্রদানপূর্বক হরিদাসকে, কতিপয় দিবস, তথায় অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিলেন।

এক দিবস, রাজা হরিশ্চন্দ্র সভামধ্যে হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হরিদাস! তুমি কি বোধ কর, কলিযুগের আরম্ভ হইয়াছে কিনা। তখন সে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, হাঁ মহারাজ! কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে। তাহার অধিকার প্রভাবেই সংসারে মিথ্যাপ্রপঞ্চ প্রবল হইয়া উঠিতেছে; সত্যের হ্রাস হইতেছে; পৃথিবী অল্প ফল দিতেছেন; লোক মুখে মিষ্ট বাক্য ব্যবহার করে, কিন্তু অন্তরে সম্পূর্ণ কপটতা, রাজারা, প্রজার সুখসমৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, কেবল কোষ পরিপূরণে যত্নবান হইয়াছেন; ব্রাহ্মণেরা সৎকর্মের অনুষ্ঠানে বিসর্জন দিয়াছেন এবং যৎপরোনাস্তি লোভী হইয়াছেন, স্ত্রীলোক লজ্জায় এককালে জলাঞ্জলি দিয়াছে এবং সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছে; পুত্র পরম গুরু পিতামাতার শুশ্রূষায়ও আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছে, ভ্রাতা ভ্রাতার প্রতি সর্বতোভাবে স্নেহশূন্য দৃষ্ট হইতেছে; মিত্রতানিবন্ধন অকৃত্রিমপ্রণয়সম্বলিত সরল ব্যবহার আর দৃষ্টিগোচর হয় না, নিত্য, নৈমিত্তিক প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত কর্মে কাহারও আস্থা

দেখিতে পাওয়া যায় না ; পামরেরা, বুদ্ধি ও বিদ্যার অহঙ্কারে, প্রতিকূল তর্ক দ্বারা, ধর্মমূল সনাতন বেদশাস্ত্রের বিপ্লাবনে উদ্যত হইয়াছে। মহারাজ ! ইত্যাদি নানাপ্রকারে কেবল ধর্মের তিরোভাব ও অধর্মের প্রাদুর্ভাব সর্বত্র নেত্রগোচর হইতেছে। রাজা শুনিয়া, সন্তুষ্ট হইয়া, হরিদাসের সবিশেষ প্রশংসা করিলেন।

সভাভঙ্গান্তে, রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। হরিদাস, আপন অবস্থিতিস্থানে উপস্থিত হইয়া, এক অপরিচিত ব্রাহ্মণতনয়কে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে, কি নিমিত্তে আসিয়াছ। সে কহিল, আমি তোমার নিকটে কিছু প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। হরিদাস কহিল কি প্রার্থনা, বল ; আমার সামর্থ্য হয়, সম্পন্ন করিব। সে কহিল, তোমার এক পরম সুন্দরী গুণবতী কন্যা আছে ; আমার সহিত তাহার বিবাহ দাও। হরিদাস কহিল, আমি কন্যার প্রার্থনা অনুসারে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে ব্যক্তি সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী ও অসাধারণ গুণসম্পন্ন হইবেক, তাহাকে কন্যাদান করিব। সে কহিল, আমি, বাল্যকাল অবধি পরম যত্নে, নানা বিদ্যায় নিপুণ হইয়াছি ; আর আমার এক অসাধারণ গুণ এই যে এক অদ্ভুত রথ নির্মাণ করিয়াছি ; তাহাতে আরোহণ করিলে এক দণ্ডে বর্ষগম্য দেশে উপস্থিত হওয়া যায়।

হরিদাস শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল ; এবং কন্যাদানে সম্মত হইয়া কহিল, কল্য প্রাতঃকালে তুমি রথ লইয়া আমার নিকটে আসিবে। এই বলিয়া ব্রাহ্মণতনয়কে বিদায় দিয়া হরিদাস স্নান, আহ্নিক ও ভোজন করিল ; এবং অপরাহ্নে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, বিদায় লইয়া, স্বদেশ প্রতিগমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া রহিল।

পর দিন, প্রভাত হইবামাত্র, ব্রাহ্মণতনয় হরিদাসের নিকট উপস্থিত হইলে, উভয়ে, রথে আরোহণ করিয়া, স্বল্প সময় মধ্যে ধারানগরে উপস্থিত হইল। হরিদাসের প্রত্যাগমনের পূর্বে, তদীয় পত্নী ও পুত্র, পৃথক পৃথক, এক এক ব্রাহ্মণতনয়ের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিল, মহাদেবীর সহিত বিবাহ দিব ; তাহাতে কেবল হরিদাসের গৃহ প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা প্রতিবন্ধক ছিল। এক্ষণে, সেই পূর্বাশ্বাসিত বরেরা, হরিদাসকে গৃহাগত শুনিয়া, বিবাহের নিমিত্ত, তদীয় আলয়ে উপস্থিত হইল।

এইরূপে তিন বর একত্র হইলে, হরিদাস, অতিশয়, ব্যাকুল হইয়া, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, তিন জনে তিন জনের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছি ; তিন জনেই বিদ্যাবান্ ও অসাধারণগুণসম্পন্ন, কাহাকেই নিরাশ করি। অনন্তর, সে তাহাদিগকে কহিল, অদ্য তোমরা আমার আলয়ে অবস্থিতি কর ; আমি পুত্র ও গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া, কর্তব্য স্থির করিব। তাহারা, সম্মত হইয়া, সে দিন, হরিদাসের আবাসে অবস্থিতি করিল। দৈববিড়ম্বনায়, সেই রজনীতে বিন্ধ্যাচলবাসী এক রাক্ষস আসিয়া, হরিদাসের কন্যাকে হস্তাগত করিয়া, প্রস্থান করিল।

গৃহজন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিল, মহাদেবী গৃহে নাই। তখন সকলে, একত্র হইয়া, নানা প্রকার কল্পনা করিতে লাগিল। বিবাহার্থী ব্রাহ্মণকুমারেরাও ভাবিনী ভার্যার অদর্শনবার্তা শ্রবণগোচর করিয়া ম্লান বদনে উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি, সমাধিবলে, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সমুদয় প্রত্যক্ষবৎ দেখিত। সে হরিদাসকে কহিল, মহাশয! উৎকণ্ঠিত হইবেন না। আমি দেখিতেছি, এক রাক্ষস আপনকার কন্যার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাহাকে লইযা গিযা বিন্ধ্য পর্বতে রাখিয়াছে; যদি তথা হইতে প্রত্যাহরণ করিবাব কোনও উপায় থাকে, চেষ্টা দেখুন। দ্বিতীয় কহিল, আমি শব্দবেধী শব দ্বারা বিপক্ষের প্রাণসংহার করিতে পারি। অতএব কোনও উপায়ে তথায় উপস্থিত হইতে পারিলে রাক্ষসেব প্রাণবিনাশ ও কন্যাব উদ্ধার-সাধন কবিতে পাবিব। তখন তৃতীয কহিল, আমার এই বথে আবোহণ কবিয়া প্রস্থান কর, অবিলম্বে তথায উপস্থিত হইতে পারিবে।

অনন্তর সে, ঐ রথে আরোহণপূর্বক, বিন্ধ্যাচলে উপস্থিত হইল; এব' শব্দবেধী শব দ্বারা ক্রব্যাদের প্রাণসংহার করিয়া, মহাদেবী সমভিব্যাহাবে, অবিলম্বে ধাবানগবে প্রত্যাগমন করিল। অনন্তর, তিন বর, পবস্পর বিবাদ করিয়া কহিতে লাগিল, আমিই ইহার পাণিগ্রহণে অধিকারী; আমি না হইলে, ইহাব উদ্ধার হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। হরিদাস, তদীয় বাদানুবাদ শ্রবণে কর্তব্যাবধারণে বিমূঢ ও যৎপবোনাস্তি ব্যাকুল হইল।

এইরূপে উপাখ্যানের সমাপন কবিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহাবাজ! এই তিনের মধ্যে কোন ব্যক্তি মহাদেবীর প্রাণিগ্রহণে অধিকারী হইতে পারে। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, যে ব্যক্তি রাক্ষসের প্রাণসংহার করিয়া, মহাদেবীর প্রত্যানযন করিযাছে। বেতাল কহিল, তিন জনেই সমান বিদ্বান, এবং তিন জনই প্রত্যানয়ন বিষয়ে, সমান সাহায্য করিয়াছে; তবে কি জন্য, অন্য কাহারও না হইয়া, এই কন্যা প্রত্যাহর্তারই প্রণয়িনী হইবেক। রাজা কহিলেন, তিন জনই অসাধারণ গুণপ্রকাশ কবিয়াছে, যথার্থ বটে, কিন্তু, সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে, প্রত্যাহর্তাব গুণেই, প্রকৃত কার্য নিষ্পন্ন হইয়াছে; অতএব তাহাবই প্রাধান্য যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

ষষ্ঠ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

ধর্মপুর নামে অতি প্রসিদ্ধ নগর আছে। তথায় ধর্মশীল নামে অতি সুশীল রাজা ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রীর নাম অন্ধক। মন্ত্রী, একদিন বাজাকে পরামর্শ দিলেন, মহারাজ! মন্দির

নির্মাণপূর্বক, কাত্যায়নীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতিদিন, যথাবিধানে পূজা করিতে আরম্ভ করুন ; শাস্ত্রে এ বিষয়ে বিলক্ষণ ফলশ্রুতি আছে। রাজা মন্ত্রীর পরামর্শে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন ; এবং নূতন মন্দির নির্মিত করাইয়া ভগবতী কাত্যায়নীর কাঞ্চনময়ী প্রতিমূর্তি সংস্থাপনপূর্বক, প্রত্যহ, মহাসমারোহে যথোপযুক্ত ভক্তিযোগ সহকারে, দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন।

রাজা এইরূপে, দেবতার আরাধনে নিয়ত যত্নবান্ ও গো, ব্রাহ্মণে সাতিশয় ভক্তিমান ছিলেন ; তথাপি সংসারাশ্রমের সারভূত তনয়ের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণে অধিকারী হইলেন না। সর্বদাই তিনি মনে মনে চিন্তা করেন, শাস্ত্রে ও লোকাচারে প্রসিদ্ধ আছে, অপুত্র ব্যক্তিব সংসারাশ্রম ধনে জনে পরিপূর্ণ হইলেও শূন্যপ্রায় ; এবং পরকালেও, তাহার সদ্গতিলাভ হয় না। অতএব কি কর্তব্য।

একদিন রাজা, মন্ত্রিপ্রবর অন্ধকের পরামর্শ অনুসারে কাত্যায়নীর মন্দিরে প্রবেশপূর্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন, দেবি! তুমি ত্রিলোকজননী ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ নিয়ত তোমার আরাধনা করেন ; তুমি কালে কালে ত্রিভুবনের মহানর্থহেতু উৎপাতধূমকেতুপ্রায় মহিষাসুর, রক্তবীজ প্রভৃতি দুর্বৃত্ত দৈত্য দানবগণের প্রাণসংহার করিয়া, ভূমির-ভার হরিয়াছ ; আর, যখন যে স্থানে তোমার ভক্তেরা বিপদগ্রস্ত হইয়াছে, তুমি তৎক্ষণাৎ তথায় আবির্ভূত হইয়া তাহাদের পরিত্রাণ করিয়াছ ; তুমি শরণাগত ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাক ; এই নিমিত্ত আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমার মনস্কামনা পরিপূর্ণ কর। স্তবাবসানে রাজা, পুনর্বার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

অনন্তর আকাশবাণী হইল, রাজন্! আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি ; অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর। রাজা শুনিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়া, আনন্দ গদগদ স্বরে কহিলেন, জননি! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, কৃপা করিয়া এই বর দাও, যেন আমি অবিলম্বে পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করি। দেবী কহিলেন, বৎস! অবিলম্বে তোমার পুত্র জন্মিবেক এবং ঐ পুত্র সুশীল, শান্তস্বভাব, সর্বগুণসম্পন্ন ও সর্ব বিষয়ে পারদর্শী হইবেক।

কিয়ৎ দিন অতীত হইলে রাজার এক পুত্র জন্মিল। রাজা মহাসমারোহে সপরিবারে দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া, স্বহস্তে পূজাকার্য সম্পন্ন করিলেন এবং সমাগত দীন, দরিদ্র, অনাথ প্রভৃতিকে প্রার্থনাধিক ধন দিয়া, পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন।

একদিন দীনদাস নামে তন্তুবায়, কোনও কার্য উপলক্ষে নিজ বন্ধুর সহিত রাজধানীতে গমন করিতেছিল। দৈবযোগে তাহার সজাতীয়া, রাজধানী নগরবাসিনী এক পরম সুন্দরী কন্যা নয়নগোচর হওয়াতে, দীনদাস তদীয় অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হইল। অনন্তর সে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, তন্তুবায় মনে মনে চিন্তা করিল আমাদের

মহারাজ পুত্রবিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়াও, ভগবতী কাত্যায়নীর প্রসাদে বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়াছেন। দেবীর কৃপাদৃষ্টি হইলে, আমারও এই স্ত্রীরত্নলাভ সম্পন্ন হইতে পারে।

এই চিন্তা করিয়া, দেবীর মন্দিরে প্রবেশপূর্বক, দৃঢ়তর ভক্তিযোগ সহকারে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া, তন্তুবায় কৃতাঞ্জলিপুটে মানসিক করিল, ভগবতি! যদি এই কামিনীর সহিত আমার বিবাহ হয়, স্বহস্তে মস্তকচ্ছেদন করিয়া, তোমায় পূজা দিব। এইরূপ মানসিক করিয়া, প্রণামপূর্বক, সে আপন বন্ধুর সহিত নির্দিষ্ট স্থানে প্রস্থান করিল; পরে, নিজালয়ে প্রতিগমন করিয়া সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণীর দুঃসহ বিরহানলে দগ্ধহৃদয় হইয়া, আহার বিহার প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে প্রবৃত্তিশূন্য হইল; এবং অষ্ট প্রহর অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া কেবল সেই কামিনীর বিভ্রম বিলাস-আদি ধ্যান করিতে লাগিল।

তাহার সহচর, স্বীয় প্রিয় বয়স্যের এবংবিধ অপ্রতিবিধেয় স্মরদশার প্রাদুর্ভাব দেখিয়া, নিরতিশয় বিষণ্ণমনা হইল এবং অশেষবিধ চিন্তা করিয়াও উপায়নিরূপণে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে তাহার পিতার নিকট সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিল। তাহার পিতা সমস্ত শ্রবণ ও স্বচক্ষে সমস্ত অবলোকন করিয়া বিবেচনা করিল, ইহার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় সেই কন্যার সহিত বিবাহ না হইলে প্রাণত্যাগ করিতে পারে। অতএব এ বিষয়ে উপেক্ষা করা বিধেয় নহে; যাহাতে ত্বরায় ইহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া কর্তব্য।

এই স্থির করিয়া দীনদাসের পিতা পুত্রের মিত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া সেই কন্যার পিত্রালয়ে উপস্থিত হইল; এবং যথোচিত শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপের পর গৃহস্বামীকে কহিল আমি তোমার নিকট কিছু প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি; যদি তুমি দয়া করিয়া প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সম্মত হও, ব্যক্ত করি। সে কহিল, যদি সাধ্যাতীত না হয়, অবশ্য করিব তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এইরূপে গৃহস্বামীকে বচনবদ্ধ করিয়া দীনদাসের পিতা, তাহার নিকট আপন প্রার্থনা ব্যক্ত করিলে, সে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া, শুভ দিন ও শুভ লগ্ন নির্ধারিত করিয়া কন্যাদান করিল। তন্তুবায়তনয়, অভিলষিত দারসমাগম দ্বারা, কৃতার্থম্মন্য হইয়া পরম সুখে কালহরণ করিতে লাগিল।

কিয়ৎ দিন পরে দীনদাস শ্বশুরালয়ে কর্মবিশেষ উপস্থিত হওয়াতে, নিমন্ত্রিত হইয়া পূর্ব বন্ধুকে সমভিব্যাহারে লইয়া পত্নীর সহিত তথায় প্রস্থান করিল। রাজধানীর নিকটবর্তী হইলে ভগবতী কাত্যায়নীর মন্দির দীনদাসের দৃষ্টিগোচর হইল। তখন পূর্বকৃত মানসিক স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে সে মনোমধ্যে এই আলোচনা করিতে লাগিল, আমি অতিশয় অসত্যবাদী পামর; দেবীর নিকট মানসিক করিয়া, বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছি; জন্ম-জন্মান্তরেও আমি এই গুরুতর অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইব না। যাহা হউক, এক্ষণে

ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া দেবীর ধার পরিশোধ করা উচিত।

এইরূপ স্থির করিয়া দীনদাস স্বীয় সহচরকে কহিল, মিত্র! তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর; আমি, দেবীদর্শন করিয়া ত্বরায় প্রত্যাগমন করিতেছি। এই বলিয়া, তথায় উপস্থিত ও সন্নিহিত সরোবরে স্নাত হইয়া, সে প্রথমতঃ যথাবিধি পূজা করিল; অনন্তর ভগবতি কাত্যায়নী! বহুকাল হইল আমি তোমার নিকট মানসিক করিয়াছিলাম; অদ্য তাহার পরিশোধ করিতেছি। এই বলিয়া মন্দিরস্থিত খড়্গ লইয়া স্কন্ধদেশে আঘাত করিবামাত্র, তাহার মস্তক দেহ হইতে পৃথগ্‌ভূত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

দীনদাসের আসিতে অনেক বিলম্ব দেখিয়া তাহার বন্ধু তাহার স্ত্রীকে কহিল, তুমি এইখানে থাক, আমি বন্ধুকে ডাকিয়া আনি। এই বলিয়া তথায় গমন করিয়া, মন্দির মধ্যে প্রবেশপূর্বক সে দেখিল, দীনদাসের মস্তক ও কলেবর পৃথক পৃথক পতিত আছে। তখন সে হতবুদ্ধি হইয়া, মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, সংসার অতি বিরুদ্ধ স্থান; কোনও ব্যক্তি বোধ করিবেক না এ স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিয়াছে; সকলেই বলিবেক আমি ইহার স্ত্রীর সৌন্দর্যে মোহিত হইয়া, নির্বিঘ্নে আপন অসৎ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত, ইহার প্রাণবধ করিয়াছি। অকারণে এরূপ বিরূপ লোকাপবাদে দূষিত হওয়া অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করাই বিধেয়। এই ভাবিয়া সে ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ সেই খড়্গ দ্বারা আপনার মস্তকচ্ছেদন করিল।

তন্তুবায়তনয়া বহুক্ষণ একাকিনী দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহাদের অন্বেষণার্থে, দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইল; এবং উভয়কেই মৃত পতিত দেখিয়া, বিবেচনা করিল, দৈবদুর্বিপাকে আমার যে দুরবস্থা ঘটিল, তাহাতে বোধ করি, পূর্বজন্মে অনেক মহাপাতক করিয়াছিলাম। যাহা হউক, যাবজ্জীবন বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিয়া, অসার দেহভার বহন করা বিডম্বনামাত্র। আর, লোককেও বিশেষ না জানিয়া বলিবেক, এই স্ত্রী দুশ্চরিত্রা, আপন অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত, স্বামীর ও স্বামীর বন্ধুর প্রাণবধ করিয়াছে। অতএব, সর্ব প্রকারেই, আমার প্রাণত্যাগ করা উপযুক্ত।

এই বলিয়া, সেই শোণিতলিপ্ত খড়্গ লইয়া তন্তুবায়তনয়া আত্মশিরশ্ছেদনে উদ্যত হইবামাত্র, দেবী তৎক্ষণাৎ আবির্ভূতা হইয়া, তাহার হস্ত ধরিলেন এবং কহিলেন, বৎসে! আমি তোমার সাহস ও সদ্বিবেচনা দর্শনে প্রসন্ন হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। সে কহিল, জননি! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, ইহাদের দুইজনের প্রাণদান কর। দেবী, তথাস্তু বলিয়া, উভয়ের কলেবরের সহিত মস্তকের যোগ করিতে আদেশ দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। তন্তুবায়তনয়া, কাত্যায়নীর বচন শ্রবণে আহ্লাদে অন্ধপ্রায়া হইয়া একের মস্তক অন্যের শরীরে যোজিত করিয়া দিল। উভয়েই, তৎক্ষণাৎ প্রাণদান পাইয়া গাত্রোত্থান করিল।

এইরূপে উপাখ্যান শেষ করিয়া, বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ!

এক্ষণে কোন ব্যক্তি ঐ কন্যার স্বামী হইবেক বল। রাজা কহিলেন, শুন বেতাল! যেমন নদীর মধ্যে গঙ্গা উত্তম, পর্বতের মধ্যে সুমেরু উত্তম, বৃক্ষের মধ্যে কল্পতরু উত্তম ; সেই-রূপ, সমুদয় অঙ্গের মধ্যে মস্তক উত্তম, এই নিমিত্তে শাস্ত্রকারেরা মস্তকের নাম উত্তমাঙ্গ রাখিয়াছেন। অতএব, যে ব্যক্তির কলেবরে পূর্বস্বামীর উত্তমাঙ্গ যোজিত হইয়াছে, সেই তাহার স্বামী হইবেক।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

সপ্তম উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ! শ্রবণ কর :

চম্পা নগরে চন্দ্রাপীড় নামে নরপতি ছিলেন। তাঁহাব সুলোচনা নামে ভার্যা ও ত্রিভুবন-সুন্দরী নামে পরম সুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যা কালক্রমে বিবাহযোগ্যা হইলে, রাজা উপযুক্ত পাত্রের নিমিত্ত অতিশয চিন্তিত হইলেন। নানাদেশীয বাজারা ক্রমে ক্রমে অবগত হইলেন, রাজা চন্দ্রাপীড়ের এক পরম সুন্দবী কন্যা আছে ; তদীয় রূপলাবণ্যের মাধুরী দর্শনে, মুনিজনেরও মন মোহিত হয। তাঁহারা সকলেই, বিবাহপ্রার্থনায়, নিপুণ-তর চিত্রকর দ্বারা স্ব স্ব প্রতিমূর্তি চিত্রিত করাইযা, চন্দ্রাপীড়ের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। রাজা, মনোনীত করিবার নিমিত্ত, সেই সকল চিত্র কন্যার নিকটে উপনীত কবিতে লাগিলেন। কিন্তু, কাহারও ছবি তাহাব মনোনীত হইল না। তখন রাজা কন্যার স্বয়ংবরের আদেশ দিলেন। সে তাহাতে অসম্মতা হইয়া কহিল, তাত! স্বয়ংবর বৃথা আড়ম্বর মাত্র ; তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। যে ব্যক্তি বিদ্যা, বুদ্ধি, বিক্রম, এই তিনে অসাধারণ হইবেক, আমি তাহাকেই পতিত্বে পরিগৃহীত করিব।

কিয়ৎ দিন পরে, দেশান্তর হইতে চারি বর উপস্থিত হইল। রাজা তাহাদিগকে স্ব স্ব গুণের পরিচয় দিতে বলিলেন। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি কহিল, মহারাজ! আমি বাল্যকাল অবধি, বহু যত্নে ও বহু পরিশ্রমে, নানা বিদ্যায় নিপুণ হইয়াছি ; আর আমার এক অসাধারণ গুণ এই যে, প্রতিদিন, একখানি মনোহর বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া, পাঁচ রত্ন মূল্যে বিক্রয় করি। তাহার মধ্যে সর্বাগ্রে এক রত্ন ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করি ; দ্বিতীয় দেবসাৎ করিয়া, তৃতীয় আপন অঙ্গে ধারণ করি ; চতুর্থ ভাবী ভার্যার নিমিত্ত রাখিয়া, পঞ্চম দ্বারা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয়ের নির্বাহ করিয়া থাকি। এই গুণ আমাভিন্ন অন্য কোনও ব্যক্তির নাই। আব আমার রূপের পরিচয় দিবার আবশ্যকতা কি ; মহারাজ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। দ্বিতীয় কহিল, আমি জলচর, স্থলচর, সমস্ত পশুপক্ষীর ভাষা জানি ;

আমার সমান বলবান ত্রিভুবনে আর কোনও ব্যক্তি নাই; আর, আমার আকার আপনকার সমক্ষেই উপস্থিত রহিয়াছে। তৃতীয় কহিল, আমি শাস্ত্রে অদ্বিতীয়; আমার সৌন্দর্য সাক্ষাৎ দেখিতেছেন, আপন মুখে বর্ণন করিয়া, নির্লজ্জ হইবার প্রয়োজন কি। চতুর্থ কহিল, আমি শস্ত্রবিদ্যায় অদ্বিতীয়, শব্দবেধী শর নিক্ষিপ্ত করিতে পারি; আর, আমার রূপলাবণ্যের বিষয় সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে, এবং আপনিও স্বচক্ষে দেখিতেছেন।

এইরূপে, ক্রমে ক্রমে, চারি জনের রূপ, গুণ ও বিদ্যার পরিচয় লইয়া, রাজা মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, 'চারি জনকেই রূপে, গুণে বিদ্যায় অসাধারণ দেখিতেছি, কাহাকে কন্যা দান করি। অনন্তর ত্রিভুবনসুন্দরীর নিকটে গিয়া, চারি জনের গুণের পরিচয় দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসে! এই চারিবর উপস্থিত, তুমি কাহাকে মনোনীত কর। শুনিয়া ত্রিভুবনসুন্দরী লজ্জায় অধোমুখী ও নিরুত্তরা হইয়া রহিল।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! কোন ব্যক্তি, যুক্তিমার্গ অনুসারে ত্রিভুবনসুন্দরীর পতি হইতে পারে। রাজা কহিলেন, যে ব্যক্তি বস্ত্র নির্মাণ করিয়া বিক্রয় করে, সে জাতিতে শূদ্র; যে ব্যক্তি পশুপক্ষীর ভাষা শিক্ষা করিয়াছে, সে জাতিতে বৈশ্য; যে সমস্ত শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছে, সে জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু শস্ত্রবেধী ব্যক্তি কন্যার সজাতীয়; সেই, শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে এই কন্যাব পরিণেতা হইতে পারে।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

অষ্টম উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

মিথিলানগরে গুণাধিপ নামে রাজা ছিলেন। দক্ষিণদেশীয়, চিরঞ্জীব নামে, রজঃপুত, তাঁহার বদান্যতা ও গুণগ্রাহকতা কীর্তি শ্রবণ করিয়া, কর্মের প্রার্থনায়, তাঁহার রাজধানীতে উপস্থিত হইল। কিন্তু, তাহার দুরদৃষ্টক্রমে, রাজা তৎকালে, সর্বক্ষণ অন্তঃপুরবাসী হইয়া, মহিলাগণের সহবাসে কালযাপন করিতেন, বহু কালেও একবার রাজসভায় উপস্থিত হইতেন না। সংবৎসর অতীত হইল, তথাপি চিরঞ্জীব রাজার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিল না; এদিকে, ব্যয়নির্বাহের জন্য, যৎকিঞ্চিৎ যাহা সমভিব্যাহারে আনিয়াছিল, তাহা ক্রমে, ক্ষয়প্রাপ্ত হইল।

এইরূপে নিতান্ত নিঃসম্বল হইয়া, চিরঞ্জীব মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, প্রায় সংবৎসর অতীত হইল, আশারাক্ষসীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, শ্ববৃত্তি সেবার প্রত্যাশায়, দূর দেশ হইতে আসিয়া, রাজ্যতন্ত্রপরাঙ্মুখ স্ত্রীপরতন্ত্র রাজার আশ্রয় লইয়াছি। অভীষ্টসিদ্ধির

কথা দূরে থাকুক, এ পর্যন্ত তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতেও পারিলাম না। দেবতা, কত দিনে, আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, রাজাকে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইবার মতি ও প্রবৃত্তি দিবেন, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। আর, এ ব্যক্তিকে অমাত্যায়ত্ত দেখিতেছি, স্বয়ং রাজকার্যে মনোযোগ'করেন না। কিন্তু, রাজা স্বায়ত্ত না হইলেও, তাঁহার নিকট মাদৃশ জনের অনায়াসে প্রার্থনাসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। আর, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেই, যে আমি, এতাদৃশ ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করিয়া, কৃতকার্য হইতে পারিব, তাহারই বা নিশ্চয় কি। বিশেষতঃ, এক্ষণে আমি নিঃসম্বল হইলাম; ভিক্ষা দ্বারা উদরান্নসংগ্রহ ব্যতিরেকে, এ স্থলে অবস্থিতি করিবারও উপায় নাই। কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষাও সমধিক ক্লেশদায়িনী। অতএব, এক অনিশ্চিত শ্বৃত্তিলাভের প্রত্যাশায়, অন্য এক শ্বৃত্তি অবলম্বন কবা, নিতান্ত নির্ঘৃণ ও কাপুরুষের কর্ম। ফলতঃ, আশার দাসত্বস্বীকার করিলেই, নিঃসন্দেহ, দুঃসহ ক্লেশ ও ভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি, আশাকে দাসী করিয়া, সকল ক্লেশের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছে, তাহারই জীবন সার্থক; যদি সংসারে কেহ সুখী থাকে, তবে সে ব্যক্তিই যথার্থ সুখী। অতএব, অদ্যই আমি, সংসারাশ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া, অরণ্যে গিয়া, জগদীশ্ববের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইব। এই নিশ্চয় করিয়া, মিথিলা পবিত্যাগ পূর্বক, চিরঞ্জীব অরণ্যে প্রবেশ কবিল।

কিয়ৎ দিন পরে, রাজা গুণাধিপ, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া, পুনর্বাব রাজকার্যে নিবিষ্টমনা হইলেন; এবং, কতিপয় দিবসের পর, সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে কবিয়া, মহাসমারোহে, মৃগয়ায় গমন করিলেন। নানা বনে ভ্রমণ করিয়া, পবিশেষে তিনি, এক মৃগের অনুসরণক্রমে, অশ্বারোহণে, একাকী, অরণ্যের নিবিডতর প্রদেশে প্রবিষ্ট হইলেন। সকলভুবনপ্রকাশক ভগবান কমলিনীনায়ক অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে, চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল; এবং সে মৃগও দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল।

রাজা, যৎপরোনাস্তি ভীত ও ক্ষুৎপিপাসায় অভিভূত হইয়া, সাতিশয় বিষণ্ণ ও চিন্তাকুল হইলেন। কিন্তু, ভয়ক্ষোভ অপেক্ষা, বুভুক্ষা ও পিপাসার যন্ত্রণা, ক্রমে ক্রমে, অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি নিতান্ত অধৈর্য হইয়া, ইতস্ততঃ জলের অন্বেষণ করিতে করিতে, অরণ্যের মধ্যে অসম্ভাবিত কুটীর দর্শনে সাতিশয় হৃষ্টমনা হইলেন। রজঃপূত চিরঞ্জীব, বিষয়বিরক্ত হইয়া, ঐ কুটীরে তপস্যা করিতেছিল। তথায় উপস্থিত ও কুটীরদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে, কাতরতাপ্রদর্শনপূর্বক, রাজা জলদান দ্বারা প্রাণদান প্রার্থনা করিলেন। চিরঞ্জীব, আতিথেয়তাপ্রদর্শনপূর্বক তৎক্ষণাৎ, তপোবনসুলভ সুস্বাদ ফল ও সুশীতল জল প্রদান করিল।

রাজা, ফল ও জল পাইয়া, ক্ষুধানিবৃত্তি ও পিপাসাশান্তি করিলেন, এবং নিরতিশয় পরিতৃপ্ত হইয়া,* আপনাকে পুনর্জীবিত বোধ করিতে লাগিলেন; পরে, মহোপকারক

চিরঞ্জীবের ভাবদর্শনে, প্রকৃত ঋষি বলিয়া বোধ না হওয়াতে, বিনয়নম্র বচনে বলিলেন, মহাশয়! আপনি আমার যে মহোপকার করিলেন, তাহাতে আমি আপনকার নিকট চিরক্রীত রহিলাম। এক্ষণে, এক অনুচিত প্রার্থনা দ্বারা, ধৃষ্টতাপ্রকাশে প্রবৃত্ত হইতেছি, অনুগ্রহপূর্বক অপরাধমার্জনা করিবেন। আমি ক্রিয়া দ্বারা আপনাকে বিশুদ্ধ তপস্বী দেখিতেছি; কিন্তু, আকার ইঙ্গিত দর্শনে, কোনও ক্রমে প্রকৃত তপস্বী বলিয়া বোধ হইতেছে না। এ বিষয়ে আমার গুরুতর সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। আপনি, প্রাণসংশয় সময়ে, জলদান দ্বারা, আমায় প্রাণদান করিয়াছেন; এক্ষণে, কৃপাপ্রদর্শনপূর্বক, সংশয়াপনোদন দ্বারা, আমায় চরিতার্থ করুন।

চিরঞ্জীব, রাজার অনুরোধলঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া, আত্মপরিচয়প্রদানপূর্বক কহিল, আমি, লোকমুখে মিথিলাধিপতি রাজা গুণাধিপের আশ্রিতপ্রতিপালনকীর্তি শ্রবণ করিয়া, কর্মপ্রার্থনায়, তাঁহার রাজধানীতে গিয়াছিলাম। কিন্তু, আমার ভাগ্যদোষে, রাজা, বিষয়সম্ভোগে আসক্ত হইয়া, সংবৎসরমধ্যেও, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন না। তৎপরে, নানা কারণে বিরক্ত হইয়া আমি অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছি। কিন্তু, জাতিস্বভাবসিদ্ধ রজোগুণের আতিশয্যবশতঃ আমার অন্তঃকরণ সাত্ত্বিক কার্যে অনুরক্ত হইতেছে না; এখনও রাজসপ্রকৃতিসুলভ বিষয়ানুরাগে বিচলিত হইতেছে। অতএব, আপনকার এ সংশয় নিতান্ত অমূলক নহে; আপনি উত্তম অনুভব করিয়াছেন। রাজা শুনিয়া, মনে মনে, নিরতিশয় লজ্জিত হইলেন; কিন্তু, তখন কিছু মাত্র ব্যক্ত না করিয়া, চিরঞ্জীবের অনুমতিগ্রহণপূর্বক, তদীয় কুটীরেই রজনীযাপন করিলেন।

পরদিন, প্রভাত হইবামাত্র, রাজা গুণাধিপ, আত্মপরিচয়প্রদানপূর্বক, চিরঞ্জীবকে রাজধানীতে লইয়া গেলেন; এবং সাতিশয় অনুগ্রহভাজন ও প্রিয়পাত্র করিয়া, আপন নিকটে রাখিলেন। তদবধি, তিনি, তাহার প্রতি, সতত সাতিশয় সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সে ব্যক্তিও, তদীয় নির্দেশ সম্পাদনে, প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিল।

একদা রাজা, অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রয়োজনবিশেষবশতঃ, চিরঞ্জীবকে দেশান্তরে প্রেরণ করিলেন। সে রাজকার্যসম্পাদন করিয়া, প্রত্যাগমনকালে অর্ণবকূলে এক অপূর্ব দেবালয় দেখিতে পাইল। তন্মধ্যে প্রবেশপূর্বক, দেবদর্শন করিয়া, চিরঞ্জীব বহির্গত হইবামাত্র, এক পরম সুন্দরী কামিনী সহসা তাহার সম্মুখবর্তিনী হইল। তদীয় কোমল কলেবরে লোকাতিগ লাবণ্য অবলোকনে মোহিত হইয়া, চিরঞ্জীব একতান মনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সেই রমণী, তাহার এইরূপ ভাব দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, অহে পুরুষবর! তুমি, কি নিমিত্তে, এ স্থানে আসিয়াছ; এবং, কি নিমিত্তেই বা চিত্রার্পিতের ন্যায়, দণ্ডায়মান রহিয়াছ। চিরঞ্জীব কহিল, কার্যবশতঃ দেশান্তরে গিয়াছিলাম; কার্য শেষ করিয়া, স্বদেশে প্রতিগমন করিতেছি; কিন্তু; অকস্মাৎ তোমার অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে, মোহিত

ও হতবুদ্ধি হইয়া, দণ্ডায়মান আছি। তখন, সেই সীমন্তিনী কহিল, তুমি এই সরোবরে অবগাহন কর, তাহা হইলে, আমি তোমার আজ্ঞানুবর্তিনী হইব।

চিরঞ্জীব, শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া, সরোবরে অবগাহন করিল; কিন্তু, জলের মধ্য হইতে মস্তক উত্তোলিত করিয়া দেখিল, আপন আলয়ে উপস্থিত হইয়াছে। তখন সে, যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ করিল; এবং, অবিলম্বে নরপতি-গোচরে উপস্থিত হইয়া, পূর্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার কর্ণগোচর করিয়া, রাজা অতিশয় চমৎকৃত হইলেন, এবং কহিলেন, তুমি ত্বরায় আমায় ঐ স্থানে লইয়া চল। অনন্তর, উভয়ে সমুচিত যানে আরোহণপূর্বক, অর্ণবতীরে উপস্থিত হইয়া, সেই দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন; এবং, যথোচিত ভক্তিযোগ সহকারে পূজা ও প্রণাম করিয়া, বহির্গত হইলেন।

এই সময়ে, সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণী, রাজার সম্মুখে আসিয়া, দণ্ডায়মান হইল, এবং তদীয় সৌন্দর্য দর্শনে মোহিত হইয়া কহিল, মহারাজ! আমার প্রতি যে আজ্ঞা করিবেন, তাহাই শিরোধার্য করিব। রাজা কহিলেন, যদি তুমি, আমার বাক্য অনুসারে, কার্য করিতে চাও, আমার প্রিয়পাত্র চিরঞ্জীবের সহধর্মিণী হও। সে কহিল, আমি তোমার রূপের ও গুণের বশীভূত হইয়াছি; এমন স্থলে, কেমন করিয়া, উহার সহধর্মিণী হইব। রাজা কহিলেন, তুমি এইমাত্র অঙ্গীকার করিয়াছ, আমার আদেশ অনুসারে কর্ম করিবে। সজ্জনেরা, প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া, প্রতিজ্ঞাপালন করেন। অতএব, আপন বাক্যরক্ষা কর, চিরঞ্জীবের সহধর্মিণী হও। পরিশেষে, সেই কামিনী সম্মতিপ্রদর্শন করিলে, রাজা, গান্ধর্ব বিধান দ্বারা, উভয়কে পরস্পর সহচর করিয়া দিয়া, আপন সমভিব্যাহারে, রাজধানীতে লইয়া গেলেন, এবং তাহাদের সচ্ছন্দরূপ জীবিকানির্বাহের যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

বেতাল জিজ্ঞাসিল, মহারাজ! রাজা ও চিরঞ্জীবের মধ্যে, কোন ব্যক্তির অধিক সৌজন্য ও ঔদার্য প্রকাশ হইল। রাজা কহিলেন, চিরঞ্জীবের। বেতাল কহিল, কি প্রকারে। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, রাজা পরিশেষে চিরঞ্জীবের নানা মহোপকার করিলেন, যথার্থ বটে; কিন্তু, চিরঞ্জীব, মৃগয়াদিবসে, ফল, জল ও আশ্রয়দান দ্বারা রাজার যে উপকার করিয়াছিল, তাহার সহিত ও সকলের তুলনা হইতে পারে না।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

নবম উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

মগধপুর নামে এক নগর আছে। তথায় বীরবর নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার অধিকারে, হিরণ্যদত্ত নামে, এক ঐশ্বর্যশালী বণিক বাস করিত। ঐ বণিকের, মদনসেনা নামে, এক

পরম সুন্দরী কন্যা ছিল। ঋতুরাজ বসন্ত সমাগত হইলে, মদনসেনা, স্বীয় সহচরীবর্গ সমভিব্যাহারে, উপবনবিহারে গমন করিল। দৈবযোগে, ধর্মদত্ত বণিকের পুত্র সোমদত্তও, পরিভ্রমণবাসনায়, সেই সময়ে, ঐ উপবনে উপস্থিত হইল। সে, কিয়ৎক্ষণ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া, দূর হইতে দর্শন করিল, এক পরম সুন্দরী, পূর্ণযৌবনা কামিনী, সখীগণ সহিত, ভ্রমণ করিতেছে। ক্রমে ক্রমে নিকটবর্তী হইয়া, সোমদত্ত, মদনসেনার অসামান্য রূপ-লাবণ্য নয়নগোচর করিয়া, মোহিত হইল ; এবং, নিতান্ত অধৈর্য হইয়া, তাহার নিকটে গিয়া কহিল, সুন্দরি ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও ; আমি, তোমার অলৌকিক রূপ-লাবণ্য দর্শনে, নিতান্ত বিচেতন হইয়াছি। অধিক আব কি বলিব, যদি আমাব প্রতি অনুকূল না হও, তোমার সমক্ষে আত্মঘাতী হইব।

মদনসেনা শুনিযা, সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া, সোমদত্তকে, অশেষ প্রকাবে, সদুপদেশ প্রদান কবিল ; কিন্তু, কোনও প্রকারে তাহাকে প্রকৃতিস্থ কবিতে পারিল না। সোমদত্ত, অধিকতর অধৈর্য ও ব্যাকুল হইয়া, অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া, অশ্রুমুখে, সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিল। তখন মদনসেনা, উদারস্বভাবতাবশতঃ, পবের প্রাণরক্ষা করা প্রধান ধর্ম বোধ করিয়া, কহিল, আগামী পঞ্চম দিবসে, আমার বিবাহ হইবেক ; তৎপরে শ্বশুরালয়ে যাইব। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অগ্রে তোমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া, স্বামিসেবায় প্রবৃত্ত হইব না। তুমি এক্ষণে ক্ষান্ত হও, গৃহে গমন কর। সোমদত্ত, মদনসেনার বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া, বিশ্বাসিত মনে, গৃহে গমন করিল।

তৎপরে, পঞ্চম দিবস পরিণীতা হইয়া, মদনসেনা শ্বশুরালয়ে গেল। রজনী উপস্থিত হইলে, গৃহজনেরা তাহারে শয়নাগারে প্রবেশিত করিল। সে, সর্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া, মৌন অবলম্বনপূর্বক, শয্যার এক পার্শ্বে উপবিষ্ট রহিল। তাহার স্বামী, পরম সমাদরে করগ্রহণ-পূর্বক, প্রিয় সম্ভাষণ করিতে লাগিল। কিন্তু মদনসেনা, তৎকালোচিত নবোঢ়াচেষ্টিত-সমুদয়ের বৈপরীত্যে, সোমদত্তের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিল, যদি তুমি আমায় তাহার নিকটে যাইতে অনুমতি না দাও, আমি আত্মঘাতিনী হইব। তাহার স্বামী প্রথমতঃ বিস্তর নিষেধ করিল ; পরে তাহার আগ্রহের আতিশয্য দেখিয়া কহিল, যদি তুমি নিতান্তই তাহার নিকটে যাইতে চাও, যাও, আমি নিষেধ করিতে পারি না ; প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন অবশ্য কর্তব্য বটে।

মদনসেনা, এইরূপে স্বামীর সম্মতিলাভ করিয়া, অর্ধরাত্র সময়ে, একাকিনী সোমদত্তের আলয়ে চলিল। রাজপথে উপস্থিত হইলে, এক তস্কর তাহার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসিল, সুন্দরি ! তুমি কে ; এবং, সর্বাঙ্গে সর্বপ্রকার অলঙ্কার পরিয়া, এ ঘোর রজনীতে, কি অভিপ্রায়ে, কোথায় যাইতেছ। তোমায় একাকিনী দেখিতেছি ; অথচ, তোমার অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার লক্ষিত হইতেছে না। মদনসেনা কহিল, আমি হিরণ্যদত্ত

শ্রেষ্ঠীর কন্যা। আমার নাম মদনসেনা ; প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালনের জন্য, সোমদত্তের নিকটে যাইতেছি।

চোর শুনিয়া, ঈষৎ হাসিয়া, তাহার গাত্র হইতে অলঙ্কার গ্রহণের উদ্যম করিলে মদনসেনা ব্যাকুল হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে, পূর্বাপর সমস্ত বৃত্তান্তের নির্দেশ করিয়া কহিল, ভ্রাতঃ! আমি, অনেক যত্নে, স্বামীকে সম্মত করিয়া, তাঁহার অনুমতি লইয়া, প্রতিজ্ঞাভার হইতে মুক্ত হইবার উপায় করিয়াছি ; তুমি, আমার বেশভঙ্গ করিয়া, প্রতিবন্ধকতাচরণ করিও না। এই স্থানে অবস্থিতি কর ; প্রতিজ্ঞা করিতেছি, প্রত্যাগমনকালে, সমস্ত অলঙ্কার তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইব। চোর, মদনসেনার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, তাহাকে ছাড়িয়া দিল ; এবং, সেই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া অলঙ্কারের প্রত্যাশায়, তদীয় প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

মদনসেনা, সোমদত্তের শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে সুপ্ত দেখিয়া জাগরিত করিল। সোমদত্ত, মদনসেনার অসম্ভাবিত সমাগমে বিস্ময়াপন্ন হইয়া, জিজ্ঞাসা করিল, তুমি, এই ঘোর রজনীতে, একাকিনী কি প্রকারে কোথা হইতে উপস্থিত হইলে। মদনসেনা কহিল, বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে গিয়াছি ; তথা হইতে আসিতেছি। কয়েক দিবস হইল, উপবনবিহারকালে, তোমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সেই প্রতিজ্ঞার প্রতি-পালনার্থে উপস্থিত হইয়াছি ; এক্ষণে তোমার ইচ্ছা বলবতী। সোমদত্ত জিজ্ঞাসিল, তোমার পতির নিকটে এই বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়াছ কি না। সে উত্তর দিল, তাঁহার নিকটে সকল বিষয়ের অবিকল বর্ণন করিলাম ; তিনি, শুনিয়া ও বিবেচনা করিয়া, কিঞ্চিৎকাল পরে, অনুমতি প্রদান করিলেন ; তৎপরে তোমার নিকট আসিয়াছি।

সোমদত্ত কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, আমি পরকীয় মহিলার অঙ্গস্পর্শ করিব না ; শাস্ত্রে সে বিষয়ে সবিশেষ দোষনির্দেশ আছে। যাহা হউক, তোমার বাক্যনিষ্ঠায় ও তোমার পতির ভদ্রতায়, অতিশয় প্রীত হইলাম। অকপট হৃদয়ে বলিতেছি, তুমি প্রতিজ্ঞাভার হইতে মুক্ত হইলে ; এক্ষণে যাও, প্রকৃত প্রস্তাবে পতিশুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হও।

তদনন্তর, মদনসেনা, প্রত্যাবর্তনকালে, মলিম্লুচের নিকটে উপস্থিত হইল। সে, তাহাকে ত্বরায় প্রত্যাগত দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসিলে, মদনসেনা সবিশেষ সমস্ত বর্ণন করিল। চোর শুনিয়া, যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া, অকপট হৃদয়ে কহিল, আমার অলঙ্কারের প্রয়োজন নাই। তুমি অতি সুশীলা ও সত্যবাদিনী। ধর্মে ধর্মে, তোমার যে সতীত্বরক্ষা হইল, তাহাই আমার পরম লাভ। তুমি নির্বিঘ্নে শ্বশুরালয়ে গমন কর। এই বলিয়া চোর চলিয়া গেল। অনন্তর, মদনসেনা স্বামীর সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, সে আর তাহার সহিত পূর্ববৎ সম্ভাষণ না করিয়া, অপ্রসন্ন মনে শয়ান রহিল।

ইহা কহিয়া, বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসিল, মহারাজ! এই চারি জনের মধ্যে কাহার

ভদ্রতা অধিক। রাজা উত্তর দিলেন, চোরের। বেতাল কহিল, কি প্রকারে। রাজা কহিলেন, মদনসেনার স্বামী, তাহাকে অন্যসংক্রান্তহৃদয়া দেখিয়া, পরিত্যাগ করিয়াছিল, প্রশস্ত মনে সোমদত্তের নিকট গমনে অনুমতি দেয় নাই ; তাহা হইলে উহার মন এখন অপ্রসন্ন হইত না। আর, সোমদত্ত, উপবনে তাদৃশ অধৈর্য প্রদর্শন করিয়া, এক্ষণে, কেবল রাজদণ্ডভয়ে, মদনসেনার সতীত্বভঙ্গে পরাঙ্মুখ হইল, আন্তরিক ধর্মভীরুতা প্রযুক্ত নহে। আর, মদনসেনা সোমদত্তের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, এবং প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালন করা উচিত কর্ম বটে ; কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে সতীত্ব প্রতিপালন করাই সর্বাপেক্ষা প্রধান ধর্ম। সুতরাং, প্রতিজ্ঞাভঙ্গভয়ে, সতীত্বভঙ্গে প্রবৃত্ত হওয়া, অসতীর কর্ম বলিতে হইবেক ; অতএব, তাহার এই সত্যনিষ্ঠা সাধুবাদযোগ্য নহে। কিন্তু, চোর স্বভাবতঃ অর্থগৃধ্নু ; সে যে মহামূল্য অলঙ্কার সমস্ত হস্তে পাইয়া, মদনসেনার সতীত্বরক্ষাশ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া, লোভ সংবরণপূর্বক, তাহাকে অক্ষত বেশে গমন করিতে দিল, ইহা অকৃত্রিম ঔদার্যের কার্য, তাহার সন্দেহ নাই।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

দশম উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

গৌড়দেশে বর্ধমান নামে এক নগর আছে। তথায় গুণশেখর নামে, অশেষ গুণসম্পন্ন নরপতি ছিলেন। তাঁহার প্রধান অমাত্য অভয়চন্দ্র বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। নরপতিও, তদীয় উপদেশের বশবর্তী হইয়া, বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিলেন , এবং, স্বয়ং শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা, গোদান, ভূমিদান, পিতৃকৃত্য প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত অবশ্য কর্তব্য ক্রিয়াকলাপ এককালে জলাঞ্জলি দিয়া, মন্ত্রিপ্রধান অভয়চন্দ্রের প্রতি আদেশ দিলেন, আমার রাজ্যমধ্যে, যেন এই সমস্ত অবৈধ ব্যাপার আর প্রচলিত না থাকে।

সর্বাধিকারী, রাজকীয় আজ্ঞা অনুসারে, রাজ্যমধ্যে এই ঘোষণাপ্রদান করিলেন, যদি, অতঃপর, কোনও ব্যক্তি এই সকল রাজনিষিদ্ধ অবৈধ কর্মের অনুষ্ঠান করে, রাজা তাহার সর্বস্বহরণ ও নির্বাসনরূপ দণ্ডবিধান করিবেন। প্রজারা, কুলক্রমাগত আচার ও অনুষ্ঠানের পরিত্যাগে নিতান্ত অনিচ্ছু ও রাজার প্রতি মনে মনে নিরতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াও, দণ্ড-ভয়ে, প্রকাশ্যরূপে তদনুষ্ঠানে বিরত হইল।

এক দিবস, অভয়চন্দ্র রাজার নিকটে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! সংক্ষেপে ধর্মশাস্ত্রের মর্মপ্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ করুন। এ জন্মে কোনও ব্যক্তি কাহারও প্রাণহিংসা করিলে,

হতপ্রাণ ব্যক্তি, জন্মান্তরে, ঐ প্রাণঘাতকের প্রাণহন্তা হয়। এই উৎকট হিংসাপাপের প্রবলতাপ্রযুক্তই, মানবজাতি, সংসারে আসিয়া, জন্মমৃত্যু পরম্পরারূপ দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকে। এই নিমিত্তই, শাস্ত্রকারেরা নিরূপণ করিয়াছেন, অহিংসা মনুষ্যের পক্ষে, সর্বপ্রধান ধর্ম। মহারাজ! দেখুন, হরি, হর, বিরিঞ্চি প্রভৃতি প্রধান দেবতারাও, কেবল কর্মদোষে, সংসারে আসিয়া, বারংবার অবতার হইতেছেন। অতএব, অতি প্রবল জন্তু হস্তী অবধি, অতি ক্ষুদ্র জন্তু কীট পর্যন্ত, প্রত্যেক জীবের প্রাণরক্ষা করা সর্বপ্রধান কর্ম ও পরম পবিত্র ধর্ম। আর, বিবেচনা করিযা দেখিলে, মনুষ্যেরা যে পরমাংস দ্বারা আপন মাংসবৃদ্ধি করে, ইহা অপেক্ষা গুরুতর অধর্ম ও যার পর নাই অসৎ কর্ম আর নাই। এবংবিধ ব্যক্তিরা, দেহান্তে নরকগামী হইয়া, অশেষ প্রকারে যাতনাভোগ করে। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি, স্বদৃষ্টান্ত অনুসারে, অন্যের দুঃখ বিবেচনা না করিয়া, প্রাণহিংসাপূর্বক, মাংসভক্ষণ দ্বারা, স্বীয় রসনা পরিতৃপ্ত করে, সে রাক্ষস, তাহার আয়ু, বিদ্যা, বল, বিত্ত, যশ প্রভৃতি হ্রাস-প্রাপ্ত হয়; এবং সে কাণা, খঞ্জ, কুব্জ, মূক, অন্ধ, পঙ্গু, বধিররূপে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করে। আর, সুরাপান অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই। অতএব, জীবহিংসা ও সুরাপান সর্ব প্রযত্নে, পরিত্যাগ করা উচিত।

ঈদৃশ অশেষবিধ উপদেশ দ্বারা, অভয়চন্দ্র বৌদ্ধধর্মে রাজার এরূপ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মাইল যে, যে ব্যক্তি তাঁহার সমক্ষে, ঐ ধর্মের প্রশংসা করিত, সে অশেষ প্রকারে রাজপ্রসাদ-ভাজন হইত। ফলতঃ রাজা, সবিশেষ অনুরাগ ও ভক্তিযোগ সহকারে, স্বীয় অধিকারে, অবলম্বিত অভিনব ধর্মের বহুল প্রচার করিলেন।

কালক্রমে রাজার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে, তাঁহার পুত্র ধর্মধ্বজ পৈতৃক সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তিনি, সনাতন বেদশাস্ত্রের অনুবর্তী হইয়া, বৌদ্ধদিগের যথোচিত তিরস্কার ও নানাপ্রকার দণ্ড করিতে লাগিলেন; পিতার প্রিয়পাত্র প্রধান মন্ত্রীকে, শিরোমুণ্ডনপূর্বক, গর্দভে আরোহণ ও নগর প্রদক্ষিণ কবাইয়া, দেশ বহিষ্কৃত করিলেন; এবং বৌদ্ধধর্মের সমূলে উন্মূলন করিয়া, বেদবিহিত সনাতন ধর্মের পুনঃস্থাপনে অশেষ-প্রকার যত্ন ও প্রয়াস করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎদিন পরে, ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে, রাজা ধর্মধ্বজ, মহিষীত্রয় সমভিব্যাহারে, উপবনবিহারে গমন করিলেন। সেই উপবনে এক সুশোভন সরোবর ছিল। রাজা, তাহাতে কমল সকল প্রফুল্ল দেখিয়া, স্বয়ং জলে অবতরণপূর্বক, কতিপয় পুষ্প লইয়া, তীরে আসিয়া, এক মহিষীর হস্তে দিলেন। দৈবযোগে, একটি পদ্ম, মহিষীর হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া, তদীয় বাম পদে পতিত হওয়াতে, উহার আঘাতে তাহার সেই পদ ভগ্ন হইল। তখন রাজা, হা হতোহস্মি বলিয়া, অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া, প্রতিকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সায়ংকাল উপস্থিত হইল। সুধাকরের উদয় হইবামাত্র, তদীয় অমৃতময়

শীতল কিরণমালার স্পর্শে, দ্বিতীয়া মহিষীর গাত্র স্থানে স্থানে দগ্ধ হইয়া গেল। আর, তৎকালে অকস্মাৎ এক গৃহস্থের ভবনে উদূখলের শব্দ হইল ; সেই শব্দ শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, তৃতীয়া মহিষীর শিরোবেদনা ও মূর্চ্ছা হইল।

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসিল, মহারাজ! উহাদের মধ্যে কোন কামিনী অধিক সুকুমারী। রাজা কহিলেন, সুধাকর করস্পর্শে যে রাজমহিষীর দেহ দগ্ধ হইল, আমার মতে, সে-ই সর্বাপেক্ষা সুকুমারী।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

একাদশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

পুণ্যপুর নগরে, বল্লভ নামে, নিরতিশয় প্রজাবল্লভ নরপতি ছিলেন। তাঁহার অমাত্যের নাম সত্যপ্রকাশ। এক দিবস, রাজা সত্যপ্রকাশের নিকট কহিলেন, দেখ, যে ব্যক্তি, রাজ্যেশ্বর হইয়া, অভিলাষানুরূপ বিষয়ভোগ না করে, তাহার রাজ্য ক্লেশপ্রপঞ্চ মাত্র। অতএব, অদ্যাবধি, আমি ইচ্ছানুরূপ বৈষয়িক সুখ সম্ভোগে-প্রবৃত্ত হইব ; তুমি কিয়ৎ-কালের নিমিত্তে, সমস্ত রাজকার্যের ভার গ্রহণ করিয়া, আমায় একেবারে অবসর দাও। ইহা কহিয়া, অমাত্য হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ ভারার্পণ করিয়া, রাজা, অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া, কেবল ভোগসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সত্যপ্রকাশ, অগত্যা, রাজকীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ; কিন্তু, স্বতন্ত্র রাজতন্ত্রনির্বাহ ও অহর্নিশ দুরবগাহ নীতিশাস্ত্রের অবিশ্রান্ত পর্যালোচনা দ্বারা, একান্ত ক্লান্ত হইতে লাগিলেন।

এক দিবস, অমাত্য আপন ভবনে, উৎকণ্ঠিত মনে, নির্জনে বসিয়া আছেন ; এমন সময়ে, তাঁহার গৃহলক্ষ্মী লক্ষ্মীনাম্নী পত্নী তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং, স্বামীকে সাতিশয় অবসন্ন ও নিরতিশয় দুর্ভাবনাগ্রস্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কি নিমিত্তে, তোমায় সতত উৎকণ্ঠিত দেখিতে পাই, এবং, কি নিমিত্তেই বা, তুমি দিন দিন দুর্বল হইতেছ। তিনি কহিলেন, রাজা, আমার উপর সমস্ত বিষয়ের সম্পূর্ণ ভার দিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, ভোগ-সুখে কালযাপন করিতেছেন। তদীয় আদেশ অনুসারে, ইদানীং, আমায় রাজশাসন ও প্রজাপালন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় সম্পন্ন করিতে হইতেছে। রাজ্যের নানাবিষয়ক বিষম চিন্তাদ্বারা, আমি এরূপ দুর্বল হইতেছি। তখন তাঁহার পত্নী কহিলেন, তুমি, অনেক দিন, একাকী সমস্ত রাজকার্য নিষ্পন্ন করিলে ; এক্ষণে, কিছুদিনের অবকাশ লইয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, তীর্থপর্যটন কর।

সত্যপ্রকাশ, সহধর্মিণীর উপদেশ অনুসারে, নৃপতি সমীপে বিদায় লইয়া, তীর্থপর্যটনে প্রস্থান করিলেন। তিনি, ক্রমে ক্রমে, নানাস্থানের তীর্থদর্শন করিয়া, পরিশেষে সেতুবন্ধ রামেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি, রামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশপূর্বক, দর্শনাদি করিয়া, নির্গত হইলেন; এবং, সমুদ্রে দৃষ্টিপাতমাত্র, দেখিতে পাইলেন, প্রবাহমধ্য হইতে এক অদ্ভুত স্বর্ণময় মহীরুহ বহির্গত হইল। ঐ মহীরুহের শাখায় উপবিষ্ট হইয়া, এক পরম সুন্দরী পূর্ণযৌবনা কামিনী, হস্তে বীণা লইয়া, মধুর, কোমল, তানলয়বিশুদ্ধ স্বরে, সঙ্গীত করিতেছে। সত্যপ্রকাশ, বিস্ময়াবিষ্ট ও অনন্যদৃষ্টি হইয়া, নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, ঐ অদ্ভুত মহীরুহ প্রবাহগর্ভে বিলীন হইল।

ঈদৃশ অঘটন ঘটনা নিরীক্ষণে চমৎকৃত হইয়া, সত্যপ্রকাশ, ত্বরায় স্বদেশে প্রতিগমনপূর্বক, নরপতি গোচরে উপস্থিত হইলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! আমি এক অদৃষ্টচর, অশ্রুতপূর্ব আশ্চর্য দর্শন করিয়াছি; কিন্তু, বর্ণন করিলে, তাহাতে কোনও প্রকারে, আপনকার বিশ্বাস জন্মাইতে পারিব না। প্রাচীন পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যাহা কাহারও বুদ্ধিগম্য ও বিশ্বাসযোগ্য না হয়, তাদৃশ বিষয়ের কদাপি নির্দেশ করিবেক না; করিলে কেবল উপহাসাস্পদ হইতে হয়। কিন্তু, মহারাজ! আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; এই নিমিত্ত নিবেদন করিতেছি, যে স্থানে ত্রেতাবতার ভগবান রামচন্দ্র, দুর্বৃত্ত দশাননের বংশধ্বংসবিধানবাসনায় মহাকায় মহাবল কপিবল সাহায্যে, শতযোজনবিস্তীর্ণ অর্ণবের উপর লোকাতীত কীর্তিহেতু সেতুসঙ্ঘটন করিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, কল্লোলিনীবল্লভের প্রবাহমধ্য হইতে, অকস্মাৎ এক স্বর্ণময় ভূরুহ বিনির্গত হইল; তদুপরি এক পরম সুন্দরী রমণী, বীণাবাদনপূর্বক, মধুর স্বরে সঙ্গীত করিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে, সেই বৃক্ষ কন্যা সহিত জলে মগ্ন হইয়া গেল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইয়া, তীর্থপর্যটন পরিত্যাগপূর্বক, আমি আপনকার নিকট ঐ বিষয়ের সংবাদ দিতে আসিয়াছি।

রাজা শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, পুনর্বার সত্যপ্রকাশের হস্তে রাজ্যের ভারপ্রদানপূর্বক, সেতুবন্ধ রামেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। নিরূপিত সময়ে, মহাদেবের পূজা করিয়া, মন্দির হইতে বহির্গত হইবামাত্র, সত্যপ্রকাশের বর্ণনানুরূপ ভূরুহ মহীপতির নয়নগোচর হইল। তাঁহার উল্লিখিত সর্বাঙ্গসুন্দরী কামিনীর সৌন্দর্যসন্দর্শনে ও সঙ্গীত শ্রবণে, বিমূঢ় ও পূর্বাপর পর্যালোচনাপরিশূন্য হইয়া, রাজা অর্ণবপ্রবাহে লম্ফপ্রদানপূর্বক, অল্পক্ষণ মধ্যে, ঐ বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। বৃক্ষও, মহীপতি সহিত, তৎক্ষণাৎ পাতালপুরে প্রবিষ্ট হইল।

অনন্তর, সেই রমণী রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, অহে বীরপুরুষ! তুমি কে,

কি অভিপ্রায়ে এ স্থানে আগমন করিলে, বল। তিনি কহিলেন, আমি পুণ্যপুরের রাজা ; আমার নাম বল্লভ ; তোমার সৌন্দর্য ও সৌকুমার্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছি। এই কথা শুনিয়া, সেই রমণী কহিল, আমি তোমার সাহসে সন্তুষ্ট হইয়াছি। যদি তুমি, কেবল কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে, আমার সহিত সর্বপ্রকারে সম্পর্কশূন্য হইতে পার, তাহা হইলে, আমি তোমার সহধর্মিণী হই। রাজা, শুনিয়া, আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া, তৎক্ষণাৎ তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তৎপরে সে রাজাকে, এই নিয়মের রক্ষার্থে, পুনরায় প্রতিজ্ঞা-পাশে বদ্ধ করিয়া, গান্ধর্ব বিধানে আপন প্রতিজ্ঞা সম্পন্ন করিল। রাজা, নব মহিষীর সহিত, পরম কৌতুকে, কালযাপন করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ চতুর্দশী উপস্থিত হইল। রাজমহিষী, সাতিশয় আগ্রহ ও নিরতিশয় ব্যগ্রতা প্রদর্শন-পূর্বক, নিকটে থাকিতে নিষেধ করিলে, রাজা, পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞা অনুসারে, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপসৃত হইলেন। কিন্তু, কি কারণে পূর্বে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছিল, এবং এক্ষণে, এতাদৃশ আগ্রহ ও ব্যগ্রতা প্রদর্শনপূর্বক, পুনর্বার নিষেধ করিল, যাবৎ ইহা সবিশেষ অবগত না হইব, তাবৎ আমার অন্তঃকরণে এক বিষম সংশয় থাকিবেক। অতএব, ইহার তথ্যানুসন্ধান করা আবশ্যক। এই বলিয়া, কৌতূহলাকুলিত চিত্তে, অন্তরালে থাকিয়া, রাজা অবলোকন করিতে লাগিলেন।

অর্ধরাত্র সময়ে, এক রাক্ষস আসিয়া কন্যার অঙ্গে করার্পণ করিল। রাজা দেখিয়া, একান্ত অসহমান হইয়া, করতলে করাল করবাল ধারণপূর্বক, তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং অশেষপ্রকার তিরস্কার করিয়া কহিলেন, অরে দুরাচার রাক্ষস! তুই, আমার সমক্ষে, প্রিয়তমার অঙ্গে হস্তার্পণ করিস না। যাবৎ তোরে না দেখিয়াছিলাম, তাবৎ অন্তঃকরণে ভয় ছিল ; এক্ষণে দেখিয়া নির্ভয় হইয়াছি, এবং তোর প্রাণদণ্ড করিতে আসিয়াছি। এই বলিয়া, তিনি খড়্গপ্রহার দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। তখন রাজমহিষী অকৃত্রিম পরিতোষপ্রদর্শনপূর্বক, কহিলেন, তুমি, দুর্দান্ত রাক্ষসের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া, আমায় জীবনদান করিলে। আমি, এতকাল, কি যন্ত্রণাভোগ করিয়াছি, বলিতে পারি না।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন, সুন্দরি! কি কারণে তুমি, এতাবৎ কাল পর্যন্ত, এই দারুণ দৈব-দুর্বিপাকে পতিত ছিলে, বল!

তিনি কহিলেন, মহারাজ! শ্রবণ কর। আমি বিদ্যাধর নামক গন্ধর্বরাজের কন্যা ; আমার নাম রত্নমঞ্জরী। ভোজনকালে আমি নিকটে উপবিষ্ট না থাকিলে, পিতার তৃপ্তি হইত না ; এজন্য, নিত্যই, ভোজন সময়ে তাঁহার সন্নিহিত থাকিতাম। একদিন, বাল্যখেলায় আসক্ত হইয়া, ভোজনবেলায় গৃহে উপস্থিত ছিলাম না। পিতা, আমার অপেক্ষায়, বুভুক্ষায় অভিভূত হইয়া, ক্রোধভরে এই শাপ দিলেন, অদ্যাবধি তুমি রসাতলবাসিনী হইবে ; এবং কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে, এক রাক্ষস আসিয়া তোমায় অশেষ প্রকারে যন্ত্রণা দিবে। আমি

শুনিয়া অত্যন্ত কাতর হইলাম, এবং, পিতার চরণে ধরিয়া, বহুবিধ স্তুতি ও বিনীতি করিয়া, নিবেদন করিলাম, পিতঃ! আমার দুরদৃষ্টবশতঃ, সামান্য অপরাধে, উৎকট দণ্ড-বিধান করিলেন। এক্ষণে, কৃপা করিয়া, শাপমোচনের কোনও উপায় করিয়া দেন; নতুবা, কত কাল যন্ত্রণাভোগ করিব। ইহা কহিয়া, আমি, বিষণ্ণ বদনে, রোদন করিতে লাগিলাম। তখন তিনি পূর্বার্জিত স্নেহরসের সহায়তা দ্বারা, আমার বিনয়ের বশীভূত হইয়া কহিলেন, এক মহাবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষ আসিয়া, সেই রাক্ষসের প্রাণদণ্ড করিয়া, তোমার শাপমোচন করিবেন। আমি, সেই শাপে, এই পাপে আশ্লিষ্ট ছিলাম। বহু দিনের পর, তুমি আমায় মুক্ত করিলে। এক্ষণে, অনুমতি কর, পিতৃদর্শনে যাই।

রাজা কহিলেন, যদি তুমি উপকার স্বীকার কর, অগ্রে একবার আমার রাজধানীতে চল; পরে পিতৃদর্শনে যাইবে। রত্নমঞ্জরী, মহোপকারকের নিকট অবশ্য কর্তব্য কৃতজ্ঞতা স্বীকারের অন্যথাভাবে অধর্মজানিয়া, রাজার প্রার্থনায় সম্মত হইলে, তিনি, তাহারে সমভিব্যাহারে লইয়া, রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন; এবং, কিছুদিন, তদীয় সহবাসে বিষয়রসে কালযাপন করিযা, পরিশেষে, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক, তাহাকে পিতৃদর্শনে যাইতে অনুমতি দিলেন। তখন রত্নমঞ্জরী কহিলেন, মহারাজ! বহুকাল মনুষ্য সহবাস দ্বারা, আমার গন্ধর্বত্ব গিয়াছে; এখন, সর্বতোভাবে, মনুষ্যভাবাপন্ন হইয়াছি। পিতা আমার সর্বগন্ধর্বপতি; এক্ষণে, তাঁহার নিকটে গিয়া, সমুচিত সমাদর পাইব না। অতএব, আর আমার তথায় যাইতে অভিলাষ নাই; তোমার নিকটেই যাবজ্জীবন অবস্থিতি করিব। রাজা শুনিযা অতিশয় হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন; এবং, রাজকার্যে এককালে জলাঞ্জলি দিয়া, দিন যামিনী, সেই কামিনীর সহিত, বিষয় বাসনায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া, প্রধান অমাত্য সত্যপ্রকাশ প্রাণত্যাগ করিলেন।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসিল, মহারাজ! কি কারণে, অমাত্য প্রাণত্যাগ কবিলেন, বল। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, মন্ত্রী বিবেচনা করিলেন, রাজা, বিষয়রসে আসক্ত হইয়া, রাজ্যচিন্তায় জলাঞ্জলি দিলেন; প্রজা অনাথ হইল। অতঃপর, আর কোনও ব্যক্তি আমার প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেক না। অহোরাত্র এই বিষম চিন্তাবিষ শরীরে প্রবিষ্ট হওয়াতে, সত্যপ্রকাশের প্রাণবিয়োগ হইল।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

দ্বাদশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

চূড়াপুরে, দেবস্বামী নামে, এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি রূপে রতিপতি, বিদ্যায় বৃহস্পতি, সম্পদে ধনপতি ছিলেন। কিয়ৎ দিন পরে, দেবস্বামী, লাবণ্যবতী নামে, এক

গুণবতী ব্রাহ্মণতনয়ার পাণিগ্রহণ করিলেন। ঐ কন্যা রূপ লাবণ্যে ভুবন বিখ্যাত ছিল। উভয়ে প্রণয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

একদা বিপ্রদম্পতী, গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত, অট্টালিকার উপরিভাগে শয়ন করিয়া, নিদ্রা যাইতেছিলেন। সেই সময়ে, এক গন্ধর্ব, বিমানে আরোহণপূর্বক, আকাশপথে ভ্রমণ করিতেছিল। দৈবযোগে, বিপ্রকামিনীর উপর দৃষ্টিপাত হওয়াতে, সে তদীয় অলৌকিক রূপলাবণ্যদর্শনে মোহিত হইল; এবং, বিমান কিঞ্চিত অবতীর্ণ করিয়া, নিদ্রান্বিতা লাবণ্যবতীকে লইয়া পলায়ন করিল।

কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, দেবস্বামী, স্বীয় প্রেয়সীকে পার্শ্বশায়িনী না দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া, ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু, কোনও সন্ধান না পাইয়া, সাতিশয় বিষণ্ণভাবে, নিশাযাপন করিলেন। পরদিন, প্রভাত হইবামাত্র, তিনি, অতিমাত্র ব্যগ্র ও চিন্তাকুল চিত্তে, পুনরায়, বিশেষ করিয়া, অশেষ প্রকার অনুসন্ধান করিলেন; পরিশেষে, নিতান্ত নিরাশ্বাস ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া, সংসারাশ্রমে বিসর্জন দিয়া, সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

একদিন, দেবস্বামী, দিবা দ্বিপ্রহরের সময়, অতিশয় ক্ষুধার্ত হইয়া, এক ব্রাহ্মণের আলয়ে অতিথি হইলেন; কহিলেন, আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি; কিছু ভোজনীয় দ্রব্য দিয়া, আমার প্রাণরক্ষা কর। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, তৎক্ষণাৎ এক পাত্র দুগ্ধে পরিপূর্ণ করিয়া, অতিথি ব্রাহ্মণের হস্তে অর্পণ করিলেন। গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ, ইতঃপূর্বে, এক কৃষ্ণসর্প ঐ দুগ্ধে মুখার্পণ করাতে তাহা অতিশয় বিষাক্ত হইয়াছিল। পান করিবামাত্র, সেই বিষ, সর্বাঙ্গব্যাপী হইয়া, অতিথি ব্রাহ্মণকে ক্রমে ক্রমে অবসন্ন ও অচেতন করিতে লাগিল। তখন তিনি গৃহস্থ ব্রাহ্মণকে, তুমি বিষভক্ষণ করাইয়া ব্রহ্মহত্যা করিলে, এই বলিয়া ভূতলে পড়িলেন ও প্রাণত্যাগ করিলেন। ব্রাহ্মণ, অকস্মাৎ ব্রহ্মহত্যা দেখিয়া, যার পর নাই বিষণ্ণ হইলেন; এবং বাটীর মধ্যে প্রবেশিয়া, আপন পত্নীকে, তুই দুগ্ধে বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছিলি, তাহাতেই ব্রহ্মহত্যা হইল; তুই অতি দুর্বৃত্তা, আর তোর মুখাবলোকন করিব না; ইত্যাদি নানাপ্রকার তিরস্কার ও বহু প্রহার করিয়া, গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

ইহা কহিয়া, বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! এ স্থলে কোন ব্যক্তি দোষভাগী হইবেক। রাজা কহিলেন, সর্পের মুখে স্বভাবতঃ বিষ থাকে; সুতরাং সে দোষী হইতে পারে না; গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ও তাঁহার ব্রাহ্মণী, সেই দুগ্ধকে বিষাক্ত বলিয়া জানিতেন না; সুতরাং, তাঁহারাও ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইবেন না; আর, অতিথি ব্রাহ্মণ, সবিশেষ না জানিয়া, পান করিয়াছেন; এজন্য, তিনিও আত্মঘাতী নহেন। কিন্তু গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া, নিরপরাধা সহধর্মিণীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন,

তাহাতে তিনি, অকারণে পত্নী পরিত্যাগ জন্য, দুরদৃষ্টভাগী হইবেন।
ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

ত্রয়োদশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!
চন্দ্রহৃদয় নগরে, রণধীর নামে, প্রবল প্রতাপ নরপতি ছিলেন। রাজা রণধীরের প্রভাবে, প্রজারা চিরকাল নিরুপদ্রবে বাস করিত। কিয়ৎ দিন পরে, নগরে গুরুতর চৌর্যক্রিয়ার আরম্ভ হইল। পৌরেরা, চোরের উপদ্রবে অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া, সকলে মিলিয়া, নৃপতিসমীপে স্ব স্ব দুঃখের পরিচয় প্রদান করিল। রাজা সবিশেষ সমস্ত শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, যাহা হইয়াছে, তাহার আর উপায় নাই; অতঃপর যাহাতে না হইতে পায়, সে বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান থাকিলাম। এইরূপ আশ্বাস দিয়া, রাজা নগরবাসীদিগকে বিদায় করিলেন; এবং নূতন নূতন প্রহরী নিযুক্ত করিয়া, তাহাদিগকে সাতিশয় সতর্কতা-পূর্বক নগররক্ষার আদেশ দিয়া, স্থানে স্থানে পাঠাইলেন; বলিয়া দিলেন, চোর পাইলে তাহার প্রাণদণ্ড করিবে। প্রহরীরা, সাতিশয় সাবধানে, নগররক্ষা করিতে লাগিল; তথাপি চৌর্যের কিঞ্চিৎমাত্র নিবৃত্তি হইল না, বরং দিনে দিনে বৃদ্ধিই হইতে লাগিল।
পুরবাসীরা, পুনরায় একত্র হইয়া, রাজার নিকটে গিয়া, আপন আপন দুঃখ জানাইলে, তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, এক্ষণে তোমরা বিদায় হও; অদ্য রজনীতে, আমি স্বয়ং নগররক্ষার্থে নির্গত হইব। প্রজারা, রাজাজ্ঞা অনুসারে স্বীয় স্বীয় আলয়ে গমন করিল। রাজাও, সায়ংকাল উপস্থিত হইলে, অসি, চর্ম ও বর্ম ধারণপূর্বক, একাকী নগররক্ষার্থে নির্গত হইলেন; এবং কিয়ৎ দূরে গিয়া, এক অপরিচিত ব্যক্তিকে সম্মুখে দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে, কোথায় যাইতেছ, তোমার বাস কোথায়। সে কহিল, আমি চোর; তুমি কে, কি নিমিত্তে আমার পরিচয় লইতেছ, বল। রাজা ছল করিয়া বলিলেন, আমিও চোর। তখন সে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিল, আইস, উভয়ে একত্র হইয়া চুরি করিতে যাই। রাজা সম্মত হইলেন।
চোর রাজাকে সহচর করিয়া, এক ধনাঢ্য গৃহস্থের ভবনে প্রবেশপূর্বক বহু অর্থ হস্তগত করিল; এবং, নগর হইতে নির্গত হইয়া, কিয়ৎ দূরে গিয়া, এক প্রচ্ছন্ন সুরঙ্গ দ্বারা পাতালে প্রবিষ্ট হইল। আপন আলয়ে উপস্থিত হইয়া, রাজাকে দ্বারদেশে বসিতে আসন দিয়া, সে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। এই অবকাশে, এক দাসী আসিয়া, কথায় কথায়, রাজার পরিচয় লইল, এবং সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া কহিল, মহারাজ! তুমি কি নিমিত্ত, এই দুর্বৃত্ত দস্যুর আবাসে আসিয়াছ; সে না আসিতে আসিতে, যত দূর পার,

পলায়ন কর ; নতুবা, সে আসিয়াই তোমার প্রাণসংহার করিবেক। রাজা শুনিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন, এবং বলিলেন, আমি পথ জানি না, কিরূপে পলাইব ; যদি তুমি কৃপা করিয়া পথ দেখাইয়া দাও, তাহা হইলে এবার আমার প্রাণরক্ষা হয়। তখন সেই দাসী পথ প্রদর্শন করিলে, রাজা পলাইয়া আপন আলয়ে উপস্থিত হইলেন।

পরদিন, প্রভাত হইবামাত্র, রাজা রণধীর, বহু সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে, পূর্বনির্দিষ্ট সুরঙ্গ দ্বারা পাতালে প্রবিষ্ট হইয়া, চোরের ভবনরোধ করিলেন। এক রাক্ষস সেই পাতালস্থ নগরীর, অধিষ্ঠাত্রী-দেবতার ন্যায়, রক্ষণাবেক্ষণ করিত। চোর, রাজকীয় অবরোধ হইতে আত্মরক্ষার নিতান্ত অনুপায় দেখিয়া নগররক্ষক রাক্ষসের শরণাপন্ন হইল, এবং নিবেদন করিল, এক রাজা সসৈন্যে আসিয়া আমার উপর আক্রমণ করিয়াছে। যদি তুমি এ সময়ে আমার সহায়তা না কর, অদ্যই তোমার নগর হইতে প্রস্থান করিব। এই বলিয়া, প্রলোভনস্বরূপ তাহার আহারোপযোগী দ্রব্য উপঢৌকন দিয়া, চোর সম্মুখে কৃতাঞ্জলি দণ্ডায়মান রহিল। আহারসামগ্রী উপহার পাইয়া, রাক্ষস সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল ; এবং, তুমি নির্ভয় হও, কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই, আমি রাজার সমস্ত সৈন্য উচ্ছিন্ন করিতেছি ; এই বলিয়া, তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া, সৈন্যের অন্তর্গত নর, করী, তুরঙ্গ প্রভৃতি এক এক গ্রাসে উদরস্থ করিতে আরম্ভ করিল। রাজা, রাক্ষসের ভয়ানক আকার ও ক্রিয়া দর্শনে অতিশয় কাতর হইয়া, পলায়ন করিলেন। ফলতঃ, যে পলাইতে পারিল, তাহারই প্রাণ বাঁচিল ; অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্য, সেই দুর্দান্ত রাক্ষসের গ্রাসে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

রাজা একাকী পলায়ন করিতে লাগিলেন। চোর, রাক্ষসের সহায়তায় সাহসী ও স্পর্ধাবান হইয়া, তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল ; এবং ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত হইয়া, ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিল, অরে কুলাঙ্গার! ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, এরূপ কাপুরুষতা প্রদর্শন করিতেছিস, তোরে ধিক্। রাজা হইয়া, ভঙ্গ দিয়া, রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলে, ইহলোকে অকীর্তি ও পরলোকে নরকপাত হয়। রাজা, তৎকালে নিতান্ত ব্যাকুল ও সর্বথা উপায়বিহীন হইয়াও, কেবল কুলাভিমান ও খড়্গ, চর্ম সহায় করিয়া, চোরের সম্মুখীন হইলেন।

ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। পরিশেষে, রাজা রণধীর চোরকে পরাজিত করিয়া, বন্ধনপূর্বক রাজধানীতে লইয়া গেলেন ; এবং পরদিন প্রাতঃকালে, শূলদানের ব্যবস্থা করিয়া, বধ্যবেশপ্রদানপূর্বক, তাহাকে গর্দভে আরোহণ করাইয়া, নগরের সমস্ত প্রদেশে পরিভ্রমণ করাইতে আদেশ দিলেন। চোর প্রায় সকলেরই সর্বনাশ করিয়াছিল ; সুতরাং সকলেই তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া, নিরতিশয় আহ্লাদিত হইয়া, তাহার অশেষপ্রকার তিরস্কার ও রাজার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল।

কিন্তু, ধর্মধ্বজ নামক বণিকের গৃহের নিকটবর্তী হইলে, তাহার কন্যা শোভনা, গবাক্ষদ্বার দিয়া চোরকে নয়নগোচর করিয়া, একবারে মোহিত হইল ; এবং তৎক্ষণাৎ স্বীয় পিতার সমীপবর্তিনী হইয়া কহিল, তুমি রাজার নিকটে গিয়া, যেরূপে পার, ঐ চোরকে ছাড়াইয়া আন। বণিক কহিল, যে চোর সমস্ত নগর নির্ধন করিয়াছে ; যাহার নিমিত্তে, রাজার সমস্ত সৈন্য উচ্ছিন্ন হইয়াছে ; এবং রাজারও নিজের প্রাণসংশয় পর্যন্ত ঘটিয়াছিল ; তাহাকে, আমার কথায়, কখনই ছাড়িয়া দিবেন না। শোভনা কহিল, যদি তোমার সর্বস্ব দিলেও, রাজা উহাকে ছাড়িয়া দেন, তাহাও তোমায় করিতে হইবেক। যদি তুমি উহারে না আন, তোমার সমক্ষে আত্মঘাতিনী হইব।

কন্যা ধর্মধ্বজের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ছিল ; সুতরাং সে, তদীয় নির্বন্ধ উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া, রাজার নিকটে গিয়া আবেদন করিল, মহারাজ ! আমার যে কিছু সম্পত্তি আছে, সমস্ত দিতেছি ; আপনি, দয়া করিয়া, এই চোরকে ছাড়িয়া দেন। রাজা কহিলেন, এ চোর আমার ও পৌরবর্গের যৎপরোনাস্তি অপকার করিয়াছে ; আমি, কোনও প্রকারে, উহারে ছাড়িয়া দিব না। তখন ধর্মধ্বজ আপন কন্যার নিকটে গিয়া কহিল, আমি, সর্বস্ব-দান পর্যন্ত স্বীকারপূর্বক, প্রার্থনা করিলাম ; রাজা, কোনও ক্রমে, চোরকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন না। তখন শোভনা, অভীষ্টসিদ্ধি বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়া, বিষাদ-সাগরে মগ্ন হইল।

এই সময় মধ্যে, রাজপুরুষেরা চোরকে সমস্ত পরিভ্রমণ করাইয়া, পরিশেষে বধ্যভূমিতে আনয়নপূর্বক, শূলস্তম্ভের নিকট দণ্ডায়মান করিল। শোভনার অপরূপ বৃত্তান্ত, তৎক্ষণাৎ নগর মধ্যে প্রচারিত হওয়াতে, অনতিবিলম্বে চোরেরও কর্ণগোচর হইল। তখন সে প্রথমতঃ হাসিতে লাগিল ; অনন্তর, হাস্য হইতে বিরত হইয়া, রোদন আরম্ভ করিবা-মাত্র, রাজপুরুষেরা তাহাকে শূলে আরোহণ করাইল।

বণিক কন্যা, চোরের মৃত্যুসংবাদ পাইবামাত্র, সহগমনের উদ্যোগ করিয়া, বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইল ; এবং, যথা নিয়মে চিতা প্রস্তুত হইলে, চোরকে শূল হইতে অবতীর্ণ করিয়া গাঢ় আলিঙ্গনপূর্বক, তাহাকে লইয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিল।

দাহকেরা অগ্নিপ্রদানে উদ্যত হইল। নিকটে ভগবতী কাত্যায়নী দেবীর মন্দির ছিল। দেবী, তথা হইতে নির্গমপূর্বক, শ্মশানভূমিতে উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন, বৎসে ! বরপ্রার্থনা কর ; তোমার সাহস ও সতীত্ব দর্শনে সবিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। শোভনা কহিল, জননি ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, এই চোরের জীবনদান কর। দেবী তথাস্তু বলিয়া, তৎক্ষণাৎ পাতাল হইতে অমৃত আনয়নপূর্বক, চোরের প্রাণদান করিলেন।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ ! চোর, কি নিমিত্তে, প্রথমে হাস্য ও পরে রোদন করিয়াছিল, বল। রাজা কহিলেন, চোর, কন্যার কামনা শুনিয়া, আমার মৃত্যুসময়ে

ইহার অনুরাগ সঞ্চার হইল ; ভগবানের কি ইচ্ছা, কিছুই বুঝা যায় না ; এই আলোচনা করিয়া, প্রথমে হাস্য করিয়াছিল ; অনন্তর, এই কন্যা, আমার নিমিত্তে, রাজাকে সর্বস্ব দিতে উদ্যত হইয়াছিল ; আমি ইহার এমন কি উপকারে আসিতাম, এই অনুশোচনা করিয়া, দুঃখিত হৃদয়ে রোদন করিল।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

চতুর্দ্দশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ !

কুসুমবতী নগরীতে সুবিচার নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার চন্দ্রপ্রভা নামে, অবিবাহিতা দুহিতা ছিল। রমণীয় বসন্তকাল উপস্থিত হইলে, রাজকুমারী উপবনবিহারে অভিলাষিণী হইয়া, পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাজা সম্মত হইলেন ; এবং রাজধানীর অনতিদূরে, যে যোজনবিস্তৃত অতি রমণীয় উপবন ছিল, উহাকে স্ত্রীলোকের বাসোপযোগী করিবার নিমিত্ত বহুসংখ্যক লোক পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা তথায় উপস্থিত হইবার পূর্বে, বিংশতিবর্ষ বয়স্ক, অতি রূপবান ; মনস্বী নামে বিদেশীয় ব্রাহ্মণকুমার, পরিশ্রান্ত ও আতপক্লান্ত হইয়া, উপবনমধ্যবর্তী নিকুঞ্জ মধ্যে প্রবেশপূর্বক স্নিগ্ধ ছায়াতে নিদ্রাগত ছিল। রাজ-পরিচারকেরা তথায় উপস্থিত হইয়া, আবশ্যক কার্য সকল সম্পন্ন করিয়া প্রস্থান করিল। দৈবযোগে ঐ ব্রাহ্মণকুমার তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল না।

রাজকুমারী, স্বীয় সহচরীবর্গ ও পরিচারিকাগণের সহিত, উপবনে উপস্থিত হইয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রাহ্মণকুমারের সমীপবর্তিনী হইলেন। ভ্রমণকারিণীদিগের পদশব্দে মনস্বীরও নিদ্রাভঙ্গ হইল। ব্রাহ্মণকুমারের ও রাজকুমারীর চারিচক্ষুঃ একত্র হইলে, ব্রাহ্মণকুমার মোহিত ও মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল ; রাজকুমারীও, আবির্ভূত সাত্ত্বিক ভাবের প্রভাবে, কম্পমানকলেবরা, ও বিকলিতচিত্তা হইলেন। সখীগণ অকস্মাৎ ঈদৃশ অতিবিষম বিষমশরদশা উপস্থিত দেখিয়া, মনুষ্যবাহ্য যানে আরোহণ করাইয়া, তৎক্ষণাৎ রাজকুমারীকে গৃহে লইয়া গেল। ব্রাহ্মণকুমার সেই স্থানেই, স্পন্দহীন পতিত রহিল।

শশী ও ভূদেব নামে দুই ব্রাহ্মণ, কামরূপে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া, স্বদেশে প্রতিগমন করিতেছিলেন। তাঁহারাও, আতপে তাপিত হইয়া বিশ্রামার্থে, উপবনস্থ নিকুঞ্জ মধ্যে উপস্থিত হইলেন। প্রবেশ মাত্র, সেই ব্রাহ্মণকুমারকে তদবস্থ পতিত দেখিয়া, ভূদেব স্বীয় সহচরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বল দেখি, শশী ! এ এরূপ অচেতন হইয়া পতিত আছে কেন।

শশী কহিলেন, বোধ করি কোনও নায়িকা ভ্রূচাপ দ্বারা কটাক্ষবান নিক্ষিপ্ত করিয়াছে,

তাহাতেই এরূপে পতিত আছে। ভূদেব কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কহিলেন, ইহাকে জাগরিত করিয়া সবিশেষ জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক।

অনন্তর, ভূদেব শশীর নিষেধ না মানিয়া, নানাবিধ উপায় দ্বারা, ব্রাহ্মণকুমারের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, অহে ব্রাহ্মণতনয়! কি কারণে তোমার ঈদৃশী দশা ঘটিযাছে বল। ব্রাহ্মণকুমার কহিল, যে ব্যক্তি দুঃখ দূর করিতে ইচ্ছুক ও সমর্থ, তাহার নিকটেই দুঃখের কথা ব্যক্ত করা উচিত; নতুবা যার তার কাছে বলিয়া বেড়াইলে, মূঢ়তা মাত্র প্রকাশ পায়। ভূদেব কহিলেন, ভাল তুমি আমার নিকটে ব্যক্ত কর; আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে রূপে পারি, তোমার দুঃখ দূর করিব। মনস্বী কহিল কিয়ৎক্ষণ পূর্বে, এক রাজকন্যা এই উপবনে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিল; তাহাকে দেখিয়া আমার এই অবস্থা ঘটিয়াছে। অধিক আর কি বলিব, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহাকে না পাইলে, প্রাণত্যাগ করিব।

তখন ভূদেব কহিলেন, তুমি আমার সমভিব্যাহারে চল; যাহাতে তোমার মনোরথ সিদ্ধ হয়, সে বিষয়ে অশেষবিধ যত্ন করিব। আর, যদি তোমার প্রার্থিত সম্পাদনে নিতান্তই কৃতকার্য হইতে না পারি, অন্ততঃ বহুসংখ্যক অর্থ দিয়া বিদায় করিব। মনস্বী কহিল, যদি আমার অভিপ্রেত স্ত্রীরত্নলাভের সদুপায় করিতে পার, তবেই তোমাদের সঙ্গে যাই; নতুবা, ধনের নিমিত্তে আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই। ভূদেব মনস্বীর এই বাক্য শ্রবণ-গোচর করিয়া, ঈষৎ হাস্য করিলেন, এবং, অবশ্যই তোমার মনোরথ সম্পন্ন কবিব, তুমি আমাদের সমভিব্যাহারে চল, এই বলিয়া আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া, তিনি তাহাকে এক একাক্ষর মন্ত্র শিখাইয়া দিলেন; বলিলেন, এই মন্ত্রের উচ্চারণ কবিলে, তুমি ষোড়শবর্ষীয়া কন্যার আকৃতি ধারণ করিবে, এবং ইচ্ছা কবিলেই, পুনর্বার আপন স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে।

মনস্বী মন্ত্রবলে ষোড়শবর্ষীয়া কন্যা হইল। ভূদেব অশীতিবর্ষদেশীয়ের আকার ধারণ করিলেন, এবং মনস্বীকে বধূবেশধারণ করাইয়া, রাজা সুবিচারের নিকটে উপস্থিত হইলেন। রাজা, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দর্শন মাত্র, গাত্রোত্থান করিয়া, প্রণামপূর্বক বসিতে আসন প্রদান করিলেন।

ব্রাহ্মণ, আসনপরিগ্রহ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন, যিনি, এই জগন্মণ্ডল প্রলয়জলধিজলে নিলীন হইলে, মীনরূপধারণ করিয়া ধর্মমূল অপৌরুষেয় বেদের রক্ষা করিয়াছেন, যিনি, ববাহমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া, বিশাল দশনাগ্রভাগ দ্বারা প্রলয়জলনিমগ্ন মেদিনীমণ্ডলের উদ্ধার করিয়াছেন; যিনি কূর্মরূপ অবলম্বন করিয়া, পৃষ্ঠে এই সসাগরা ধরা ধারণ করিয়া আছেন; যিনি, নৃসিংহের আকার স্বীকার করিয়া নখকুলিশপ্রহার দ্বারা বিষম শত্রু হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছেন, যিনি, দৈত্যরাজ বলিকে ছলিবার নিমিত্ত,

বামন অবতার হইয়া, দেবরাজকে পুনর্বার ত্রিলোকীর ইন্দ্রত্বপদে সংস্থাপিত করিয়াছেন; যিনি, জমদগ্নির ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া, পিতৃবধামর্ষে প্রদীপ্ত হইয়া তীক্ষ্ণধার কুঠার দ্বারা মহাবীর্য কার্তবীর্য অর্জুনের ভুজবনচ্ছেদন করিয়াছেন, এবং, একবিংশতি বার পৃথ্বীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া অরাতিশোণিতজলে পিতৃতর্পণ করিয়াছেন; যিনি, দেবতাগণের অভ্যর্থনা অনুসারে, দশরথগৃহে অংশচতুষ্টয়ে অবতীর্ণ হইয়া, বানরসৈন্য সমভিব্যাহারে, সমুদ্রে সেতুবন্ধনপূর্বক দুর্বৃত্ত দশাননের বংশধ্বংস করিয়াছেন; যিনি, দ্বাপরযুগের অন্তে ধর্মসংস্থাপনার্থে যদুবংশে অংশে অবতীর্ণ হইয়া, দৈত্যবধ দ্বারা ভূমির ভার হরিয়া, অশেষ-প্রকার লীলা করিয়াছেন; যিনি, বেদমার্গবিপ্লাবনের নিমিত্ত, বুদ্ধাবতার হইয়া দয়ালুত্ব, জিতেন্দ্রিয়ত্ব প্রভৃতি সদগুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত করিয়াছেন; যিনি সম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ধর্মনিষ্ঠ ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের ভবনে অবতীর্ণ হইয়া, ভুবনমণ্ডলে কল্কী নামে বিখ্যাত হইবেন, এবং অতি দ্রুতগামী দেবদত্ত তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া, করতলে করাল করবাল ধারণপূর্বক, বেদবিদ্বেষী, ধর্মমার্গপরিভ্রষ্ট নষ্টমতি দুরাচারদিগের সমুচিত দণ্ডবিধান করিবেন, সেই ত্রিলোকীনাথ, বৈকুণ্ঠস্বামী, ভূত-ভাবন ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, মহাশয়! কোথা হইতে আসিতেছেন। বৃদ্ধবেশী ভূদেব কহিলেন, মহারাজ! আমি গঙ্গার পূর্বপার হইতে আসিতেছি। ইনি আমার পুত্রবধূ। ইঁহাকে ইঁহার পিত্রালয় হইতে আনিতে গিয়াছিলাম; প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম, মারীভয়ে গ্রামস্থ সমস্ত লোক, স্থানত্যাগ করিয়া দেশান্তরে প্রস্থান করিয়াছে। গৃহে ব্রাহ্মণী ও বিংশতিবর্ষীয় পুত্র রাখিয়া গিয়াছিলাম; তাহারাও, সেই উপদ্রবের সময় দেশত্যাগ করিয়াছে; কোথায় গিয়াছে, কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। জানি না, কত স্থানে ভ্রমণ করিলে, কত কালে তাহাদিগকে দেখিতে পাইব। তাহাদের অদর্শনে, দুঃসহ শোকভারে আক্রান্ত হইয়া, একবারে আমি আহার ও নিদ্রায় বিসর্জন দিয়াছি। এক্ষণে মানস করিয়াছি, পুত্রবধূকে বিশ্বস্তহস্তে ন্যস্ত করিয়া, তাহাদের অন্বেষণে নির্গত হইব। আপনি দেশাধিপতি; আপনকার ন্যায় প্রকৃত বিশ্বাসভাজন কোথায় পাইব। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রত্যাগমন পর্যন্ত, পুত্রবধূটিকে আপনকার আশ্রয়ে রাখুন।

রাজা শুনিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, পরকীয় মহিলা গৃহে রাখা অতি কঠিন কর্ম; কিন্তু, অস্বীকার করিলে ব্রাহ্মণ মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন; অতএব চন্দ্রপ্রভার নিকটে দিয়া, তাহার উপর ইহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দি। এই ব্যবস্থা স্থির করিয়া তিনি ব্রাহ্মণকে কহিলেন, মহাশয়! আপনি যে আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাতে আমি সম্মত হইলাম। ভূদেব, হৃষ্টচিত্তে আশীর্বাদ প্রয়োগপূর্বক রাজার হস্তে পুত্রবধূ ন্যস্ত করিয়া প্রস্থান করিলেন। রাজাও, অনতিবিলম্বে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, কন্যার হস্তে কন্যাবেশধারী মনস্বীর ভার সমর্পণ করিলেন।

রাজকন্যা ব্রাহ্মণবধূকে সমবয়স্কা দেখিয়া, আদরপূর্বক তাহার ভার লইলেন, এবং স্বীয় সহোদরার ন্যায় যত্ন ও স্নেহ করিতে লাগিলেন। সর্বদা একত্র উপবেশন, একত্র ভোজন, এক শয্যায় শয়ন আদি দ্বারা, পরস্পর প্রণয়সঞ্চার হইতে লাগিল। মনস্বী, ক্রমে ক্রমে রাজকন্যার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় হইয়া উঠিল। এক দিবস সে রাজকন্যার মনের ভাব পরীক্ষার্থে, কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল, প্রিয়সখি! তুমি দিবানিশি কি চিন্তা কর, এবং কি নিমিত্তে, দিন দিন দুর্বল হইতেছ, বল।

রাজপুত্রী কহিলেন, সখি! বসন্তকালে একদিন সখীগণ সঙ্গে লইয়া বনবিহারে গিয়াছিলাম। তথায়, দৈবযোগে এক পরম সুন্দর যুবা ব্রাহ্মণকুমার আমার নয়নপথের পথিক হইলেন। তদবধি, তদাসক্তচিত্তা হইয়া তদ্বিরহে দিন দিন এরূপ দুর্বল হইতেছি। দুঃসহ বিরহানল, ক্রমে প্রবল হইয়া নিরন্তর অন্তরদাহ করিতেছে। আমার আহার, বিহার, শয়ন, উপবেশন, কোনও বিষয়েই সুখ নাই। দিবানিশি কেবল সেই মোহিনী মূর্তির চিন্তা করিয়া প্রাণধারণ করিতেছি, এবং চতুর্দিকে তন্ময় দেখিতেছি। তাঁহার নাম ধাম কিছুই জানি না। ভাবিয়া চিন্তিয়া কোনও উপায় স্থির করিতে পারি নাই। নিতান্ত নির্লজ্জা হইয়া কাহারও নিকট মনের বেদনা ব্যক্ত করিতে পারি না। তুমি আমার দ্বিতীয় প্রাণ; তোমার কাছে কোনও কথাই গোপনীয় নাই। তুমি কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাতেই প্রকাশ করিলাম। ফলতঃ, তোমার নিকটে মনের বেদনা ব্যক্ত করিয়াও, অনেক অংশে, স্বাস্থ্যলাভ হইল। তুমি এ বিষয় অতি গোপনে রাখিবে।

এইরূপে রাজকন্যার অভিপ্রায় বুঝিয়া, মনস্বী আনন্দ প্রবাহে মগ্ন হইল, এবং কহিল, প্রিয়সখি! আমি যদি তোমার প্রিয়সমাগম সম্পন্ন করিতে পারি, আমায় কি পারিতোষিক দাও। রাজকন্যা কহিলেন, সখি! অধিক আর কি বলিব, যদি তুমি তাঁহাকে মিলাইয়া দিতে পার, তোমার দাসী হইয়া চিরকাল চরণ সেবা করিব। মনস্বী, তৎক্ষণাৎ আপন স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, প্রিয় সম্ভাষণপূর্বক রাজকুমারীর কর গ্রহণ করিল। রাজকন্যা অসম্ভাবিত প্রিয়সমাগম দ্বারা, মনোরথ নদীর পার প্রাপ্ত হইয়া, প্রথমতঃ বাক্‌পথাতীত হর্ষ, বিস্ময়, লজ্জার উদ্রেক সহকারে, পরম রমণীয় অনির্বচনীয় দশান্তর প্রাপ্ত হইলেন; অনন্তর, লজ্জাভঙ্গ হইলে, মনস্বীর রূপান্তরপ্রতিপত্তিরূপ অদ্ভুত ব্যাপারের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য, একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সে আপন বিচেতনদশা অবধি, ভূদেবেরা, তিরস্করণী বিদ্যাপ্রদান পর্যন্ত, আদ্যোপ্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত রাজকন্যার গোচর করিয়া গান্ধর্ব বিধানে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিল।

কিছু দিনের পর, রাজকুমারী অন্তর্বত্নী হইলেন। এই সময়ে, এক দিন, রাজা সুবিচার সপরিবার অমাত্য ভবনে নিমন্ত্রিত হইলেন। রাজকন্যা, এক নিমিষের নিমিত্তেও, ব্রাহ্মণবধূকে নয়নের বহির্বর্তিনী করিতেন না; সুতরাং তিনি অমাত্য ভবনপ্রস্থানকালে,

তাহারে সমভিব্যাহারে লইয়া গেলেন। অমাত্যপুত্র, ব্রাহ্মণবধূর অসামান্য রূপ লাবণ্য দর্শনে, মোহিত হইল; এবং নিতান্ত অধৈর্য হইয়া, আপন মিত্রের নিকটে কহিল, যদি এই স্ত্রীরত্ন হস্তগত না হয়, প্রাণত্যাগ করিব। ফলতঃ, ক্রমে ক্রমে, মন্ত্রিপুত্রের বিরহবেদনা এরূপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, যে কেবল দশমী দশা মাত্র অবশিষ্ট রহিল।

তখন তাহার মিত্র অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া, অমাত্যের নিকট গিয়া, তদীয় অবস্থা ও প্রার্থনা জানাইল। অমাত্য, অপত্যস্নেহের আতিশয্যবশতঃ উচিতানুচিতবিবেচনায় বিসর্জন দিয়া, রাজসমীপে সবিশেষ সমস্ত নির্দেশপূর্বক ব্রাহ্মণ বধূপ্রাপ্তির প্রার্থনা জানাইলেন। রাজা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কহিলেন, অবে মূর্খ! স্থাপিত ধন, স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে, অন্যকে দেওয়া সর্বতোভাবে অতি গর্হিত কর্ম। বিশেষতঃ, ব্রাহ্মণ কোনও কালে কোনও ক্রমে, ব্যতিক্রমের আশঙ্কা নাই জানিয়া বিশ্বাস করিয়া, আমার হস্তে পুত্রবধূ সমর্পণ করিয়া গিয়াছে। বিশ্বাসভঙ্গ, শাস্ত্র ও লোকাচাব অনুসারে যার পব নাই, গর্হিত ব্যবহার। আমি তোমার অনুরোধে, এইরূপ দুষ্ক্রিয়ায়, প্রাণান্তেও প্রবৃত্ত হইতে পারিব না। মন্ত্রী শুনিয়া, নিরাশ হইয়া, গৃহে প্রতিগমন করিলেন; কিন্তু পুত্রের তাদৃশী দশা দর্শনে, নিতান্ত কাতর হইয়া আহার নিদ্রা পরিহারপূর্বক, বিষাদ-সাগবে মগ্ন হইলেন।

সর্বাধিকাবী ক্রমে ক্রমে, পুত্রের তুল্য দশা প্রাপ্ত হইলে, রাজকার্যব্যাঘাতের উপক্রম দেখিয়া, অন্যান্য প্রধান রাজপুরুষেরা রাজার নিকটে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! মন্ত্রিপুত্রেব যাদৃশী অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে তাহার জীবনরক্ষা হওয়া কঠিন। যেরূপ দেখিতেছি, তাহার কোনও অমঙ্গল ঘটিলে, মন্ত্রীও অবধারিত প্রাণত্যাগ করিবেন। এরূপ সর্বাংশে কর্মদক্ষ কার্যসহায় দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই; সুতরাং রাজকার্যনির্বাহ বিষয়ে বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবেক। অতএব, আমরা বিনয়বাক্যে প্রার্থনা কবিতেছি, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পুত্রবধূকে অমাত্যপুত্রের নিকট প্রেরিত করুন। বহুদিন হইল ব্রাহ্মণের উদ্দেশ নাই; আর তাঁহার আসিবার সম্ভাবনা, কোনও ক্রমে, বোধগম্য হইতেছে না; যদিও কালান্তরে প্রত্যাগমন করেন; ব্রাহ্মণজাতি সাতিশয় অর্থলোভী; বহুসংখ্যক অর্থ দিয়া, তুষ্ট করিয়া, অনায়াসে বিদায় করিতে পারিবেন; অথবা কন্যান্তর সঙ্ঘটন করিয়া, তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিয়াও তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারা যাইবেক।

রাজা, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, অবশেষে, ব্রাহ্মণবধূব নিকটে গিয়া মন্ত্রিপুত্রের প্রার্থনা জানাইলেন। কপটচারী বধূবেশধারী মনস্বী নিবেদন করিল, মহারাজ! আপনি দেশা-ধিপতি; আপনকার ইচ্ছা, সর্বকাল সর্ববিষয়ে সর্বাংশে বলবতী; বিশেষতঃ, এক্ষণে আমি আপনকার আশ্রয়ে আছি; আপনকার আজ্ঞাপ্রতিপালন, আমার পক্ষে সর্বতোভাবে, সম্পূর্ণ উচিত কর্ম। কিন্তু মহারাজ! বিবেচনা করুন, আমি বিবাহিতা নারী; বিবাহিতা

নারীর পুরুষান্তরসেবা শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও লোকাচারবিরুদ্ধ। আপনি দণ্ডধারী হইয়া কি রূপে, ঈদৃশ বিসদৃশ আজ্ঞা করিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না। মহারাজ! আমি; প্রাণান্তেও পরপুরুষের মুখ দেখিব না। রাজা শুনিয়া, নিরতিশয় বিষণ্ণ, হতবুদ্ধি, ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন।

মনস্বী, আর এখানে থাকায় ভদ্রস্থতা নাই, অতঃপর পলায়ন করাই সর্বাংশে শ্রেয়। এই স্থির করিয়া বধূবেশপরিত্যাগপূর্বক, কৌশলক্রমে রাজবাটী হইতে পলায়ন করিল। রাজা, ব্রাহ্মণবধূর অদর্শনবৃত্তান্ত অবগত হইয়া এক বারে বিষাদপারাবারে মগ্ন হইলেন; এবং ভাবিতে লাগিলেন, এ আবার এক বিষম সর্বনাশ উপস্থিত হইল; ব্রাহ্মণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, কি উত্তর দিব; ব্রাহ্মণবধূর নিকট ওরূপ অনুচিত প্রস্তাব করাই অতি অসঙ্গত কর্ম হইয়াছে। যদর্থে প্রার্থনা করিলাম, তাহাও সিদ্ধ হইল না; অথচ ঘোরতর বিপদে পড়িলাম।

এদিকে মনস্বী, ভূদেবের নিকটে গিয়া পূর্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, তিনি অতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হইলেন, এবং স্বীয় সহচর শশীকে বিংশতিবর্ষীয় পুত্র সাজাইয়া, স্বয়ং পূর্ববৎ বৃদ্ধবেশধারণপূর্বক রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজা, প্রণাম ও স্বাগতপ্রশ্ন-পূর্বক বসিতে আসন দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়ের এত বিলম্ব হইল কেন। ভূদেব কহিলেন, মহারাজ, বিলম্বের কথা কেন জিজ্ঞাসা করেন। অনেক কষ্টে, অনেক অন্বেষণ করিয়া পুত্র পাইয়াছি। এক্ষণে পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া, গৃহে যাইব। রাজা, ব্রহ্মশাপভয়ে কম্পিত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিলেন।

ব্রাহ্মণ শুনিয়া কোপে কম্পমানকলেবর হইলেন, এবং শাপপ্রদানে উদ্যত হইয়া কহিলেন, তোমার একি ব্যবহার; আমি তোমাকে রাজা জানিয়া, বিশ্বাস করিয়া তোমার হস্তে পুত্রবধূসমর্পণ করিয়াছিলাম। তুমি আপন ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত যথেচ্ছ বিনিয়োগে প্রবৃত্ত হইয়া, আমার সর্বনাশ করিয়াছ। বলিতে কি, কোনও কালে, আমার এ মনোবেদনা দূর হইবেক না। রাজা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি ভীত হইলেন, এবং অশেষপ্রকার স্তুতি ও বিনীতি করিয়া কহিলেন, মহাশয়! কৃপা করিয়া আমায় ক্ষমা করিতে হইবেক, আপনকার যে অপকার করিয়াছি, তাহার প্রতিক্রিয়ার্থে যে আজ্ঞা করিবেন, দ্বিরুক্তি না করিয়া, তাহাতেই সম্মত হইব। ভূদেব কহিলেন, যদি তুমি আমার পুত্রের সহিত আপন কন্যায় বিবাহ দাও, তাহা হইলে আমি কথঞ্চিৎ ক্ষমা করিতে পারি।

রাজা ব্রহ্মকোপানলে কুলক্ষয়ভয়ে, তৎক্ষণাৎ তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; এবং জ্যোতির্বিদ ব্রাহ্মণ দ্বারা শুভদিন ও শুভলগ্ন নির্ধারিত করিয়া, ব্রাহ্মণতনয়ের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। ভূদেব রাজকন্যা লইয়া আলয়ে উপস্থিত হইলে, শশী ও মনস্বী, উভয়ে, এই ভার্যা আমার আমার বলিয়া পরস্পর বিষম-বিবাদ আরম্ভ করিল। মনস্বী কহিল,

আমি পূর্বে ইহার পাণিগ্রহণ করিয়াছি, এবং আমার সহযোগে, ইহার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে। শশী কহিলেন, রাজা সর্বসমক্ষে আমাকে কন্যাদান করিয়াছেন।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! এক্ষণে এই কন্যা, শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে কাহার সহধর্মিণী হইতে পারে। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, আমার মতে মনস্বীর। বেতাল কহিল, শাস্ত্রে লিখিত আছে, কন্যার দান, বিক্রয়, পরিত্যাগে পিতামাতার সম্পূর্ণ অধিকার। রাজা সর্বসমক্ষে ধর্ম সাক্ষী করিয়া, শশীকে কন্যা দান করিয়াছেন। অতএব পিতৃদত্তা কন্যা শশীরই সহধর্মিণী হইতে পারে; তাহা না হইয়া, মনস্বীর কেন হইবেক বল। রাজা কহিলেন, তুমি যাহা কহিতেছ, তাহার যথার্থতা বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু মনস্বী পূর্বে বিবাহ করিয়াছে, এবং তাহার সহযোগে, রাজকন্যার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে। এমন স্থলে সে মনস্বীর সহচারিণী হইলে, তাহারও সতীত্বরক্ষা হয়, ধর্মেরও মান থাকে।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

পঞ্চদশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

ভারতবর্ষের উত্তর সীমায়, হিমালয় নামে অতি প্রসিদ্ধ পর্বত আছে। তাহার প্রস্থদেশে পুষ্পপুর নামে, পরম রমণীয় নগর ছিল। গন্ধর্বরাজ জীমূতকেতু ঐ নগরে রাজত্ব করিতেন। তিনি পুত্রকামনা করিয়া বহুকাল, কল্পবৃক্ষের আরাধনা করিয়াছিলেন। কল্পবৃক্ষ প্রসন্ন হইয়া বরপ্রদান করিলে, রাজা জীমূতকেতুর এক পুত্র জন্মিল। তিনি পুত্রের নাম জীমূতবাহন রাখিলেন। জীমূতবাহন স্বভাবতঃ, সাতিশয় ধর্মশীল, দয়াবান ও ন্যায়-পরায়ণ ছিলেন; এবং স্বল্প পরিশ্রমে, স্বল্পকাল মধ্যে, সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী ও শাস্ত্রবিদ্যায় বিশারদ হইয়া উঠিলেন।

কিয়ৎ কাল পরে রাজা জীমূতকেতু, পুনরায় কল্পবৃক্ষকে প্রসন্ন করিয়া এই বরপ্রার্থনা করিলেন, আমার প্রজারা সর্বপ্রকার সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ হউক। কল্পবৃক্ষের বরদান দ্বারা, তদীয় প্রজাবর্গ সর্বপ্রকার সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ হইল, এবং ঐশ্বর্যমদে মত্ত হইয়া রাজাকেও তৃণজ্ঞান করিতে লাগিল। ফলতঃ, অল্পকাল মধ্যে রাজা ও প্রজা বলিয়া, কোনও অংশে, কোনও বিশেষ রহিল না। তখন জীমূতকেতুর জ্ঞাতিবর্গ গোপনে পরামর্শ করিল, ইহারা পিতা পুত্রে অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া দিবানিশি কেবল ধর্মচিন্তায় কালযাপন করিতেছে; রাজ্যের দিকে ক্ষণমাত্রও দৃষ্টিপাত করে না। প্রজা সকল উচ্ছৃঙ্খল হইতে লাগিল। অতএব, ইহাদের উভয়কে রাজ্যচ্যুত করিয়া যাহাতে উপযুক্তরূপে রাজ্যশাসন

হয়, এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। অনন্তর, বহুতর সৈন্যসংগ্রহপূর্বক তাহারা রাজপুরীর চতুর্দিক নিরুদ্ধ করিল।

এই ব্যাপার দেখিয়া, যুবরাজ জীমূতবাহন পিতার নিকট নিবেদন করিলেন, মহারাজ! জ্ঞাতিবর্গ একবাক্য হইয়া, আমাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিবার অভিসন্ধিতে, এই উদ্যোগ করিয়াছে। আপনকার আজ্ঞা পাইলে, রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া বিপক্ষপক্ষের সৈন্যক্ষয় ও সমুচিত দণ্ডবিধান করি।

জীমূতকেতু কহিলেন, এই ক্ষণভঙ্গুর পাঞ্চভৌতিক দেহ অতি অকিঞ্চিৎকর; বিনশ্বর রাজপদের নিমিত্ত, বহুসংখ্যক জীবের প্রাণহিংসা করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হওয়া উচিত নহে। ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির, আত্মীয়গণের কুমন্ত্রণায়, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, পশ্চাৎ অনেক অনুতাপ করিয়াছিলেন। অতএব রাজপদপরিত্যাগ করিয়া কোনও নিভৃত স্থানে গিয়া প্রশান্ত মনে দেবতার আরাধনা করা ভাল। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া পিতাপুত্রে নগর হইতে বহির্গত হইলেন; এবং মলয় পর্বতে গিয়া, তদীয় অধিত্যকায় কুটীর নির্মাণপূর্বক তপস্যা করিতে লাগিলেন।

এক ঋষিকুমারের সহিত, রাজকুমারের অতিশয় বন্ধুত্ব জন্মিল। একদিন, দুই বন্ধুতে একত্র হইয়া ভ্রমণার্থে নির্গত হইলেন অনতিদূরে কাত্যায়নীর মন্দির ছিল; শ্রবণমনোহর বীণাশব্দ শ্রবণগোচর করিয়া, তাঁহারা, কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে, সত্বর গমনে, তথায় উপস্থিত হইয়া, দেখিলেন, এক পরম সুন্দরী কন্যা, বীণানুগত স্তুতিগর্ভ গীত দ্বারা, কাত্যায়নীর উপাসনা করিতেছে। উভয়ে একতানমনা হইয়া, শ্রবণ ও দর্শন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, সেই কন্যা, জীমূতবাহনকে নয়নগোচর করিয়া, মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ, এবং স্বীয় সহচরী দ্বারা তাঁহার নাম, ধাম, ব্যবসায় প্রভৃতির পরিচয় গ্রহণপূর্বক, প্রস্থান করিল।

অনন্তর, তাহার সহচরী, তদীয় নির্দেশ ক্রমে, তাহার মাতার নিকট পূর্বাপর সমস্ত নিবেদন করিলে, তিনি স্বীয় পতি রাজা মলয়কেতুর নিকটে কন্যার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। মলয়কেতুর আপন পুত্র মিত্রাবসুকে কহিলেন, তোমার ভগিনী বিবাহযোগ্যা হইয়াছে; আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে; উপযুক্ত পাত্রের অন্বেষণ করা আবশ্যক। শুনিলাম, গন্ধর্বাধিপতি রাজা জীমূতকেতু, রাজ্যাধিকারপরিহার পূর্বক, নিজ পুত্র জীমূতবাহন মাত্র সমভিব্যাহারে, মলয়াচলে অবস্থিতি করিতেছেন। আমার অভিপ্রায় জীমূতবাহনকে কন্যা দান করি। তুমি, রাজা জীমূতকেতুর নিকটে গিয়া, আমার এই অভিপ্রায় তাঁহার গোচর কর।

মিত্রাবসু, পিতার আদেশ অনুসারে, জীমূতকেতুর সমীপে উপস্থিত হইয়া, সবিশেষ সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন; এবং জীমূতবাহনকে, মিত্রাবসুর

সমভিব্যাহারে, মলয়কেতুর নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। মলয়কেতু, শুভ লগ্নে, স্বীয় কন্যা মলয়বতীর বিবাহকার্য সম্পন্ন করিলেন। বর ও কন্যা, পরম সুখে, কালযাপন করিতে লাগিলেন।

একদিন, জীমূতবাহন ও মিত্রাবসু, উভয়ে, মলয় মহীধরের পরিসরে, পরিভ্রমণবাসনায়, বাসস্থান হইতে বহির্গত হইলেন। ভূধরের উভয় ভাগে উপস্থিত হইয়া, দূর হইতে এক শ্বেতবর্ণ বস্তুরাশি নয়নগোচর করিয়া, জীমূতবাহন মিত্রাবসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! গণ্ডশৈলের ন্যায়, ধবলবর্ণ, রাশিকৃত কি বস্তু দৃষ্ট হইতেছে। মিত্রাবসু কহিলেন, মিত্র! পূর্বকালে, গরুড়ের সহিত, নাগগণের নিরন্তর ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে, নাগেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া, সন্ধিপ্রার্থনা করিলে, গরুড় কহিলেন, যদি তোমরা, আমার দৈনন্দিন আহারের নিমিত্ত, এক এক নাগ উপহার দিতে পার, তাহা হইলে, আমি তোমাদের প্রার্থনায় সম্মত হই; নতুবা, অবিলম্বে নাগকুল নিঃশেষ করিব। নিরুপায় নাগেরা, তাহাতেই সম্মত হইল। তদবধি, প্রতিদিন এক এক নাগ, পাতাল হইতে আসিয়া, ঐ স্থানে উপস্থিত থাকে; গরুড, মধ্যাহ্নকালে আসিয়া, ভক্ষণ করেন এইরূপে, ভক্ষিত নাগগণেব অস্থি দ্বারা, ঐ পর্বতাকার ধবলরাশি প্রস্তুত হইয়াছে।

শ্রবণ মাত্র, জীমূতবাহনের অন্তঃকরণ কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ হইল। তখন তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, মধ্যাহ্নকাল আগতপ্রায় অবশ্যই এক নাগ, গরুড়ের আহারার্থে, পর্যায়ক্রমে, উপস্থিত হইবেক; আমি, আপন প্রাণ দিয়া, তাহার প্রাণরক্ষা করিব। অনন্তর, কৌশল ক্রমে শ্যালককে বিদায় করিয়া, ক্রমে ক্রমে অস্থিরাশির নিকটবর্তী হইয়া, জীমূতবাহন রোদনশব্দশ্রবণ করিলেন; এবং সত্বর গমনে, রোদনস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক বৃদ্ধা নাগী, শিরে করাঘাতপূর্বক হাহাকার ও উচ্চৈঃস্বরে রোদন কবিতেছে। দেখিয়া, একান্ত শোকাক্রান্ত হইয়া তিনি কাতর বচনে নাগীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! তুমি নিমিত্তে রোদন করিতেছ। সে গরুড়বৃত্তান্তের বর্ণন করিয়া কহিল, অদ্য আমার পুত্র শঙ্খচূড়ের বার; ক্ষণকাল পরেই গরুড় আসিয়া, আহারার্থে তাহার প্রাণসংহার করিবেক। আমার দ্বিতীয় পুত্র নাই। আমি, সেই দুঃখে দুঃখিত হইয়া রোদন করিতেছি। জীমূতবাহন কহিলেন, মা। আর রোদন করিও না; আমি, আপন প্রাণ দিয়া, তোমার পুত্রের প্রাণরক্ষা করিব। নাগী কহিল, বৎস! তুমি, কি কারণে, পরের জন্যে প্রাণত্যাগ করিবে। আর, পরের পুত্রের প্রাণ দিয়া, আপন পুত্রের প্রাণরক্ষা করিলে, আমারও ঘোরতর অধর্ম ও যারপর নাই অপযশ হইবেক।

এইরূপে উভয়ের কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে শঙ্খচূড়ও তথায় উপস্থিত হইল; এবং, জীমূতবাহনের অভিসন্ধি শুনিয়া, তাঁহার পরিচয়গ্রহণপূর্বক, বিশেষজ্ঞ হইয়া কহিল, মহারাজ! আপনি অন্যায় আজ্ঞা করিতেছেন। বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমার মত কত

শত ব্যক্তি সংসারে জন্মিতেছে ও মরিতেছে কিন্তু আপনকার ন্যায় ধর্মাত্মা দয়ালু সংসারে সর্বদা জন্মগ্রহণ করেন না। অতএব, আমার পরিবর্তে আপনকার প্রাণত্যাগ করা, কোনও ক্রমে, উচিত নহে। আপনি জীবিত থাকিলে, লক্ষ লক্ষ লোকের মহোপকার হইবেক। আমি জীবিত থাকিয়া, কোনও কালে, কাহারও কোনও উপকার করিতে পারিব না। মাদৃশ ব্যক্তির জীবন মরণ দুই তুল্য।

জীমূতবাহন কহিলেন, শুন শঙ্খচূড়! প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আপন প্রাণ দিয়া, তোমার প্রাণরক্ষা করিব। আমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ক্ষত্রিয়েরা, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অপেক্ষা, প্রাণত্যাগ অতি লঘু ও সহজ জ্ঞান করেন। বিশেষতঃ, প্রাণস্নেহে প্রতিজ্ঞা-প্রতিপালনে পারাঙ্মুখ হইলে নরকগামী হইতে হয়। অতএব, যখন স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছি, তখন অবশ্যই প্রাণ দিয়া, তোমার প্রাণরক্ষা করিব; তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কব। এইরূপ বলিয়া, তিনি শঙ্খচূড়কে বিদায় করিলেন; এবং, তদীয় প্রতিশীর্ষ হইয়া, গরুড়ের আগমন প্রতীক্ষায়, নির্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট রহিলেন। শঙ্খচূড, জীমূতবাহনের নির্বন্ধলঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া, বিষণ্ণ মনে, বিরস বদনে, মলয়াচলবাসিনী কাত্যায়নীর সম্মুখে উপস্থিত হইল; এবং একাগ্রচিত্ত হইয়া, জীবনদাতা জীমূতবাহনের জীবনরক্ষণের উপায়প্রার্থনা করিতে লাগিল।

নিরূপিত সময় উপস্থিত হইলে, গরুড আসিয়া, চঞ্চুপুট দ্বারা জীমূতবাহন গ্রহণ-পূর্বক, নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইয়া, মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কিয়ংক্ষণ পরে, জীমূতবাহনের দক্ষিণবাহুস্থিত নামাঙ্কিত মণিময় কেয়ূর শোণিতলিপ্ত হইযা, মলয়বতীর সম্মুখে পতিত হইল। মলয়বতী, নামাক্ষরপরিচয় দ্বারা, প্রিয়তমের প্রাণাত্যয় স্থির করিয়া, শিরে করাঘাতপূর্বক, ভূতলে পতিত হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, কেয়ূর দর্শনে সাতিশয় বিষণ্ণ হইযা, হাহাকার করিতে লাগিলেন। রাজা মলয়কেতু, চতুর্দিকে বহুসংখ্যক লোক প্রেরিত কবিয়া, পরিশেষে স্বয়ং, পুত্র সহিত জীমূতবাহনের অন্বেষণে নির্গত হইলেন।

শঙ্খচূড, কাত্যায়নীর আলয় হইতে রাজপরিবাবের কোলাহলশ্রবণ করিয়া, সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা, জীমূতবাহনের অমঙ্গল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে পূর্বস্থানে উপস্থিত হইল; এবং গরুড়কে সম্বোধন করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, অহে বিহঙ্গরাজ! তুমি শঙ্খচূড়ভ্রমে, রাজা জীমূতবাহনকে লইয়া গিয়াছ; উনি তোমার ভক্ষ্য নহেন। আমার নাম শঙ্খচূড়; অদ্য আমার বার। তুমি, তাঁহারে পরিত্যাগ করিয়া, আমায় ভক্ষণ কর; নতুবা, তোমায় সাতিশয় অধর্মগ্রস্ত হইতে হইবেক।

গরুড় শুনিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইলেন; এবং মৃতকল্প জীমূতবাহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে মহাপুরুষ! তুমি কে, কি নিমিত্তে প্রাণদানে উদ্যত হইয়াছ। জীমূতবাহন

আত্মপরিচয়প্রদানপূর্বক, কহিলেন, অদ্য বা অব্দশতান্তে, অবশ্যই মৃত্যু ঘটিবেক। যে ব্যক্তি, ক্ষণবিধ্বংসী তুচ্ছ শরীরের বিনিয়োগ দ্বারা, পরোপকার করিয়া, দিগন্ত-ব্যাপিনী ও অনন্তকালস্থায়িনী কীর্তি উপার্জন করে, তাহারই এই সংসারে জন্মগ্রহণ সার্থক ; নতুবা, স্বোদরপরায়ণ কাক, কুক্কুর, শৃগাল প্রভৃতি হইতে বিশেষ কি। এই বিবেচনায় আমি আত্মপ্রাণব্যয় দ্বারা, শঙ্খচূড়ের প্রাণরক্ষা করিতে আসিয়াছি। গরুড় শুনিয়া, যারপর নাই, সন্তুষ্ট হইলেন, এবং জীমূতবাহনকে শত শত সাধুবাদপ্রদান করিয়া কহিলেন, জগতে জীব মাত্রেই স্ব স্ব প্রাণরক্ষায় যত্নবান। কিন্তু আপন প্রাণ দিয়া, পরের প্রাণরক্ষা করে, এরূপ ব্যক্তি অতি বিরল। যাহা হউক, আমি তোমার দয়া ও সাহস দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি ; বর প্রার্থনা কর।

জীমূতবাহন কহিলেন, খগেশ্বর! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, এই বর দাও, তুমি অতঃপর আর নাগহিংসা করিবে না ; এবং দীর্ঘকাল ভক্ষণ করিয়া, যে অসংখ্য নাগের প্রাণসংহার করিয়াছ, তাহাদেরও জীবনদান কর। গরুড়, তথাস্তু বলিয়া, তৎক্ষণাৎ পাতাল হইতে অমৃত আহরণপূর্বক, অস্থিস্তূপের উপর সেচন করিয়া, মৃত নাগগণের জীবনদান করিলেন ; এবং জীমূতবাহনকে কহিলেন, রাজকুমার! আমার প্রসাদে, তোমাদের অপহৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধার হইবেক। এইরূপ বরদান করিয়া, গরুড় অন্তর্হিত হইলে, শঙ্খচূড়ও জীমূত-বাহনের বহুবিধ স্তুতি করিয়া, বিদায় লইয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

জীমূতবাহন, এইরূপ বরলাভে চরিতার্থ হইয়া, পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলেন ; এবং লোক দ্বারা, শ্বশুরালয়ে স্বীয় মঙ্গলসংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাদের রাজ্যাপহারক জ্ঞাতিবর্গ, বরপ্রদানবৃত্তান্ত অবগত হইয়া, রাজা জীমূতকেতুর শরণাগত হইল ; এবং, স্তুতি ও বিনতি দ্বারা প্রসন্ন করিয়া, তাঁহাকে রাজপদে পুনঃস্থাপিত করিল।

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! জীমূতবাহন ও শঙ্খচূড়, এ উভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তির অধিক ভদ্রতাপ্রকাশ হইল। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, শঙ্খচূড়ের। বেতাল কহিল, কি প্রকারে। রাজা কহিলেন, শঙ্খচূড়, জীমূতবাহনের প্রাণদান বিষয়ে, প্রথমতঃ কোনও মতে সম্মত হয় নাই ; পরিশেষে, সম্মত হইয়াও, কাত্যায়নীর নিকটে গিয়া, উপকারকের মঙ্গলপ্রার্থনা করিতে লাগিল ; এবং, পুনরায় আসিয়া, প্রাণদানে উদ্যত হইয়া, জীমূতবাহনের প্রাণরক্ষা করিল। বেতাল কহিল, যে ব্যক্তি পরার্থে প্রাণদান করিল, তাহার ভদ্রতা অধিক বলিয়া গণ্য হইল না কেন। রাজা কহিলেন, জীমূতবাহন ক্ষত্রিয়জাতি ; ক্ষত্রিয়েরা প্রাণত্যাগ অতি অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করে। অতএব, এই জীবন-দান, জীমূতবাহনের পক্ষে, তাদৃশ দুষ্কর নহে।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

ষোড়শ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

চন্দ্রশেখর নগরে রত্নদত্ত নামে বণিক বাস করিত। তাহার উন্মাদিনী নামে পরম সুন্দরী কন্যা ছিল। সে বিবাহযোগ্য হইলে, তাহার পিতা, তত্রত্য নরপতির নিকটে গিয়া, নিবেদন করিল, মহারাজ! আমার এক সুরূপা কন্যা আছে; যদি আপনকার অভিরুচি হয়, গ্রহণ করুন; নতুবা, অন্য ব্যক্তিকে দিব।

রাজা, দুই তিন বয়োবৃদ্ধ প্রধান রাজপুরুষদিগকে, উন্মাদিনীর লক্ষণপরীক্ষার্থে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা, রাজকীয় আদেশ অনুসারে, রত্নদত্তের আলয়ে উপস্থিত হইলেন; এবং, উন্মাদিনীকে ইন্দ্রের অপ্সরা অপেক্ষাও অধিকতর রূপবতী ও সর্বপ্রকারে সুলক্ষণা দেখিয়া, পরামর্শ করিলেন, এই কন্যা মহিষী হইলে, রাজা, ইহার নিতান্ত বশতাপন্ন হইয়া, একবারেই রাজ্যচিন্তা পরিত্যাগ করিবেন। অতএব উত্তম কল্প এই, রাজার নিকটে কুরূপা ও কুলক্ষণা বলিয়া পরিচয় দেওয়া যাউক। অনন্তর, তাঁহারা রাজসমীপে পরামর্শানুরূপ সংবাদ দিলে, তিনি, তদীয় বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, অস্বীকার করিলেন। তখন রত্নদত্ত, সৈন্যাধ্যক্ষ বলভদ্রবর্মার সহিত, আপন কন্যার বিবাহ দিল।

একদিন, রাজা, নগরভ্রমণে নির্গত হইয়া, সেনাপতির বাটীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে, উন্মাদিনী, মনোহর বেশভূষা করিয়া, অট্টালিকার উপরি দেশে দণ্ডায়মান ছিল। রাজা, উন্মাদিনীকে নয়নগোচর করিয়া, মোহিত ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া, তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগমন করিলেন। রাজাকে সহসা প্রত্যাগত বিচেতনপ্রায় দেখিয়া, এক প্রিয় পার্শ্বচর জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! কি নিমিত্তে আজ আপনাকে নিতান্ত চলচিত্ত দেখিতেছি। রাজা কহিলেন, অদ্য বলভদ্রের ভবনে একটি স্ত্রীলোক দেখিলাম; তদীয় লোকাতীত রূপলাবণ্য দর্শনে, আমার মন মোহিত হইয়াছে, ও আমি এইরূপ বিকলচিত্ত হইয়াছি।

পার্শ্বচর কহিল, মহারাজ! যাহাকে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, সে রত্নদত্তের কন্যা; তাহার নাম উন্মাদিনী। আপনি অস্বীকার করাতে, সেনাপতি বলভদ্রের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। রাজা কহিলেন, আমি যাহাদিগকে ঐ কন্যার রূপ ও লক্ষণ দেখিতে পাঠাইয়াছিলাম, বুঝিলাম, তাহারা প্রতারণা করিয়াছে। অনন্তর, রাজার আহ্বান অনুসারে, রাজপুরুষেরা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, দেখ, আজ আমি, নগরভ্রমণে নির্গত হইয়া, রত্নদত্তের কন্যাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। জন্মাবচ্ছিন্নে তাহার ন্যায় সুরূপা সুলক্ষণা নারী আমার নয়নগোচর হয় নাই। তবে তোমরা, কি নিমিত্তে, তৎকালে তাহাকে কুরূপা ও কুলক্ষণা বলিয়া, আমায় তাদৃশ স্ত্রীরত্নলাভে বঞ্চিত করিলে।

রাজপুরুষেরা কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন, মহারাজ! যে আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা যথার্থ বটে। কিন্তু তৎকালে আমরা বিবেচনা করিয়াছিলাম, এরূপ সুরূপা কন্যা মহিষী হইলে, মহারাজ, রাজকার্য পরিত্যাগ করিয়া, অহোরাত্র অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিবেন। তাহাতে রাজ্যভঙ্গের সম্ভাবনা। এই আশঙ্কায়, আমরা ঐ কন্যাকে, মহারাজের নিকট, কুরূপা ও কুলক্ষণা বলিয়াছিলাম। ইহাতে আমাদের যে অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয়। রাজা, তোমরা যাহা কহিলে, তাহা সর্বতোভাবে ন্যায়ানুগত বটে; ইহা কহিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। কিন্তু আপনি, নিতান্ত বিচেতন হইয়া, দিন যামিনী, কেবল উন্মাদিনী, চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন। রাজার এই অবস্থা কর্ণপরম্পরায় নগরমধ্যে প্রচারিত হইলে, সেনাপতি বলভদ্র বর্মা, রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! বলভদ্র আপনকার দাস, উন্মাদিনী দাসী। দাসীর নিমিত্তে ঈদৃশ ক্লেশস্বীকারের আবশ্যকতা কি। মহারাজের আজ্ঞা হইলেই, সে উপস্থিত হইতে পারে।

রাজা শুনিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন; এবং, কহিলেন, আমার কি ধর্মজ্ঞান নাই যে, পরস্ত্রীস্পর্শ দ্বারা পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইব। শাস্ত্রকারেরা পরস্ত্রীতে মাতৃদৃষ্টি করিতে কহিয়াছেন। বলভদ্র কহিলেন, মহারাজ! শাস্ত্রকারেরা ইহাও নির্দিষ্ট করিয়াছেন, পত্নীর উপর পরিণেতার সর্বতোমুখী প্রভুতা আছে। তদনুসারে, আমি আপনাকে উন্মাদিনী দান করিতেছি; তাহা হইলে আর মহারাজের পরস্ত্রীস্পর্শদোষের আশঙ্কা থাকিতেছে না। রাজা কহিলেন, যাহাতে সমস্ত সংসারে অপযশ হইবেক, প্রাণান্তেও আমি এরূপ কর্ম করিব না। যশোধনেরা, পঞ্চীকৃতভূতপঞ্চময় ক্ষণবিনশ্বর শরীরের অনুরোধে, অবিনশ্বর যশঃশরীরের অপক্ষয় করেন না।

সেনাপতি কহিলেন, মহারাজ! আমি তাহাকে, গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া, অন্যস্থানে রাখিব; তাহা হইলে সে সাধারণ স্ত্রী হইবেক; তখন আর অপযশের আশঙ্কা কি। রাজা, শুনিয়া, পূর্ব অপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া, কহিলেন, যদি তুমি পতিব্রতা কামিনীকে কুলটা কর, আমি তোমার গুরুতর দণ্ডবিধান করিব, এবং জন্মাবচ্ছিন্নে আর মুখাবলোকন করিব না। তখন বলভদ্র, ভীত ও নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। কিন্তু উন্মাদিনীচিন্তা, কালস্বরূপিনী হইয়া, দশম দিবসে রাজার প্রাণসংহার করিল।

প্রভুভক্ত বলভদ্র, এবংবিধ ধর্মশীল স্বামীর প্রাণবিনাশ সংবাদ শ্রবণে, সাতিশয় শোক ও পরিতাপ প্রাপ্ত হইয়া, মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এতাদৃশ প্রভুর লোকান্তর গমনের পর, আর জীবন ধারণের প্রয়োজন কি। বিবেচনা করিলে, আমার নিমিত্তেই স্বামীর এই অকালমৃত্যু হইল। জানি না, জন্মান্তরে, এই পাপে, আমায় কত যাতনাভোগ

করিতে হইবেক। এক্ষণে, প্রাণত্যাগরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, আত্মাকে বিশুদ্ধ করি। এইরূপ অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া, তিনি প্রেতভূমিতে উপস্থিত হইলেন, এবং চিতা প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়া, সূর্যদেবের অভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া, প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, ভগবান ভাস্কর! আমি, কৃতাঞ্জলি হইয়া, একাগ্রচিত্তে, প্রার্থনা করিতেছি, যেন জন্মে জন্মে এইরূপ ধর্মপরায়ণ প্রভু পাই।

এই বলিযা, বলভদ্র প্রজ্বলিত চিতায় আরোহণ করিলে, তাহার পত্নী উন্মাদিনী মনে মনে বিবেচনা করিল, আমার আর জীবনধারণের প্রয়োজন কি; বরং সহগমন অবলম্বন করিলে, পরকালে সদ্গতি পাইব। ধর্মশাস্ত্র প্রবর্তকেরা কহিয়াছেন, সহগমন স্ত্রীলোকেব পরম ধর্ম। নারী, চিরকাল দুশ্চারিণী হইলেও, সহগমনবলে, স্বামীর সহিত স্বর্গলোকে, অনন্তকাল, সুখসম্ভোগ করে, এবং, পতি অতি দুবাচার ও পাপাত্মা হইলেও, সহগমন-প্রভাবে, নাবী তাঁহারও উদ্ধারকারিণী হয়। এই ভাবিয়া, সহগামিনী হইয়া উন্মাদিনী প্রাণত্যাগ করিল।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! এই তিনজনের মধ্যে, কোন ব্যক্তিব ভদ্রতা অধিক। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, রাজার। বেতাল কহিল, কি নিমিত্তে। তিনি কহিলেন, রাজা উন্মাদিনীর নিমিত্তে প্রাণত্যাগ করিলেন, তথাপি, অধর্ম ও অপযশেব ভয়ে, পবস্ত্রীস্পর্শে প্রবৃত্ত হইলেন না। আর, স্বামীব নিমিত্ত সেবকের প্রাণত্যাগ কবা উচিত কর্ম। স্ত্রীলোকেরও স্বামীর সহগামিনী হওযা প্রধান ধর্ম। অতএব, রাজার ভদ্রতাই আমার বিবেচনায়, সর্বাপেক্ষা অধিক।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

সপ্তদশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

হেমকূট নগরে, বিষ্ণুশর্মা নামে, পরম ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার গুণাকর নামে পুত্র ছিল। ঐ পুত্র, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, দ্যূতক্রীড়ায় সাতিশয় আসক্ত হইল; এবং ক্রমে ক্রমে, পিতার সর্বস্ব দুরোদরমুখে আহুতি দিয়া, পরিশেষে, অর্থের নিমিত্ত তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিল। তখন বিষ্ণুশর্মা তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

গুণাকর, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে করিতে, এক নগরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইল, এবং দেখিল, এক সন্ন্যাসী, শ্মশানে উপবেশন করিয়া, যোগাভ্যাস করিতেছেন। পরে সে, যোগীর নিকটে গিয়া, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্বক, সমীপদেশে উপবিষ্ট হইল। যোগী, গুণাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত দ্বারা, তাহাকে ক্ষুধার্ত বোধ করিয়া, জিজ্ঞাসা

করিলেন, তুমি কিছু ভোজন করিবে। সে কহিল, মহাশয়! আপনি কৃপা করিয়া প্রসাদ দিলে, অবশ্য ভোজন করিব। তখন তিনি, অন্নব্যঞ্জনপূর্ণ এক নরকপাল তাহার সম্মুখে রাখিয়া, ভোজন করিতে বলিলেন। সে কহিল, মহাশয়! এ অন্ন, এ ব্যঞ্জন ভোজন করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না।

তখন যোগী, যোগাসনে আসীন হইয়া, নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিবামাত্র, এক যক্ষকন্যা, অঞ্জলিবদ্ধপূর্বক, তাঁহার সম্মুখবর্তিনী হইয়া, নিবেদন করিল, মহাশয়! দাসী উপস্থিত; কি আজ্ঞা হয়। যোগী কহিলেন, এই ব্রাহ্মণ ক্ষুধার্ত হইয়া, আমার আশ্রমে আসিয়াছেন; ইঁহার যথোচিত অতিথি সংকার কর। যোগী আজ্ঞা করিবামাত্র, যক্ষকন্যার মায়াবলে, নিমিষমধ্যে, পরম রমণীয় সুসজ্জিত হর্ম আবির্ভূত হইল। সে ব্রাহ্মণকে, তথায় লইয়া গিয়া, সুরস অন্ন, ব্যঞ্জন, মৎস্য, মাংস, দধি, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্বারা ইচ্ছানুরূপ ভোজন করাইয়া, মণিময় পল্যঙ্কে শয়ন করাইল; পরে, রজনী উপস্থিত হইলে, স্বয়ং মনোহর বেশভূষার সমাধান করিয়া পল্যঙ্কের এক দেশে উপবেশনপূর্বক, তাহার চরণসেবা করিতে লাগিল। গুণাকরের পরম সুখে রজনীযাপন হইল।

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, যক্ষকন্যা ও তৎকৃত যাবতীয় অদ্ভুত ব্যাপারের চিহ্নমাত্র দেখিতে না পাইয়া, গুণাকর, নিরতিশয় দুঃখিত মনে, সন্ন্যাসীর নিকটে গিয়া, নিবেদন করিল, মহাশয়ের প্রসাদে, কল্য রাজভোগে রজনীযাপন করিয়াছি। কিন্তু নিশাবসানে, সেই কামিনী প্রস্থান করিয়াছে, এবং তৎকৃত সেই সমস্ত হর্মাদিও লয় পাইয়াছে। যোগী কহিলেন, যক্ষকন্যা যোগবিদ্যার প্রভাবে আসিয়াছিল। যে ব্যক্তি যোগবিদ্যায় সিদ্ধ হয়, তাহার নিকটে চিরকাল অবস্থিতি করে। গুণাকর কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, মহাশয়! যদি কৃপা করিয়া উপদেশ দেন, আমিও সেই বিদ্যার সাধনা করি। যোগী, তদীয় বিনয়ের বশীভূত হইয়া, এক মন্ত্রের উপদেশ দিয়া কহিলেন, তুমি চত্বারিংশৎ দিবস, অর্ধরাত্র সময়ে, জলে আকণ্ঠ মগ্ন হইয়া, একাগ্রচিত্তে, এই মন্ত্রের জপ কর।

গুণাকর, সন্ন্যাসীর আদেশানুরূপ জপ করিয়া, তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, মহাশয়! আপনকার আদেশ অনুসারে, যথানিয়মে, চল্লিশ দিন জপ করিয়াছি; এক্ষণে কি আজ্ঞা হয়। যোগী কহিলেন, আর চল্লিশ দিন, জলন্ত অনলে প্রবেশপূর্বক, জপ কর, তাহা হইলেই তুমি কৃতকার্য হইবে। তখন সে কহিল, মহাশয়! বহু দিবস হইল, গৃহপরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। পিতা মাতা প্রভৃতিকে দেখিবার নিমিত্ত, চিত্ত অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে। অতএব অগ্রে একবার পিতামাতার চরণদর্শন করিয়া আসি; পশ্চাৎ আপনকার আদেশানুরূপ মন্ত্রসাধন করিব। এই বলিয়া, সন্ন্যাসীর নিকট বিদায় লইয়া, গুণাকর আপন আলয়ে প্রস্থান করিল।

গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র, তাহার পিতামাতা, বহুকালের পর পুত্রকে প্রত্যাগত দেখিয়া,

অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন, এবং, জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস ! এতদিন তুমি কোথায় ছিলে ; আমরা তোমার অদর্শনে মৃতপ্রায় হইয়া আছি। গুণাকর কহিল, হে তাত ! হে মাতঃ ! আমি, যদৃচ্ছাক্রমে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে, সৌভাগ্যক্রমে, এক পরম দয়ালু সন্ন্যাসীর দর্শন পাইয়াছি, এবং তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি। এক্ষণে, তদীয় উপদেশ অনুসারে, মন্ত্রসাধন করিতেছি। তোমাদিগকে বহুকাল না দেখিয়া, অতিশয় উৎকণ্ঠিত ও চলচিত্ত হইয়াছিলাম, তাহাতেই একবার কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত, দর্শন করিতে আসিয়াছি। সম্প্রতি জন্মের মত বিদায় লইয়া, যোগসাধনার্থে প্রস্থান করিব।

গুণাকর এই বলিয়া প্রস্থানের উদ্যম করিলে, তাহার জননী, বাষ্পাকুল লোচনে, শোকাকুল বচনে কহিতে লাগিলেন, বৎস ! এ তোমার যোগাভ্যাসের সময় নয়। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া, গৃহস্থধর্ম প্রতিপালন কর ; তাহা হইলেই, তুমি যোগাভ্যাসের সম্পূর্ণ ফল পাইবে। গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের মূল, এবং সকল আশ্রম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বিশেষতঃ, পরম গুরু পিতা মাতার শুশ্রূষা করাই পুত্রের প্রধান ধর্ম। অতএব, যাবৎ আমরা জীবিত আছি, তাবৎ তোমার তীর্থযাত্রা ও যোগাভ্যাসের প্রয়োজন নাই। আমাদের শুশ্রূষা কর, তাহাতেই তোমার পরম ধর্মলাভ হইবেক। আর বিবেচনা কর, তুমি আমার এক মাত্র পুত্র ; মা বলিয়া সম্ভাষণ করিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। অন্ধের যষ্টির ন্যায়, তুমি আমাদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন আছ। আমরা, তোমায় বিদায় দিয়া, কোনও ক্রমে, প্রাণধারণ করিতে পারিব না। যদি নিতান্তই যোগাভ্যাসের বাসনা হইয়া থাকে, অন্ততঃ, আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা কর ; পরে ইচ্ছানুরূপ ধর্মোপার্জন করিবে।

গুণাকর শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিল ; এবং কহিল, এই মায়াময় সংসার অতি অকিঞ্চিৎকর। ইহাতে লিপ্ত থাকিলে, কেবল জন্মমৃত্যু পরম্পরারূপ দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিতে হয়। প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান পদার্থ মাত্রই মায়াপ্রপঞ্চ, বাস্তবিক কিছুই নহে। কে কাহার পিতা, কে কাহার মাতা, কে কাহার পুত্র। সকলই ভ্রান্তিমূলক। অতএব, আর আমি বৃথা মায়ায় মুগ্ধ হইব না ; এবং, শ্রেয়ঃসাধন বোধ করিয়া, যে পথ অবলম্বন করিয়াছি, তাহা ছাড়িতে পারিব না। এই বলিয়া, পিতা মাতার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া প্রস্থান করিল ; এবং, সন্ন্যাসীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, অগ্নিপ্রবেশপূর্বক, মন্ত্রসাধনে যত্ন করিতে লাগিল, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিল না।

ইহা কহিয়া, বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ ! কি কারণে, ব্রাহ্মণ সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইতে পারিল না, বল। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, একাগ্রচিত্ত না হইলে, মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। ব্রাহ্মণের মনে একান্ত নিষ্ঠা ছিল না ; সেই বৈগুণ্যবশতঃ, তাহার সাধনা বিফল হইল। ইহা শুনিয়া বেতাল কহিল, যে সাধক, মন্ত্র সিদ্ধ করিবার উদ্দেশে, এতাদৃশ ক্লেশ স্বীকার করিলেক, সে একাগ্রচিত্ত হয় নাই, তাহার প্রমাণ কি ?

বিক্রমাদিত্য কহিলেন, সে, একাগ্রচিত্ত হইলে, পিতামাতার নিমিত্ত চলচিত্ত হইত না; এবং মধ্যে যোগে ভঙ্গ দিয়া, তাঁহাদের দর্শনে যাইত না। ফলতঃ, সকলই অদৃষ্টমূলক; নতুবা যোগাভ্যাসদ্বারা সর্বাংশে নির্মম ও জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও, কি নিমিত্তে সিদ্ধপ্রায় সাধনফলে বঞ্চিত হইল, বল।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

অষ্টাদশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

কুবলয়পুরে, ধনপতি নামে, এক সঙ্গতিপন্ন বণিক ছিলেন। তিনি ধনবতী নাম্নী নিজ কন্যার, গৌরীকালে, গৌরীদত্ত নামক ধনাঢ্য বণিকের সহিত বিবাহ দিলেন। কিয়ৎকাল পরে, ধনবতীর এক কন্যা জন্মিল। গৌরীদত্ত কন্যার নাম মোহিনী রাখিলেন। কালক্রমে, তিনি লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে, তদীয় জ্ঞাতিবর্গ, ধনবতীকে অসহায়িনী দেখিয়া, তাঁহার সর্বস্ব অপহরণ করিল। সে, নিতান্ত দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া, কন্যা লইয়া, এক তমিস্রা রজনীতে, পিত্রালয়ে প্রস্থান করিল।

কিয়ৎ দূর গমন করিয়া, পথ ভুলিয়া, উহারা এক শ্মশানে উপস্থিত হইল। তথায় এক চোর, রাজদণ্ড অনুসারে, তিন দিন, শূলে আরোহিত ছিল; বিধিবিপাকে, সে পর্যন্ত, তাহার প্রাণপ্রয়াণ হয় নাই। দৈবযোগে, ধনবতীর দক্ষিণ কর চোরের চরণে লগ্ন হইলে, সে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া কহিল, তুমি কে, কি নিমিত্তে; এমন দুঃখের সময়ে, আমায় মর্মান্তিক যাতনা দিলে। ধনবতী কহিল, জ্ঞানপূর্বক তোমাকে যাতনা দি নাই। যাহা হউক, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। অনন্তর, আত্মপরিচয় দিয়া, সে চোরকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে, কি নিমিত্ত শ্মশানে আছ, ও কিরূপ দুঃখভোগ করিতেছ, বল।

চোর কহিল, আমি বণিগ্‌জাতি, চৌর্যাপরাধে শূলে আরোহিত হইয়াছি: অদ্য তৃতীয় দিবস, তথাপি প্রাণ নির্গত হইতেছে না; তাহাতেই যার পর নাই যাতনাভোগ করিতেছি। জন্মকালে, জ্যোতির্বিদেরা গণনা দ্বারা, স্থির করিয়াছিলেন, অবিবাহিত অবস্থায় আমার মৃত্যু হইবেক না। যাবত বিবাহ না হইতেছে; তাবৎ আমায়, এই অবস্থায় দুঃসহ যাতনাভোগ করিতে হইবেক। যদি তুমি কৃপা করিয়া কন্যাদান কর, তবেই আমি এ অসহ্য যাতনা হইতে পরিত্রাণ পাই। আমার চিরসঞ্চিত সুবর্ণরাশি আছে; যদি আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর, সমস্ত তোমায় দি।

ধনবতী অর্থলোভে বিমূঢ় হইয়া, মনে মনে মলিম্লুচের প্রার্থনায় সম্মতপ্রায় হইল; এবং কহিল, তুমি যে প্রস্তাব করিলে, তাহাতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু, আমার দৌহিত্র-মুখদর্শনে ঐকান্তিক অভিলাষ আছে; তোমায় কন্যাদান করিলে, আমার সে অভিলাষ

পূর্ণ হয় না। এ কথা শুনিয়া চোর কহিল, তুমি এখন কন্যাদান করিয়া, আমায় যাতনা হইতে মুক্ত কর। আমি অনুমতি দিতেছি, তোমার কন্যার বয়ঃপ্রাপ্তি হইলে, কোনও ব্রাহ্মণতনয়কে ধনদান দ্বারা সম্মত করিয়া, তাহা দ্বারা ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপন্ন করিয়া লইবে; তাহা হইলে তোমারও বাসনা পূর্ণ হইল; আমিও দুঃসহ যাতনা হইতে পরিত্রাণ পাইলাম।

ধনবতী কন্যা সম্প্রদান করিল। তখন চোর কহিল, ঐ পুরোবর্তী গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে আমার গৃহ। গৃহের পূর্ব ভাগে; কূপের নিকট, এক বটবৃক্ষ দেখিতে পাইবে; তাহার মূলে আমার সমস্ত সম্পত্তি নিহিত আছে; যাইয়া গ্রহণ কর। ইহা কহিবামাত্র চোরের প্রাণবিয়োগ হইল; ধনবতীও, চৌরনির্দিষ্ট ন্যগ্রোধবৃক্ষের মূলখননপূর্বক, সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা হস্তগত করিয়া, পিত্রালয়ে প্রস্থান করিল। পরে সে, পিতাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া তাঁহার হস্তে সম্পত্তিসমর্পণপূর্বক, তদীয় আবাসে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

কালক্রমে, মোহিনী যৌবনবতী হইল। সে, এক দিন, স্বীয় সহচরীর সহিত, গবাক্ষ দিয়া রথ্যানিরীক্ষণ করিতেছে, এমন সময়ে, দৈবযোগে; এক পরমসুন্দর বিংশতিবর্ষীয় ব্রাহ্মণ-তনয় তথায় উপস্থিত হইল। তাহাকে নয়নগোচর করিয়া, মোহিনীর মন মোহিত হইল। তখন, সে আপন সহচরীকে কহিল, তুমি এই ব্রাহ্মণকুমারকে আমার মার নিকট লইয়া যাও। সখী ব্রাহ্মণতনয়কে তাহার জননীর নিকট উপস্থিত করিলে, সে চৌরবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া, তাহাকে প্রার্থনানুরূপ অর্থ দিয়া মোহিনীর পুত্রোৎপাদনার্থে নিযুক্ত করিল।

মোহিনী গর্ভবতী ও যথাকালে পুত্রবতী হইল। সূতিকাষষ্ঠীর রজনীতে সে স্বপ্নে দেখিল, দুই হস্ত, পঞ্চ মস্তক, প্রতি মস্তকে তিন তিন চক্ষুঃ ও এক এক অর্ধচন্দ্র, অতি দীর্ঘ জটাভার পৃষ্ঠদেশে লম্বমান, দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল, বাম হস্তে নরকপাল, ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান, ভুজঙ্গের মেখলা; উজ্জ্বল রজতগিরির ন্যায় কলেবর, অতিশুভ্র নাগযজ্ঞোপবীত, সর্বাঙ্গ ভস্মভূষিত; এবংবিধ আকার ও বেশবিশিষ্ট বৃষভারূঢ় এক পুরুষ, তাহার সম্মুখে আসিয়া, কহিতেছেন, বৎসে মোহিনী! তোমার পুত্র জন্মিয়াছে, এজন্য আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। এই বালক ক্ষণজন্মা। তুমি, আমার আজ্ঞা অনুসারে, ঐ শিশুকে, সহস্র সুবর্ণ সহিত, পেটকের মধ্যগত করিয়া, কল্য অর্ধরাত্র সময়ে, রাজদ্বারে রাখিয়া আসিবে। রাজা তাহার, পুত্রনির্বিশেষে প্রতিপালন করিবেন। রাজার স্বর্গারোহণের পর, তোমার পুত্র, তদীয় সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, ক্রমে ক্রমে, নিজ প্রতাপে ও নীতিবিদ্যা-প্রভাবে, সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হইবেক।

মোহিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে সমস্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত স্বীয় জননীর গোচর করিল। ধনবতী শুনিয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইল; এবং, পরদিন নিশীথ সময়ে, ঐ শিশুকে, সহস্র স্বর্ণ-

মুদ্রা সহিত, পেটকের মধ্যে স্থাপিত করিয়া, রাজদ্বারে রাখিয়া আসিল। সেই সময়ে, রাজাও স্বপ্নে দেখিতেছেন, পূর্বোক্তপ্রকার পুরুষ, তাঁহাব সম্মুখবর্তী হইয়া, কহিতেছেন, মহারাজ! গাত্রোত্থান কর; এক পেটকমধ্যশায়ী চক্রবর্তী লক্ষণাক্রান্ত সন্তান তোমার দ্বারদেশে উপনীত। অবিলম্বে উহারে আনিয়া পুত্রনির্বিশেষে প্রতিপালন কর। উত্তরকালে সেই তোমার উত্তরাধিকারী হইবেক।

রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন তিনি, রাজমহিষীকে জাগরিত করিয়া, স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনাইলেন। অনন্তর, উভয়ে, দ্বারদেশে গিয়া পেটক পতিত দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ পেটকের মুখ উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিলেন, বালকের রূপে পেটক আলোকপূর্ণ হইয়া আছে। রাজ্ঞী, সেই শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া, অগ্রগামিনী হইলেন; রাজা, স্বর্ণমুদ্রাগ্রহণপূর্বক, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

প্রভাত হইবামাত্র, রাজা সামুদ্রিকবেত্তা পণ্ডিতগণকে আনাইয়া, দেবপ্রসাদলব্ধ বালকের লক্ষণপরীক্ষার্থে, আজ্ঞাপ্রদান করিলেন। তাঁহারা সেই শিশুকে দৃষ্টিগোচর করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপাততঃ তিন স্পষ্ট সুলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে; দীর্ঘ আকার, উন্নত ললাট, বিস্তৃত বক্ষঃস্থল। অনন্তর, তাঁহারা সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, সামুদ্রিক শাস্ত্রে পুরুষেব দ্বাত্রিংশৎ শুভ লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে; মহারাজ! সেই সমুদয় এই একাধারে লক্ষিত হইতেছে। এই বালক সমস্ত পৃথিবীর সম্রাট হইবেন, সন্দেহ নাই।

রাজা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন, এবং পারিতোষিক প্রদানপূর্বক, ব্রাহ্মণদিগকে বিদায় করিয়া, দীন, দরিদ্র, অনাথ প্রভৃতিকে প্রার্থনাধিক অর্থপ্রদান করিলেন। ষষ্ঠ মাসে অন্নপ্রাশন দিয়া, তিনি বালকের নাম হরদত্ত রাখিলেন। বালক অল্পকাল মধ্যে চতুর্দশ বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন; এবং, রাজার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে, তদীয় সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া, ক্রমে ক্রমে, সমস্ত ভূমণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করিলেন।

কিয়ৎ কাল পরে, হরদত্ত, তীর্থযাত্রায় নির্গত হইয়া, প্রথমতঃ, পিতৃকৃত্য সম্পাদনার্থে, গয়াধামে উপস্থিত হইলেন। ফল্গু তীরে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিয়া, রাজা পিতৃপিণ্ড প্রদানে উদ্যত হইলে, নদীর মধ্য হইতে, পিণ্ডগ্রহণার্থে, তিনজনের তিন দক্ষিণ হস্ত যুগপৎ নির্গত হইল; প্রথম ক্ষেত্রিক চোরের, দ্বিতীয় বীজী ব্রাহ্মণের, তৃতীয় প্রতিপালক রাজার।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! ইহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি, শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে হরদত্ত দত্ত পিণ্ডের অধিকারী হইতে পারে। রাজা বলিলেন, চোর। বেতাল কহিল, অন্যেরা কি অপরাধ করিয়াছে। রাজা বলিলেন, ব্রাহ্মণ, অর্থ লইয়া বীজ বিক্রয় করিয়াছেন; রাজাও, সহস্র সুবর্ণ লইয়া, প্রতিপালন করিয়াছেন; এজন্য তাঁহারা পিণ্ডগ্রহণে অধিকারী হইতে পারেন না।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

ঊনবিংশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ !

চিত্রকূট নগরে রূপদত্ত নামে রাজা ছিলেন। তিনি, এক দিন, একাকী অশ্বে আরোহণ করিয়া, মৃগয়ায় গমন করিলেন। মৃগের অন্বেষণে, বনে বনে অনেক ভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে, তিনি এক ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক অতি মনোহর সরোবর ছিল। তিনি তাহার তীরে গিয়া দেখিলেন, কমল সকল প্রফুল্ল হইয়া আছে ; মধুকরেরা, মধুপানে মত্ত হইয়া, গুনগুন রবে গান করিতেছে ; হংস, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি জল বিহঙ্গগণ তীরে ও নীরে বিহার করিতেছে ; চারিদিকে, কিসলয়ে ও কুসুমে সুশোভিত নানাবিধ পাদপসমূহ বসন্তলক্ষ্মীর সৌভাগ্যবিস্তার করিতেছে , সর্বতঃ, শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার হইতেছে। রাজা নিতান্ত পরিশ্রান্ত ছিলেন ; বৃক্ষমূলে অশ্ববন্ধন করিয়া, তথায় উপবেশনপূর্বক শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, এক ঋষিকন্যা আসিয়া স্নানার্থে সরোবরে অবগাহন করিল। রাজা, দর্শনমাত্র, অতিমাত্র মোহিত ও জ্ঞানরহিত হইলেন। স্নানক্রিযাব সমাপন করিযা, ঋষিতনয়া আশ্রমাভিমুখী হইলে, বাজা তাহাব সম্মুখবর্তী হইয়া কহিলেন, ঋষিকন্যে ! তোমার এ কেমন ধর্ম। আমি, আতপে তাপিত হইয়া, বিশ্রামার্থে তোমার আশ্রমে অতিথি হইলাম ; তুমি এমনই আতিথেয়ী, যে সম্ভাষণ দ্বারাও, আমার সংবর্ধনা করিলে না। ঋষিতনয়া শুনিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

এই অবসরে, ঋষিও, বনান্তর হইতে ফল, পুষ্প, কুশ, সমিধ প্রভৃতির আহবণ করিয়া, প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রাজা, দর্শন মাত্র, আত্মপরিচয়প্রদানপূর্বক, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলে, ঋষি অভীষ্টসিদ্ধির্ভবতু বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। রাজা, আশীর্বাদ শ্রবণে, মনে মনে দুষ্ট অভিসন্ধি করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, নিবেদন করিলেন, মহাশয় ! আমরা চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি, ঋষিবাক্য কস্মিন্ কালেও ব্যর্থ হয় না। আপনি আশীর্বাদ করিলেন আমার অভিলাষ পূর্ণ হউক ; কিন্তু, আমি তাহার কোনরূপ সম্ভাবনা দেখিতেছি না। ঋষি কহিলেন, আমি বলিতেছি, অবশ্যই তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবেক। তখন রাজা অম্লান বদনে বলিলেন, আমি এই কন্যার পাণিগ্রহণের অভিলাষ করিয়াছি।

ঋষি, রাজার দুরভিপ্রায় শ্রবণে, মনে মনে নিরতিশয় কুপিত হইয়াও, স্বীয় আশীর্বাদ-বাক্যের বৈয়র্থ্যপরিহারের নিমিত্ত, রাজাকে কন্যাসম্প্রদান করিলেন। রাজা, নব প্রণয়িনীকে সমভিব্যাহারিণী করিয়া, রাজধানী অভিমুখে চলিলেন। পথিমধ্যে রজনী উপস্থিত হইল। রাজা ও রাজপ্রেয়সী, যথাসম্ভব ফলমূল আদি দ্বারা, কথঞ্চিত ক্ষুধানিবৃত্তি করিয়া, তরুতলে শয়ন করিলেন।

অর্ধরাত্র সময়ে, এক দুর্দান্ত রাক্ষস আসিয়া, রাজাকে জাগরিত করিয়া, কহিল, আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়াছি, তোমার ভার্যাকে ভক্ষণ করিব। রাজা কহিলেন, তুমি আমার প্রাণাধিকা প্রেয়সীর প্রাণহিংসায় বিরত হও। অন্য যাহা চাহিবে তাহাই দিব। তখন রাক্ষস কহিল, যদি তুমি, প্রশস্ত মনে, স্বহস্তে দ্বাদশ বর্ষীয় ব্রাহ্মণকুমারের মস্তকচ্ছেদন করিয়া, আমার হস্তে দিতে পার, তাহা হইলে তোমার প্রিয়তমার প্রাণবধে ক্ষান্ত হই। রাজা, প্রিয়তমার প্রাণরক্ষার্থে, ব্রহ্মহত্যাতেও সম্মত হইলেন ; এবং কহিলেন, তুমি সপ্তম দিবসে, আমার রাজধানীতে যাইবে ; সেইদিন, আমি তোমার অভিলষিত সম্পন্ন করিব।
এইরূপে রাজাকে ব্রহ্মবধ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়া, রাক্ষস প্রস্থান করিল। বাজাও, প্রভাত হইবামাত্র, প্রেয়সী সমভিব্যাহারে ; রাজধানীতে গিয়া, প্রধানমন্ত্রীব সমক্ষে রাক্ষসবৃত্তান্তের বর্ণন করিলেন। মন্ত্রী কহিলেন, মহারাজ ! আপনি, ওজন্যে উৎকণ্ঠিত হইবেন না ; আমি অনায়াসে উহা সম্পন্ন করিয়া দিব। রাজা, মন্ত্রিবাক্যে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া, নব-প্রণয়নীর সহিত, পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।
মন্ত্রী, এক পুরুষ প্রমাণ কাঞ্চনময়ী প্রতিমা নির্মিত করাইয়া, মহামূল্য অলঙ্কারে মণ্ডিত করিয়া, নগরের চতুষ্পথে স্থাপিত করিলেন, এবং প্রচার করিয়া দিলেন, যে ব্রাহ্মণ, বলিদানার্থে, স্বীয় দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র দিবেন, তিনি এই প্রতিমা পাবেন। এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণেব দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র ছিল। তিনি, ঘোষণাব বিষয় অবগত হইয়া, ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, দেখ, নির্ধন ব্যক্তিব সংসারাশ্রমে বাস করা বিড়ম্বনা মাত্র। ধনই সকল ধর্মের ও সকল সুখের মূল। আমি জন্মদরিদ্র ; এ পর্যন্ত সাংসারিক কোনও সুখের মুখ দেখিতে পাইলাম না। এক্ষণে, ধনাগমের এই এক সহজ উপায় উপস্থিত। যদি তুমি মত কর, পুত্র দিয়া স্বর্ণময়ী প্রতিমা লইয়া আসি ; তাহা হইলে, যত দিন বাঁচিব, পরমসুখে কালযাপন করিতে পারিব। ব্রাহ্মণী সম্মতা হইলেন। ব্রাহ্মণ, পুত্র দিয়া, প্রতিমা লইয়া তদ্বিক্রয় দ্বারা ধনসংগ্রহ করিলেন। সপ্তম দিনে, প্রত্যুষ সময়ে ; বাক্ষস রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবা-মাত্র, মন্ত্রী, দ্বাদশবর্ষীয় ব্রাহ্মণকুমার ও তীক্ষ্ণধার খড়্গ আনিয়া, রাজার সম্মুখে রাখিলেন। অনন্তর, রাজা শিবশ্ছেদনার্থে খড়্গ উত্তোলিত কবিলে, ব্রাহ্মণকুমার অবনত বদনে, ঈষৎ হাস্য করিল। রাজা, অম্লান বদনে, তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। তদীয় ছিন্ন মস্তক রাক্ষসের হস্তে অর্পিত হইল।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ ! মৃত্যু সময়ে সকলে রোদন করিয়া থাকে ; বালক হাস্য করিল কেন, বল। রাজা কহিলেন. বাল্যকালে পিতামাতা প্রতি-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন ; তৎপরে, কোনও বিপদ ঘটিলে, রাজা রক্ষা করিয়া থাকেন ; কিন্তু, আমার ভাগ্যদোষে, সকলই বিপরীত হইল। পিতা মাতা অর্থলোভে বিক্রয় করিলেন ; প্রাণভয়ে যে রাজার শরণাগত হইব তিনিই স্বয়ং মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত।

মনে মনে এই আলোচনা করিয়া, সে হাস্য করিয়াছিল।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

বিংশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

বিশালপুর নগরে, অর্থদত্ত নামে, ধনাঢ্য বণিক ছিলেন। তিনি কমলপুরবাসী মদনদাস বণিকের সহিত, আপন কন্যা অনঙ্গমঞ্জরীর বিবাহ দিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে মদনদাস, ভার্যাকে তদীয় পিত্রালয়ে রাখিয়া, বাণিজ্যার্থে দেশান্তরে প্রস্থান করিল।

একদিন, অনঙ্গমঞ্জরী, গবাক্ষ দ্বারা, রাজপথ নিরীক্ষণ করিতেছে; এমন সময়ে, কমলাকর নামে, সুকুমার ব্রাহ্মণকুমার তথায় উপস্থিত হইল। উভয়ের নয়নে নয়নে আলিঙ্গন হইলে, পরস্পর পরস্পরের রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হইল। ব্রাহ্মণকুমার, নিকাম ব্যাকুল হইয়া, গৃহগমনপূর্বক, প্রিয় বয়স্যের নিকট স্বীয় বিরহবেদনার নির্দেশ করিয়া, বিচেতন ও শয্যাগত হইল। তাহার সখা, উশীরানুলেপন, চন্দনবারিসেচন, সরসকমলদলশয্যা, জলার্দ্রতালবৃন্তসঞ্চালন প্রভৃতি দ্বারা, শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

এদিকে, অনঙ্গমঞ্জরীর, অনঙ্গশরপ্রহারে জর্জরিতাঙ্গী হইয়া, ধরাশয্যা অবলম্বন করিলে, তাহার সখী, সবিশেষ জিজ্ঞাসা দ্বারা, সমস্ত অবগত হইয়া, প্রবোধদানচ্ছলে, অনেক ভর্ৎসনা করিল। তখন সে কহিল, সখি! আমি নিতান্ত অবোধ নহি; কিন্তু মন আমার প্রবোধ মানিতেছে না। নির্দয় কন্দর্পের নিরন্তর শরপ্রহারে আমি জর্জরিত হইয়াছি। আর যাতনা সহ্য হয় না। যদি সেই চিত্তচোরকে ধরিয়া দিতে পার, তবেই প্রাণধারণ করিব; নতুবা, নিঃসন্দেহ, আত্মঘাতিনী হইব।

ইহা কহিয়া, অনঙ্গমঞ্জরী, অশ্রুপূর্ণ নয়নে, অবিশ্রান্ত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তাহার সহচরী, কালবিলম্ব অনুচিত বিবেচনা করিয়া, কমলাকরের আলয়ে গমনপূর্বক, তাহাকেও স্বীয় সহচরীর তুল্যাবস্থ দেখিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিল, দুরাত্মা কন্দর্পের কিছুই অসাধ্য নাই; কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলকেই, সমান রূপে, স্বীয় কুসুমময় শরাসনের বশবর্তী করিয়া রাখিয়াছে। অনন্তর, সে কমলাকরের নিকটে বলিল, অর্থদত্ত শেঠের কন্যা অনঙ্গমঞ্জরী প্রার্থনা করিতেছে, তুমি তাহারে প্রাণদান কর। কমলাকর, শ্রবণমাত্র অতি মাত্র উল্লসিত হইয়া, গাত্রোত্থান করিল, এবং কহিল, আপাততঃ তুমি, এই অমৃতবর্ষী মনোহর বাক্য দ্বারা, আমায় প্রাণদান করিলে।

তৎপরে সহচরী, কমলাকরকে সমভিব্যাহারে লইয়া, অনঙ্গমঞ্জরীর বাসগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিল, সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অমনি কমলাকর, হা প্রেয়সী! বলিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক, ভূতলে পতিত ও তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

অনঙ্গমঞ্জরীর গৃহজন, আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, উভয়কে শ্মশানে লইয়া, একচিতায় অগ্নিদান করিল। দৈবযোগে, অর্থদত্তের জামাতা মদনদাসও, সেই সময়ে, শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল; এবং, নিজ ভার্যা অনঙ্গমঞ্জরীর মৃত্যুবৃত্তান্ত শুনিয়া হাহাকার করিতে করিতে, ঊর্ধ্বশ্বাসে শ্মশানে গিয়া, জলন্ত চিতায় ঝম্পপ্রদানপূর্বক, প্রাণত্যাগ করিল।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! এই তিনের মধ্যে কোন ব্যক্তি অধিক ইন্দ্রিয়দাস। রাজা কহিলেন, মদনদাস। বেতাল কহিল, কেন। রাজা কহিলেন, অনঙ্গমঞ্জরী, পরপুরুষে অনুরাগিণী হইয়া, তাহার বিরহে প্রাণত্যাগ করিল; তাহাতে মদনদাসের অন্তঃকরণে অণুমাত্র বিরাগ জন্মিল না প্রত্যুত, তদীয় মৃত্যুশ্রবণে প্রাণধারণে অসমর্থ হইয়া, অগ্নিপ্রবেশ করিল।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

একবিংশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

জয়স্থল নগরে, বিষ্ণুস্বামী নামে, ধর্মাত্মা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র; জ্যেষ্ঠ দ্যূতাসক্ত, মধ্যম লম্পট; তৃতীয় নির্লজ্জ; চতুর্থ নাস্তিক। ব্রাহ্মণ, পুত্রগণের গর্হিত ব্যবহার ও কদাচার দর্শনে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, একদিন, চারিজনকে একত্র করিয়া, এইরূপ ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন—যে ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত হয়, কমলা, ভ্রান্তি-ক্রমেও, তার প্রেতি কৃপাদৃষ্টি করেন না। ধর্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, নাসাকর্ণচ্ছেদনপূর্বক, গর্দভে আরোহণ করাইয়া, দ্যূতাসক্ত ব্যক্তিকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবেক। দ্যূতাসক্ত ব্যক্তি হিতাহিত বিবেচনারহিত ও ধর্মাধর্মজ্ঞান শূন্য হয়। ধর্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির, দ্যূতাসক্ত হইয়া, সাম্রাজ্য ও ভার্যা পর্যন্ত হারাইয়া, পরিশেষে, দুঃসহ বনবাসক্লেশে কাল-যাপন করিয়াছিলেন। আর, যে ব্যক্তি লম্পট হয়, সে সুখভ্রমে দুঃখার্ণবে প্রবেশ করে। লম্পটেরা, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি উদ্দেশে সর্বস্বান্ত করিয়া, অবশেষে, চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। লম্পট ব্যক্তির আচার, বিচার, নিয়ম, ধর্ম, সমস্তই নষ্ট হয়। আর, যে ব্যক্তি নির্লজ্জ, তাহাকে ভর্ৎসনা করা বা উপদেশ দেওয়া বৃথা; তাহার লোকনিন্দার ভয় থাকে না, এবং গর্হিত কর্ম করিয়াও, লজ্জাবোধ হয় না। এবংবিধ ব্যক্তির যত শীঘ্র মৃত্যু হয়, ততই পৃথিবীর মঙ্গল। আর যে ব্যক্তি পরকালের ভয় না করে, দেবতা ও গুরুজনে ভক্তিমান ও শ্রদ্ধাবান না হয়, এবং সনাতন বেদাদি শাস্ত্রে আস্থাশূন্য হয়, সে অতি পাষণ্ড; তাহার সহিত বাক্যালাপ করিলেও অধর্মগ্রস্ত হইতে হয়। লোকে পুত্রের মঙ্গল-

প্রার্থনায়, জপ, তপ, দান, ধ্যান, ব্রত, উপবাস আদি করে; কিন্তু আমি কায়মনোবাক্যে, নিয়ত, তোমাদের মৃত্যু প্রার্থনা করিয়া থাকি।

পিতার এইপ্রকার তিরস্কারবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, চারিজনেরই অন্তঃকরণে অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিল। তখন তাহারা পরস্পর কহিতে লাগিল, বাল্যকালে বিদ্যাভাসে ঔদাস্য করিয়াছিলাম, তাহাতেই আমাদের এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে; এক্ষণে, বিদেশে গিয়া, প্রাণপণে যত্ন করিয়া, বিদ্যাভ্যাস করা উচিত। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া চারিজনে, নানাদেশে ভ্রমণপূর্বক, অল্পকাল মধ্যে, নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইল। গৃহপ্রতিগমন কালে, তাহারা পথিমধ্যে দেখিতে পাইল, এক চর্মকার, মৃত ব্যাঘ্রের মাংস ও চর্ম লইয়া, প্রস্থান করিল; কেবল অস্থি সকল স্থানে স্থানে পতিত রহিল।

তাহাদের মধ্যে, একজন অস্থিসঙ্ঘটনী বিদ্যা শিখিয়াছিল; সে, বিদ্যাপ্রভাবে সমস্ত অস্থি একস্থানস্থ করিয়া, ব্যাঘ্রের কঙ্কাল সঙ্কলন করিল। দ্বিতীয়, মাংসসঞ্জননী বিদ্যা দ্বারা, ঐ কঙ্কালে মাংস জন্মাইয়া দিল। তৃতীয় চর্মযোজনী বিদ্যা শিখিয়াছিল; সে তৎপ্রভাবে, শার্দুলের সর্বশরীর চর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত করিল। অনন্তর, চতুর্থ, মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা দ্বারা, প্রাণদান করিলে, ব্যাঘ্র, তৎক্ষণাৎ, তাহাদের চারি সহোদরেরই প্রাণসংহার কবিল।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! এই চারিজনেব মধ্যে, কোন ব্যক্তি অধিক নির্বোধ। রাজা কহিলেন, যে ব্যক্তি প্রাণদান কবিল, সেই সর্বাপেক্ষা অধিক নির্বোধ।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

দ্বাবিংশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

বিশ্বপুর নগরে নারায়ণ নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন। একদিন, তিনি মনে মনে বিবেচনা কবিতে লাগিলেন, এক্ষণে, বার্ধক্যবশতঃ, আমার শরীর দুর্বল ও ইন্দ্রিয় সকল বিকল হইয়াছে; কিন্তু ভোগাভিলাষ পূর্ব অপেক্ষা প্রদীপ্ত হইতেছে, আমি পরকলেবরপ্রবেশনী বিদ্যা জানি। অতএব, ভোগাক্ষম, 'জরাজীর্ণ, শীর্ণ কলেবর পবিত্যাগ করিয়া কোন যুবার কলেবরে প্রবিষ্ট হই; তাহা হইলে, আর কিছুকাল, অভিলাষানুরূপ বিষয়সুখসম্ভোগ কবিতে পারিব। কিন্তু সহসা, কলেবরত্যাগ করিয়া, অন্য কলেববে প্রবেশ করিলে, আমার এ অভিপ্রায় প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা। অতএব, অগ্রে, যোগাভ্যাসচ্ছলে, পরিবারের নিকট বিদায় হইয়া, বনপ্রবেশ করি; পরে, সুযোগ ক্রমে, স্বীয় অভিপ্রায় সম্পন্ন করিব। নারায়ণ, এইরূপ সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া, পত্নী, পুত্র, পৌত্র, দুহিতৃ, দৌহিত্র, প্রভৃতি

পরিবারবর্গ একত্র করিয়া, তাহাদের সম্মুখে কহিতে লাগিলেন, দেখ, আমি, সংসারাশ্রমে আবদ্ধ থাকিয়া, বিষয়বাসনায় আসক্ত হইয়া জীবনকাল অতিবাহিত করিলাম ; একদিন, এক মুহূর্তের নিমিত্তেও, পরকালের হিতচিন্তা করি নাই। এক্ষণে আমার শেষ দশা উপস্থিত। এজন্য, অভিলাষ করিয়াছি, অরণ্যপ্রবেশপূর্বক, যোগাভ্যাস দ্বারা তনুত্যাগ করিব ; আর আমার এক ক্ষণের জন্যেও, মায়াময় অকিঞ্চিৎকর সংসারে লিপ্ত থাকিতে বাসনা নাই। এক্ষণে তোমরা, ঐকমত্য অবলম্বনপূর্বক, অনুমতি কর ; নির্মম ও নিঃসঙ্গ হইয়া, মোক্ষপথের পথিক হই।

নারায়ণ, এইরূপ কপটবাক্য প্রয়োগপূর্বক, পরিবারের নিকট বিদায় লইয়া বনপ্রস্থান করিলেন ; এবং তথায়, জীর্ণ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া, এক যুবকলেবরে প্রবেশপূর্বক, বিষয়াভিলাষ পূর্ণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহারাজ ! ব্রাহ্মণ, পূর্বকলেবব পরিত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব ক্ষণে, রোদন করিয়া, পরকলেবর প্রবেশকালে, বিকশিত আস্যে হাস্য করিয়াছিলেন। অতএব জিজ্ঞাসা করি, ইঁহার রোদন ও হাস্যের কারণ কি। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, শুন বেতাল ! পূর্ব কলেবর পরিত্যাগ করিলেই, বহুকালের বহু যত্নের পরিবারের সহিত আব কোনও সম্বন্ধ থাকিল না , এই মমতায় মুগ্ধ হইয়া, ব্রাহ্মণ রোদন করিয়াছিলেন ; আর, পরকলেবরে প্রবেশ দ্বারা, অভিলষিত ভোগপথ অকণ্টক হইল, এজন্য, আহ্লাদিত হইয়া, হাস্য করিযাছিলেন।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

ত্রয়োবিংশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ !

ধর্মপুরে গোবিন্দ নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র। তন্মধ্যে একজন ভোজন বিলাসী ; অর্থাৎ, অন্নে ও ব্যঞ্জনে যদি কোন দোষ থাকিত, তাহা দুর্জ্ঞেয় হইলেও, ঐ অন্নের ও ঐ ব্যঞ্জনের ভক্ষণে তাহার প্রবৃত্তি হইত না ; দ্বিতীয় শয্যাবিলাসী ; অর্থাৎ, শয্যায় কোনও দুর্লক্ষ্য বিঘ্ন ঘটিলেও, সে তাহাতে শয়ন করিতে পারিত না। ফলতঃ, এই এক এক বিষয়ে তাহাদের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তদীয় ঈদৃশ বিস্ময়জনক ক্ষমতার বিষয় তত্রত্য নরপতির কর্ণগোচর হইলে, তিনি তাহাদের ঐ ক্ষমতার পরীক্ষার্থে, সাতিশয় কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন, এবং উভয়কে রাজধানীতে আনাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, তোমরা কে কোন বিষয়ে বিলাসী।

অনন্তর, তাহারা স্ব স্ব পরিচয় দিলে, রাজা, প্রথমতঃ ভোজনবিলাসীর পরীক্ষার্থে, পাচক ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া, নানাবিধ সুরস অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন।

পাচক, রাজকীয় আজ্ঞা অনুসারে, সাতিশয় যত্ন সহকারে, চর্ব, চূষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্বিধ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া, ভূপতিসমীপে সংবাদ দিল। রাজা ভোজনবিলাসীকে আহার করিবার আদেশ করিলে, সে আহারস্থানে উপস্থিত হইল ; এবং, আসনে উপবেশনমাত্র, গাত্রোত্থান করিয়া, নৃপতিসমীপে প্রতিগমন করিল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, তৃপ্তিপূর্বক ভোজন করিয়াছ। সে কহিল, না মহারাজ! আমার ভোজন করা হয় নাই। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, কেন। সে কহিল, মহারাজ! অন্নে শবগন্ধ নির্গত হইতেছে ; বোধ করি, শ্মশান সন্নিহিতক্ষেত্রজাত ধান্যের তণ্ডুল পাক করিয়াছিল। রাজা শুনিয়া, তদীয় বাক্য উন্মত্তপ্রলাপবৎ অসঙ্গত বোধ করিয়া, কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন ; এবং, এই ব্যাপার গোপনে রাখিয়া, ভাণ্ডারীকে ডাকাইয়া, সেই তণ্ডুলের বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে আদেশ দিলেন। ভাণ্ডারী সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, নরপতিগোচরে আসিয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! অমুক গ্রামেব শ্মশান-সন্নিহিতক্ষেত্রজাত ধান্যে ঐ তণ্ডুল প্রস্তুত হইয়াছিল। রাজা শুনিয়া নিরতিশয় চমৎকৃত হইলেন, এবং ভোজনবিলাসীর সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, তুমি যথার্থ ভোজন-বিলাসী।

অনন্তর, রাজা, এক সুসজ্জিত শয়নাগারে দুগ্ধফেননিভ পরম রমণীয় শয্যা প্রস্তুত করাইয়া, শয্যাবিলাসীকে শয়ন করিতে আদেশ দিলেন। সে কিয়ৎক্ষণ শয়ন করিয়া, নৃপতিসমীপে আসিয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! ঐ শয্যার সপ্তম তলে এক ক্ষুদ্র কেশ পতিত আছে, তাহা আমার সাতিশয় ক্লেশকর হইতে লাগিল ; এজন্য শয়ন করিতে পারিলাম না। রাজা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন ; এবং শয়নাগারে প্রবেশপূর্বক, অন্বেষণ করিয়া, দেখিতে পাইলেন, শয্যার সপ্তমতলে যথার্থই এক ক্ষুদ্র কেশ পতিত রহিয়াছে। তখন, তিনি, যৎপরোনাস্তি সন্তোষ প্রদর্শনপূর্বক, বারংবার তাহার প্রশংসা করিয়া কহিলেন, তুমি যথার্থ শয্যাবিলাসী! অনন্তর, তাহাদের দুই সহোদরকে, যথোচিত পারিতোষিক প্রদান-পূর্বক পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! উভয়ের মধ্যে কোন জন অধিক প্রশংসনীয়। রাজা কহিলেন, আমার মতে শয্যাবিলাসী।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

চতুর্বিংশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

কলিঙ্গদেশে যজ্ঞশর্মা নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি, অনেক কাল, অনেক দেবতার আরাধনা করিয়া, একমাত্র পুত্র প্রাপ্ত হয়েন। ঐ পুত্র, অল্পকাল মধ্যে, সর্ব শাস্ত্রে সবিশেষ পারদর্শী

হইল ; এবং, অনন্যকর্মা ও অনন্যধর্মা হইয়া, নিরন্তর পিতামাতার সেবা করিতে লাগিল। পিতামাতার ভাগ্যদোষে, ঐ পুত্র অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে, কালগ্রাসে পতিত হইল। তাহার পিতামাতা, প্রথমতঃ যৎপরোনাস্তি বিলাপ ও পরিতাপ করিলেন ; পরিশেষে, অগ্নিসংস্কারার্থে, গ্রামের উপান্তবর্তী শ্মশানে লইয়া গিয়া, চিতারচনা করিতে লাগিলেন।

এক বৃদ্ধ যোগী, বহুকাল অবধি ঐ শ্মশানে যোগাভ্যাস করিতেছিলেন। তিনি, অষ্টাদশবর্ষীয় ব্রাহ্মণকুমারের মৃত কলেবর পতিত দেখিয়া, মনে মনে বিবেচনা করিলেন, আমার এই প্রাচীন দেহ, জরায় জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া, কার্যাক্ষম হইয়াছে ; অতএব, এই যুবদেহে প্রবেশ করি ; তাহা হইলে, বহুকাল যোগাভ্যাস করিতে পারিব। এই বলিয়া, জগদীশ্বরের নামস্মরণপূর্বক, যোগী সেই যুবকলেবরে প্রবেশ করিলেন।

ব্রাহ্মণকুমার তৎক্ষণাৎ জীবিত হইয়া উঠিল। যজ্ঞশর্মা, পুত্রকে প্রত্যাগতজীবিত দেখিয়া, প্রথমতঃ, প্রফুল্ল বদনে, হাস্য করিলেন ; কিন্তু এক নিমেষ পরেই, বিষণ্ণ বদনে রোদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসিল, মহারাজ ! ব্রাহ্মণ, পুত্রকে পুনর্জীবিত দেখিয়া হৃষ্ট মনে হাস্য করিয়া, কি কারণে, পরক্ষণে, রোদন করিলেন, বল। রাজা কহিলেন, ব্রাহ্মণ প্রথমতঃ, পুত্রকে পুনর্জীবিত বোধ করিয়া, আহ্লাদে হাস্য করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি পরকলেবর প্রবেশনী বিদ্যা জানিতেন ; ঐ বিদ্যার প্রভাবে, পরক্ষণেই জানিতে পারিলেন, পুত্র পুনর্জীবিত হয় নাই ; যোগীর প্রবেশ দ্বারা এরূপ ঘটিয়াছে ; এজন্য, রোদন করিলেন।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

পঞ্চবিংশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ !

দাক্ষিণাত্য দেশে ধর্মপুর নামে নগর আছে। তথায়, মহাবল নামে, মহাবল পরাক্রান্ত মহীপতি ছিলেন। এক প্রবল প্রতিপক্ষ রাজা, চতুরঙ্গিনী সেনা লইয়া, তদীয় রাজধানীর অবরোধ করিলে, রাজা মহাবল, স্বীয় সমস্ত সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে, সমরসাগরে অবগাহন করিয়া, অশেষপ্রকার প্রতীকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু দৈবদুর্বিপাকবশতঃ, ক্রমে ক্রমে, স্বপক্ষীয় সমস্ত সৈন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, প্রাণরক্ষার্থে, মহিষী ও তনয়া সমভিব্যাহারে, অরণ্যপ্রস্থান করিলেন। পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া, তিন জনেই অতিশয় ক্ষুধার্ত হইলেন। তখন রাজা, মহিষী ও তনয়াকে তরুতলে অবস্থিতি করিতে বলিয়া, আহারোপযোগ্য দ্রব্যের আহরণার্থে গমন করিলেন।

সায়ংকাল উপস্থিত হইল। রাজা প্রত্যাগত হইলেন না। রাজমহিষী ও রাজকুমারী, রাজার অনাগমনে, নানা অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া, যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইয়া, অশেষবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ দিনে, কুণ্ডিনের অধিপতি রাজা চন্দ্রসেন, আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া, ঐ অরণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা, তাদৃশ নিবিড় অরণ্য মধ্যে, অসম্ভাবনীয় নরচরণচিহ্ন দেখিয়া, বিস্ময়াম্বিত চিত্তে, নানাপ্রকার কল্পনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে, পুংবিলক্ষণ লক্ষণ দ্বারা, উহা স্ত্রীলোকের পদচিহ্ন বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। রাজা কহিলেন, চরণচিহ্ন দর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, দুই নারী, অচিরে, এই স্থান দিয়া, গমন করিয়াছে। চল, চারিদিকে অন্বেষণ করি।

পিতা-পুত্রে, অন্বেষণ করিতে করিতে, সায়ংসময়ে দেখিতে পাইলেন, দুই পরম সুন্দরী রমণী, তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া, বাষ্পাকুললোচনে, পরস্পর বদননিরীক্ষণকরত, যূথবিরহিত কুরবীযুগলের ন্যায়, প্রগাঢ় উৎকণ্ঠায় কালযাপন করিতেছে। অবলোকনমাত্র, উভয়েরই অন্তঃকরণে অতিপ্রভূত কারুণ্যরস আবির্ভূত হইল। তখন তাহারা, স্নেহগত সম্ভাষণ পুরঃসর, অশেষপ্রকারে সান্ত্বনা ও অভয়প্রদান করিয়া, তাঁহাদিগকে রাজধানীতে লইয়া গেলেন। কিছুদিন পরে, রাজা রাজকন্যার, রাজকুমার রাজমহিষীর, পাণিগ্রহণ করিলেন।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! এই দুই নারীর সন্তান জন্মিলে তাহাদের পরস্পর কি সম্বন্ধ হইবেক, বল। রাজা বিক্রমাদিত্য, ঈষৎহাসিয়া, মৌনাবলম্বণ করিয়া রহিলেন।

উপসংহার

বেতাল কহিল, মহারাজ! আমি, তোমার সাহস ও অধ্যবসায় দর্শনে, অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমায় কিছু উপদেশ দিতেছি, অবধানপূর্বক শ্রবণ কর।

যে যোগী তোমায় শবানয়নে নিযুক্ত করিয়াছে; সে কুম্ভকারকুলে উৎপন্ন; তাহার নাম শান্তশীল। আর যে শব লইতে আসিয়াছ, উহা ভোগবতীর অধিপতি রাজা চন্দ্রভানুর মৃতদেহ। শান্তশীল, যোগসিদ্ধির নিমিত্ত, অনেক কৌশলে, চন্দ্রভানুর প্রাণবধ করিয়া, প্রায় কৃতকার্য হইয়া আছে; এক্ষণে, তোমার প্রাণসংহার করিতে পারিলেই, উহার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এজন্য আমি তোমায় সাবধান করিয়া দিতেছি; যোগী পূজাসমাপন করিয়া তোমায় বলিবেক, মহারাজ! সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত কর। তদনুসারে তুমি যেমন দণ্ডবৎ পতিত হইবে, অমনই সে খড়্গপ্রহার দ্বারা তোমার প্রাণসংহার করিবেক। অতএব, তুমি, কোনওক্রমে, সেরূপ প্রণাম না করিয়া বলিবে, আমি কোনও কালে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি নাই; এবং, কেমন করিয়া, সেরূপ প্রণাম করিতে হয়, তাহাও জানি না;

জননী ভগবতী দেবী।

পত্নী -দিনময়ী দেবী।

আপনি কৃপা করিয়া দেখাইয়া দিলে, আপনকার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারি। অনন্তর, তোমায় দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত, সে যেমন দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিবেক, অমনি তুমি, খড়্গপ্রহার দ্বারা, তাহার মস্তকচ্ছেদনপূর্বক, তাহার ও চন্দ্রভানুর মৃতদেহ সন্নিহিত জ্বলন্ত মহানসের উপরিস্থিত তৈলকটাহে নিক্ষিপ্ত করিবে; এবং, তাহা হইলেই, তদীয় সম্পূর্ণ যোগফলপ্রাপ্ত হইয়া, অখণ্ড ভূমণ্ডলে অবিচল সাম্রাজ্যস্থাপন করিতে পারিবে। সে ব্যক্তি আততায়ী; আততায়ীর বধে পাতক নাই।

এইরূপে বিক্রমাদিত্যকে সতর্ক করিয়া দিয়া, বেতাল, সেই মৃত শরীর হইতে বহির্নিঃসরণ পুবসরঃ; স্বস্থানে প্রস্থান কবিল। রাজা সেই শব লইয়া, সন্ন্যাসীর সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, তিনি সাতিশয় সন্তোষপ্রদর্শন ও রাজাব অশেষপ্রকার প্রশংসাকীর্তন করিতে লাগিলেন; অনন্তর, চন্দ্রভানুব জীবনদানপূর্বক, বলিপ্রদান করিলেন; এবং, পূজার অন্যান্য অঙ্গ যথাবৎ সমাপ্ত করিয়া, রাজাকে বলিলেন, মহারাজ! সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কর; তোমার প্রতাপবৃদ্ধি ও অভীষ্টসিদ্ধি হইবেক। রাজা, বেতালদত্ত উপদেশ অনুসারে কৃতাঞ্জলি হইয়া, অতি বিনিতভাবে আবেদন করিলেন, মহাশয়! আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কবিতে জানি না; আপনি গুরু; কি প্রকারে ঐরূপ প্রণাম করিতে হয়, কৃপা করিয়া দেখাইয়া দিউন। যোগী, রাজাকে সাষ্টাঙ্গপ্রণাম শিখাইবার নিমিত্ত, যেমন ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন, অমনি রাজা, বেতালের উপদেশ অনুসারে, খড়্গাঘাত দ্বারা, তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন।

দেবতাবা, এই ব্যাপার দর্শনে সাতিশয় পবিতুষ্ট হইয়া, দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দেবরাজ, দেবলোক হইতে অবতরণপূর্বক, রাজাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, মহাবাজ! আমি তোমার সৌভাগ্য দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। রাজা, অনিমিষ সহস্র নয়নে অলঙ্কৃত কলেবর দর্শনে, দেবরাজ স্থির করিয়া, আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিলেন; এবং বলিলেন, আপনকাব প্রসাদে, পৃথিবীতে আমার কোনও প্রার্থয়িতব্য নাই। এক্ষণে, এইমাত্র প্রার্থনা করি; যেন আমার এই বৃত্তান্ত সমস্ত সংসারে প্রসিদ্ধ হয়। ইন্দ্র কহিলেন, মহারাজ! যাবৎ চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল বিদ্যমান থাকিবেক, তাবৎকাল পর্যন্ত, তোমার এই বৃত্তান্ত ধরাতলে প্রসিদ্ধ থাকিবেক। এইরূপে রাজাকে ববপ্রদান করিয়া, দেবরাজ দেবলোকে প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর রাজা মন্ত্রপ্রয়োগপূর্বক, দুই মৃতদেহ তৈলকটাহে নিক্ষিপ্ত করিবামাত্র দুই বিকটাকার বীরপুরুষ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল; এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! কি আজ্ঞা হয়। রাজা কহিলেন, আমি যখন যখন স্মরণ করিব, তোমরা আমার নিকটে উপস্থিত হইবে। তাহারা যে আজ্ঞা মহারাজ! বলিয়া, প্রস্থান করিল। রাজাও বিক্রমাদিত্যও, সর্বপ্রকারে চরিতার্থ হইয়া, নিরতিশয় হৃষ্ট চিত্তে, রাজধানী প্রতিগমনপূর্বক অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

বাঙ্গালার ইতিহাস

[দ্বিতীয় ভাগ]

বিজ্ঞাপন

বাঙ্গালার ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ, শ্রীযুক্ত মার্শমন সাহেবের রচিত ইঙ্গরেজী গ্রন্থের শেষ নয় অধ্যায় অবলম্বনপূর্ব্বক, সঙ্কলিত, ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। কোনও কোনও অংশ, অনাবশ্যকবোধে, পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং কোনও কোনও বিষয়, আবশ্যক বোধে, গ্রন্থান্তর হইতে সঙ্কলনপূর্ব্বক, সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই পুস্তকে, অতি দুরাচার নবাব সিরাজ উদ্দৌলার সিংহাসনারোহণ অবধি, চিরস্মরণীয় লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক মহোদয়ের অধিকারসমাপ্তি পর্য্যন্ত, বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। সিরাজ উদ্দৌলা, ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে, বাঙ্গালা ও বিহারের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন; আর, লার্ড বেণ্টিক, ১৮৩৫ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে, ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া, ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সুতরাং এই পুস্তকে, একোন অশীতি বৎসরের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

বাঙ্গালার ইতিহাস

[দ্বিতীয় ভাগ]

প্রথম অধ্যায়

১৭৫৬ খৃষ্টীয় অব্দের ১০ই এপ্রিল, সিরাজউদ্দৌলা বাঙ্গালা ও বিহারের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তৎকালে, দিল্লীর অধীশ্বর এমন দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন যে, নূতন নবাব তাঁহার নিকট সনন্দ প্রার্থনা করা আবশ্যক বোধ করিলেন না।

তিনি, রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ, আপন পিতৃব্যপত্নীর সমুদয় সম্পত্তি হরণ করিবার নিমিত্ত, সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাঁহার পিতৃব্য নিবাইশ মহম্মদ, ষোল বৎসর ঢাকার অধিপতি থাকিয়া, প্রভূত অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি লোকান্তরপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহার পত্নী তদীয় সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হয়েন। ঐ বিধবা নারী আপন সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত, যে সৈন্য রাখিয়াছিলেন, তাহারা কার্যকালে পলায়ন করিল; সুতরাং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি, নির্বিবাদে, নবাবের প্রাসাদে প্রেরিত হইল, এবং তিনিও সহজে আপন বাসস্থান হইতে বহিষ্কৃতা হইলেন।

রাজবল্লভ ঢাকায় নিবাইশ মহম্মদের সহকারী ছিলেন, এবং মুসলমানদিগের অধিকার-সময়ের প্রথা অনুসারে; প্রজার সর্বনাশ করিয়া, যথেষ্ট ধনসঞ্চয় করেন। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের আরম্ভে, নিবাইশ পরলোক যাত্রা করেন। তৎকালে আলিবর্দি সিংহাসনারূঢ় ছিলেন, কিন্তু বার্ধক্যবশতঃ, হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন। রাজবল্লভ ঐ সময়ে মুরশিদাবাদে উপস্থিত থাকাতে, সিরাজউদ্দৌলা, তাঁহাকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া, তদীয় সম্পত্তি রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত, ঢাকায় লোক প্রেরণ করেন। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস, অগ্রে সংবাদ জানিতে পারিয়া, সমস্ত সম্পত্তি লইয়া, নৌকারোহণপূর্বক, গঙ্গাসাগর অথবা জগন্নাথ যাত্রার ছলে কলিকাতায় পলায়ন করেন; এবং, ১৭ই মার্চ, তথায় উপস্থিত হইয়া, তথাকার অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেবের অনুমতি লইয়া; নগর মধ্যে বাস করেন। তিনি মনে-মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, যাবৎ পিতার মুক্তিসংবাদ না পান, ততদিন ঐ স্থানে অবস্থিতি করিবেন।

রাজবল্লভের সম্পত্তি এইরূপে হস্তবহির্ভূত হওয়াতে, সিরাজউদ্দৌলা সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; এক্ষণে, সিংহাসনারূঢ় হইয়া, কৃষ্ণদাসকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবেক, এই দাওয়া করিয়া, কলিকাতায় দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ঐ দূত

বিশ্বাসযোগ্য পত্রাদির প্রদর্শন করিতে না পারিবাতে, ড্রেক সাহেব তাহাকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

কিছু দিন পরে, য়ুরোপ হইতে এই সংবাদ আসিল, অল্পদিনের মধ্যেই, ফরাসিদিগের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছে। তৎকালে ফরাসিরা, করমণ্ডল উপকূলে, অতিশয় প্রবল ও পরাক্রান্ত ছিলেন; আর কলিকাতায় ইংরেজদিগের যত য়ুরোপীয় সৈন্য ছিল, চন্দননগরে ফরাসিদের তদপেক্ষা দশগুণ অধিক থাকে। এই সমস্ত কারণে, কলিকাতাবাসী ইংরেজরা আপনাদের দুর্গের সংস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। এই ব্যাপার, অনতিবিলম্বে, অল্পবয়স্ক উদ্ধতস্বভাব নবাবের কর্ণগোচর হইল। ইংরেজদিগের উপর তাঁর সবিশেষ দ্বেষ ছিল; এজন্য, তিনি, ভয় প্রদর্শনপূর্বক, ড্রেক সাহেবকে এই পত্র লিখিলেন, আপনি নূতন দুর্গ নির্মাণ করিতে পাইবেন না; পুরাতন যাহা আছে, ভাঙিয়া ফেলিবেন; এবং, অবিলম্বে, কৃষ্ণদাসকে আমার লোকের হস্তে সমর্পণ করিবেন।

আলিবর্দির মৃত্যুর দুই এক মাস পূর্বে, সিরাজউদ্দৌলার দ্বিতীয় পিতৃব্য সায়দ মহম্মদের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। তাঁহার পুত্র সকতজঙ্গ তদীয় সমস্ত সৈন্য, সম্পত্তি, ও পূর্ণিয়ার রাজত্বের অধিকারী হয়েন। সুতরাং, সকতজঙ্গ, সিরাজউদ্দৌলার সুবাদার হইবার কিঞ্চিৎ পূর্বে, রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই তুল্যরূপ নির্বোধ, নৃশংস, ও অবিমৃশ্যকারী ছিলেন; সুতরাং, অধিককাল, তাঁহাদের পরস্পর সম্প্রীত ও ঐক্যবাক্য থাকিবেক, তাহার কোনও সম্ভাবনা ছিল না।

সিরাজউদ্দৌলা, সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, মাতামহের পুরান কর্মচারী ও সেনাপতিদিগকে পদচ্যুত করিলেন। কুপ্রবৃত্তির উত্তেজক কতিপয় অল্পবয়স্ক দুষ্ক্রিয়াসক্ত ব্যক্তি তাঁহার প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিল। তাহারা, প্রতিদিন, তাঁহাকে কেবল অন্যায্য ও নিষ্ঠুর ব্যাপারের অনুষ্ঠানে পরামর্শ দিতে লাগিল। ঐ সকল পবামর্শের এই ফল দর্শিয়াছিল যে, তৎকালে, প্রায় কোন ব্যক্তির সম্পত্তি বা কোনও স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা পায় নাই।

রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকেরা, এই সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহার পরিবর্তে, অন্য কোনও ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা, আপাততঃ, সকতজঙ্গকেই লক্ষ্য করিলেন। তাঁহারা নিশ্চিত জানিতেন, তিনি সিরাজউদ্দৌলা অপেক্ষা ভদ্র নহেন; কিন্তু, মনে মনে এই আশা করিয়াছিলেন, আপাততঃ, এই উপায় দ্বারা, উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া, পরে, কোনও যথার্থ ভদ্র ব্যক্তিকে সিংহাসনে নিবিষ্ট করিতে পারিবেন।

এ বিষয়ে সমুদয় পরামর্শ স্থির হইলে, সকতজঙ্গের সুবাদারীর সনন্দ প্রার্থনায়, দিল্লীতে

দূত প্রেরিত হইল। আবেদন পত্রে বার্ষিক কোটি মুদ্রা কর প্রদানের প্রস্তাব থাকাতে অনায়াসেই তাহাতে সম্রাটের সম্মতি হইল।

সিরাজউদ্দৌলা, এই চক্রান্তের সন্ধান পাইয়া, অবিলম্বে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, সকতজঙ্গের প্রাণদণ্ডার্থে, পূর্ণিয়া যাত্রা করিলেন। সৈন্য সকল, রাজমহলে উপস্থিত হইয়া, গঙ্গা পার হইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে, নবাব, কলিকাতার ড্রেক সাহেবের নিকট হইতে, আপন পূর্বপ্রেরিত পত্রের এই উত্তর পাইলেন, আমি আপনকার আজ্ঞায় কদাচ সম্মত হইতে পারি না।

এই উত্তর পাইয়া, তাঁহার কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি, ইংরেজেরা রাজ্যের বিরুদ্ধাচারীদিগকে আশ্রয় দিতেছে; এবং, আমার অধিকারের মধ্যে, দুর্গ নির্মাণ করিয়া, আপনাদিগকে দৃঢ়ীভূত করিতেছে, অতএব, আমি তাহাদিগকে নির্মূল করিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, সৈন্যদিগকে, অবিলম্বে শিবির ভঙ্গ করিয়া, কলিকাতা যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন, কাশিমবাজারে, ইংরেজদিগের যে কুঠী ছিল, আগমনকালে তাহা লুঠ করিলেন; এবং তথায় যে যে য়ুরোপীয়দিগকে দেখিতে পাইলেন, সকলকেই কারারুদ্ধ করিলেন।

কলিকাতাবাসী ইংরেজেরা, ষাটি বৎসরের অধিককাল, নিরুপদ্রবে ছিলেন, সুতরাং, বিশেষ আস্থা না থাকাতে, তাঁহাদের দুর্গ একপ্রকার নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তাঁহারা আপনাদিগকে এত নিঃসঙ্গ ভাবিয়াছিলেন যে, দুর্গপ্রাচীরের বহির্ভাগে বিংশতি ব্যামের মধ্যেও, অনেক গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তৎকালে, দুর্গ মধ্যে একশত সত্তর জন মাত্র সৈন্য ছিল; তন্মধ্যে কেবল ষাটি জন য়ুরোপীয়। বারুদ পুরান ও নিস্তেজ; কামান সকল মরিচাধরা। এ দিকে, সিরাজউদ্দৌলা, চল্লিশ পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য ও উত্তম উত্তম কামান লইয়া, কলিকাতা আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। ইংরেজেরা দেখিলেন আক্রমণ নিবারণের কোনও সম্ভাবনা নাই; অতএব, সন্ধি প্রার্থনায়, বারংবার পত্র প্রেরণ করিতে লাগিলেন, এবং বহুসংখ্যক মুদ্রা প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু, নবাবের অন্য কোনও বিষয়ে কর্ণ দিতে ইচ্ছা ছিল না; তিনি ইংরেজদিগকে একবারে উচ্ছিন্ন করিবার মানস করিয়াছিলেন; অতএব, পত্রের কোনও উত্তর না দিয়া, অবিশ্রামে কলিকাতা অভিমুখে আসিতে লাগিলেন।

১৬ই জুন, তাঁহার সৈন্যের অগ্রসর ভাগ চিৎপুরে উপস্থিত হইল। ইংরেজেরা, ইতঃপূর্বে, তথায় এক উপদুর্গ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তথা হইতে তাঁহারা, নবাবের সৈন্যের উপর, এমন ভয়ানক গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন যে, তাহারা হটিয়া গিয়া, দমদমায় অবস্থিতি করিল।

নবাবের সৈন্যরা, ১৭ই জুন, নগর বেষ্টন করিয়া, তৎপর দিন, এককালে চারিদিকে

আক্রমণ করিল। তাহারা, ভিত্তির সন্নিহিত গৃহ সকল অধিকার করিয়া, এমন ভয়ানক গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল যে, এক ব্যক্তিও, সাহস করিয়া, গড়ের উপর দাঁড়াইতে পারিল না। ঐ দিবস অনেক ব্যক্তি হত ও অনেক ব্যক্তি আহত হইল, এবং দুর্গের বহির্ভাগ বিপক্ষের হস্তগত হওয়াতে, ইংরেজদিগকে দুর্গের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিতে হইল। রাত্রিতে, বিপক্ষেরা দুর্গের চতুঃপার্শ্ববর্তী অতি বৃহৎ কতিপয় গৃহে অগ্নিপ্রদান করিল; ঐ সকল গৃহ অতি ভয়ানক রূপে জ্বলিত হইতে লাগিল।

অতঃপর কি করা উচিত, ইহার বিবেচনা করিবার নিমিত্ত, দুর্গস্থিত ইংরেজেরা একত্র সমবেত হইলেন। তৎকালীন সেনাপতিদিগের মধ্যে এক ব্যক্তিও কার্যজ্ঞ ছিলেন না। তাঁহারা সকলে কহিলেন, পলায়ন ব্যতিরেকে পরিত্রাণ নাই। বিশেষতঃ এত অধিক এতদ্দেশীয় লোক দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল যে, তন্মধ্যে যে আহারসামগ্রী ছিল, তাহাতে এক সপ্তাহ চলিতে পারিত না। অতএব নির্ধারিত হইল, গড়ের নিকট যে সকল নৌকা প্রস্তুত আছে, পরদিন প্রত্যূষে, নগর পরিত্যাগ করিয়া, তদ্দ্বারা পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু, দুর্গ মধ্যে, এক ব্যক্তিও এমন ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না যে, এই ব্যাপার সুশৃঙ্খল রূপে সম্পন্ন করিয়া উঠেন। সকলেই আজ্ঞাপ্রদানে উদ্যত; কেহই আজ্ঞা-প্রতিপালনে সম্মত নহে।

নিরূপিত সময় উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ স্ত্রীলোক সকল প্রেরিত হইলেন। অনন্তর, দুর্গস্থিত সমুদয় লোক ও নাবিকগণ ভয়ে অতিশয় অভিভূত হইল। সকল ব্যক্তিই তীরাভিমুখে ধাবমান। নাবিকেরা নৌকা লইয়া পলাইতে উদ্যত। ফলতঃ সকলেই আপন লইয়া ব্যস্ত। যে, যে নৌকা সম্মুখে পাইল, তাহাতেই আরোহণ করিল। সর্বাধ্যক্ষ ড্রেক সাহেব, ও সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব, সর্বাগ্রে পলায়ন করিলেন। যে কয়েকখান নৌকা উপস্থিত ছিল, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে, কতক জাহাজের নিকটে, কতক হাবড়া পারে, চলিয়া গেল; কিন্তু, সৈন্য ও ভদ্রলোক অর্ধেকেরও অধিক দুর্গের মধ্যে রহিয়া গেল।

সর্বাধ্যক্ষ সাহেবের পলায়ন সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র, অবশিষ্ট ব্যক্তিরা, একত্র সমবেত হইয়া, হলওয়েল সাহেবকে আপনাদের অধ্যক্ষ স্থির করিলেন। পলায়িতেরা, জাহাজে আরোহণ করিয়া, প্রায় একক্রোশ ভাটিয়া গিয়া নদীতে নঙ্গর করিয়া রহিল। ১৯শে জুন, নবাবের সৈন্যেরা পুনর্বার আক্রমণ করিল; কিন্তু পরিশেষে অপসারিত হইল।

দুর্গবাসীরা, দুই দিবস পর্যন্ত, আপনাদের রক্ষা করিল; এবং জাহাজস্থিত লোকদিগকে অনবরত এই সঙ্কেত করিতে লাগিল, তোমরা আসিয়া আমাদের উদ্ধার কর। এই উদ্ধারক্রিয়া অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারিত। কিন্তু, পলায়িত ব্যক্তিরা, পরিত্যক্ত ব্যক্তিদিগের উদ্ধারার্থে, একবারও উদ্যোগ করিল না। যাহা হউক, তখনও তাহাদের

অন্য এক আশা ছিল। রয়েল জর্জ নামে একখানা জাহাজ, চিৎপুরের নীচে, নঙ্গর করিয়াছিল। হলওয়েল সাহেব, ঐ জাহাজ গড়ের নিকটে আনিবার নিমিত্ত, দুইজন ভদ্রলোককে পাঠাইয়া দিলেন; দুর্ভাগ্যক্রমে, উহা আসিবার সময় চড়ায় লাগিয়া গেল। এইরূপে, দুর্গস্থিত হত্যভাগ্য দিগের শেষ আশাও উচ্ছিন্ন হইল।

১৯শে জুন রাত্রিতে, নবাবের সৈন্যরা, দুর্গের চতুর্দিকস্থ অবশিষ্ট গৃহ সকলে অগ্নি প্রদান করিয়া, ২০শে, পুনর্বার; পূর্বাপেক্ষা অধিকতর পরাক্রম সহকারে, আক্রমণ করিল। হলওয়েল সাহেব, আর নিবারণ চেষ্টা করা ব্যর্থ বুঝিয়া, নবাবের সেনাপতি মানিকচাঁদের নিকট পত্র দ্বারা সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। দুই প্রহর চারিটার সময়, নবাবের পক্ষের এক সৈনিক পুরুষ, কামান বন্ধ করিতে সঙ্কেত করিল। তদনুসারে, ইংরেজরা, সেনাপতির উত্তর আসিল ভাবিয়া, আপনাদের কামান ছোঁড়া রহিত করিবামাত্র, বিপক্ষেরা প্রাচীরের নিকট দৌড়িয়া আসিল; প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল; এবং, তৎপরে এক ঘণ্টার মধ্যে, দুর্গ অধিকার করিয়া, লুঠ আরম্ভ করিল।

বেলা পাঁচটার সময়, সিবাজউদ্দৌলা, চৌপালায় চডিয়া, দুর্গ মধ্যে উপস্থিত হইলে, যুরোপীয়েরা তাঁহার সম্মুখে নীত হইল। হলওয়েল সাহেবের দুই হস্ত বদ্ধ ছিল, নবাব খুলিয়া দিতে আজ্ঞা দিয়া, তাঁহাকে এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন, তোমার একটি কেশও স্পৃষ্ট হইবেক না; অনন্তর, বিস্ময় প্রকাশপূর্বক কহিলেন, এত অল্প সংখ্যক ব্যক্তি, কিরূপে, চারিশত গুণ অধিক সৈন্যের সহিত এতক্ষণ যুদ্ধ করিল। পরে, এক অনাবৃত প্রদেশে সভা কবিযা, তিনি কৃষ্ণদাসকে সম্মুখে আনিতে আদেশ করিলেন। নবাব যে ইংরেজদিগকে আক্রমণ করেন, কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দেওয়া তাহার প্রধান কারণ। তাহাতে সকলে অনুমান করিয়াছিল, তিনি কৃষ্ণদাসের গুরুতর দণ্ড করিবেন; কিন্তু তিনি, তাহা না করিয়া, তাঁহাকে এক মহামূল্য পরিচ্ছদ পুরস্কার দিলেন।

বেলা ছয় সাত ঘণ্টার সময়, নবাব, সেনাপতি মানিকচাঁদের হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিয়া, শিবিরে গমন করিলেন। সমুদয়ে এক শত ছচল্লিশ জন য়ুরোপীয় বন্দী ছিল। সেনাপতি সে রাত্রি তাহাদিগকে যেখানে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, এমন স্থানের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তৎকালে দুর্গের মধ্যে, দীর্ঘে বার হাত, প্রস্থে নয় হাত, এরূপ এক গৃহ ছিল। বায়ুসঞ্চারের নিমিত্ত, ঐ গৃহের এক এক দিকে এক এক মাত্র গবাক্ষ থাকে। ইংরেজেরা কলহকারী দুর্বৃত্ত সৈনিকদিগকে ঐ গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিতেন। নবাবের সেনাপতি, দারুণ গ্রীষ্মকালে, সমস্ত য়ুরোপীয় বন্দীদিগকে ঐ ক্ষুদ্র গৃহে নিক্ষিপ্ত করিলেন। সে রাত্রিতে যন্ত্রণার পরিসীমা ছিল না। বন্দীরা, অতি ত্বরায়, ঘোরতর পিপাসায় কাতর হইল। তাহারা, রক্ষকদিগের নিকট বারংবার প্রার্থনা করিয়া, যে জল পাইল, তাহাতে কেবল তাহাদিগকে ক্ষিপ্তপ্রায় করিল। প্রত্যেক ব্যক্তি, সম্যকরূপে নিশ্বাস আকর্ষণ

করিবার আশায়, গবাক্ষের নিকটে যাইবার নিমিত্ত, বিবাদ করিতে লাগিল ; এবং, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, রক্ষীদিগের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল, তোমরা, গুলি করিয়া, আমাদের এই দুঃসহ যন্ত্রণার অবসান কর। এক এক জন করিয়া, ক্রমে ক্রমে, অনেকে পঞ্চত্ব পাইয়া ভূতলশায়ী হইল। অবশিষ্ট ব্যক্তিরা শবরাশির উপর দাঁড়াইয়া, নিশ্বাস আকর্ষণের অনেক স্থান পাইল, এবং তাহাতেই কয়েকজন জীবিত থাকিল।

পরদিন প্রাতঃকালে ঐ গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইলে, দৃষ্ট হইল, এক শত ছচল্লিশের মধ্যে, তেইশ জন মাত্র জীবিত আছে। অন্ধকূপহত্যা নামে যে অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার প্রসিদ্ধ আছে, সে এই। এই হত্যার নিমিত্তই, সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণ শুনিতে এত ভয়ানক হইয়া রহিয়াছে ; উক্ত ঘোরতর অত্যাচার প্রযুক্তই, এই বৃত্তান্ত লোকের অন্তঃকরণে অদ্যাপি দেদীপ্যমান আছে, এবং সিরাজউদ্দৌলাও নৃশংস রাক্ষস বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু তিনি, পরদিন প্রাতঃকাল পর্যন্ত, এই ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গ জানিতেন না। সে রাত্রিতে, সেনাপতি মানিকচাঁদের হস্তে দুর্গের ভার অর্পিত ছিল ; অতএব, তিনিই সমস্ত দোষের ভাগী।

২১শে জুন, প্রাতঃকালে, এই নিদারুণ ব্যাপার নবাবের কর্ণগোচর হইলে তিনি অতিশয় অনবধান প্রদর্শন করিলেন। অন্ধকূপে রুদ্ধ হইয়া, যে কয় ব্যক্তি জীবিত থাকে, হলওয়েল সাহেব তাহাদের মধ্যে এক জন। নবাব, তাঁহাকে আহ্বান করিয়া ধনাগার দেখাইয়া দিতে কহিলেন। তিনি দেখাইয়া দিলেন ; কিন্তু ধনাগারের মধ্যে পঞ্চাশ সহস্রের অধিক টাকা পাওয়া গেল না।

সিরাজউদ্দৌলা, নয় দিবস, কলিকাতার সান্নিধ্যে থাকিলেন ; অনন্তর, কলিকাতার নাম আলীনগর রাখিয়া, মুরশিদাবাদ প্রস্থান করিলেন। ২রা জুলাই, গঙ্গা পার হইয়া তিনি হুগলীতে উত্তীর্ণ হইলেন, এবং লোক দ্বারা ওলন্দাজ ও ফরাসিদিগের নিকট কিছু কিছু টাকা চাহিয়া পাঠাইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন, যদি অস্বীকার কর, তোমাদেরও ইংরেজদের মত দুরবস্থা করিব। তাহাতে ওলন্দাজেরা সাড়ে চারি লক্ষ, আর ফরাসিরা সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দিয়া পরিত্রাণ পাইলেন।

যে বৎসর কলিকাতা পরাজিত হইল, ও ইংরেজেরা বাংলা হইতে দূরীকৃত হইলেন, সেই বৎসর, অর্থাৎ ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে, দিনামারেরা, এই দেশে বাসের অনুমতি পাইয়া শ্রীরামপুর নগর সংস্থাপিত করিলেন।

সিরাজউদ্দৌলা, জয়লাভে প্রফুল্ল হইয়া, পূর্ণিয়ার অধিপতি পিতৃব্যপুত্র সকতজঙ্গকে আক্রমণ করা স্থির করিলেন। বিবাদ উত্থাপন করিবার নিমিত্ত, আপন এক ভৃত্যকে ঐ প্রদেশের ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া, পিতৃব্যপুত্রকে এই আজ্ঞাপত্র লিখিলেন, তুমি অবিলম্বে ইহার হস্তে সমস্ত বিষয়ের ভার দিবে। ঐ উদ্ধত যুবা, পত্রপাঠে ক্রোধান্ধ ও ক্ষিপ্তপ্রায়

হইয়া, উত্তর লিখিলেন, আমি সমস্ত প্রদেশের যথার্থ অধিপতি, দিল্লী হইতে সনন্দ পাইয়াছি ; অতএব, আজ্ঞা করিতেছি, তুমি অবিলম্বে মুরশিদাবাদ হইতে চলিয়া যাও। এই উত্তর পাইয়া, সিরাজউদ্দৌলা, ক্রোধে অধৈর্য হইলেন, এবং অতি ত্বরায়, সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পূর্ণিয়া যাত্রা করিলেন। সকতজঙ্গও, এই সংবাদ পাইয়া সৈন্য লইয়া, তদভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকতজঙ্গ নিজে যুদ্ধের কিছুই জানিতেন না, এবং কাহারও পরামর্শ শুনিতেন না। তাঁহার সেনাপতিরা সৈন্য সহিত এক দৃঢ় স্থানে উপস্থিত হইল। ঐ স্থানের সম্মুখে জলা, পার হইবার নিমিত্ত মধ্যে এক মাত্র সেতু ছিল। সৈন্য সকল সেই স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিল। কিন্তু, তদীয় সৈন্য মধ্যে, এক ব্যক্তিও উপযুক্ত সেনাপতি ছিলেন না, এবং অনুষ্ঠানেরও কোনও পরিপাটি ছিল না। প্রত্যেক সেনাপতি আপন আপন সুবিধা অনুসারে, পৃথক পৃথক স্থানে সেনাপতি নিবেশিত করিলেন।

সিরাজউদ্দৌলার সৈন্য, ঐ জলার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সকতজঙ্গের সৈন্যের উপর গোলা চালাইতে লাগিল। বড় বড় কামানের গোলাতে তদীয় সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইলে, তিনি নিতান্ত উন্মত্তের ন্যায়, স্বীয় অশ্বারোহীদিগকে, জলা পার হইয়া, বিপক্ষ সৈন্য আক্রমণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহারা অতি কষ্টে কর্দম পার হইয়া, শুষ্ক স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র, সিরাজউদ্দৌলার সৈন্য অতি ভয়ানক রূপে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল।

ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে, এমন সময়ে, সকতজঙ্গ স্বীয় শিবিরে প্রবেশ করিলেন, এবং, অত্যধিক সুরাপান করিয়া, এমন মত্ত হইলেন যে, আর সোজা হইয়া বসিতে পারেন না। তাঁহার সেনাপতিরা আসিয়া তাঁহাকে, রণস্থলে উপস্থিত থাকিবার নিমিত্ত, অতিশয় অনুরোধ করিতে লাগিলেন ; পরিশেষে, ধরিয়া থাকিবার নিমিত্ত এক ভৃত্যসমেত, তাঁহাকে হস্তীতে আরোহণ করাইয়া, জলার প্রান্তভাগে উপস্থিত করিলেন। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র, শত্রুপক্ষ হইতে এক গোলা আসিয়া তাঁহার কপালে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সৈন্যরা, তাহাকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়া, শ্রেণীভঙ্গপূর্বক পলায়ন করিল। দুই দিবস পরে, নবাবের সেনাপতি মোহনলাল পূর্ণিয়া অধিকার করিলেন, এবং তথাকার ধনাগারে প্রাপ্ত ন্যূনাধিক নবতি লক্ষ টাকা ও সকতজঙ্গের যাবতীয় অন্তঃপুরিকাগণ মুরশিদাবাদে পাঠাইয়া দিলেন।

সিরাজউদ্দৌলা, সাহস করিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, বস্তুতঃ, তিনি রাজমহলের অধিক যান নাই ; কিন্তু, এই জয়ের সমুদয় বাহাদুরী আপনার বোধ করিয়া, মহাসমারোহে মুরশিদাবাদ প্রত্যাগমন করিলেন।

এ দিকে, ড্রেক সাহেব, কাপুরুষত্ব প্রদর্শনপূর্বক, পলায়ন করিয়া স্বীয় অনুচরবর্গের সহিত নদীমুখে জাহাজে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তথায়, অনেক ব্যক্তি, রোগাভিভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

কলিকাতার দুর্ঘটনার সংবাদ মান্দ্রাজে পঁহুছিলে, তথাকার গবর্ণর ও কৌন্সিলের সাহেবেরা যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইলেন, এবং চারিদিকে বিপদ সাগর দেখিতে লাগিলেন। সেই সময়ে, ফরাসিদিগের সহিত ত্বরায় যুদ্ধ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়াছিল। ফরাসিরা তৎকালে পণ্ডিচেরীতে অতিশয় প্রবল ছিলেন; ইংরেজদিগের সৈন্য অতি অল্প মাত্র ছিল। তথাপি তাঁহারা বাঙ্গালার সাহায্য করাই সর্বাগ্রে কর্তব্য স্থির করিলেন। তদনুসারে, তাঁহারা অতি ত্বরায় কতিপয় যুদ্ধজাহাজ ও কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিলেন, এবং এডমিরল ওয়াট্‌সন সাহেবকে জাহাজের কর্তৃত্ব দিয়া, আর কর্ণেল ক্লাইব সাহেবকে সৈন্যাধ্যক্ষ করিয়া, বাঙ্গালায় পাঠাইলেন।

ক্লাইব, অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, কোম্পানির কেরানি নিযুক্ত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর পূর্বে, ভারতবর্ষে আগমন করেন, সাংগ্রামিক ব্যাপারে গাঢতর অনুরাগ থাকাতে, প্রার্থনা করিয়া সেনাসংক্রান্ত কর্মে নিবিষ্ট হয়েন, এবং, অল্প কাল মধ্যে, একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা হইয়া উঠেন। এই সময়ে, তিনি বয়সে যুবা, কিন্তু অভিজ্ঞতাতে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন।

মান্দ্রাজে উদ্যোগ করিতে অনেক সময় নষ্ট হয়; এজন্য, জাহাজ সকল অক্‌টোবরের পূর্বে বহির্গত হইতে পারিল না। তৎকালে উত্তরপূর্বীয় বায়ুর সঞ্চার আবদ্ধ হইয়াছিল; এ প্রযুক্ত, জাহাজ সকল, ছয় সপ্তাহের ন্যূনে, কলিকাতায় উপস্থিত হইতে পারিল না, তন্মধ্যে দুইখানার আরও অধিক বিলম্ব হইয়াছিল।

কলিকাতার উদ্ধারার্থে, মান্দ্রাজ হইতে সমুদয়ে ৯০০ গোরা ও ১৫০০ সিপাই প্রেরিত হয়। তাহারা, ২০শে ডিসেম্বর, ফলতায়, ও ২৮শে, মায়াপুরে পঁহুছিল। তৎকালে মায়াপুরে মুসলমানদিগের এক দুর্গ ছিল। কর্ণেল ক্লাইব, শেষোক্ত দিবসে, রজনীযোগে, স্বীয়, সমস্ত সৈন্য তীরে অবতীর্ণ করিলেন; কিন্তু, পথদর্শকদিগের দোষে, অরুণোদয়ের পূর্বে, ঐ দুর্গের নিকট পঁহুছিতে পারিলেন না।

নবাবের সেনাপতি মানিকচাঁদ, কলিকাতা হইতে অকস্মাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া, ক্লাইবকে আক্রমণ করিলেন। ঐ সময়ে, নবাবের সৈন্যরা যদি প্রকৃতরূপে কার্য সম্পাদন করিত, তাহা হইলে, ইংরেজেরা নিঃসন্দেহ পরাজিত হইতেন। যাহা হউক, ক্লাইব, অতি ত্বরায় কামান আনাইয়া, শত্রুপক্ষের উপর গোলা চালাইতে আরম্ভ করিলেন। তন্মধ্যে এক গোলা মানিকচাঁদের হাওদার ভিতর দিয়া চলিয়া যাওয়াতে, তিনি, যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া, তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। পরিশেষে, কলিকাতায় থাকিতেও সাহস না হওয়াতে, তথায় কেবল পাঁচশত সৈন্য রাখিয়া, আপন প্রভুর নিকটস্থ হইবার মানসে, তিনি অতি সত্বর মুরশিদাবাদ প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর, ক্লাইব স্থলপথে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। জাহাজ সকল তাঁহার উপস্থিতির পূর্বেই তথায় পঁহুছিয়াছিল। ওয়াট্‌সন সাহেব, কলিকাতার উপর, ক্রমাগত দুইঘণ্টা

কাল, গোলাবৃষ্টি করিয়া ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের ২রা জানুয়ারি, ঐ স্থান অধিকার করিলেন। এইরূপে, ইংরেজেরা পুনর্বার কলিকাতার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন, অথচ স্বপক্ষীয় এক ব্যক্তিরও প্রাণহানি হইল না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্লাইব বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ভয় প্রদর্শন না করিলে, নবাব কদাচ সন্ধি করিতে চাহিবেন না। অতএব তিনি, কলিকাতা উদ্ধারের দুই দিবস পরে, যুদ্ধজাহাজ ও সৈন্য পাঠাইয়া, হুগলী অধিকাব করিলেন। তৎকালে এই নগর প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল।

বোধ হইতেছে, কলিকাতা অধিকার হইবার অব্যবহিত পরে, ক্লাইব মুরশিদাবাদের শেঠদিগেব নিকট এই প্রার্থনা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তাঁহারা, মধ্যস্থ হইয়া, নবাবের সহিত ইংরেজদিগের সন্ধি করিয়া দেন। তদনুসারে তাঁহারা সন্ধির প্রস্তাব করেন। সিরাজউদ্দৌলাও, প্রথমতঃ, প্রসন্নচিত্তে, তাঁহাদের পরামর্শ শুনিয়াছিলেন; কিন্তু ক্লাইব, হুগলী অধিকার করিয়া, তথাকার বন্দর লুঠ করিয়াছেন, ইহা শুনিবামাত্র, ক্রোধে অন্ধ হইয়া, সসৈন্য অবিলম্বে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। তিনি, ৩০শে জানুয়ারি, হুগলীর ঘাটে গঙ্গা পার হইলেন; এবং, ২রা ফেব্রুয়ারি, কলিকাতার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া, ক্লাইবের ছাউনির এক পোয়া অন্তরে শিবির নিবেশিত করিলেন।

ক্লাইব, ৭০০ গোরা ও ১২০০ সিপাই, এইমাত্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু নবাবের সৈন্য প্রায় চত্বারিংশৎ সহস্র।

সিরাজউদ্দৌলা পঁহুছিবামাত্র, ক্লাইব, সন্ধি প্রার্থনায়, তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। নবাবের সহিত দূতদিগের অনেকবার সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইল। তাহাতে তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, নবাব যদিও মুখে সন্ধির কথা কহিতেছেন, তাঁহার অন্তঃকরণ সেরূপ নহে। বিশেষতঃ, তাহাকে উপস্থিত দেখিয়া, কলিকাতার চারিদিকের লোক ভয়ে পলায়ন করাতে, ইংরেজদিগের আহারসামগ্রী দুষ্প্রাপ্য হইতে লাগিল। অতএব ক্লাইব, এক উদ্যমেই, নবাবকে আক্রমণ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। তিনি ৪ঠা ফেব্রুয়ারি রাত্রিতে, ওয়াট্‌সন সাহেবের জাহাজে গিয়া, তাঁহার নিকট ছয়শত জাহাজী গোরা চাহিয়া লইলেন, এবং তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া, রাত্রি একটার সময় তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। দুইটার সময়, সমুদয় সৈন্য স্ব স্ব অস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইল, এবং চারিটার সময়, একবারে নবাবের ছাউনির দিকে যাত্রা করিল। সৈন্য

সমুদয়ে ১৩৫০ গোরা ও ৮০০ সিপাই। অকুতোভয় ক্লাইব, সাহসে নির্ভর করিয়া, এইমাত্র সৈন্য লইয়া, বিংশতি গুণ অধিক সৈন্য আক্রমণ করিতে চলিলেন।

শীতকালের শেষে, প্রায় প্রতিদিন কুজ্ঝটিকা হইয়া থাকে। সে দিবসও প্রভাত হইবামাত্র, এমন নিবিড় কুজ্ঝটিকা হইল যে, কোনও ব্যক্তি, আপনার সম্মুখের বস্তুও দেখিতে পায় না। যাহা হউক, ইংরেজেরা, যুদ্ধ করিতে করিতে, বিপক্ষের শিবির ভেদ করিয়া চলিয়া গেলেন। হত ও আহত সমুদয়ে তাঁহাদের দুই শত বিংশতি জন মাত্র সৈন্য নষ্ট হয়। কিন্তু নবাবের তদপেক্ষায় অনেক অধিক লোক নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল।

নবাব, ক্লাইবের ঈদৃশ অসম্ভব সাহস দর্শনে, অতিশয় ভয়প্রাপ্ত হইলেন, এবং বুঝিতে পারিলেন, কেমন ভয়ানক শত্রুর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব, তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে চারি ক্রোশ দূরে গিযা ছাউনি করিলেন। ক্লাইব দ্বিতীয়বার আক্রমণের সমুদয় উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু নবাব, তদীয় অসম্ভব সাহস ও অকুতোভয়তা দর্শনে, যুদ্ধের বিষয়ে এত ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিলেন যে, সন্ধির বিষয়েই সম্মত হইয়া ৯ই ফেব্রুয়ারি, সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

এই সন্ধি দ্বারা ইংরেজেরা, পূর্বের ন্যায়, সমুদয় অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। অধিকন্তু, কলিকাতায় দুর্গনির্মাণ ও টাকশালস্থাপন করিবার অনুমতি পাইলেন; আর তাঁহাদের পণ্যদ্রব্যের শুল্কদান রহিত হইল। নবাব ইহাও স্বীকার করিলেন, কলিকাতায় আক্রমণ কালে যে সকল দ্রব্য গৃহীত হইযাছে, সমুদয় ফিরিয়া দিবেন; আর যাহা যাহা নষ্ট হইয়াছে, সে সমুদয়ের যথোপযুক্ত মূল্য ধরিয়া দিবেন।

ইংরেজেরা যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন, এই ভাবিয়া, নবাব এই সকল নিয়ম তৎকালে অতিশয় অনুকূল বোধ করিলেন। আর ক্লাইবও এই বিবেচনা করিয়া সন্ধিপক্ষে নির্ভর করিলেন যে, য়ুরোপে ফরাসিদিগের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ আরব্ধ হইয়াছে; আর কলিকাতায় ইংরেজদিগের যত য়ুরোপীয় সৈন্য আছে, চন্দননগরে ফরাসিদিগেরও তত আছে। অতএব, চন্দননগর আক্রমণ করিতে যাইবার পূর্বে, নবাবের সহিত নিষ্পত্তি করিয়া, সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হওয়া আবশ্যক।

ইংরেজ ও ফরাসি, এই উভয় জাতির য়ুরোপে পরস্পর যুদ্ধ আরব্ধ হইবার সংবাদ কলিকাতায় পঁহুছিলে, ক্লাইব, চন্দননগরবাসী ফরাসিদিগের নিকট প্রস্তাব করিলে, য়ুরোপে যেরূপ হউক, ভারতবর্ষে আমরা কেহ কোনও পক্ষকে আক্রমণ করিব না। তাহাতে চন্দননগরের গবর্ণর উত্তর দিলেন যে, আপনকার প্রস্তাবে সম্মত হইতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু, যদি প্রধান পদারূঢ় কোনও ফরাসি সেনাপতি আইসেন, তিনি এরূপ সন্ধিপত্র অগ্রাহ্য করিতে পারেন।

ক্লাইব বিবেচনা করিলেন, যাহাতে নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায়, এরূপ নিষ্পত্তি হওয়া

অসম্ভব। আর, যতদিন চন্দননগরে ফরাসিদের অধিক সৈন্য থাকিবেক, তাবৎকাল পর্যন্ত কলিকাতা নিরাপদ হইবেক না। তিনি ইহাও নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন যে, সিরাজউদ্দৌলা কেবল ভয় প্রযুক্ত সন্ধি করিয়াছেন; সুযোগ পাইলে, নিঃসন্দেহ, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। বস্তুতঃ, সিবাজউদ্দৌলা, এ পর্যন্ত, ক্রমাগত, ফরাসিদিগের সহিত ইংরেজদিগের উচ্ছেদের মন্ত্রণা করিতেছিলেন; এবং যুদ্ধকালে ফরাসিদিগের সাহায্যার্থে কিছু সৈন্যও পাঠাইয়াছিলেন।

যাহা হউক, ক্লাইব বিবেচনা করিলেন, নবাবের অনুমতি ব্যতিরেকে, ফরাসিদিগকে আক্রমণ কবা পবামর্শসিদ্ধ নহে। কিন্তু, এ বিষয়ে অনুমতির নিমিত্ত, তিনি যতবার প্রার্থনা করিলেন, প্রত্যেকবারেই, নবাব কোনও স্পষ্ট উত্তর দিলেন না। পরিশেষে, ওয়াট্‌সন সাহেব নবাবকে এইভাবে পত্র লিখিলেন, আমার যত সৈন্য আসিবার কল্পনা ছিল, সমুদয় আসিথাছে; এক্ষণে আপনকার রাজ্যে এমন প্রবল যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিব যে, সমুদয় গঙ্গার জলেও ঐ যুদ্ধানলেব নির্বাণ হইবেক না। সিরাজউদ্দৌলা, এই পত্র পাঠে যৎপবোনাস্তি ভীত হইয়া, ১৭৫৭ খৃঃ অব্দেব ১০ই মার্চ, বিনয় করিয়া, এক পত্র লিখিলেন। ঐ পত্রেব শেষে এই কথা লিখিত ছিল, যাহা আপনকার উচিত বোধ হয়, করুন।

ক্লাইব ইহাকেই ফবাসিদিগকে আক্রমণ করিবার অনুমতি গণ্য করিয়া লইলেন, এবং অবিলম্বে, সৈন্য সহিত, স্থলপথে, চন্দননগর যাত্রা করিলেন। ওয়াট্‌সন সাহেবও সমস্ত যুদ্ধজাহাজ সহিত, জলপথে প্রস্থান করিয়া, ঐ নগরের নিকটে নঙ্গর করিলেন। ইংরেজদিগের সৈন্য চন্দননগব অবরোধ করিল। ক্লাইব, স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ সাহসিকতা সহকারে, অশেববিধ চেষ্টা কবিলেন; কিন্তু জাহাজী সৈন্যের প্রযত্নেই ঐ স্থান হস্তগত হইল। ইংরেজেরা, এ পর্যন্ত, ভারতবর্ষে অনেক যুদ্ধ করিযাছিলেন; কিন্তু এই যুদ্ধ সর্বাপেক্ষা ভয়ানক। নয় দিন অবরোধের পর, চন্দননগর পবাজিত হয়।

এরূপ প্রবাদ আছে, ইংরেজেরা ফরাসি সৈন্য ও সেনাপতিদিগকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করেন, তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতাতেই চন্দননগব পরাজিত হয়। এই প্রবাদের মূল এই, ফরাসি গবর্ণর, ইংরেজদিগের জাহাজের গতির প্রতিবোধের নিমিত্ত, নৌকা ডুবাইয়া গঙ্গার প্রায় সমুদায় অংশ রুদ্ধ করিয়া, কেবল এক অল্প পরিসর পথ রাখিয়াছিলেন। এই বিষয় অতি অল্প লোক জানিত। ফরাসিদিগের এক কর্মচারী ছিল, তাহার নাম টেরেনো। টেরেনো, কোনও কারণবশতঃ, ফরাসি গবর্ণর রেনড সাহেবের উপর বিরক্ত হইয়া, ইংরেজদিগের পক্ষে আইসে. এবং ক্লাইবকে ঐ পথ দেখাইয়া দেয়। উত্তরকালে, ঐ ব্যক্তি, ইংরেজদিগের নিকট কর্ম করিয়া, কিছু উপার্জন করে, এবং ঐ উপার্জিত অর্থের কিয়ৎ অংশ ফ্রান্সে আপন বৃদ্ধ পিতার নিকট পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু তাহার পিতা এই

টাকা গ্রহণ করেন নাই, বিশ্বাসঘাতকের দত্ত বলিয়া, ঘৃণা প্রদর্শনপূর্বক ফিরিয়া পাঠান। ইহাতে টেরেনোর অন্তঃকরণে এমন নির্বেদ উপস্থিত হয় যে, সে উদ্বন্ধন দ্বারা প্রাণত্যাগ করে।

সিরাজউদ্দৌলার সহিত যে সন্ধি হয়, তদ্দ্বারা ইংরেজরা টাকশাল ও দুর্গ নির্মাণ করিবার অনুমতি পান। ষাটি বৎসরের অধিক হইবেক, তাঁহারা, এই দুই বিষয়ের নিমিত্ত বারংবার প্রার্থনা করিয়াও, কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। কলিকাতার যে পুরাতন দুর্গ নবাব অনায়াসে অধিকার করেন, তাহা অতি গোপনে নির্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে, ক্লাইব, এই সন্ধির পরেই, এতদ্দেশীয় সৈন্যে পরাজয় করিতে না পারে, এরূপ এক দুর্গ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং তাহার সমাধান বিষয়ে সবিশেষ সত্বর ও সযত্ন হইলেন। যখন নক্সা প্রস্তুত করিয়া আনে, তখন তিনি, তাহাতে কত ব্যয় হইবেক, বুঝিতে পারেন নাই। কার্য আরব্ধ হইলে, ক্রমে দৃষ্ট হইল, দুই কোটি টাকার ন্যূনে নির্বাহ হইবেক না। কিন্তু তখন আর তাহার কোনও পরিবর্তন করিবার উপায় ছিল না। কলিকাতার বর্তমান দুর্গ, এইরূপে, দুই কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছিল। সেই বৎসরেই, এক টাকশাল নির্মিত, এবং আগষ্ট মাসের ঊনবিংশ দিবসে, ইংরেজদিগের টাকা প্রথম মুদ্রিত হয়।

ক্লাইব, এইরূপে, পরাক্রম দ্বারা, ইংরেজদিগের অধিকার পুনঃস্থাপিত করিয়া, মনে মনে স্থির করিলেন, পরাক্রম ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ে এ অধিকারের রক্ষা হইবেক না। তিনি, প্রথম অবধিই, নিশ্চিত বুঝিয়া ছিলেন, ইংরেজরা নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবেক না, অবশ্য তাহাদিগকে অন্য অন্য উপায় দেখিতে হইবেক। আর ইহাও বুঝিতে পরিয়াছিলেন, ফরাসিদিগের সাহায্য পাইলে নবাব দুর্জয় হইয়া উঠিবেন। অতএব, যাহাতে ফরাসিরা পুনরায় বাঙ্গালাতে প্রবেশ করিতে না পায়, এ বিষয়ে তিনি সবিশেষ সতর্ক ও সচেষ্ট ছিলেন।

তৎকালে, দক্ষিণ রাজ্যে ফরাসিদিগের বুসি নামে এক সেনাপতি ছিলেন। তিনি, অনেক দেশ জয় করিয়া সাতিশয় পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। সিরাজউদ্দৌলা, ইংরেজদিগের প্রতি মুখে বন্ধুত্ব দর্শাইতেন; কিন্তু, ঐ ফরাসি সেনাপতিকে, সৈন্য সহিত বাঙ্গালায় আসিয়া, ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত, পত্রদ্বারা বারংবার আহ্বান করিতেছিলেন। নবাব এবিষয়ে যে সমস্ত পত্র লিখিলেন, তাহার কয়েক খান ক্লাইবের হস্তে আইসে। ইংরেজেরা সিরাজউদ্দৌলাকে খর্ব করিয়াছিলেন, এজন্য, তিনি তাঁহাদের প্রতি অক্রোধ হইতে পারেন নাই। সময়ে সময়ে, তাঁহার ক্রোধ উদ্বেল হইয়া উঠিত। অর্বাচীন নির্বোধ নবাব, ক্রোধোদয় কালে, উন্মত্তপ্রায় হইতেন; কিন্তু, ক্রোধ নিবৃত্ত হইলে, ইংরেজদিগের ভয় তাঁহার অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইত। ওয়াট্‌স নামে এক সাহেব, তাঁহার দরবারে

ইংরেজদিগের রেসিডেন্ট ছিলেন। নবাব, একদিন, শূলে দিব বলিয়া, তাঁহাকে ভয় দেখাইতেন ; দ্বিতীয় দিন, তাঁহার নিকট মর্যাদাসূচক পরিচ্ছদ পুরস্কার পাঠাইতেন ; একদিন, ক্রোধে অন্ধ হইয়া, ক্লাইবের পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিতেন ; দ্বিতীয় দিন, বিনয় ও দীনতা প্রকাশ করিয়া, তাঁহাকে পত্র লিখিতেন।

ইংরেজরা বুঝিতে পারিলেন, যাবৎ এই দুর্দান্ত বালক বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিবেক, তাবৎ কোনও প্রকারে ভদ্রস্থতা নাই। অতএব, তাঁহারা, কি উপায়ে নিরাপদ হইতে পাবেন, মনে মনে এ বিষয়ের আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে দিল্লীর সম্রাটের কোষাধ্যক্ষ পরাক্রান্ত শেঠবংশীয়েরা নবাবের সর্বাধিকারী রাজা রায়দুর্লভ, সৈন্যদিগের ধনাধ্যক্ষ ও সেনাপতি মীরজাফর, এবং উমিচাঁদ ও খোজা বাজীদ নামক দুই জন ঐশ্বর্যশালী বণিক, ইত্যাদি কতিপয় প্রধান ব্যক্তি তাঁহাদেব নিকট এক পত্র প্রেরণ করিলেন।

সিরাজউদ্দৌলা, নিষ্ঠুরতা ও স্বেচ্ছাচারিতা দ্বাবা, তাঁহাদের অন্তঃকরণে নিবতিশয় বিরাগোৎপাদন করিযাছিলেন। বিশেষতঃ, তাহারা আপনাদের ধন, মান, জীবন সর্বদা সঙ্কটাপন্ন বোধ করিতেন। পূর্ব বৎসর, সকতজঙ্গকে সিংহাসনে নিবেশিত করিবার নিমিত্ত, সকলে এক বাক্য হইয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহাদের সে উদ্যোগ বিফল হইয়া যায়। এক্ষণে তাঁহারা, সিবাজউদ্দৌলাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিবার নিমিত্ত, প্রাণ পর্যন্ত পণ করিযা ; ইংরেজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনায় গোপনে পত্রপ্রেরণ করেন।

ইংবেজবা বিবেচনা কবিলেন, আমরা সাহায্য না করিলেও, এই রাজবিপ্লব ঘটিবেক ; সাহায্য করিলে, আমাদের অনেক উপকারের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু, তৎকালের কৌন্সিলের মেম্বরেরা প্রায় সকলেই ভীরুস্বভাব ছিলেন ; এমন গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে তাঁহাদেব সাহস হইল না। এডমিরেল ওয়াট্‌সন সাহেবও বিবেচনা করিযাছিলেন, যাহাবা এ পর্যন্ত কেবল সামান্যকারণে বাণিজ্য কবিযা আসিতেছে, তাহাদের পক্ষে দেশাধিপতিকে পদচ্যুত করিতে উদ্যত হওয়া অত্যন্ত অসংসাহসের কর্ম। কিন্তু ক্লাইব অকুতোভয় ও অত্যন্ত সাহসী ছিলেন ; সঙ্কট পডিলে, তাঁহাব ভয় না জন্মিয়া, বরং সাহস ও উৎসাহের বৃদ্ধি হইত। তিনি উপস্থিত প্রস্তাবে সম্মত হইতে, কোনও-ক্রমে, পরাঙ্মুখ হইলেন না।

ক্লাইব, এপ্রিল মে দুই মাস, মুরশিদাবাদের রেসিডেন্ট ওয়াট্‌স সাহেব দ্বারা, নবাবের প্রধান প্রধান কর্মচারীদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ; এত গোপনে যে, সিরাজ-উদ্দৌলা কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন নাই। একবার মাত্র তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন তিনি মীরজাফরকে ডাকাইয়া কোরান স্পর্শ করাইয়া, শপথ করান। জাফরও যথোক্ত প্রকারে শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করেন, আমি কখনও কৃতঘ্ন হইব না।

সমুদায় প্রায় স্থির হইয়াছে, এমন সময়ে উমিচাঁদ সমস্ত উচ্ছিন্ন করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। নবাবের কলিকাতা আক্রমণ কালে, তাঁহার অনেক সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছিল, এ নিমিত্ত, মূল্যস্বরূপ তাঁহাকে যথেষ্ট টাকা দিবার কথা নির্ধারিত হয়। কিন্তু তিনি, তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া এক দিন বিকালে, ওয়াট্স সাহেবের নিকটে গিয়া কহিলেন, মীরজাফরের সহিত ইংরেজদিগের যে প্রতিজ্ঞাপত্র হইবেক, তাহাতে আমাকে আর ত্রিশ লক্ষ টাকা দিবার কথা লিখিয়া দেখাইতে হইবেক ; নতুবা, আমি এখনই, নবাবের নিকটে গিয়া সমুদয় পরামর্শ ব্যক্ত করিব। উমিচাঁদ এরূপ করিলে, ওয়াট্স প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি এই ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের প্রাণদণ্ড হইত। ওয়াট্স সাহেব, কালবিলম্বের নিমিত্ত, উমিচাঁদকে অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া, অবিলম্বে কলিকাতায় পত্র লিখিলেন।

এই সংবাদ পাইয়া, ক্লাইব প্রথমতঃ একবারে হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি, ধূর্ততা ও প্রতারকতা, বিষয়ে, উমিচাঁদ অপেক্ষা অধিক পণ্ডিত ছিলেন ; অতএব, বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, উমিচাঁদ গর্হিত উপায় দ্বারা অর্থলাভের চেষ্টা করিতেছে ; এ ব্যক্তি সাধারণের শত্রু , ইহার দুষ্টতাদমনের নিমিত্ত, যে কোনও প্রকার চাতুরী করা অন্যায় নহে। অতএব আপাততঃ, ইহাব দাওয়া অঙ্গীকার করা যাউক। পরে এ ব্যক্তি আমাদের হস্তে আসিবেক। তখন ইহাকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন হইবেক না। এই স্থির করিয়া তিনি, ওয়াট্স সাহেবকে উমিচাঁদের দাওয়া স্বীকার করিতে আজ্ঞা দিয়া, দুই খান প্রতিজ্ঞাপত্র প্রস্তুত করিলেন. এক খান শ্বেত বর্ণের ; দ্বিতীয় লোহিত বর্ণের। লোহিত বর্ণের পত্রে উমিচাঁদকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দিবার কথা লেখা রহিল, শ্বেত বর্ণের পত্রে সে কথার উল্লেখ রহিল না। ওয়াট্সন সাহেব, ক্লাইবের ন্যায়, নিতান্ত ধর্মজ্ঞানশূন্য ছিলেন না। তিনি প্রতারণাঘটিত লোহিত বর্ণের প্রতিজ্ঞাপত্রে ; স্বীয় নাম স্বাক্ষরিত করিতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু উমিচাঁদ অতিশয় চতুর ও অতিশয় সতর্ক ; তিনি, প্রতিজ্ঞাপত্রে ওয়াট্সনের নাম স্বাক্ষরিত না দেখিলে, নিঃসন্দেহ সন্দেহ করিবেন। ক্লাইব কোনও কর্ম অঙ্গহীন করিতেন না, এবং, অভিপ্রেত সাধনের নিমিত্ত সকল কর্মই করিতে পারিতেন। তিনি ওয়াট্সন সাহেবের নাম জাল করিলেন। লোহিত বর্ণের পত্র উমিচাঁদকে দেখান গেল, এবং তাহাতেই তাঁহার মন সুস্থ হইল। অনন্তর, মীরজাফরের সহিত এই নিয়ম হইল, ইংরেজেরা যেমন অগ্রসর হইবেন, তিনি, স্বীয় প্রভুর সৈন্য হইতে আপন সৈন্য পৃথক করিয়া, ইংরেজদিগের সহিত মিলিত হইবেন।

এইরূপে সমুদয় স্থিরীকৃত হইলে, ক্লাইব সিরাজউদ্দৌলাকে এই মর্মে পত্র লিখলেন যে, আপনি ইংরেজদিগের অনেক অনিষ্ট করিয়াছেন, সন্ধিপত্রের নিয়মলঙ্ঘন করিয়াছেন যে যে ক্ষতিপূরণ স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা করেন নাই, এবং ইংরেজদিগকে বাঙ্গালা

হইতে তাড়াইয়া দিবার নিমিত্ত, ফরাসিদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। অতএব, আমি স্বয়ং মুরশিদাবাদে যাইতেছি, আপনকার সভার প্রধান প্রধান লোকদিগের উপর ভার দিব, তাঁহারা সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিবেন।

নবাব, এই পত্রের লিখনভঙ্গী দেখিয়া, এবং ক্লাইব স্বয়ং আসিতেছেন ইহা পাঠ করিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইলেন, এবং ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ অপরিহরণীয় স্থির করিয়া, অবিলম্বে সৈন্য সংগ্রহপূর্বক, কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্লাইবও, ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের জুন মাসের আরম্ভেই, আপন সৈন্য লইয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি, ১৭ই জুন কাটোয়াতে উপস্থিত হইলেন, এবং পর দিন তথাকার দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করিলেন।

১৯শে জুন, ঘোরতর বর্ষার আরম্ভ হইল। ক্লাইব, নদী পার হইয়া নবাবের সহিত যুদ্ধ করি, কি ফিরিয়া যাই, মনে মনে এই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কারণ, তিনি তৎকাল পর্যন্ত মীরজাফরের কোনও উদ্দেশ পাইলেন না, এবং তাঁহার একখানি পত্রিকাও প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি, স্বীয় সেনাপতিদিগকে সমবেত করিয়া, পরামর্শ করিতে বসিলেন। তাঁহারা সকলেই যুদ্ধের বিষয়ে অসম্মতিপ্রদর্শন করিলেন। ক্লাইবও, প্রথমত তাঁহাদের সিদ্ধান্তই গ্রাহ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু, পরিশেষে, অভিনিবেশ-পূর্বক বিবেচনা করিয়া, ভাগ্যে যাহা থাকে ভাবিয়া, যুদ্ধপক্ষই অবলম্বন করিলেন। তিনি স্থির বুঝিয়াছিলেন, যদি এত দূর আসিয়া, এখন ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে, বাঙ্গালাতে ইংরেজদিগের অভ্যুদয়ের আশা একবারে উচ্ছিন্ন হইবেক।

২২শে জুন, সূর্যোদয় কালে, সৈন্য সকল গঙ্গা পার হইতে আরম্ভ করিল। দুই প্রহর চারিটার সময়; সমুদয় সৈন্য অপর পারে উত্তীর্ণ হইল। তাহারা, অবিশ্রান্ত গমন করিয়া রাত্রি দুই প্রহর একটার সময়, পলাশির বাগানে উপস্থিত হইল।

প্রভাত হইবামাত্র, যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্লাইব, উৎকণ্ঠিত চিত্তে মীরজাফরের ও তদীয় সৈন্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু, তখন পর্যন্ত, তাঁহার ও তদীয় সৈন্যের কোনও চিহ্ন দেখা গেল না। যুদ্ধক্ষেত্রে নবাবের পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহ ও পঞ্চত্রিংশৎ সহস্র পদাতি সৈন্য উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি স্বয়ং চাটুকারবর্গে বেষ্টিত হইয়া, সকলের পশ্চাদ্ভাগে তাঁবুর মধ্যে ছিলেন। মীরমদন নামক একজন সেনাপতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মীরজাফর, আত্মসৈন্য সহিত, তথায় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন নাই।

বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময়, কামানের গোলা লাগিয়া, সেনাপতি মীরমদনের দুই পা উড়িয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ নবাবের তাঁবুতে নীত হইলেন এবং তাঁহার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিলেন। তদ্দৃষ্টে নবাব যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইলেন, এবং ভৃত্যদিগকে

বিশ্বাসঘাতক বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিলেন। তখন, তিনি মীরজাফরকে ডাকাইয়া আনিলেন, এবং তাঁর চরণে স্বীয় উষ্ণীষ স্থাপিত করিয়া, অতিশয় দীনতা প্রদর্শনপূর্বক এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, অন্ততঃ আমার মাতামহের অনুরোধে, আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া, এই বিষম বিপদের সময় সহায়তা কর।

জাফর অঙ্গীকার করিলেন, আমি আত্মধর্ম প্রতিপালন করিব; এবং, তাহার প্রমাণ-স্বরূপ, নবাবকে পরামর্শ দিলেন, অদ্য বেলা অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, সৈন্য সকল ফিরাইয়া আনুন। যদি জগদীশ্বর কৃপা করেন, কল্য আমরা, সমুদয় সৈন্য একত্র করিয়া, যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইব। তদনুসারে, নবাব সেনাপতিদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার আজ্ঞা পাঠাইলেন। নবাবের অপর সেনাপতি মোহনলাল ইংরেজদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছিলেন; কিন্তু নবাবের এই আজ্ঞা পাইয়া নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক নিবৃত্ত হইলেন। তিনি অকস্মাৎ ক্ষান্ত হওয়াতে, সৈন্যদিগের উৎসাহভঙ্গ হইল। তাহারা, ভঙ্গ দিয়া, চারি দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সুতরাং ক্লাইবের অনায়াসে সম্পূর্ণ জয়লাভ হইল। যদি মীরজাফর বিশ্বাসঘাতক না হইতেন এবং ঈদৃশ সময়ে এরূপ প্রতারণা না করিতেন, তাহা হইলে, ক্লাইবের, কোনও ক্রমে, জয়লাভের সম্ভাবনা ছিল না।

তদনন্তর, সিরাজউদ্দৌলা, এক উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া, দুই সহস্র অশ্বারোহ সমভিব্যাহারে, সমস্ত রাত্রি গমন করতঃ, পর দিন বেলা ৮টার সময়, মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইলেন, এবং উপস্থিত হইয়াই আপনার প্রধান প্রধান ভৃত্য ও অমাত্যবর্গকে সন্নিধানে আসিতে আজ্ঞা করিলেন। কিন্তু তাহারা সকলেই স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিল। অন্যের কথা দূরে থাকুক, সে সময়ে, তাঁহার শ্বশুর পর্যন্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

নবাব, সমস্ত দিন, একাকী আপন প্রাসাদে কালযাপন করিলেন; পরিশেষে, নিতান্ত হতাশ হইয়া, রাত্রি তিনটার সময়ে, মহিষীগণ ও কতিপয় প্রিয়পাত্র সমভিব্যাহারে করিয়া, শকটারোহণপূর্বক, ভগবানগোলায় পলায়ন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া, ফরাসি সেনাপতি লা সাহেবের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত, তিনি নৌকারোহণপূর্বক জলপথে প্রস্থান করিলেন। ইতঃপূর্বে, তিনি, ঐ সেনাপতিকে পাটনা হইতে আসিতে পত্র লিখিয়াছিলেন।

পলাশির যুদ্ধে ইংরেজদিগের, হত আহত সমুদয়ে, কেবল কুড়ি জন গোরা ও পঞ্চাশ জন সিপাই নষ্ট হয়। যুদ্ধ সমাপ্তির পর, মীরজাফর, ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার রণজয় নিমিত্ত সভাজন ও হর্ষপ্রদর্শন করিলেন। অনন্তর, উভয়ে একত্র হইয়া মুরশিদাবাদ চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া, মীরজাফর রাজকীয় প্রাসাদ অধিকার করিলেন। রাজধানীর প্রধান প্রধান লোক ও প্রধান প্রধান রাজকীয় কর্মচারী সমবেত হইলেন।

অবিলম্বে এক দরবার হইল। ক্লাইব, আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, মীরজাফরের কর গ্রহণপূর্বক সিংহাসনে বসাইযা তাঁহাকে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব বলিয়া সম্ভাষণ ও বন্দনা করিলেন। তৎপরে তাঁহারা উভয়ে কয়েকজন ইংরেজ এবং ক্লাইবের দেওয়ান রামচাঁদ ও তাঁহার মুন্সী নবকৃষ্ণকে সঙ্গে লইযা, ধনাগারে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু তন্মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়ে দুই কোটী টাকার অধিক দেখিতে পাইলেন না। তৎকালের মুসলমান ইতিহাস লেখক কহেন যে, উহা কেবল বাহ্য ধনাগার মাত্র। এতদ্ভিন্ন, অন্তঃপুরে আর এক ধনাগার ছিল, ক্লাইব, তাহার কিছুমাত্র সন্ধান পান নাই। ঐ কোষে স্বর্ণ, রজত ও রত্নে আট কোটি টাকার ন্যূন ছিল না। মীরজাফর, আমির বেগ খাঁ, রামচাঁদ, নবকৃষ্ণ, এই কয়জনে ঐ ধন যথাযোগ্য ভাগ করিয়া লযেন। এই নির্দেশ নিতান্ত অমূলক বা অসম্ভব বোধ হয় না, কারণ, রামচাঁদ তৎকালে ষাটি টাকা মাত্র মাসিক বেতন পাইতেন, কিন্তু, দশ বৎসর পরে, তিনি এক কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকার বিষয় রাখিয়া মরেন। মুন্সী নবকৃষ্ণেরও মাসিক বেতন ষাটি টাকার অধিক ছিল না। কিন্তু তিনি, অল্প দিন পরে, মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে, নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। এই ব্যক্তিই পরিশেষে, রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইযা, রাজা নবকৃষ্ণ নামে বিখ্যাত হইযাছিলেন।

এক্ষণে ইংরেজেরা সকল সঙ্কট হইতে মুক্ত হইলেন। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের জুন মাসে, তাঁহাদের সবস্বলুণ্ঠন, বাণিজ্যের উচ্ছেদ এবং কর্মচারিদিগের প্রাণদণ্ড হয়। বস্তুতঃ, তাঁহারা বাঙ্গালাতে এক বারে সর্ব প্রকারে সম্বন্ধশূন্য হইযাছিলেন। কিন্তু, ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের জুন মাসে, তাঁহারা কেবল আপনাদের বৃঠীস্বল পুনর্বার অধিকার করিলেন, এমন নহে, আপনাদের বিপক্ষ সিরাজউদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিলেন, এবং অনুগত এক ব্যক্তিকে নবাবী পদ দিলেন, আর তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসিরা বাঙ্গালা হইতে দূরীকৃত হইলেন।

নবাব কলিকাতা আক্রমণ করাতে, কোম্পানি বাহাদুরের, এবং ইংরেজ বাঙ্গালি ও আরমানি বণিকদিগের যথেষ্ট ক্ষতি হইযাছিল, সেই ক্ষতির পূরণস্বরূপ, কোম্পানি বাহাদুর, এক কোটি টাকা পাইলেন, ইংরেজ বণিকেরা পঞ্চাশ লক্ষ, বাঙ্গালি বণিকেরা বিশ লক্ষ, আরমানি বণিকেরা সাত লক্ষ, এ সমস্ত ভিন্ন, সৈন্য সংক্রান্ত লোকেরা অনেক পারিতোষিক পাইলেন। আর, কোম্পানির যে সকল কর্মচারীরা মীরজাফরকে সিংহাসনে নিবেশিত করিয়াছিলেন, তাঁহারাও বঞ্চিত হইলেন না। ক্লাইব ষোল লক্ষ টাকা পাইলেন, কৌন্সিলের অন্যান্য মেম্বরেরা, কিছু কিছু ন্যূন পরিমাণে, পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। ইহাও নির্ধারিত হইল, মহারাষ্ট্রখাতের অন্তর্গত সমুদয় স্থান ও তাহার বাহ্যে ছয় শত ব্যাম পর্যন্ত, ইংরেজদিগের হইবেক, কলিকাতার দক্ষিণ কুল্পী পর্যন্ত সমুদয় দেশ

কোম্পানির জমিদারী হইবেক ; আর, ফরাসিরা, কোনও কালে, এ দেশে বাস করিবার অনুমতি পাইবেন না।

এ দিকে, সিরাজউদ্দৌলা, ভগবানগোলা হইতে রাজমহলে পঁহুছিয়া, আপন স্ত্রী ও কন্যার জন্য অন্ন পাক করিবার নিমিত্ত, এক ফকিরের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। পূর্বে ঐ ফকিরের উপর তিনি অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ ব্যক্তি তাঁহার অনুসন্ধানকারীদিগকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার পঁহুছসংবাদ দিলে, তাহারা আসিয়া তাঁহাকে রুদ্ধ করিল। সপ্তাহ পূর্বে, তিনি ঐ সকল ব্যক্তির সহিত আলাপও করিতেন না ; এক্ষণে, অতি দীন বাক্যে, তাহাদের নিকট বিনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা, তদীয় বিনয়বাক্য শ্রবণে বধির হইয়া, তাঁহার সমস্ত স্বর্ণ ও রত্ন লুটিয়া লইল, এবং তাঁহাকে মুরশিদাবাদে প্রত্যানয়ন করিল।

যৎকালে, তিনি রাজধানীতে আনীত হইলেন, তখন মীরজাফর, অধিক মাত্রায় অহিফেন সেবন করিয়া, তন্দ্রাবেশে ছিলেন ; তাঁহার পুত্র পাপাত্মা মীরন, সিরাজউদ্দৌলার উপস্থিতিসংবাদ শুনিয়া, তাঁহাকে আপন আলয়ের সন্নিধানে রুদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিল, এবং দুই ঘণ্টার মধ্যেই, স্বীয় বয়স্যগণের নিকট তাঁহার প্রাণবধের ভার লইবার প্রস্তাব করিল। কিন্তু, তাহারা একে একে সকলেই অস্বীকার করিল। মহম্মদিবেগ নামক এক ব্যক্তি আলিবর্দি খাঁর নিকট প্রতিপালিত হইয়াছিল ; পরিশেষে সেই দুরাত্মাই এই নিষ্ঠুর ব্যাপারের সমাধানের ভার গ্রহণ করিল। সে ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র, হতভাগ্য নবাব, তাহার আগমনের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, করুণ স্বরে কহিলেন, আমি যে, বিনা অপরাধে, হুসেন কুলি খাঁর প্রাণদণ্ড করিয়াছিলাম, তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমায় অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিতে হইবেক। তিনি এই বাক্য উচ্চারণ করিবামাত্র, দুরাচার মহম্মদিবেগ তরবারি প্রহার দ্বারা তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিল। উপর্য্যুপরি কতিপয় আঘাতের পর, তিনি, হুসেনকুলি খাঁর প্রাণদণ্ডের প্রতিফল পাইলাম, এই বলিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত ও ভূতলে পতিত হইলেন।

অনন্তর, মীরনের আজ্ঞাবহেরা নবাবের মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিল , এবং অযত্ন ও অবজ্ঞাপূর্বক, হস্তিপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত করিয়া, জনাকীর্ণ রাজপথ দিয়া, গোর দিবার নিমিত্ত লইয়া চলিল। ঐ সময়ে, সকলে লক্ষ্য করিয়াছিল, কোনও কারণবশতঃ, পথের মধ্যে মাহুতের থামিবার আবশ্যক হওয়াতে, আঠারো মাস পূর্বে সিরাজউদ্দৌলা যে স্থানে হুসেনকুলি খাঁর প্রাণবধ করিয়াছিলেন, ঐ হস্তী ঠিক সেই স্থানে দণ্ডায়মান হয় ; এবং, যে ভূভাগে বিনা অপরাধে, তিনি হুসেনের শোণিতপাত করিয়াছিলেন, ঠিক সেই স্থানে, তাঁহার খণ্ডিত কলেবর হইতে কতিপয় রুধিরবিন্দু নিপতিত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

মীরজাফরের প্রভুত্ব এক কালে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, তিন প্রদেশে অব্যাহত রূপে অঙ্গীকৃত হইল। কিন্তু, অতি অল্পকালেই, প্রকাশ পাইল, তাঁহার কিছুমাত্র বিষয়বুদ্ধি নাই। তিনি স্বভাবতঃ নির্বোধ, নিষ্ঠুর ও অর্থলোভী ছিলেন। রাজ্যের প্রধান প্রধান হিন্দু কর্মচারীরা, পূর্ব পূর্ব নবাবদিগের অধিকার কালে, যথেষ্ট ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ, তাঁহাদের সর্বস্বহরণ মনস্থ করিলেন। প্রধানমন্ত্রী রাজা রায় দুর্লভ কেবল বিলক্ষণ ধনবান ছিলেন, এমন নহে; তাঁহার নিজের ছয় সহস্র সৈন্যও ছিল। মীরজাফর সর্বাগ্রে তাঁহাকেই লক্ষ্য করিলেন।

মীরজাফরকে সিংহাসনে নিবেশিত করিবার বিষয়ে, রাজা রায় দুর্লভ প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। যখন সিরাজউদ্দৌলাকে রাজ্যভ্রষ্ট কবিবার নিমিত্ত চক্রান্ত হয়, রায় দুর্লভই চক্রান্তকারীদিগের নিকট প্রস্তাব করেন যে, মীরজাফরকে নবাব করা উচিত। তথাপি মীরজাফর, সর্বাগ্রে, রায় দুর্লভের সর্বনাশের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। ফলতঃ, তাঁহাব উপর মীরজাফবের এমন বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার সহিত সিবাজউদ্দৌলার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বন্ধুতা আছে, এই সন্দেহ করিয়া, সেই অল্প বযস্ক নিরপরাধ রাজকুমারের প্রাণবধ করিলেন। বায় দুর্লভও, কেবল ইংবেজদিগের শরণাগত হইয়া, সে যাত্রা পরিত্রাণ পাইলেন।

বাজা বামনারাযণ, বহুকাল অবধি বিহারেব ডেপুটি গবর্ণব ছিলেন। নবাব মনস্থ করিলেন, তাঁহাকে পদচ্যুত কবিয়া, তদীয় সমুদয় সম্পত্তি অপহরণ করিবেন, ও আপন ভ্রাতাকে গবর্ণরী পদ দিবেন। ক্লাইবের মতে মীবজাফরের ভ্রাতা মীরজাফর অপেক্ষাও নির্বোধ ছিলেন। নবাব মেদিনীপুরে গবর্ণর রাজা রাম সিংহের ভ্রাতাকে কারাগারে রুদ্ধ করিলেন; তাহাতে রাম সিংহও তাঁহাব প্রতি ভগ্নস্নেহ হইলেন। পূর্ণিয়ার ডেপুটি গবর্ণর অদল সিংহ, মন্ত্রীদিগের কুমন্ত্রণা অনুসারে, রাজবিদ্রোহে অভ্যুত্থান করিলেন।

এইরূপে, মীরজাফরের সিংহাসনারোহণের পর, পাঁচ মাসের মধ্যে, তিন প্রদেশে তিন বিদ্রোহ ঘটিল। তখন তিনি ব্যাকুল হইয়া, বিদ্রোহশান্তির নিমিত্ত, ক্লাইবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তৎকালে ক্লাইব বাঙ্গালাতে সকলেরই বিশ্বাসভাজন ছিলেন। এই বিশ্বাস অপাত্রে বিন্যস্ত হয় নাই। তিনি, উপস্থিত তিন বিদ্রোহের শান্তি করিলেন অথচ এক বিন্দু রক্তপাত হইল না।

নবাব বিনয়বাক্যে প্রার্থনা করাতে, ক্লাইব পাটনা যাইবার সময়, মুরশিদাবাদ হইয়া যান। নবাব, ইংরেজদিগের যত টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এ পর্যন্ত, তাহার অধিকাংশই পরিশোধিত হয় নাই। ক্লাইব, রাজধানীতে উত্তীর্ণ হইয়া,

নবাবকে জানাইলেন যে, সে সকলের পরিশোধ করিবার কোনও বন্দোবস্ত করিতে হইবেক। নবাব, তদনুসারে, দেয়-পরিশোধ স্বরূপ, বর্ধমান, নদীয়া, হুগলী, এই তিন প্রদেশের রাজস্ব তাঁহাকে নির্ধারিত করিয়া দিলেন।

এই বিষয়ের নিষ্পত্তি হইলে পর, ক্লাইব ও নবাব, স্ব স্ব সৈন্য লইয়া, পাটনা যাত্রা করিলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলে, রামনারায়ণ ক্লাইবের শরণাগত হইয়া কহিলেন, যদি ইংরেজরা আমায় অভয়দান করেন, তাহা হইলে, আমি নবাবের আজ্ঞানুবর্তী থাকিতে পারি। ক্লাইব বিস্তর বুঝাইলে পর, নবাব রামনারায়ণের উপর অক্রোধ হইলেন। অনন্তর, রামনারায়ণ, মীরজাফরের শিবিরে গিয়া, তাঁহার সমুচিত সম্মান করিলেন। মীরজাফর, এ যাত্রায়, তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন না। পরে, ক্লাইব ও নবাব, একত্র হইয়া মুরশিদাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা রায়দুর্লভ, পূর্বাপর, তাঁহাদের সমভিব্যাহারে ছিলেন। তিনি, মনে মনে নিশ্চয় করিয়াছিলেন, ইংরেজেরা যাবৎ উপস্থিত আছেন, ততদিনই রক্ষার সম্ভাবনা।

পাটনার ব্যাপারে এইরূপে নিষ্পন্ন হওয়াতে, জাফরের পুত্র মীরন অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। তাহাদের পিতা পুত্রের এই অভিপ্রায় ছিল, পরাক্রান্ত হিন্দুদিগের দমন ও সর্বস্বহরণ করিবেন। কিন্তু, এ যাত্রায়, তাহা না হইয়া, বরং তাঁহাদের পরাক্রমের দৃঢ়ীকরণ হইল। তাঁহারা উভয়েই, ক্লাইবের এইরূপ ক্ষমতা দর্শনে, অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। মীরজাফর, শুনিতে তিন প্রদেশের নবাব ছিলেন বটে, কিন্তু বাস্তবিক কিছুই ছিলেন না ; ক্লাইবই সকল ছিলেন।

দুই বৎসর পূর্বে, ইংরেজদিগকে, নবাবের নিকট স্বপক্ষে একটি অনুকূল কথা বলাইবার নিমিত্ত, টাকা দিয়া যে সকল প্রধান লোকের উপাসনা করিতে হইত, এক্ষণে সেই সকল ব্যক্তিকে ইংরেজদিগের উপাসনা করিতে হইল। মুসলমানেরা দেখিতে লাগিলেন, চতুর হিন্দুরা, অকর্মণ্য নবাবের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া, ক্লাইবের নিকটেই, সকল বিষয়েই, প্রার্থনা করিতে আরম্ভ কবিয়াছে। কিন্তু ক্লাইব, ঐ সকল বিষয়ে, এমন বিজ্ঞতা ও বিবেচনাপূর্বক কার্য করিতেন যে, যাবৎ তাঁহার হস্তে সকল বিষয়ের কর্তৃত্ব-ভার ছিল, তাবৎ, কোনও অংশে, বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় নাই।

হতভাগ্য দিল্লীশ্বরের পুত্র শাহআলম, প্রয়াগের ও অযোধ্যার সুবাদারদিগের সহিত সন্ধি করিয়া, বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া, বিহারদেশ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। ঐ দুই সুবাদারে, এই সুযোগে, বাঙ্গালা রাজ্যের কোনও অংশ আত্মসাৎ করিতে পারা যায় কি না, এই চেষ্টা দেখা যেরূপ অভিপ্রেত ছিল, উক্ত রাজকুমারের সাহায্য করা সেরূপ ছিল না। শাহআলম ক্লাইবকে পত্র লিখিলেন, যদি আপনি আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধি বিষয়ে সহায়তা করেন, তাহা হইলে, আমি আপনাকে, ক্রমে ক্রমে এক এক প্রদেশের

আধিপত্য প্রদান করিব। কিন্তু ক্লাইব উত্তর দিলেন, আমি মীরজাফরের বিপক্ষাচরণ করিতে পারিব না। শাহআলম, সম্রাটের সহিত বিবাদ করিয়া, তদীয় সম্মতি ব্যতিরেকে, বিহারদেশ আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত, সম্রাটও ক্লাইবকে এই আজ্ঞাপত্র লিখিলেন, তুমি আমার বিদ্রোহী পুত্রকে দেখিতে পাইলে রুদ্ধ করিয়া, আমার নিকট পাঠাইবে।

মীরজাফরের সৈন্যসকল, বেতন না পাওয়াতে, অতিশয় অবাধ্য হইয়াছিল; সুতরাং, সে সৈন্য দ্বারা উল্লিখিত আক্রমণের নিবারণ কোনও মতে সম্ভাবিত ছিল না। এজন্য, তাঁহাকে, উপস্থিত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত, পুনর্বার ক্লাইবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইল। তদনুসারে ক্লাইব, সত্বর হইয়া ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে, পাটনা যাত্রা করিলেন। কিন্তু, ক্লাইবের উপস্থিতিব পূর্বেই, এই ব্যাপার একপ্রকার নিষ্পন্ন হইয়াছিল। রাজকুমার ও প্রয়াগের সুবাদাব, নয় দিবস পাটনা অবরোধ করিয়াছিলেন। ঐ স্থান তাঁহাদের হস্তগত হইতে পারিত; কিন্তু তাঁহারা শুনিলেন, ইংরেজেরা আসিতেছেন, এবং অযোধ্যার সুবাদার, প্রয়াগের সুবাদারের অনুপস্থিতিরূপ সুযোগ পাইয়া, বিশ্বাস-ঘাতকতাপূর্বক, তাঁহার রাজধানী অধিকার কবিযাছেন। এই সংবাদ পাইয়া, প্রয়াগের সুবাদার, আপনার উপায় আপনি চিন্তা করুন এই বলিয়া, রাজকুমারের নিকট বিদায় লইয়া, স্বীয় রাজ্যের রক্ষার নিমিত্ত, প্রস্থান করিলেন। এই উপলক্ষে যে যুদ্ধ উপস্থিত হইল, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। রাজকুমারের সৈন্যরা অনতিবিলম্বে তাঁহাকে পরিত্যগ করিল। কেবল তিনশত ব্যক্তি তাঁহার অদৃষ্টেব উপর নির্ভর করিয়া রহিল। পরিশেষে, তাঁহার এমন দুরবস্থা ঘটিয়াছিল যে, তিনি ক্লাইবের নিকট ভিক্ষার্থে লোক প্রেরণ করেন। ক্লাইব, বদান্যতা প্রদর্শনপূর্বক, রাজকুমারকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়া দেন।

মীরজাফর, এইরূপে উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ, ক্লাইবকে ওমরা উপাধি দিলেন, এবং, কোম্পানিকে নবাব সরকারে কলিকাতার জমিদারীর যে রাজস্ব দিতে হইত, তাহা তাঁহাকে জায়গীরস্বরূপ দান করিলেন। নির্দিষ্ট আছে, ঐ রাজস্ব বার্ষিক তিন লক্ষ টাকার ন্যূন ছিল না।

এই সকল ঘটনার কিছুদিন পরে, মীরজাফর, কলিকাতায় আসিয়া, ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; এবং তিনিও, যৎপরোনাস্তি সমাদরপূর্বক, তাঁহার সংবর্ধনা করিলেন। তিনি তথায় থাকিতে থাকিতে, ওলন্দাজদিগের সাতখানা যুদ্ধ জাহাজ নদীমুখে আসিয়া নঙ্গর করিল। ঐ সাত জাহাজে পঞ্চদশ শত সৈন্য ছিল। অতি ত্বরায় ব্যক্ত হইল, ঐ সকল জাহাজ নবাবের সম্মতি ব্যতিরেকে আইসে নাই। ইংরেজদিগকে দমনে রাখিতে পারে, এরূপ একদল য়ুরোপীয় সৈন্য আনাইবার নিমিত্ত, তিনি, কিছুদিন অবধি,

চুঁচুড়াবাসী ওলন্দাজদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতেছিলেন। খোজাবাজীদ নামক কাশ্মীর দেশীয় বণিক এই সকল কুমন্ত্রণার সাধক হইয়াছিলেন।

খোজাবাজীদ আলিবর্দি খাঁর সবিশেষ অনুগ্রহ পাত্র ছিলেন। লবণ ব্যবসায় তাঁহার একচেটিয়া ছিল। তিনি এমন ঐশ্বর্যশালী ছিলেন যে, সহস্র মুদ্রার ন্যূনে তদীয় দৈনন্দিন ব্যয়ের নির্বাহ হইত না। একদা তিনি নবাবকে পঞ্চদশ লক্ষ টাকা উপহার দিয়াছিলেন। পূর্বে তিনি মুরশিদাবাদে ফরাসিদিগের এজেন্ট ছিলেন; পরে, চন্দননগরের পরাজয় দ্বারা তাঁহাদের অধিকার উচ্ছিন্ন হইলে, ইংরেজদিগের পক্ষে আইসেন।

সিরাজউদ্দৌলা তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু, উক্ত নবাবকে রাজ্যভ্রষ্ট করিবার নিমিত্ত ইংরেজদিগকে আহ্বান করিবার বিষয়ে, তিনিই প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন। রাজবিপ্লবের পর, তিনি দেখিলেন যে ইংরেজদিগের নিকট যে সকল আশা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হইল না; এজন্য, তাঁহাদের দমন করিবার নিমিত্ত, বহুসংখ্যক ওলন্দাজী সৈন্যের আনয়ন বিষয়ে যত্নবান হইয়াছিলেন।

তৎকালে চুঁচুড়ার কৌন্সিলে দুই পক্ষ ছিল। গবর্ণর বিসদম সাহেব এক পক্ষের প্রধান। ইনি ক্লাইবের বন্ধু ছিলেন। তাঁহার নিতান্ত বাসনা, কোনরূপে সন্ধিভঙ্গ না হয়। বর্ণেট নামক এক ব্যক্তি অপর পক্ষের প্রধান। এই পক্ষের লোকেরা অতিশয় উদ্ধত ছিলেন। তাঁহাদের মত অনুসারে, চুঁচুড়ার সমুদয় কার্য সম্পন্ন হইত। ইতঃপূর্বে, ইংরেজেরা, আপনাদের মঙ্গলের নিমিত্ত, ওলন্দাজদিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন যে, আপনারা এই নদীতে স্বজাতীয় নাবিক রাখিতে পারিবেন না। ওলন্দাজেরা, বহুসংখ্যক সৈন্য পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত, বটেবিয়াতে পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে মনে আশা করিয়াছিলেন, এদেশে এক্ষণে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, এই সুযোগে আপনাদের অনেক ইষ্টসাধন করিতে পারা যাইবেক।

এই সৈন্যের উপস্থিতি সংবাদ অবগত হইয়া, ক্লাইব, অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। তৎকালে ওলন্দাজদিগের সহিত ইংরেজদের সন্ধি ছিল। আর, যত তাঁহাদের য়ুরোপীয় সৈন্য থাকে, ইংরেজদিগের তাহার তৃতীয়াংশের অধিক ছিল না। যাহা হউক, ক্লাইব, স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ পরাক্রম ও অকুতোভয়তা সহকারে, কার্য করিতে লাগিলেন।

ক্লাইব, বাঙ্গালাতে ফরাসিদিগের প্রাধান্যলাভ করিয়া, মনে মনে নিশ্চয় করিয়াছিলেন ওলন্দাজদিগকেও প্রবল হইতে দিবেন না। এক্ষণে, তিনি মীরজাফরকে কহিলেন, আপনি ওলন্দাজী সৈন্যদিগকে প্রস্থান করিতে আজ্ঞাপ্রদান করুন। নবাব কহিলেন, আমি স্বয়ং হুগলীতে গিয়া এ বিষয়ের শেষ করিব। কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া, তিনি, ক্লাইবকে পত্র লিখিলেন, আমি ওলন্দাজদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছি; প্রস্থানের উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইলেই, তাহাদের সমুদয় জাহাজ চলিয়া যাইবেক।

ক্লাইব, এই চাতুরীর মর্ম বুঝিতে পারিয়া, স্থির করিলেন, ওলন্দাজী জাহাজ সকল আর অগ্রসর হইতে দেওয়া উচিত নহে ; অতএব, কলিকাতার দক্ষিণবর্তী টানা নামক স্থানে যে চর ছিল, তাহা দৃঢ়ীভূত করিতে লাগিলেন। কিন্তু, তিনি নিশ্চয় করিয়াছিলেন, অগ্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। ওলন্দাজেরা, দুর্গের নিকটবর্তী হইয়া, অবিলম্বে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু পরাস্ত হইলেন। অনন্তর, তাঁহাবা কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া, সাত শত য়ুরোপীয় ও আট শত মালাই সৈন্য, ভূমিতে অবতীর্ণ করিলেন। ঐ সকল সৈন্য, স্থলপথে গঙ্গার পশ্চিম পার দিয়া, চুঁচুড়া অভিমুখে চলিল। ক্লাইব, ওলন্দাজদিগের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, চুঁচুড়া ও চন্দননগরের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিবার নিমিত্ত, পূর্বেই কর্ণেল ফোর্ড সাহেবকে স্বল্প সৈন্য সহিত পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

ওলন্দাজী সৈন্য, ক্রমে অগ্রসর হইয়া চুঁচুড়ার এক ক্রোশ দক্ষিণে ছাউনি করিল। কর্ণেল ফোর্ড জানিতেন, উভয় জাতির পরস্পর সন্ধি আছে , এজন্য, সহসা তাঁহাদিগকে আক্রমণ না করিয়া, স্পষ্ট অনুমতির নিমিত্ত, কলিকাতার কৌন্সিলে পত্র লিখিলেন। ক্লাইব তাস খেলিতেছেন, এমন সময়ে ফোর্ড সাহেবের পত্র উপস্থিত হইল। তিনি, খেলা হইতে না উঠিয়াই, পেন্সিল দিয়া এই উত্তর লিখিলেন, ভ্রাতঃ ! অবিলম্বে তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর ; কল্য আমি কৌন্সিলের অনুমতি পাঠাইব। ফোর্ড, এই আদেশ প্রাপ্তি মাত্র, আক্রমণ করিয়া, আধ ঘণ্টার মধ্যেই, ওলন্দাজদিগকে পরাস্ত করিলেন। তাঁহাদের যে সকল জাহাজ নদী মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, ঐ সময়ে তৎসমুদায়ও ইংরেজদিগের হস্তে পতিত হইল। এইরূপে ওলন্দাজদিগের ঐ মহোদ্যোগ পরিশেষে ধূমশেষ হইয়া গেল।

এই যুদ্ধের অব্যবহিত পবক্ষণেই, রাজকুমার মীরন, ছয় সাত সহস্র অশ্বারোহ সৈন্য সহিত চুঁচুড়ায় উপস্থিত হইলেন। ওলন্দাজেরা জয়ী হইলে, তিনি তাহাদের সহিত যোগ দিতেন, সন্দেহ নাই ; কিন্তু, এক্ষণে, অগত্যা ইংবেজদের সহিত মিলিত হইয়া, ওলন্দাজদিগকে আক্রমণ করিলেন। কর্ণেল ফোর্ড, যুদ্ধ সমাপ্তির অব্যবহিত পরেই, চুঁচুড়া অবরোধ কবিলেন। ঐ নগর ত্বরায় ইংরেজদিগেব হস্তগত হইত ; কিন্তু ওলন্দাজেরা ক্লাইবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কবাতে, তিনি উক্ত নগর অধিকার করিলেন না। অনন্তর, তাঁহারা যুদ্ধের সমুদয় ব্যয় ধরিয়া দিতে স্বীকার করাতে, তিনি তাঁহাদের জাহাজ সকলও ছাড়িয়া দিলেন।

ক্লাইব, ক্রমাগত তিন বৎসর গুরুতর পরিশ্রম করিয়া, শারীরিক সাতিশয় অপটু হইয়াছিলেন। এজন্য, এই সকল ঘটনার অবসানেই, ১৭৬০ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারিতে, ধনে মানে পূর্ণ হইয়া ইংলণ্ড যাত্রা করলেন। গবর্ণমেণ্টের ভার বান্সিটার্ট সাহেবের হস্তে ন্যস্ত হইল।

বাঙ্গালা দেশ যে একেবারে নিরুপদ্রব হইবেক, তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। বৃদ্ধ

নবাব মীরজাফর নিজপুত্র মীরনের হস্তে রাজ্যশাসনের ভার সমর্পণ করিলেন। যুবরাজ রাজপুরুষদিগের সহিত সাতিশয় সাহঙ্কার ব্যবহার ও প্রজাগণের উপর অসহ্য অত্যাচার আরম্ভ করাতে, সকলেই তাঁহার শাসনে অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে এরূপ নিষ্ঠুর ব্যাপারের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন যে, সকলে সিরাজউদ্দৌলার কুক্রিয়া সকল বিস্মৃত হইয়া গেল।

সম্রাটের পুত্র শাহআলম, সর্বসাধারণের ঈদৃশ অসন্তোষ দর্শনে সাহসী হইয়া, দ্বিতীয় বার বিহার আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। পূর্ণিয়ার গবর্ণর, কাদিম হোসেন খাঁ, সৈন্য লইয়া, তাঁহার সহিত যোগ দিবার নিমিত্ত, প্রস্তুত হইলেন। শাহআলম, কর্মনাশা পার হইয়া বিহারের সীমান্তে পদার্পণ মাত্র, সংবাদ পাইলেন, সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ক্রূর ইমাদ উল্‌মুলুক সম্রাটের প্রাণবধ করিয়াছে। এই দুর্ঘটনা হওয়াতে, শাহআলম ভারতবর্ষের সম্রাট হইলেন, এবং অযোধ্যার সুবাদারকে সাম্রাজ্যের সর্বাধিকারিপদে নিযুক্ত কবিলেন। কিন্তু তিনি নামেমাত্র সম্রাট হইলেন; তাঁহার পরাক্রমও ছিল না, প্রজাও ছিল না; তৎকালে, তাঁহার রাজধানী পর্যন্ত বিপক্ষের হস্তগত ছিল; এবং তিনিও নিজে নিজ রাজ্যে একপ্রকার পলায়িত স্বরূপ ছিলেন।

তিনি পাটনা অভিমুখে যাত্রা করিলে, পরাক্রান্ত রামনারায়ণ, নগররক্ষার একপ্রকার উদ্যোগ করিয়া, সাহায্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত, মুরশিদাবাদে পত্র লিখিলেন। কর্ণেল কালিয়ড তৎকালে সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিলেন; তিনি, ইংলণ্ডীয় সৈন্য লইয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন; এবং মীরনও স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে, তাঁহার অনুগামী হইলেন।

মীরন, ইতঃপূর্বে, দুই নিজ কর্মকারকের প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন, এবং স্বহস্তে দুই ভোগ্যা কামিনীর মস্তকচ্ছেদন করেন। আলিবর্দি খাঁর দুই কন্যা, ঘেসিতি বেগম, আমান বেগম, আপন আপন স্বামী নিবাইশ মহম্মদ ও সায়দ আহম্মদের মৃত্যুর পর; গুপ্তভাবে ঢাকায় বাস করিতেছিলেন। মীরন, এই যুদ্ধ যাত্রাকালে, তাঁহাদের প্রাণবধ করিতে আজ্ঞাপ্রেরণ করিলেন। ঢাকার গবর্ণর, এই নিষ্ঠুর ব্যাপারের সমাধানে অসম্মত হওয়াতে, তিনি আপন এক ভৃত্যকে এই আজ্ঞা দিয়া পাঠাইলেন যে, তাহাদিগকে, মুরশিদাবাদে আনয়নচ্ছলে, নৌকায় আরোহণ করাইয়া, পথের মধ্যে নৌকা সমেত জলমগ্ন করিবে।

এই নির্দেশ প্রকৃত প্রস্তাবেই প্রতিপালিত হইল। হত্যাকারীরা, ডুবাইয়া দিবার নিমিত্ত, নৌকায় ছিপি খুলিবার উপক্রম করিলে, কনিষ্ঠা ভগিনী করুণস্বরে কহিলেন হে সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর! আমরা উভয়েই পাপীয়সী ও অপরাধিনী বটে, কিন্তু মীরনের কখনও কোনও অপরাধ করি নাই; প্রত্যুত, আমরাই তাঁহার এই সমস্ত আধিপত্যের মূল।

মীরন, প্রস্থানকালে, স্বীয় স্মরণ পুস্তকে এই অভিপ্রায়ে তিনশত ব্যক্তির নাম লিখিয়া-

ছিলেন যে, প্রত্যাগমন করিয়া তাহাদের প্রাণদণ্ড করিবেন। কিন্তু আর তাঁহাকে প্রত্যাগমন করিতে হইল না।

কর্ণেল কালিয়ড রামনারায়ণকে এই অনুরোধ কবিয়াছিলেন, যাবৎ আমি উপস্থিত না হই, আপনি, কোনওক্রমে, সম্রাটের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন না। কিন্তু তিনি, এই উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, নগব হইতে বহির্গমনপূর্বক, সম্রাটের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া, সম্পূর্ণরূপে পবাজিত হইলেন। সুতরাং, পাটনা নিতান্ত অশরণ হইল। সম্রাট, এক উদ্যমেই, ঐ নগর অধিকাব করিতে পারিতেন, কিন্তু, অগ্রে তাহার চেষ্টা না কবিযা, দেশ লুণ্ঠনেই সকল সময় নষ্ট কবিলেন। ঐ সময় মধ্যে, কালিয়ড, স্বীয় সমুদয় সৈন্য সহিত, উপস্থিত হইলেন এবং অবিলম্বে সম্রাটের সৈন্য আক্রমণের প্রস্তাব কবিলেন। কিন্তু মীরন, ফেব্রুযাবীব দ্বাবিংশ দিবসেব পূর্বে গ্রহ সকল অনুকূল নহেন, এই বলিয়া আপত্তি উত্থাপন কবাতে, প্রস্তাবিত আক্রমণ স্থগিত বহিল।

২০শে, সম্রাট, তাঁহাদের উভয়েব সৈন্য এককালে আক্রমণ কবিলেন। মীরনেব পঞ্চদশ সহস্র অশ্বাবোহ সহসা ভঙ্গ দিযা পলাযন কবিল। কিন্তু কর্ণেল কালিয়ড, দৃঢতা ও অকুতোভয়তা সহকারে, সম্রাটের সৈন্য আক্রমণ করিয়া, অবিলম্বে পরাজিত কবিলেন। শাহআলম, সেই বাত্রিতেই, শিবিব ভঙ্গ কবিয়া, বণক্ষেত্রেব পাঁচ ক্রোশ অন্তরে গিযা অবস্থিতি কবিলেন। অনন্তব, তিনি, স্বীয সেনাপতিব পরামর্শ অনুসাবে, গিরিমার্গ দ্বাবা অতর্কিত রূপে গমন কবিয়া, সহসা মুবশিদাবাদ অধিকাব করিবার আশায, প্রস্থান কবিলেন।

এই প্রযাণ অতি ত্বরাপূর্বক সম্পাদিত হইল। কিন্তু মীরন, জানির্তে পাবিয়া দ্রুতগতি পোত দ্বারা, আপন পিতাব নিকট এই সম্ভাবিত বিপদের সংবাদ প্রেরণ করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই, সম্রাট, মুবশিদাবাদের পঞ্চদশ ক্রোশ দূরে; পর্বত হইতে অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু, সত্বব আক্রমণ না করিয়া, জনপথ মধ্যে, অনর্থক কালহরণ কবিতে লাগিলেন। এই অবকাশে কর্ণেল কালিয়ডও আসিয়া পঁহুছিলেন। উভয় সৈন্য পবস্পব দৃষ্টিগোচর স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিল। ইংরেজেরা যুদ্ধদানে উদ্যত হইলেন, কিন্তু সম্রাট, সহসা অসম্ভব ত্রাসযুক্ত হইয়া পাটনা প্রতিগমনপূর্বক, ঐ নগর দৃঢরূপে অববোধ করিবার নিমিত্ত, স্বীয় সৈন্য সহিত যাত্রা করিলেন।

সম্রাট, ক্রমাগত নয় দিবস, পাটনা আক্রমণ কবিলেন। প্রথমতঃ নিশ্চিত বোধ হইয়াছিল, উক্ত নগর অবিলম্বে তাঁহার হস্তগত হইবেক। কিন্তু, কাপ্তেন নক্স অত্যল্প সৈন্য সহিত সহসা পাটনায় উপস্থিত হওয়াতে, সে আশঙ্কা দূব হইল। তিনি, কর্ণেল কালিয়ড কর্তৃক প্রেরিত হইয়া, বর্ধমান হইতে ত্রয়োদশ দিবসে তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং রাত্রিতে, বিপক্ষের শিবির পরীক্ষা করিয়া, পরদিন, তাহাদের মধ্যাহ্নকালীন নিদ্রার

সময়, আক্রমণ করিলেন। সম্রাটের সেনা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। তখন তিনি, আপন শিবিরে অগ্নিদান করিয়া, পলায়ন করিলেন।

দুই এক দিন পরে, কাদিম হোসেন খাঁ, যোড়শ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে হাজীপুরে পঁহুছিয়া, পাটনা আক্রমণের উপক্রম করিলেন। কিন্তু কাপ্তেন নক্স, সহস্রের অনধিক সৈন্য মাত্র সহিত গঙ্গা পার হইয়া, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। এই জয়লাভকে অসাধারণ সাহসের কার্য বলিতে হইবেক। এই জয়লাভ দর্শনে, এতদ্দেশীয় লোকেরা ইংরেজদিগকে মহাপরাক্রান্ত নিশ্চয় করিলেন। এই যুদ্ধে, রাজা সিতাব রায় এমন অসাধারণ সাহসিকতা প্রদর্শন করেন যে, তদ্দর্শনে ইংরেজেরা, তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। পরাজয়ের পর, পূর্ণিয়ার গবর্ণর, সম্রাটের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত, প্রস্থান করিলেন। কর্ণেল কালিয়ড ও মীরন, উভয়ে একত্র হইয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বর্ষার আরম্ভ হইল; তথাপি তাঁহারা তাঁহার অনুসরণে বিরত হইলেন না। ১৭৬০ খৃঃ অব্দের ২রা জুলাই রজনীতে অতিশয় দুর্যোগ হইল। মীরন আপন পটমণ্ডপে উপবিষ্ট হইয়া, গল্প শুনিতেছিলেন; দৈবাৎ, ঐ সময়ে, অশনিপাত দ্বারা, তাঁহার ও তাঁহার দুইজন পরিচারকের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হইল। কর্ণেল কালিয়ড, এই দুর্ঘটনা প্রযুক্ত, কাদিম হোসেনের অনুসরণে বিরত হইলেন, এবং পাটনা প্রত্যাগমন-পূর্বক, বর্ষার অনুরোধে তথায় শিবির সন্নিবেশিত করিলেন।

মীরন নিতান্ত দুরাচার, কিন্তু নিজ পিতার রাজত্বের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ ছিলেন। তৎকালের মুসলমান ইতিহাসলেখক কহেন, নির্বোধ ইন্দ্রিয়পরায়ণ বৃদ্ধ নবাবের যে কিছু বুদ্ধি ও বিবেচনা ছিল, এতক্ষণে তাহা একবারে লোপ পাইল। অতঃপর রাজকার্যে অত্যন্ত গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। সেনাগণ, পূর্বতন বেতন নিমিত্ত, রাজভবন অবরোধ করিয়া, বিসংবাদে উদ্যত হইল। তখন, নবাবের জামাতা, মীরকাসিম, তাহাদের পুরোবর্তী হইয়া কহিলেন, আমি অঙ্গীকার করিতেছি, স্বধন দ্বারা তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিব। এই বলিয়া, তিনি তাহাদিগকে আপাততঃ ক্ষান্ত করিলেন।

নবাব মীরকাসিমকে, দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করিয়া, কলিকাতায় পাঠাইলেন। তথায়, বান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস সাহেবের নিকটে, তাঁহার বুদ্ধি ও ক্ষমতা বিশেষরূপে প্রকাশ পায়। তৎকালে, এই দুই সাহেবের মত অনুসারেই, কোম্পানির এতদ্দেশীয় সমুদয় বিষয়কর্ম নিষ্পন্ন হইত। দ্বিতীয়বার দূত প্রেরণ আবশ্যক হওয়াতে, মীরকাসিম পুনর্বার প্রেরিত হয়েন। এইরূপে, দুইবার, মীরকাসিমের বুদ্ধি ও ক্ষমতা দেখিয়া, গবর্ণর সাহেবের অন্তঃকরণে এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, কেবল এই ব্যক্তি অধুনা বাঙ্গালার রাজকার্য নির্বাহে সমর্থ। তদনুসারে, তিনি মীরকাসিমকে তিন প্রদেশের ডেপুটি নাজিমী পদ প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। মীরকাসিম সম্মত হইলেন। অনন্তর, বান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস, উভয়ে,

এক দল সৈন্য সহিত মুরশিদাবাদ গমন করিয়া, মীরজাফরের নিকট ঐ প্রস্তাব করিলে, তিনি তদ্বিষয়ে অত্যন্ত অনিচ্ছাপ্রদর্শন করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, এরূপ হইলে, সমুদয় ক্ষমতা অবিলম্বে জামাতার হস্তে যাইবেক, আমি আপন সভামণ্ডপে পুত্তলিকা প্রায় হইব।

বান্সিটার্ট সাহেব, নবাবের অনিচ্ছা দেখিয়া, দোলায়মানচিত্ত হইলেন। মীরকাসিম এই বলিয়া ভয় দেখাইলেন, আমি সম্রাটের পক্ষে যাইব। তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন, এত কাণ্ড করিয়া, কখনই মুরশিদাবাদে নিরাপদে থাকিতে পারিবেন না। তখন, বান্সিটার্ট সাহেব, দৃঢ়তা সহকারে কার্য করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, ইংলণ্ডীয় সৈন্যদিগকে রাজভবন অধিকার করিতে আদেশ দিলেন। তদ্দর্শনে শঙ্কিত হইয়া, মীরজাফর অগত্যা সম্মত হইলেন।

অনন্তর, মুরশিদাবাদ ও কলিকাতা, এ উভয়ের অন্যতর স্থানে, বৃদ্ধ নবাবকে এক বাসস্থান দিবার প্রস্তাব হইল। নবাব বিবেচনা করিলেন, যদি আমি মুরশিদাবাদে থাকি, তাহা হইলে, যেখানে এতকাল আধিপত্য করিলাম, তথায় সাক্ষিগোপাল হইয়া থাকিতে হইবেক, এবং জামাতৃকৃত পরিভব সহ্য করিতে হইবেক। অতএব, আমার কলিকাতায় যাওয়াই শ্রেয়ঃকল্প। তিনি, এক সামান্য নর্তকীকে আপন প্রণয়িনী করিয়াছিলেন, এবং তাহারই আজ্ঞাকারী ছিলেন। ঐ কামিনী উত্তর কালে মণিবেগম নামে সবিশেষ প্রসিদ্ধ হন। মুসলমান পুরাবৃত্তলেখক কহেন, ঐ রমণী ও মীরজাফর, প্রস্থানের পূর্বে, অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্বক, পূর্ব পূর্ব নবাবদিগের সঞ্চিত মহামূল্য রত্নসকল হস্তগত করিয়া, কলিকাতা প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

১৭৬০ খৃঃ অব্দের ৪ঠা অক্টোবর, ইংরেজেরা মীরকাসিমকে বাঙ্গালা ও বিহারের সুবাদার করিলেন। তিনি, কৃতজ্ঞতাস্বরূপ, কোম্পানি বাহাদুরকে বর্ধমান প্রদেশের অধিকার প্রদান করিলেন, এবং কলিকাতার কৌন্সিলের মেম্বরদিগকে বিংশতি লক্ষ টাকা উপঢৌকন দিলেন। সেই টাকা তাঁহারা সকলে যথাযোগ্য অংশ করিয়া লইলেন।

মীরকাসিম অতিশয় বুদ্ধিশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। তিনি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, ইংরেজদিগকে এবং মীরজাফরের ও নিজের সৈন্য ও কর্মচারীদিগকে যত টাকা দিতে হইবেক, প্রথমতঃ তাহার হিসাব প্রস্তুত করিলেন, তৎপরে সেই সকল পরিশোধ করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। তিনি, সকল বিষয়ে ব্যয়ের সঙ্কোচ করিয়া আনিলেন; অভিনিবেশপূর্বক সমুদয় হিসাব দেখিতে লাগিলেন; এবং, মীরজাফরের

শিথিল শাসনকালে, রাজপুরুষেরা সুযোগ পাইয়া যত টাকা অপহরণ করিয়াছিলেন, অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে, সেই সকল টাকা আদায় করিয়া লইতে লাগিলেন। তিনি, জমীদারদিগের নিকট হইতে, কেবল বাকী আদায় করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, সমুদয় জমীদারীর নূতন বন্দোবস্তও করিলেন। তাঁহার অধিকারের পূর্বে, দুই প্রদেশের রাজস্ব বার্ষিক ১৪২৪৫০০০ টাকা নির্ধারিত ছিল, তিনি বৃদ্ধি করিয়া ২৫৬২৪০০০ টাকা করিলেন। এই সকল উপায় দ্বারা তাঁহার ধনাগার অনতিবিলম্বে পরিপূর্ণ হইল। তখন, তিনি সমস্ত পূর্বতন দেয়ের পরিশোধ করিলেন। নিয়মিত রূপে বেতন দেওয়াতে, তদীয় সৈন্যসকল বিলক্ষণ বশীভূত রহিল।

ইংরেজেরা তাঁহাকে রাজ্যাধিকার প্রদান করেন; কিন্তু ইংরেজদিগের অধীনতা হইতে আপনাকে মুক্ত করা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যদিও আমি সর্বসম্মত নবাব বটে, বাস্তবিক সমুদয় ক্ষমতা ও প্রভুত্ব ইংরেজদিগের হস্তেই রহিয়াছে। আর, তিনি ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বলপ্রকাশ ব্যতিরেকে কখনই ইংরেজদিগের হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিবেন না, অতএব, স্বীয় সৈন্যের শুদ্ধি ও বৃদ্ধি বিষয়ে তৎপর হইলেন। যে সকল সৈন্য অকর্মণ্য হইয়াছিল, তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দিলেন; সৈন্যদিগকে, ইংরেজী রীতি অনুসারে, শিক্ষা দিতে লাগিলেন, এবং এক আরমানিকে সৈন্যের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন।

এই ব্যক্তি পারস্যের অন্তর্গত ইস্পাহান নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার নাম গর্গিন খাঁ। ইনি অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন ও বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। গর্গিন, প্রথমতঃ, একজন সামান্য বস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন; কিন্তু যুদ্ধবিদ্যা বিষয়ে অসাধারণ বুদ্ধি নৈপুণ্য থাকাতে, মীরকাসিম তাঁহাকে সৈনাপত্যে নিযুক্ত করিলেন। তিনিও, সাতিশয় অধ্যবসায় সহকারে, স্বীয় স্বামীকে ইংরেজদিগের অধীনতা হইতে মুক্ত করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। তিনি কামান ও বন্দুক প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং গোলন্দাজদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষিত সৈন্য সকল এমন উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল যে, বাঙ্গালাতে কখনও কোনও রাজার সেরূপ ছিল না।

মীরকাসিম, ইংরেজদিগের অগোচরে আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত, মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া, মুঙ্গেরে রাজধানী করিলেন। ঐ স্থানে তাঁহার আরমানি সেনাপতি বন্দুক ও কামানের কারখানা স্থাপিত করিলেন। বন্দুকের নির্মাণ কৌশলের নিমিত্ত, ঐ নগরের অদ্যাপি যে প্রতিষ্ঠা আছে, গর্গিন খাঁ তাহার আদিকরণ। তৎকালে, গর্গিনের বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসরের অধিক ছিল না।

সম্রাট শাহ আলম তৎকাল পর্যন্ত, বিহারের পর্যন্তদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। অতএব, ১৭৬০ খৃঃ অব্দে বর্ষা শেষ হইবা মাত্র, মেজর কার্ণাক, সৈন্য সহিত যাত্রা করিয়া,

তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। যুদ্ধের পর কার্ণাক সাহেব, সন্ধি প্রস্তাব করিয়া, রাজা সিতাব রায়কে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। সম্রাট তাহাতে সম্মত হইলে, ইংলণ্ডীয় সেনাপতি, তদীয় শিবিরে গমনপূর্ব্বক, তাঁহার সমুচিত সম্মান করিলেন।

মীরকাসিম, সম্রাটের সহিত ইংরেজদিগের সন্ধিবার্ত্তা শ্রবণে, অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং আপনার পক্ষে কোনও অপকার না ঘটে, এই নিমিত্ত সত্বর পাটনা গমন করিলেন। মেজর কার্ণাক মীরকাসিমকে, সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি, কোনও ক্রমে, সম্রাটের শিবিরে গিয়া সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে, এই নির্দ্ধারিত হইল, উভয়েই ইংরেজদিগের কুঠিতে আসিয়া, পরস্পর সাক্ষাৎ করিবেন।

উপস্থিত কার্য্যের নির্ব্বাহের নিমিত্ত, এক সিংহাসন প্রস্তুত হইল। সমস্ত ভারতবর্ষের সম্রাট তদুপরি উপবেশন করিলেন। মীরকাসিম, সমুচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক, তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন, সম্রাট তাঁহাকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারী প্রদান করিলেন, তিনি প্রতি বৎসর চতুর্ব্বিংশতি লক্ষ টাকা করদান স্বীকার করিলেন। তৎপরে, সম্রাট দিল্লী যাত্রা করিলেন। কার্ণাক সাহেব, কর্ম্মনাশার তীর পর্য্যন্ত, তাঁহার অনুগমন করিলেন। সম্রাট, কার্ণাকের নিকট বিদায় লইবার সময়, প্রস্তাব করিলেন, ইংরেজেরা যখন প্রার্থনা করিবেন, তখনই আমি তাহাদিগকে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, এই তিন প্রদেশের দেওয়ানী প্রদান করিব। ১৭৫৫ খৃঃ অব্দে, উড়িষ্যার অধিকাংশ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে প্রদত্ত হয়, সুবর্ণরেখার উত্তরবর্ত্তী অংশ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। তদবধি ঐ অংশই উড়িষ্যা নামে উল্লিখিত হইত।

মীরকাসিম, পাটনার গবর্ণর রামনারায়ণ ব্যতিরিক্ত, সমুদয় জমিদারদিগকে সম্পূর্ণরূপে আপন বশে আনিয়াছিলেন। রামনারায়ণের ধনবান বলিয়া খ্যাতি ছিল, কিন্তু তিনি ইংরেজদিগের আশ্রয়চ্ছায়াতে সন্নিবিষ্ট ছিলেন। এজন্য, সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করা অবিধেয় বিবেচনা করিয়া, নবাব কৌশলক্রমে তাহার সর্ব্বনাশের উপায় দেখিতে লাগিলেন। রামনারায়ণ তিন বৎসর হিসাব পরিষ্কার করেন নাই। নবাব ইংরেজদিগকে লিখিলেন, রামনারায়ণের নিকট বাকীর আদায় না হইলে, আমি আপনাদের প্রাপ্যের পরিশোধ করিতে পারিব না, আর, যাবৎ আপনাদের সৈন্য পাটনাতে থাকিবেক, তাবৎ ঐ বাকীর আদায়ের কোনও সম্ভাবনা নাই।

তৎকালে, কলিকাতার কৌন্সিলে দুই পক্ষ ছিল, এক পক্ষ মীরকাসিমের অনুকূল, অন্য পক্ষ তাঁহার প্রতিকূল; গবর্ণর বান্সিটার্ট সাহেব অনুকূল পক্ষে ছিলেন মীরকাসিমের প্রস্তাব লইয়া, উভয় পক্ষের বিস্তর বাদানুবাদ হইল। পরিশেষে বান্সিটার্টের পক্ষই প্রবল হইল। এই পক্ষের মত অনুসারে, ইংরেজেরা পাটনা হইতে আপনাদের সৈন্য

উঠাইয়া আনিলেন ; সুতরাং, রামনারায়ণ নিতান্ত অসহায় হইলেন ; এবং, নবাবও তাঁহাকে রুদ্ধ ও কারাবদ্ধ করিতে কালবিলম্ব করিলেন না। গুপ্ত ধনাগার দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহার কর্মচারীদিগকে অনেক যন্ত্রণা দেওয়া হইল ; কিন্তু, গবর্ণমেণ্টের আবশ্যক ব্যয়ের নিমিত্ত যাহা আবশ্যক, তদপেক্ষা অধিক টাকা পাওয়া গেল না।

মীরকাসিম, এ পর্যন্ত, নির্বিবাদে রাজ্যশাসন করিলেন। পরে তিনি, কোম্পানির কর্মকারকদিগের আত্মম্ভরিতা দোষে, যেরূপে রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন, এক্ষণে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

ভারতবর্ষের যে সকল পণ্যদ্রব্য এক প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে নীত হইত, তাহাব শুল্ক হইতেই রাজস্বের অধিকাংশ উৎপন্ন হইত। এইরূপে রাজস্ব গ্রহণ করা এক প্রকার অসভ্যতার প্রথা বলিতে হইবেক ; কারণ, ইহাতে বাণিজ্যের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মে। কিন্তু, এই কালে, ইহা বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল, এবং ইংরেজেরাও, ১৮৩৫ খৃঃ অব্দের পূর্বে, ইহা রহিত করেন নাই। যখন কোম্পানি বাহাদুর, সালিয়ানা তিন হাজার টাকার পেস্কস দিয়া, বাণিজ্য করিবার অনুমতি পাইযাছিলেন, তদবধি তদীয় পণ্যদ্রব্যেব মাশুল লাগিত না। কলিকাতার গবর্ণর এক দস্তকে স্বাক্ষর করিতেন, মাশুলঘাটায় তাহা দেখাইলেই, কোম্পানির বস্তু সকল বিনা মাশুলে চলিয়া যাইত।

এই অধিকার কেবল কোম্পানিব নিজের বাণিজ্য বিষযে ছিল ; কিন্তু যখন ইংবেজেরা অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন, তখন কোম্পানিব যাবতীয় কর্মকাবকেরা বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। যত দিন ক্লাইব এ দেশে ছিলেন, তাঁহাবা সকলেই, দেশীয় বণিকদের ন্যায়, রীতিমত শুল্কপ্রদান করিতেন। পবে যখন তিনি স্বদেশে যাত্রা করিলেন, এবং কৌন্সিলের সাহেবেরা অন্য এক নবাবকে সিংহাসনে বসাইলেন, তখন তাঁহারা, আরও প্রবল হইয়া, বিনা শুল্কেই বাণিজ্য করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, তৎকালে তাঁহারা এমন প্রবল হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগকে কোনও প্রকার বাধা দিতে নবাবের কর্মকারকদিগের সাহস হইত না।

ইংরেজদের গোমস্তারা, শুল্কবঞ্চন করিবার নিমিত্ত, ইচ্ছা অনুসাবে, ইংবেজী নিশান তুলিত, এবং দেশীয় বণিক ও রাজকীয় কর্মকারকদিগকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিত। ব্যক্তি মাত্রেই, যে কোনও ইংরেজের স্বাক্ষরিত দস্তক হস্তে করিয়া, আপনাকে কোম্পানি বাহাদুরের তুল্য বোধ করিত। নবাবের লোকেরা কোনও বিষয়ে আপত্তি করিলে, য়ুরোপীয় মহাশয়েরা, সিপাই পাঠাইয়া, তাহাদিগকে ধরিয়া আনিতেন ও কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতেন। শুল্ক না দিয়া কোনও স্থানে কিছু দ্রব্য লইয়া যাইবার ইচ্ছা হইলে, নাবিকেরা নৌকার উপর কোম্পানির নিশান তুলিয়া দিত।

ফলতঃ, এইরূপে, নবাবের পরাক্রম এককালে লোপ পাইল। দেশীয় বণিকদিগের

সর্বনাশ উপস্থিত হইল ইংরেজ মহাত্মারা বিলক্ষণ ধনশালী হইয়া উঠিলেন। নবাবের রাজস্ব অত্যন্ত ন্যূন হইল, কারণ, ইংরেজেরাই কেবল মাশুল দিতেন না, এমন নহে; যাহারা তাঁহাদের চাকর বলিয়া পরিচয় দিত, তাহারাও, তাঁহাদের নাম করিয়া, মাশুল ফাঁকি দিতে আরম্ভ করিল। মীরকাসিম, এই সকল অত্যাচারের উল্লেখ করিয়া, কলিকাতার কৌন্সিলে অনেকবার অভিযোগ করিলেন। পরিশেষে, তিনি এই বলিয়া ভয় দেখাইলেন, আপনারা ইহার নিবারণ না করিলে, আমি রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিব।

বান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস সাহেব এই সকল অন্যায়ের নিবারণ বিষয়ে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু, কৌন্সিলের অন্যান্য মেম্বরেরা, ঐ সকল অবৈধ উপায় দ্বারা, উপার্জন করিতেন, সুতরাং তাঁহাদের সে সকল চেষ্টা বিফল হইল। পরিশেষে, ঐ সকল অবৈধ ব্যবহারের এত বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল যে, কাম্পানির গোমস্তাদিগের নির্ধারিত মূল্যেই, দেশীয় বণিকদিগকে ক্রয় বিক্রয় করিতে হইত। অতঃপর, মীরকাসিম ইংরেজদিগকে শত্রু মধ্যে পরিগণিত করিলেন, এবং ত্বরায় উভয় পক্ষের পরস্পর যুদ্ধ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠিল।

ইহার নিবারণার্থে, বান্সিটার্ট সাহেব, স্বয়ং মুঙ্গেরে গিয়া, নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, নবাবও সৌহৃদ্য ভাবে তাহার সংবর্ধনা করিলেন। পরে, বিষয়কর্মের কথা উত্থাপিত হইলে, মীরকাসিম, কোম্পানির কর্মকারকদিগের অত্যাচার বিষয়ে যৎপরোনাস্তি অসন্তোষ প্রদর্শনপূর্বক, অনেক অনুযোগ করিলেন। বান্সিটার্ট সাহেব, তাঁহাকে অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া, প্রস্তাব করিলেন কি দেশীয় লোক, কি ইংরেজ সকলকেই বস্তুমাত্রের একবিধ মাশুল দিতে হইবেক, কিন্তু আমার স্বয়ং এরূপ নিয়ম নির্ধারিত করিবার ক্ষমতা নাই, অতএব, কলিকাতায় গিয়া কৌন্সিলের সাহেবদিগকে এই নিয়ম নির্ধারিত করিতে পরামর্শ দিব। নবাব, অত্যন্ত অনিচ্ছাপূর্বক, এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, কিন্তু কহিলেন, যদি ইহাতেও এই অনিয়মের নিবারণ না হয়, আমি মাশুলের প্রথা একেবারে রহিত করিয়া কি দেশীয়, কি য়ুরোপীয়, উভয়বিধ বণিকদিগকে সমান করিব।

বান্সিটার্ট সাহেব, কৌন্সিলে এই বিষয়ের প্রস্তাব করিবার নিমিত্ত, সত্বর কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু মীরকাসিম, কৌন্সিলের মতামত পরিজ্ঞান পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া, শুল্ক সম্পর্কীয় কর্মকারকদিগের নিকট এই আজ্ঞা পাঠাইলেন, তোমরা ইংরেজদের নিকট হইতেও শতকরা নয় টাকার হিসাবে মাশুল আদায় করিবে। ইংরেজেরা মাশুল দিতে অসম্মত হইলেন এবং নবাবের কর্মকারকদিগকে কয়েদ করিয়া রাখিলেন। মফঃস্বলের কুঠির অধ্যক্ষ সাহেবেরা, কর্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া, সত্বর

কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। শতকরা নয় টাকা শুল্কের বিষয়ে বান্সিটার্ট সাহেব যে প্রস্তাব করিলেন, হেষ্টিংস ভিন্ন অন্য সকলেই, অবজ্ঞাপ্রদর্শন পূর্বক, তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। তাঁহারা সকলেই কহিলেন, কেবল লবণের উপর আমরা শতকরা আড়াই টাকা মাত্র শুল্ক দিব।

মীরকাসিম তৎকালে বাঙ্গালায় ছিলেন না, যুদ্ধযাত্রায় নেপাল গমন করিয়াছিলেন। তিনি তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া শ্রবণ করিলেন, কৌন্সিলের সাহেবরা মাশুল দিতে অসম্মত হইয়াছেন, এবং তাঁহার কর্মকারকদিগকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছেন। তখন তিনি, কিঞ্চিৎমাত্র বিলম্ব না করিয়া, পূর্ব প্রতিজ্ঞার অনুযায়ী কার্য করিলেন, অর্থাৎ বাঙ্গালা ও বিহারের মধ্যে, পণ্যদ্রব্যের শুল্ক একেবারে উঠাইয়া দিলেন।

কৌন্সিলের মেম্বরেরা শুনিয়া ক্রোধে অন্ধ হইলেন, এবং কহিলেন, নবাবকে, আপন প্রজাদিগের নিকট পূর্বমত শুল্ক লইতে হইবেক এবং ইংরেজদিগকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে দিতে হইবেক। এ বিষয়ে ঘোরতর বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। হেষ্টিংস সাহেব কহিলেন, মীরকাসিম অধীশ্বর রাজা, নিজ প্রজাগণের হিতানুষ্ঠান কেন না করিবেন। ঢাকার কুঠীর অধ্যক্ষ বাট্‌সন সাহেব কহিলেন, এ কথা নবাবের গোমস্তারা বলিলে সাজে, কৌন্সিলের মেম্বরের উপযুক্ত নহে। হেষ্টিংস কহিলেন, পাজী না হইলে, এরূপ কথা মুখে আনে না।

এইরূপ রোষবশ হইয়া, কৌন্সিলের মেম্বরেরা এবংবিধ গুরুতর বিষয়ে বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে এই নির্ধারিত হইল, দেশীয় লোকের বাণিজ্যেই পূর্ব নিরূপিত শুল্ক থাকে, এ বিষয়ে উপরোধ করিবার নিমিত্ত, আমিয়ট ও হে সাহেব মীরকাসিমের নিকট গমন করুন। তাঁহারা, তথায় পঁহুছিয়া, নবাবের সহিত কয়েকবার সাক্ষাৎ করিলেন। প্রথমতঃ বোধ হইয়াছিল, সকল বিষয়েরই নির্বিবাদে নিষ্পত্তি হইতে পারিবেক। কিন্তু, পাটনার কুঠীর অধ্যক্ষ এলিস সাহেবের উদ্ধত আচরণ দ্বারা, মীমাংসার আশা একেবারে উচ্ছিন্ন হইল। কোম্পানির সমুদয় কর্মকারকের মধ্যে এলিস অত্যন্ত দুর্বৃত্ত ছিলেন। নবাব আমিয়ট সাহেবকে বিদায় দিলেন, কিন্তু তাঁহার যে সকল কর্মকারক কলিকাতায় কয়েদ ছিল, হে সাহেবকে তাহাদের প্রতিভূ স্বরূপ আটক করিয়া রাখিলেন। আমিয়ট সাহেব নবাবের হস্তবহির্ভূত হইয়াছেন বোধ করিয়া, এলিস সাহেব অকস্মাৎ পাটনা আক্রমণ ও অধিকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্য সকল সুরাপানে মত্ত ও অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হওয়াতে, নবাবের একদল বহুসংখ্যক সৈন্য আসিয়া পুনর্বার নগর অধিকার করিল; এলিস ও অন্যান্য য়ুরোপীয়েরা রুদ্ধ ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

মীরকাসিম, পাটনার এই বৃত্তান্ত শুনিয়া, বোধ করিলেন, এক্ষণে নিঃসন্দেহ ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ ঘটিবেক। অতএব, তিনি সমস্ত মফঃস্বল কুঠীর কর্মকারক সাহেবদিগকে রুদ্ধ

করিতে ও আমিয়ট সাহেবের কলিকাতা যাওয়া স্থগিত করিতে আজ্ঞা দিলেন। আমিয়ট সাহেব মুরশিদাবাদে পহুছিয়াছেন, এমন সময়ে নগরাধ্যক্ষের নিকট ঐ আদেশ উপস্থিত হওয়াতে, তিনি ঐ সাহেবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সাহেব উক্ত আদেশ অমান্য করাতে, দাঙ্গা উপস্থিত হইল, ঐ দাঙ্গাতে তিনি পঞ্চত্ব পাইলেন। মীরকাসিম, শেঠবংশীয় প্রধান বণিকদিগকে ইংরেজের অনুগত বলিয়া সন্দেহ করিতেন; এজন্য তাহাদিগকে মুরশিদাবাদ হইতে আনাইয়া মুঙ্গেরে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

আমিয়ট সাহেবের মৃত্যু এবং এলিস সাহেব ও তদীয় সহচরবর্গের কারাবরোধের সংবাদ কলিকাতায় পহুছিলে, কৌন্সিলের সাহেবেরা অবিলম্বে যুদ্ধারম্ভ করা নির্ধারিত করিলেন। বান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস সাহেব, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত, বিস্তর চেষ্টা পাইলেন যে, মীরকাসিম পাটনায় যে কয়েকজন সাহেবকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের যাবৎ উদ্ধার না হয়, অন্ততঃ, তাবৎ কাল পর্যন্ত, ক্ষান্ত থাকা উচিত, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইল। অধিকাংশ মেম্বরের সম্মতিক্রমে, ইংরেজদিগের সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। সেই সময়ে, মীরজাফর স্বীকার করিলেন, যদি ইংরেজেরা পুনর্বার আমাকে নবাব করেন, আমি কেবল দেশীয় লোকদিগের বাণিজ্য বিষয়ে পূর্ব শুল্ক প্রচলিত রাখিব, ইংরেজদিগকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে দিব। অতএব, কৌন্সিলের সাহেবরা তাঁহাকেই পুনর্বার সিংহাসনে নিবিষ্ট করা মনস্থ করিলেন। বাযাত্তরিয়া বৃদ্ধ মীরজাফর তৎকালে কুষ্ঠরোগে প্রায় চলৎশক্তিরহিত হইয়াছিলেন, তথাপি, মুরশিদাবাদগামী ইংলণ্ডীয় সৈন্য সমভি-ব্যাহারে, পুনর্বার নবাব হইতে চলিলেন।

মীরকাসিম, স্বীয় সৈন্যদিগকে সুশিক্ষিত করিবার নিমিত্ত, অশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বাস্তবিক, বাঙ্গালা দেশে, কখনও কোনও রাজার তদ্রূপ উৎকৃষ্ট সৈন্য ছিল না, তাঁহার সেনাপতি গর্গিন খাঁও যুদ্ধ বিষয়ে অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। তথাপি উপস্থিত যুদ্ধ অল্প দিনেই শেষ হইল। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দের ১৯শে জুলাই, কাটোয়াতে নবাবের সৈন্য-সকল পরাজিত হইল। মতিঝিলে নবাবের যে সৈন্য ছিল, ইংরেজেরা ২৪শে, তাহা পরাজিত করিয়া, মুরশিদাবাদ অধিকার করিলেন। সুতির সন্নিহিত ঘেরিয়া নামক স্থানে, ২রা আগষ্ট, আর এক যুদ্ধ হয়, তাহাতেও মীরকাসিমের সৈন্য পরাজিত হইল। রাজ-মহলের নিকট, উদয়নালাতে তাঁহার এক দৃঢ় গড়খাই করা ছিল, নবাবের সৈন্যসকল পলাইয়া তথায় আশ্রয় লইল।

এই সকল যুদ্ধকালে মীরকাসিম মুঙ্গেরে ছিলেন, এক্ষণে উদয়নালার সৈন্য মধ্যে উপস্থিত থাকিতে মনস্থ করিলেন। তিনি এতদ্দেশীয় যে সমস্ত প্রধান প্রধান লোকদিগকে কারা-বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রস্থানের পূর্বে, তাঁহাদের প্রাণদণ্ড করিলেন। তিনি পাটনার পূর্ব গবর্ণর রাজা রামনারায়ণকে, গলদেশে বালুকাপূর্ণ গোণী বদ্ধ করিয়া, নদীতে নিক্ষিপ্ত

করাইলেন; কৃষ্ণদাস প্রভৃতি সমুদয় পুত্র সহিত রাজা রাজবল্লভ, রায়রাইয়াঁ রাজা উমেদ সিংহ, রাজা বনিয়াদ সিংহ, রাজা ফতে সিংহ, ইত্যাদি অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করিলেন, এবং শেঠবংশীয় দুইজন ধনবান বণিককে, মুঙ্গেরের গড়ের বুরুজ হইতে, গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত করাইলেন। বহুকাল পর্যন্ত, নাবিকেরা, ঐ স্থান দিয়া যাতায়াত কালে, উক্ত হতভাগ্যদ্বয়ের বধস্থান দেখাইয়া দিত।

মীরকাসিম, এই হত্যাকাণ্ডের সমাপন করিয়া, উদয়নালাস্থিত সৈন্য সহিত মিলিত হইলেন। অক্টোবরের আরম্ভে, ইংরেজেরা, নবাবের শিবির আক্রমণ করিয়া, তাঁহাকে পরাজিত করিলেন। পরাজয়ের দুই-এক দিবস পরে, তিনি মুঙ্গেরে প্রতিগমন করিলেন। কিন্তু ইংরেজদিগের যে সৈন্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিল, তাহার নিবারণ করা অসাধ্য বোধ করিয়া, সৈন্য সহিত পাটনা প্রস্থান করিলেন। যে কয়েকজন ইংরেজ তাঁহার হস্তে পড়িয়াছিল, তিনি তাঁহাদিগকেও সমভিব্যাহরে লইয়া গেলেন।

মুঙ্গের পরিত্যাগের পরদিন, তাহার সৈন্য রেবাতীরে উপস্থিত হইল। সেই স্থানে তাঁহার শিবির মধ্যে, হঠাৎ অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইল। সকল লোকই নদী পার হইয়া পলাইতে উদ্যত। দৃষ্ট হইল, কয়েক ব্যক্তি, এক শব লইয়া, গোর দিতে যাইতেছে। জিজ্ঞাসা করাতে কহিল, ইহা সৈন্যাধ্যক্ষ গর্গিন খাঁর কলেবর। বিকালে, তিন চারি জন মোগল, তদীয় পটমণ্ডপে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার প্রাণবধ করে। তৎকালে উল্লিখিত ঘটনার এই কারণ প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহারা সেনাপতির নিকট বেতন প্রার্থনা করিতে যায়; তিনি তাহাদিগকে হাঁকাইয়া দেওয়াতে তাহারা তরবারির প্রহারে তাঁহার প্রাণবধ করে। কিন্তু সে সময়ে তাহাদের কিছুই পাওনা ছিল না। নয় দিবস পূর্বে তাহারা বেতন পাইয়াছিল।

বস্তুতঃ, ইহা এক অলীক কল্পনা মাত্র। এই অশুভ ঘটনার প্রকৃত কারণ এই যে, মীর-কাসিম, স্বীয় সেনাপতি গর্গিন খাঁর প্রাণবধ করিবার নিমিত্ত, ছল পূর্বক তাহাদিগকে পাঠাইয়া দেন। গর্গিনের খোজা পিক্রুস নামে এক ভ্রাতা কলিকাতায় থাকিতেন। বান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস সাহেবের সহিত তাঁহার অতিশয় প্রণয় ছিল। পিক্রুস, এই অনুরোধ করিয়া, গোপনে গর্গিনকে পত্র লিখিয়াছিলেন, তুমি নবাবের কর্ম ছাড়িয়া দাও, আর যদি সুযোগ পাও, তাঁহাকে অবরুদ্ধ কর। নবাবের প্রধান চর, এই বিষয়ের সন্ধান পাইয়া, রাত্রি দুই প্রহর একটার সময়ে, আপন প্রভুকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দেয় যে, আপনকার সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক। তৎপরে, এক দিবস অতীত না হইতেই, আরমানি সেনাপতি গর্গিন খাঁ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন। নবাবের সৈন্য সকল, প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষিত হইয়াও, প্রতিযুদ্ধেই যে, ইংরেজদিগের নিকট পরাজিত হয়, গর্গিন খাঁর বিশ্বাস-ঘাতকতাই তাহার একমাত্র কারণ।

তদনন্তর, মীরকাসিম সত্বর পাটনা প্রস্থান করিলেন। মুঙ্গের ইংরেজদিগের হস্তগত হইল। তখন নবাব বিবেচনা করিলেন, পাটনাও পরিত্যাগ করিতে হইবেক ; এবং, পরিশেষে, দেশত্যাগীও হইতে হইবেক। ইংরেজদের উপর তাঁহার ক্রোধের ইয়ত্তা ছিল না। তিনি, পাটনা পরিত্যাগের পূর্বে, সমস্ত ইংরেজ বন্দীদিগের প্রাণদণ্ড নির্ধারিত করিয়া, আপন সেনাপতিদিগকে, বন্দীগৃহে গিয়া তাহাদের প্রাণবধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাঁহারা উত্তর করিলেন, আমরা ঘাতক নহি যে, বিনা যুদ্ধে প্রাণবধ করিব। তাহাদের হস্তে অস্ত্র প্রদান করুন, যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। তাঁহারা এইরূপে অস্বীকার করাতে, নবাব শমরু এক য়ুরোপীয় কর্মচারীকে তাঁহাদের প্রাণবধের আদেশ দিলেন।

শমরু, পূর্বে ফরাসিদিগের একজন সার্জন ছিল, পরে, মীরকাসিমের নিকট নিযুক্ত হয়। সে এই জুগুপ্সিত ব্যাপারের সমাধানের ভারগ্রহণ করিল ; এবং, কিয়ৎসংখ্যক সৈনিক সহিত, কারাগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া, গুলি করিয়া, ডাক্তার ফুলর্টন ব্যতিরিক্ত সকলেরই প্রাণবধ করিল। আটচল্লিশজন ভদ্র ইংরেজ, ও একশত পঞ্চাশজন গোরা, এইরূপে, পাটনায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। শমরু, তৎপরে, অনেক রাজার নিকট কর্ম করে ; পরিশেষে, সিরধানার আধিপত্য প্রাপ্ত হয়। এই হত্যায় যে সকল লোক হত হয়, তন্মধ্যে কৌন্সিলের মেম্বর এলিস, হে, লসিংটন, এই তিনজনও ছিলেন। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দের ৬ই নবেম্বর, পাটনানগর ইংরেজদিগের হস্তগত হইল ; মীরকাসিম, পলাইয়া, অযোধ্যার সুবাদারের আশ্রয় লইলেন।

এইরূপে, প্রায় চারি মাসে, যুদ্ধের শেষ হইল। পর বৎসর, ২২শে অক্টোবর, ইংরেজদিগের সেনাপতি, বক্সারে, অযোধ্যার সুবাদারের সৈন্যসকল পরাজিত করিলেন। জয়ের পর উজীরের সহিত যে বন্দোবস্ত হয়, বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত তাহার কোনও সংস্রব নাই ; এজন্য, এ স্থলে সে সকলের উল্লেখ না করিয়া, ইহা কহিলেই পর্যাপ্ত হইবেক যে, তিনি প্রথমতঃ মীরকাসিমকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, পরে, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হরণ করিয়া, তাড়াইয়া দেন।

মীরজাফর, দ্বিতীয়বার বাঙ্গালার সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া, দেখিলেন, ইংরেজদিগকে যত টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহার পরিশোধ করা অসাধ্য। তৎকালে তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার রোগ ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছিল। তিনি, ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে, চতুঃসপ্ততি বৎসর বয়সে, মুরশিদাবাদে প্রাণত্যাগ করিলেন।

তাঁহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করা দিল্লীর সম্রাটের অধিকার। কিন্তু, তৎকালে, সম্রাটের কোনও ক্ষমতা ছিল না। ইংরেজদিগের যাহা ইচ্ছা হইল, তাহাই তাঁহারা করিলেন।

মণিবেগমের গর্ভজাত নজমউদ্দৌলা নামে মীরজাফরের এক পুত্র ছিল; কলিকাতার কৌন্সিলের সাহেবেরা, অনেক টাকা পাইয়া, তাঁহাকেই নবাব করিলেন। তাঁহার সহিত নূতন বন্দোবস্ত হইল। ইংরেজেরা দেশরক্ষার ভার আপনাদের হস্তে লইলেন, এবং নবাবকে, রাজ্যের দেওয়ানী ও ফৌজদারী সংক্রান্ত কার্য নির্বাহের নিমিত্ত, একজন নায়েব নাজিম নিযুক্ত করিতে কহিলেন।

নবাব অনুরোধ করিলেন, নন্দকুমারকে ঐ পদে নিযুক্ত করা যায়। কিন্তু কৌন্সিলের সাহেবেরা তাহা স্পষ্টরূপে অস্বীকার করিলেন। অধিকন্তু, বান্সিটার্ট সাহেব, ভাবী গবর্ণরদিগকে সতর্ক করিবার নিমিত্ত, নন্দকুমারের কুক্রিয়া সকল কৌন্সিলের বহিতে বিশেষ করিয়া লিখিয়া রাখিলেন। আলিবর্দি খাঁর কুটুম্ব মহম্মদ রেজা ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতবর্ষীয় কর্মচারীদের কুব্যবহারে যে সকল বিশৃঙ্খলা ঘটে, এবং মীরকাসিম ও উজীরের সহিত যে যুদ্ধ ও পাটনায় যে হত্যা হয়, এই সকল ব্যাপার অবগত হইয়া, ডিরেক্টরেরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহারা এই ভয় করিতে লাগিলেন, পাছে এই নবোপার্জিত রাজ্য হস্তবহির্ভূত হয়, এবং ইহাও বিবেচনা করিলেন, যে ব্যক্তির বুদ্ধি-কৌশলে ও পরাক্রমপ্রভাবে রাজ্যাধিকার লব্ধ হইয়াছে, তিনি ভিন্ন অন্য কোনও ব্যক্তি এক্ষণে তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব, তাঁহারা ক্লাইবকে পুনরায় ভারতবর্ষে আসিতে অনুরোধ করিলেন।

তিনি ইংলণ্ডে পঁহুছিলে, ডিরেক্টরেরা তাঁহার সমুচিত পুরস্কার করেন নাই, বরং তাঁহার জায়গীর কাড়িয়া লইয়াছিলেন। তথাপি তিনি, তাঁহাদের অনুরোধে, পুনরায় ভারতবর্ষে আসিতে সম্মত হইলেন। ডিরেক্টরেরা তাঁহাকে, কার্যনির্বাহ বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া, বাঙ্গালার গবর্ণর ও প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিলেন; কহিয়া দিলেন, ভারত-বর্ষীয় কর্মচারীদিগের নিজ নিজ বাণিজ্য দ্বারাই এত অনর্থ ঘটিতেছে; অতএব তাহা অবশ্য রহিত করিতে হইবেক। আট বৎসরের মধ্যে, তাঁহাদের কর্মচারীরা, উপর্যুপরি কয়েক নবাবকে সিংহাসনে বসাইয়া, দুই কোটির অধিক টাকা উপঢৌকন লইয়াছিলেন। অতএব, তাঁহারা স্থির করিয়া দিলেন, সেরূপ উপঢৌকন রহিত করিতে হইবেক। তাঁহারা আরও আজ্ঞা করিলেন, কি রাজ্যশাসন সংক্রান্ত, কি সেনা সংক্রান্ত, সমস্ত কর্মচারীদিগকে এক এক নিয়মপত্রে নাম স্বাক্ষর ও এই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবেক, চারি হাজার টাকার অধিক উপঢৌকন পাইলে, সরকারী ভাণ্ডারে জমা করিয়া

দিবেন, এবং গবর্ণবেব অনুমতি ব্যতিবেকে, হাজাব টাকাব অধিক উপহাব লইতে পাবিবেন না।

এই সকল উপদেশ দিয়া, ডিবেক্টবেবা ক্লাইবকে ভাবতবষে প্রেবণ কবিলেন। তিনি ১৭৬৫ খৃঃ অব্দেব ৩বা মে, কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইযা দখিলেন, ডিবেক্টবেবা, যে সকল আপদেব আশঙ্কা কবিযা উদ্বিগ্ন হইযাছিলেন, সে সমস্ত অতিক্রান্ত হইয়াছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যৎপবোনাস্তি বিশৃঙ্খল হইযা উঠিযাছে। অন্যেব কথা দূবে থাকুক, কৌন্সিলেব মেম্ববেবাও কোম্পানিব মঙ্গলচেষ্টা কবেন না। সমুদয কর্মচাবীব অভিপ্রায এই, যে কোনও উপাযে অর্থোপাজন কবিযা, ত্ববায ইংলণ্ডে প্রতিগমন কবিবেন। সকল বিষযেই সম্পূর্ণরূপ অবিচাব। আব, এতদ্দেশীয লোকদিগেব উপব এত অত্যাচাব হইতে আবম্ভ হইযাছিল যে, ইংবেজ এই শব্দ শুনিলে, তাঁহাদেব মনে ঘৃণাব উদয হইত। ফলতঃ, তৎকালে, গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত ব্যক্তিদিগেব ধর্মাধর্মজ্ঞান ও ভদ্রতাব লেশমাত্র ছিল না।

পূর্ব বৎসব ডিবেক্টবেবা দৃঢ়রূপে আজ্ঞা কবিযাছিলেন, তাঁহাদেব কর্মচাবীবা আব কোনও রূপে উপঢৌকন লইতে পাবিবেন না, এই আজ্ঞা উপস্থিত হইবাব সময়, বৃদ্ধ নবাব মীবজাফব মৃত্যুশয্যায় ছিলেন। কৌন্সিলেব মেম্ববেবা উক্ত আজ্ঞা কৌন্সিলেব পুস্তকে নিবিষ্ট কবেন নাই, ববং মীবজাফবেব মৃত্যুব পব, এক ব্যক্তিকে নবাব কবিয়া, তাঁহাব নিকট হইতে অনেক উপহাব গ্রহণ কবেন, সেই পত্রে ডিবেক্টবেবা ইহাও আদেশ কবিয়াছিলেন তাঁহাদেব কর্মচাবীদিগকে নিজ নিজ বাণিজ্য, পবিত্যাগ কবিতে হইবেক। কিন্তু, এই স্পষ্ট আজ্ঞা লঙ্ঘন কবিযা, কৌন্সিলেব সাহেবেবা নূতন নবাবেব সহিত বন্দোবস্ত কবেন, ইংবেজেবা, পূর্ববৎ, বিনা শুল্কে, বাণিজ্য কবিতে পাইবেন।

ক্লাইব, উপস্থিতিব অব্যবহিত পবেই, ডিবেক্টবদিগেব আজ্ঞা সকল প্রচলিত কবিতে ইচ্ছা কবিলেন। কৌন্সিলেব মেম্ববেবা বান্সিটার্ট সাহেবেব সহিত যেরূপ বিবাদ কবিতেন, তাঁহাবও সহিত সেইরূপ কবিতে আবম্ভ কবিলেন। কিন্তু ক্লাইব অন্যবিধ পদার্থে নির্মিত। তিনি জিদ কবিতে লাগিলেন, সকল ব্যক্তিকেই, আব উপঢৌকন লইব না বলিয়া, নিযমপত্রে নাম স্বাক্ষব কবিতে হইবেক। যাঁহাবা অস্বীকাব কবিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত কবিলেন। তদ্দর্শনে কেহ কেহ নাম স্বাক্ষব কবিলেন। আব, যাঁহাবা, অপর্যাপ্ত অর্থ উপার্জন কবিযাছিলেন, তাঁহাবা গৃহপ্রস্থান কবিলেন। কিন্তু সকলেই, নির্বিশেষে, তাঁহাব বিষম শত্রু হইয়া উঠিলেন।

সমুদয় বাজস্ব যুদ্ধব্যযেই পর্যবসিত হইতেছে, অতএব সন্ধি কবা অতি আবশ্যক. এই বিবেচনা কবিযা, ক্লাইব, জুন মাসের চতুর্বিংশ দিবসে, পশ্চিম অঞ্চল যাত্রা কবিলেন। নজমউদ্দৌলাব সহিত এইরূপ সন্ধি হইল যে, ইংবেজেবা বাজ্যেব সমস্ত বন্দোবস্ত কবিবেন, তিনি, আপন ব্যয়নির্বাহেব নিমিত্ত, প্রতিবৎসব পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পাইবেন,

মহম্মদ রেজা খাঁ, রাজা দুর্লভরাম, ও জগৎ শেঠ, এই তিনজনের মত অনুসারে, ঐ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবেক। কিছু দিন পরে, অযোধ্যার নবাবের সহিত সন্ধি হইল। এই যাত্রায় যে সকল কার্য নিষ্পন্ন হয়, দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে, কোম্পানির নামে তিন প্রদেশের দেওয়ানী প্রাপ্তি সে সকল অপেক্ষা গুরুতর। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সম্রাট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, ইংরেজেরা যখন প্রার্থনা করিবেন, তখনই তিনি তাঁহাদিগকে তিন প্রদেশের দেওয়ানী দিবেন। ক্লাইব, এলাহাবাদে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ঐ প্রতিজ্ঞার পরিপূরণের প্রার্থনা করিলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। ১২ই আগষ্ট, সম্রাট কোম্পানি বাহাদুরকে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রদান করিলেন; আর, ক্লাইব, স্বীকার করিলেন, উৎপন্ন রাজস্ব হইতে সম্রাটকে প্রতি-মাসে দুই লক্ষ টাকা দিবেন।

তৎকালে, সম্রাট আপন রাজ্যে পলায়িত স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার রাজকীয় পরিচ্ছদ আদি ছিল না। ইংরেজদিগের খানা খাইবার দুই মেজ একত্রিত ও কার্মিক বস্ত্রে মণ্ডিত করিয়া, সিংহাসন প্রস্তুত করা হইল। সমস্ত ভারতবর্ষের সম্রাট, তদুপরি উপবিষ্ট হইয়া, বার্ষিক দুই কোটি টাকার রাজস্ব সহিত, তিন কোটি প্রজা ইংরেজদিগের হস্তে সমর্পিত করিলেন। তৎকালীন মুসলমান ইতিহাসলেখক এ বিষয়ে এই ইঙ্গিত করিয়াছেন, পূর্বে, একপ গুরুতর ব্যাপারের নির্বাহকালে, কত অভিজ্ঞ মন্ত্রীর ও কার্যদক্ষ দূতের প্রেরণ, এবং কত বাদানুবাদের আবশ্যকতা হইত; কিন্তু, এক্ষণে, ইহা এত অল্প সময়ে সম্পন্ন হইল যে, একটা গর্দভের বিক্রয়ও ঐ সময় মধ্যে সম্পন্ন হইয়া উঠে না।

পলাশির যুদ্ধের পর, ইংরেজদিগের পক্ষে যে সকল হিতকর ব্যাপার ঘটে, এই বিষয়ে সে সকল অপেক্ষা গুরুতর। ইংরেজেরা, ঐ যুদ্ধ দ্বারা, বাস্তবিক এ দেশের প্রভু হইয়া-ছিলেন বটে; কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরা, এ পর্যন্ত, তাঁহাদিগকে সেরূপ মনে করিতেন না; এক্ষণে, সম্রাটের এই দান দ্বারা, তিন প্রদেশের যথার্থ অধিকারী বোধ করিলেন। তদবধি, মুরশিদাবাদের নবাব সাক্ষিগোপাল হইলেন। ক্লাইব, এই সকল ব্যাপারের সমাধান করিয়া, ৭ই সেপ্টেম্বর, কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন।

কোম্পানির কর্মচারীরা যে নিজ নিজ বাণিজ্য করিতেন, তদুপলক্ষেই অশেষবিধ অত্যাচার ঘটিত। এজন্য, ডিরেক্টরেরা বারংবার এই আদেশ করেন যে, উহা এক বারে রহিত হয়। কিন্তু তাঁহাদের কর্মচারীরা, ঐ সকল আদেশ এ পর্যন্ত অমান্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের অন্তিম আদেশ কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট ছিল, এবং ক্লাইবও বিবেচনা করিলেন যে, সিবিল কর্মচারীদিগের বেতন অত্যন্ত অল্প; সুতরাং, তাহারা, অবশ্য, গর্হিত উপায় দ্বারা, পোষাইয়া লইবেক। এজন্য, তিনি তাহাদের বাণিজ্য, এক বারে রহিত না করিয়া, ভদ্র রীতি ক্রমে চালাইবার মনন করিলেন।

এই স্থির করিয়া, ক্লাইব, লবণ, গুবাক, তবাক, এই তিন বস্তুর বাণিজ্য ভদ্র রীতি ক্রমে চালাইবার নিমিত্ত, এক সভা স্থাপিত করিলেন। নিয়ম হইল, কোম্পানির ধনাগারে, শতকরা ৩৫ টাকার হিসাবে, মাশুল জমা করা যাইবেক, এবং ইহা হইতে যে উপস্বত্ব হইবেক, রাজ্যশাসন সংক্রান্ত ও সেনাসম্পর্কীয় সমুদয় কর্মচারীরা ঐ উপস্বত্বের যথাযোগ্য অংশ পাইবেন। কৌন্সিলের মেম্বরেরা অধিক অংশ পাইবেন, তাঁহাদের নীচের কর্মচারীরা অপেক্ষাকৃত ন্যূন পরিমাণে প্রাপ্ত হইবেন।

ডিরেক্টরদিগের নিকট এই বাণিজ্যপ্রণালীর সংবাদ পাঠাইবার সময়, ক্লাইব তাঁহাদিগকে, গবর্ণরের বেতন বাড়াইয়া দিবাব নিমিত্ত, অনুবোধ কবিয়াছিলেন , কারণ, তাহা হইলে, তাঁহার এই বাণিজ্য বিষযে কোনও সংস্রব বাখিবার আবশ্যকতা থাকিবেক না। কিন্তু, তাঁহারা, তৎপরে পঞ্চদশ বৎসব পর্যন্ত, এই সৎপরামর্শ গ্রাহ্য করেন নাই। তাঁহারা, উক্ত নূতন সভার স্থাপনেব সংবাদ শ্রবণ মাত্র, অতি রূঢ় বাক্যে তাহা অস্বীকার করিলেন; ক্লাইব এই সভাব স্থাপন করিয়াছিলেন বলিযা, তাঁহার যথোচিত তিরস্কার লিখিলেন, এবং এই আদেশ পাঠাইলেন উক্ত সভা রহিত করিতে হইবেক, এবং কোনও সরকারী কর্মচাবী বাঙ্গালার বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিতে পারিবেন না।

এ কাল পর্যন্ত, সমুদয রাজস্ব কেবল কাজকার্যনিবাহেব ব্যযে পর্যবসিত হইতেছিল। কোম্পানিব শুনিতে অনেক আয় ছিল বটে , কিন্তু তাঁহারা সর্বদাই ঋণগ্রস্ত ছিলেন। কি যুরোপীয, কি এতদ্দেশীয, সমুদয় কর্মচাবীরা কেবল লুঠ করিত, কিছুই দয়া ভাবিত না। ইংলণ্ডে ক্লাইবকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, কোম্পানির এরূপ আয় থাকিতেও, চিরকাল এত অপ্রতুল কেন। তাহাতে তিনি এই উত্তর দেন, কোনও ব্যক্তিকে কোম্পানি বাহাদুরের নামে, এক বার বিল করিতে দিলেই, সে বিষয় করিয়া লয়।

কিন্তু ব্যয়ের প্রধান কারণ সৈন্য। সৈন্য সকল যাবৎ নবাবেব হইয়া যুদ্ধ করিত, তিনি ততদিন তাহাদিগকে ভাতা দিতেন। এই ভাতাকে ডবলবাটা কহা যাইত। এই পারিতোষিক তাহাবা এত অধিক দিন পাইয়া আসিয়াছিল যে, পরিশেষে তাহা আপনাদের ন্যায্য প্রাপ্য বোধ কবিত। ক্লাইব দেখিলেন, সৈন্যসংক্রান্ত ব্যয়ের লাঘব করিতে না পারিলে, কখনই রাজস্ব বাঁচিতে পারে না। তিনি ইহাও জানিতেন যে, ব্যয় লাঘবের যে কোনও প্রণালী অবলম্বন করিবেন, তাহাতেই আপত্তি উত্থাপিত হইবেক। কিন্তু তিনি অতিশয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন; অতএব, একবারেই এই আজ্ঞা প্রচারিত করিলেন, অদ্যাবধি ডবলবাটা রহিত হইল।

এই ব্যাপার শ্রবণগোচর করিয়া, সেনাসম্পর্কীয় কর্মচারীবা যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহারা কহিলেন, আমাদের অস্ত্রবলে দেশজয় হইয়াছে; অতএব, ঐ জয় দ্বারা আমাদের উপকার হওয়া সর্বাগ্রে উচিত। কিন্তু ক্লাইবের মন বিচলিত হইবার

নহে। তিনি তাঁহাদিগকে কিছু কিছু দিতে ইচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু ইহাও স্থির করিয়াছিলেন, সৈন্যের ব্যয়লাঘব করা নিতান্ত আবশ্যক। সেনাপতিরা ক্লাইবকে আপনাদের অভিপ্রায় অনুসারে কর্ম করাইবার নিমিত্ত, চক্রান্ত করিলেন। তাঁহারা, পরস্পর গোপনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, সকলেই একদিনে কর্ম পরিত্যাগ করিবেন।

তদনুসারে, প্রথম ব্রিগেডের সেনাপতিরা সর্বাগ্রে কর্ম পরিত্যাগ করিলেন। ক্লাইব, এই সংবাদ পাইয়া, অতিশয় ব্যাকুল হইলেন; এবং সন্দেহ করিতে লাগিলেন, হয়ত, সমুদয় সৈন্য মধ্যে এইরূপ চক্রান্ত হইয়াছে। তিনি অনেকবার অনেক বিপদে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু এমন দায়ে কখনও ঠেকেন নাই। মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনর্বার বাঙ্গালা দেশ আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন; এদিকে, ইংরেজদিগের সেনা অধ্যক্ষহীনা হইল। কিন্তু ক্লাইব, এরূপ সঙ্কটেও চলচিত্ত না হইয়া, আপন স্বভাবসিদ্ধ সাহস সহকারে, কায করিতে লাগিলেন। তিনি মাদ্রাজ হইতে সেনাপতি আনিবার আজ্ঞাপ্রদান করিলেন। বাঙ্গালার যে যে সেনাপতি স্পষ্ট বিদ্রোহী হয়েন নাই, তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন। ক্লাইব প্রধান প্রধান বিদ্রোহীদিগকে পদচ্যুত করিয়া, ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিলেন। এবংবিধ কাঠিন্যপ্রয়োগ দ্বারা, তিনি সৈন্যদিগকে পুনর্বার বশীভূত করিয়া আনিলেন, এবং গবর্ণমেণ্টকেও এই অভূতপূর্ব ঘোরতর আপদ হইতে মুক্ত করিলেন।

ক্লাইব ভারতবর্ষে আসিয়া, বিংশতি মাসে, কোম্পানির কার্যের সুশৃঙ্খলা স্থাপন ও ব্যয়ের লাঘব করিলেন, তিন প্রদেশের দেওয়ানী প্রাপ্তি দ্বারা রাজস্ববৃদ্ধি করিয়া, প্রায় দুই কোটি টাকা বার্ষিক আয় স্থির করিলেন, এবং সৈন্য মধ্যে যে ঘোরতর বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহার শান্তি করিয়া, বিলক্ষণ সুরীতি স্থাপিত করিলেন। তিনি, এই সমস্ত গুরুতর পরিশ্রম দ্বারা, শারীরিক এরূপ ক্লিষ্ট হইলেন যে, স্বদেশে প্রস্থান না করিলে আর চলে না। অতএব, ১৭৬৭ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে, তিনি জাহাজে আরোহণ করিলেন।

ইংরেজেরা তিন প্রদেশের দেওয়ানী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন। যুরোপীয় কর্মচারীরা এ পর্যন্ত বাণিজ্য কার্যেই ব্যাপৃত ছিলেন; ভূমির করসংগ্রহ বিষয়ে কিছুই অবগত ছিলেন না। পূর্ব পূর্ব সুবাদারেরা, হিন্দুদিগকে সাতিশয় সহিষ্ণুস্বভাব ও হিসাবে বিলক্ষণ নিপুণ দেখিয়া, এই সকল বিষয়ের ভার তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত রাখিতেন। ইংরেজেরা এ দেশের তাবৎ বিষয়েই অজ্ঞ ছিলেন; সুতরাং, তাঁহাদিগকেও সমস্ত ব্যাপারই, পূর্ব রীতি অনুসারে প্রচলিত রাখিতে হইল। রাজা সীতাব রায়, বিহারের দেওয়ানের কর্মে নিযুক্ত হইয়া পাটনায় অবস্থিতি করিলেন; মহম্মদ রেজা খাঁ, বাঙ্গালার দেওয়ান হইয়া, মুরশিদাবাদে রহিলেন। প্রায় সাত বৎসর, এইরূপে রাজশাসন সম্পন্ন হয়। পরে, ১৭৭২ খৃঃ অব্দে, ইংরেজেরা স্বয়ং সমস্ত কার্যের নির্বাহ করিতে আরম্ভ করেন।

এই কয় বৎসর, রাজশাসনের কোনও প্রণালী বা শৃঙ্খলা ছিল না। জমীদার ও প্রজাবর্গ, কাহাকে প্রভু বলিয়া মান্য করিবেন, তাহার কিছুই জানিতেন না। সমস্ত রাজকার্যের নির্বাহের ভার নবাব ও তদীয় অমাত্যবর্গের হস্তে ছিল। কিন্তু ইংরেজেরা, এ দেশের সর্বত্র, এমন প্রবল হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা, যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিলেও, রাজপুরুষেরা তাঁহাদের শাসন করিতে পারিতেন না। আর, পার্লিমেণ্টের বিধান অনুসারে, কলিকাতার গবর্ণর সাহেবেরও এমন ক্ষমতা ছিল না যে, মহারাষ্ট্রখাতের বহির্ভাগে কোনও ব্যক্তি কোনও অপরাধ করিলে, তাহার দণ্ডবিধান করিতে পারেন। ফলতঃ, ইংরেজদিগের দেওয়ানী প্রাপ্তির পর, সাত বৎসর, সমস্ত দেশে যার পর নাই বিশৃঙ্খলা ও অতি ভয়ানক অত্যাচার ঘটিয়াছিল।

এইরূপে, রাজশাসন বিষয়ে নিরতিশয় বিশৃঙ্খলা ঘটাতে, সমস্ত দেশে ডাকাইতীর ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। সকল জিলাই ডাকাইতের দলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে; তজ্জন্য, কোনও ধনবান ব্যক্তি নিরাপদে ছিলেন না। ফলতঃ, ডাকাইতীর এত বাড়াবাড়ি হইয়াছিল যে, ১৭৭২ খৃঃ অব্দে, যখন কোম্পানি বাহাদুর আপন হস্তে রাজশাসনের ভার লইলেন, তখন তাঁহাদিগকে, ডাকাইতীর দমনের নিমিত্ত, অতি কঠিন আইন জারী করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা এরূপ আদেশ করিয়াছিলেন যে, ডাকাইতকে, তাহার নিজ গ্রামে লইয়া গিয়া, ফাঁসি দেওয়া যাইবেক, তাহার পরিবার, চিরকালের নিমিত্ত, রাজকীয় দাস হইবেক; এবং সেই গ্রামের সমুদয় লোককে দণ্ডভাজন হইতে হইবেক।

এই অরাজক সময়েই, অধিকাংশ ভূমি নিষ্কর হয়। সম্রাট বাঙ্গালার সমুদয় রাজস্ব ইংরেজদিগকে নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাহা, কলিকাতায় আদায় না হইয়া, মুরশিদাবাদে আদায় হইত। মালের কাছারীও সেই স্থানেই ছিল। মহম্মদ রেজা খাঁ, রাজা দুর্লভরাম, রাজ কান্ত সিংহ, এই তিন ব্যক্তি বাঙ্গালার রাজস্ব সংক্রান্ত সমস্ত কার্যের নির্বাহ করিতেন। তাঁহারাই সমস্ত বন্দোবস্ত করিতেন, এবং রাজস্ব আদায় করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতেন। তৎকালে, জমীদারেরা কেবল প্রধান করসংগ্রাহক ছিলেন। তাঁহারা, পূর্বোক্ত তিন মহাপুরুষের ইচ্ছাকৃত অনবধানের গুণে, ইংরেজদিগের চক্ষু ফুটিবার পূর্বে, প্রায় চল্লিশ লক্ষ বিঘা সরকারী ভূমি ব্রাহ্মণদিগকে নিষ্কর দান করিয়া, গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক ত্রিশ চল্লিশ লক্ষ টাকা ক্ষতি করেন।

লার্ড ক্লাইবের প্রস্থানের পর, বেরিলস্ট সাহেব, ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে, বাঙ্গালার গবর্ণর হইলেন। পর বৎসর, ডিরেক্টরেরা, কর্মচারীদিগের লবণ ও অন্যান্য বস্তু বিষয়ক বাণিজ্য রহিত করিবার নিমিত্ত, চূড়ান্ত হুকুম পাঠাইলেন। তাঁহারা এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন যে, দেশীয় বাণিজ্য কেবল দেশীয় লোকেরা করিবেক; কোনও য়ুরোপীয় তাহাতে লিপ্ত

থাকিতে পারিবেক না। কিন্তু, য়ুরোপীয় কর্মচারীদেগের বেতন অতি অল্প ছিল ; এজন্য, তাঁহারা এরূপও আদেশ করিয়াছিলেন, বেতন ব্যতিরিক্ত, সরকারী খাজনা হইতে, তাহাদিগকে শতকরা আড়াই টাকার হিসাবে দেওয়া যাইবেক ; সেই টাকা সমুদায় সিবিল ও মিলিটারি কর্মচারীরা যথাযোগ্য অংশ করিয়া লইবেন।

ক্লাইবের প্রস্থানের পর, কোম্পানির কার্য সকল পুনর্বার বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল। আয় অনেক ছিল বটে ; কিন্তু ব্যয় তদপেক্ষা অধিক হইতে লাগিল। ধনাগারে দিন দিন বিষম অনাটন হইতে আরম্ভ হইল। কলিকাতার গবর্ণর, ১৭৬৯ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে, হিসাব পরিষ্কার করিযা দেখিলেন, অনেক দেনা হইয়াছে, এবং আরও দেনা না করিলে চলে না। তৎকালে, টাকা সংগ্রহ করিবার এই রীতি ছিল, কোম্পানির য়ুরোপীয় কর্মচারীরা যে অর্থসঞ্চয় করিতেন, গবর্ণর সাহেব, কলিকাতার ধনাগারে তাহা জমা লইয়া, লণ্ডন নগরে ডিরেক্টরদিগেব উপর সেই টাকার বরাত পাঠাইতেন। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল পণ্য প্রেরিত হইত, তৎসমুদয়ের বিক্রয় দ্বারা অর্থ সংগ্রহ ব্যতিরেকে, ডিরেক্টরদিগের ঐ হুণ্ডীর টাকা দিবার কোনও উপায় ছিল না। কলিকাতার গবর্ণর যথেষ্ট ধার করিতে লাগিলেন ; কিন্তু, পূর্ব অপেক্ষা ন্যূন পরিমাণে, পণ্যদ্রব্য পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন ; সুতরাং, ঐ সকল হুণ্ডীর টাকা দেওয়া ডিরেক্টবদিগের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। এজন্য, তাঁহারা কলিকাতাব গবর্ণরকে এই আজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন, আর এরূপ হুণ্ডী না পাঠাইয়া, এক বৎসর, কলিকাতাতেই টাকা ধার করিয়া, কার্য সম্পন্ন করিবে।

ইহাতে এই ফল হইল যে, সরকারী কর্মচারীরা, ফরাসি, ওলন্দাজ ও দিনামারদিগের দ্বারা, আপন আপন উপার্জিত অর্থ য়ুরোপে পাঠাইতে লাগিলেন ; অর্থাৎ চন্দননগর, চুঁচুড়া ও শ্রীরামপুরের ধনাগারে টাকা জমা করিয়া দিয়া, বিলাতের অন্যান্য কোম্পানির নামে হুণ্ডী লইতে আরম্ভ করিলেন। উক্ত সওদাগরেরা, ঐ সকল টাকায় পণ্যদ্রব্য কিনিয়া, য়ুরোপে পাঠাইতেন ; হুণ্ডীর মিয়াদ মধ্যেই, ঐ সমস্ত বস্তু তথায় পঁহুছিত ও বিক্রীত হইত। এই উপায় দ্বারা, ভারতবর্ষস্থ অন্যান্য য়ুরোপীয় বণিকদিগের টাকার অসঙ্গতি নিবন্ধন কোনও ক্লেশ ছিল না ; কিন্তু, ইংরেজ কোম্পানি যৎপরোনাস্তি ক্লেশে পড়িলেন। ডিরেক্টরেরা নিষেধ করিলেও, কলিকাতার গবর্ণর, অগত্যা পুনর্বার পূর্ববৎ ঋণ করিয়া, ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে, ইংলণ্ডে হুণ্ডী পাঠাইলেন, তাহাতে লণ্ডন নগরে কোম্পানির কার্য একবারে উচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়া উঠিল।

নজমউদ্দৌলা, ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে, নবাব হইয়াছিলেন। পর বৎসর তাঁহার মৃত্যু হইলে, সৈফউদ্দৌলা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েন। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে, বসন্ত-রোগে তাঁহার প্রাণান্ত হইলে, তদীয় ভ্রাতা মোবারিকউদ্দৌলা তৎপদে অধিরোহণ

করেন। তাঁহার পূর্বাধিকারীরা, আপন আপন ব্যয়ের নিমিত্ত, যত টাকা পাইতেন, কলিকাতার কৌন্সিলের সাহেবেরা তাঁহাকেও তাহাই দিতেন। কিন্তু ডিরেক্টরেরা, প্রতিবৎসর তাঁহাকে তত না দিয়া, ১৬ লক্ষ টাকা দিবার আদেশ করেন।

১৭৭০ খৃঃ অব্দে, ঘোরতর দুর্ভিক্ষ হওয়াতে, দেশ শূন্য হইয়া গিয়াছিল। উক্ত দুর্ঘটনার সময়, দরিদ্র লোকেরা, যে কি পর্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। এইমাত্র কহিলে এক প্রকার বোধগম্য হইতে পারিবেক যে, ঐ দুর্ভিক্ষে দেশের প্রায় তৃতীয় অংশ লোক কালগ্রাসে পতিত হয়। ঐ বৎসরেই, ডিরেক্টরদিগের আদেশ অনুসারে, মুরশিদাবাদে ও পাটনায়, কৌন্সিল অব রেবিনিউ অর্থাৎ রাজস্ব সমাজ স্থাপিত হয়। তাঁহাদের এই কর্ম নির্ধারিত হইয়াছিল যে, তাঁহারা রাজস্ব বিষয়ক তত্ত্বানুসন্ধান ও দাখিলার পরীক্ষা করিবেন। কিন্তু, রাজস্বের কার্যনির্বাহ, তৎকাল পর্যন্ত, দেশীয় লোকদিগের হস্তে ছিল। মহম্মদ রেজা খাঁ মুরশিদাবাদে, ও রাজা সিতাব রায় পাটনায়, থাকিয়া পূর্ববৎ কার্যনির্বাহ করিতেন। ভূমি সংক্রান্ত সমুদয় কাগজ পত্রে তাঁহাদের সহী ও মোহর চলিত।

বেরিলস্ট সাহেব, ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে, গবর্ণরীপদ পরিত্যাগ করাতে, কার্টিয়র সাহেব তৎপদে অধিরূঢ় হয়েন। কিন্তু, কলিকাতার গবর্ণমেণ্টের অকর্মণ্যতা প্রযুক্ত, কোম্পানির কার্য অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়া উঠে। ডিরেক্টরেরা, কুরীতিসংশোধন ও ব্যয়লাঘব করিবার নিমিত্ত, কলিকাতার পূর্ব গবর্ণর বান্সিটার্ট, স্ক্রাফটন, কর্নেল ফোর্ড, এই তিন জনকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু, তাঁহারা যে জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলেন, অন্তরীপ উত্তীর্ণ হইবার পর, আর উহার কোনও উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। সকলে অনুমান করেন, ঐ জাহাজ সমুদয় লোক সহিত সমুদ্রে মগ্ন হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কার্টিয়র সাহেব, ১৭৭২ খৃঃ অব্দে, গবর্ণরী পরিত্যাগ করিলে, ওয়ারন হেষ্টিংস সাহেব তৎপদে অধিরূঢ় হইলেন। হেষ্টিংস, ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে, রাজশাসন সংক্রান্ত কর্মে নিযুক্ত হইয়া, আঠার বৎসর বয়ঃক্রমকালে, এদেশে আইসেন; এবং গুরুতর পরিশ্রম সহকারে, এতদ্দেশীয় ভাষা ও রাজনীতি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে, ক্লাইব তাঁহাকে মুরশিদাবাদের রেসিডেণ্টের কর্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তৎকালে, গবর্ণরের পদ ভিন্ন, ইহা অপেক্ষা সম্মানের কর্ম আর ছিল না। যখন বান্সিটার্ট সাহেব কলিকাতার প্রধান পদ প্রাপ্ত হয়েন, তখন কেবল হেষ্টিংস তাঁহার বিশ্বাসপাত্র ছিলেন। ১৭৬১ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে, হেষ্টিংস কলিকাতার কৌন্সিলের মেম্বর হন। তৎকালে, অন্য সকল

মেম্বরই বার্ল্সিটাট সাহেবের প্রতিপক্ষ ছিলেন, তিনিই একাকী তাঁহার মতের পোষকতা করিতেন। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে, ডিরেক্টরেরা তাঁহাকে মান্দ্রাজ কৌন্সিলের দ্বিতীয় পদে অভিষিক্ত করেন; তিনি তথায় নানা সুনিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন; তজ্জন্য, ডিরেক্টরেরা তাঁহার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন। এক্ষণে, কলিকাতার গবর্ণরের পদ শূন্য হওয়াতে, তাঁহারা তাঁহাকে, সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া, ঐ পদে অভিষিক্ত করিলেন। তৎকালে, তাঁহার চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল।

দেশীয় লোকেরা যে রাজস্ব সংক্রান্ত সমুদায় বন্দোবস্ত করেন, ইহাতে ডিরেক্টরেরা অতিশয় বিরক্ত ছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, আয় ক্রমে অল্প হইতেছে। অতএব, দেওয়ানী প্রাপ্তির সাত বৎসর পরে, তাঁহারা যথার্থ দেওয়ান হওয়া, অর্থাৎ রাজস্বের বন্দোবস্তের ভার আপনাদের হস্তে লইয়া য়ুরোপীয় কর্মচারী দ্বারা কার্যনির্বাহ করা, মনস্থ করিলেন। এই নূতন নিয়ম হেস্টিংস সাহেবকে আসিয়াই প্রচলিত করিতে হইল। তিনি ১৩ই এপ্রিল, গবর্ণরের পদ গ্রহণ করিলেন। ১৪ই মে কৌন্সিলেব সম্মতি ক্রমে, এই ঘোষণা প্রচারিত হইল যে,'ইংরেজেরা স্বয়ং রাজস্বের কার্যনির্বাহ করিবেন; যে সকল য়ুরোপীয় কর্মচারীরা রাজস্বের কর্ম করিবেন, তাঁহাদের নাম কালেক্টর হইবেক; কিছু কালের নিমিত্ত, সমুদয় জমী ইজারা দেওয়া যাইবেক; আর, কৌন্সিলের চারিজন মেম্বর, প্রত্যেক প্রদেশে গিয়া, সমস্ত বন্দোবস্ত করিবেন। ইঁহারা, প্রথমে কৃষ্ণনগরে গিয়া, কার্যারম্ভ করিলেন। পূর্বাধিকারীরা, অত্যন্ত কম নিরিখে, মালগুজারী দিতে চাহিবাতে, তাঁহারা সমুদায় জমী নীলাম করাইতে লাগিলেন। যে জমীদার অথবা তালুকদার ন্যায্য মালগুজারী দিতে সম্মত হইলেন, তিনি আপন বিষয় পূর্ববৎ অধিকার করিতে লাগিলেন; আর, যিনি অত্যন্ত কম দিতে চাহিলেন, তাঁহাকে পেন্‌শন দিয়া, অধিকারচ্যুত করিয়া, তৎপরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে অধিকার দেওয়াইলেন। গবর্ণব স্বচক্ষে সমুদয় দেখিতে পারিবেন, এই অভিপ্রায়ে, মালের কাছারী মুবশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আনীত হইল।

এইরূপে রাজস্বকর্মের নিয়ম পরিবর্তিত হওয়াতে, দেশের দেওয়ানী ও ফৌজদারী কর্মেরও নিয়মপরিবর্ত আবশ্যক হইল। প্রত্যেক প্রদেশে, এক ফৌজদারী ও এক দেওয়ানী, দুই বিচারালয় সংস্থাপিত হইল। ফৌজদারী আদালতে কালেক্টর সাহেব, কাজী, মুফতি, এই কয়জন একত্র হইয়া বিচার করিতেন। আর, দেওয়ানী আদালতেও, কালেক্টর সাহেব মোকদ্দমা করিতেন, দেওয়ান ও অন্যান্য আমলারা তাঁহার সহকারিতা করিত। মোকদ্দমার আপীল শুনিবার নিমিত্ত, কলিকাতায় দুই বিচারালয় স্থাপিত হইল। তন্মধ্যে, যে স্থলে দেওয়ানী বিষয়ের বিচার হইত, তাহার নাম সদর দেওয়ানী আদালত, আর যে স্থানে ফৌজদারী বিষয়ের, তাহার নাম নিজামৎ আদালত, রহিল।

এ পর্যন্ত, আদালতে, যত টাকার মোকদ্দমা উপস্থিত হইল, প্রাড়্বিবাক তাহার চতুর্থ অংশ পাইতেন, এক্ষণে তাহা রহিত হইল ; অধিক জরিমানা রহিত হইয়া গেল ; মহাজনদিগের, স্বেচ্ছাক্রমে খাতককে রুদ্ধ করিয়া, টাকা আদায় করিবার যে ক্ষমতা ছিল, তাহাও নিবারিত হইল ; আর দশ টাকার অনধিক দেওয়ানী মোকদ্দমার নিষ্পত্তির ভার পরগণার প্রধান ভূম্যধিকারীর হস্তে অর্পিত হইল। ইংরেজেরা, আপনা-দিগের প্রণালী অনুসারে, বাঙ্গালার শাসন করিবার নিমিত্ত, প্রথমে এই সকল নিয়ম নির্ধারিত করিলেন।

ডিরেক্টরেরা স্থির করিয়াছিলেন যে, মহম্মদ রেজা খাঁর অসৎ আচরণ দ্বারাই, বাঙ্গালার রাজস্বের ক্ষতি হইতেছে। তাঁহার পদপ্রাপ্তির দিবস অবধি, তাঁহারা তাঁহার চরিত্র বিষয়ে সন্দেহ করিতেন। তাঁহারা ইহাও বিস্মৃত হয়েন নাই যে, যখন তিনি, মীরজাফরের রাজত্ব সময়ে, ঢাকার চাকলায় নিযুক্ত ছিলেন ; তখন, তথায় তাঁহার অনেক লক্ষ টাকা তহবীল ঘাটি হইয়াছিল। কেহ কেহ তাঁহার নামে এ অভিযোগও করিয়াছিল যে, তিনি, ১৭৭০ খৃঃ অব্দের দারুণ অকালের সময়, অধিকতর লাভের প্রত্যাশায়, সমুদায় শস্য একচাটিয়া করিয়াছিলেন। আর সকলে সন্দেহ করিত, তিনি অনেক রাজস্ব ছাপাইয়া রাখিয়াছিলেন, এবং প্রজাদিগেরও অধিক নিষ্পীড়ন করিয়াছিলেন।

যৎকালে তিনি মুরশিদাবাদে কর্ম করিতেন, তখন বাঙ্গালায় তিনি অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন ; নায়েব সুবাদার ছিলেন ; সুতরাং রাজস্বের সমুদয় বন্দোবস্তের ভার তাঁহার হস্তে ছিল ; আর নায়েব নাজিম ছিলেন, সুতরাং পুলিশেরও সমুদয় ভার তাঁহারই হস্তে ছিল। ডিরেক্টরেরা বুঝিতে পারিলেন, যত দিন তাঁহার হস্তে এরূপ ক্ষমতা থাকিবেক, কোনও ব্যক্তি তাঁহার দোষপ্রকাশে অগ্রসর হইতে পারিবেক না। অতএব তাঁহারা এই আজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন যে, মহম্মদ রেজা খাঁকে কয়েদ করিয়া সপরিবারে কলিকাতায় আনিতে, এবং তাঁহার সমুদয় কাগজপত্র আটক করিতে, হইবেক।

হেষ্টিংস সাহেব গবর্ণরের পদে অধিরূঢ় হইবার দশ দিবস পরেই, ডিরেক্টরদিগের এই আজ্ঞা তাঁহার নিকট পঁহুছে। যৎকালে ঐ আজ্ঞা পঁহুছিল, তখন অধিক রাত্রি হইয়া-ছিল ; এজন্য, সে দিবস তদনুযায়ী কার্য হইল না। পরদিন প্রাতঃকালে, তিনি, মহম্মদ রেজা খাঁকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত, মুরশিদাবাদের রেসিডেন্ট মিডিল্টন সাহেবকে পত্র লিখিলেন। তদনুসারে, রেজা খাঁ, সপরিবারে, জলপথে, কলিকাতায় প্রেরিত হইলেন। মিডিল্টন সাহেব তাঁহার কার্যের ভার গ্রহণ করিলেন। রেজা খাঁ চিতপুরে উপস্থিত হইলে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, অকস্মাৎ এরূপ ঘটিবার কারণ জানাইবার নিমিত্ত, একজন কৌন্সিলের মেম্বার তাঁহার নিকটে প্রেরিত হইলেন। আর, হেষ্টিংস সাহেব এইরূপ পত্র লিখিলেন, আমি কোম্পানির ভৃত্য, আমাকে তাঁহাদের

আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইয়াছে ; নতুবা, আপনকার সহিত আমার যেরূপ সৌহৃদ্য আছে, তাহার কোনও ব্যতিক্রম হইবেক না, জানিবেন।

বিহারের নায়েব দেওয়ান রাজা সিতাব রায়েরও চরিত্র বিষয়ে সন্দেহ জন্মিয়াছিল ; এজন্য, তিনিও কলিকাতায় আনীত হইলেন। তাঁহার পরীক্ষা অল্প দিনেই সমাপ্ত হইল। পরীক্ষায় তাঁহার কোনও দোষ পাওয়া গেল না ; অতএব তিনি মান পূর্বক বিদায় পাইলেন। তৎকালীন মুসলমান ইতিহাস লেখক, সরকারী কার্যের নির্বাহ বিষয়ে, তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন ; কিন্তু ইহাও লিখিয়াছেন, প্রধানপদারূঢ় অন্যান্ত লোকের ন্যায়, তিনিও, অন্যায় আচরণপূর্বক, প্রজাদিগের নিকট অধিক ধন গ্রহণ করিতেন।

অপরাধী বোধ করিয়া কলিকাতায় আনয়ন করাতে, তাঁহার যে অমর্যাদা হইয়াছিল, তাহার প্রতিবিধানার্থে, কিছু পারিতোষিক দেওয়া উচিত বোধ হওয়াতে, কৌন্সিলের সাহেবেরা তাঁহাকে এক মর্যাদাসূচক পরিচ্ছদ পুরস্কার দিলেন এবং বিহারের রায় রাইয়াঁ করিলেন। কিন্তু, অপরাধিবোধে কলিকাতায় আনয়ন করাতে, তাঁহাব যে অপমানবোধ হইয়াছিল, তাহাতে তিনি একবারে ভগ্নচিত্ত হইলেন। ইংরেজেরা, এ পর্যন্ত এতদ্দেশীয় যত লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাঁহারা রাজা সিতাব রায়েব সর্বদা সবিশেষ গৌরব করিতেন। তিনি এরূপ তেজস্বী ছিলেন যে, অপবাধিবোধে অধিকারচ্যুত করা, কয়েদ করিয়া কলিকাতায় আনা, এবং দোষের আশঙ্কা কবিয়া পরীক্ষা করা, এই সকল অপমান তাঁহার অত্যন্ত অসহ্য হইয়াছিল। ফলতঃ, পাটনা প্রতিগমন করিয়া, ঐ মনঃপীড়াতেই তিনি প্রাণত্যাগ কবিলেন। তাঁহার পুত্র রাজা কল্যাণ সিংহ তদীয় পদে অভিষিক্ত হইলেন। পাটনা প্রদেশে, উৎকৃষ্ট দ্রাক্ষাফলের নিমিত্ত, যে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, রাজা সিতাব রায়ই তাহাব আদিকারণ। তাঁহার উদ্যোগেই, ঐ প্রদেশে, দ্রাক্ষা ও খরমুজের চাষ আরব্ধ হয়।

মহম্মদ রেজা খাঁর পরীক্ষায় অনেক সময় লাগিয়াছিল। নন্দকুমার তাঁহার দোষোদ্ঘাটক নিযুক্ত হইলেন। প্রথমতঃ স্পষ্টবোধ হইয়াছিল, অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ সপ্রমাণ হইবেক। কিন্তু, দ্বৈবার্ষিক বিবেচনার পর, নির্ধারিত হইল, মহম্মদ রেজা খাঁ নির্দোষ হইলেন বটে, কিন্তু আর পূর্ব কর্ম প্রাপ্ত হইলেন না।

নিজামতে মহম্মদ রেজা খাঁর যে কর্ম ছিল, তিনি পদচ্যুত হইলে পর, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হইল। নবাবকে শিক্ষা দেওয়ার ভার মণিবেগমের হস্তে অর্পিত হইল ; আর, সমুদয় ব্যয়ের তত্ত্বাবধানার্থে, হেস্টিংস সাহেব, নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাসকে নিযুক্ত করিলেন। কৌন্সিলের অধিকাংশ মেম্বর এই নিয়োগ বিষয়ে বিস্তর আপত্তি করিলেন, কহিলেন, গুরুদাস নিতান্ত বালক, তাহাকে নিযুক্ত করায়, তাহার পিতাকে নিযুক্ত

করা হইতেছে ; কিন্তু, তাহার পিতাকে কখনও বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। হেষ্টিংস তাঁহাদের পরামর্শ না শুনিয়া, গুরুদাসকেই নিযুক্ত করিলেন।

এই সময়ে, ইংলণ্ডে কোম্পানির বিষয়কর্ম অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও উচ্ছিন্ন প্রায় হইয়াছিল। ১৭৬৭ সালে লার্ড ক্লাইবের প্রস্থান অবধি. ১৭৭২ সালে হেষ্টিংসের নিয়োগ পর্যন্ত, পাঁচ বৎসর ভারতবর্ষে যেমন ঘোরতর বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, ইংলণ্ডের ডিরেক্টরদিগের কার্যও তেমনই বিশৃঙ্খল হইয়াছিল। যৎকালে কোম্পানির দেউলিয়া হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, তাদৃশ সময়ে ডিরেক্টরেরা মূলধনের অধিকারীদিগকে, শতকরা সাড়ে বার টাকার হিসাবে, মুনাফার অংশ দিলেন। যদি তাঁহাদের কার্যের বিলক্ষণ উন্নতি থাকিত, তথাপি তদ্রূপ মুনাফা দেওয়া, কোনও মতে, উচিত হইত না। যাহা হউক, এইরূপ পাগলামি করিয়া, ডিরেক্টরেরা দেখিলেন, ধনাগারে এক কপর্দকও সম্বল নাই। তখন তাঁহাদিগকে, ইংলণ্ডের বেঙ্কে, প্রথমতঃ চল্লিশ লক্ষ, তৎপরে আর বিশ লক্ষ, টাকা ধার করিতে হইল। পরিশেষে, রাজমন্ত্রীর নিকটে গিয়া, তাঁহাদিগকে এক কোটি টাকা ধার চাইতে হইয়াছিল।

এ পর্যন্ত, পার্লিমেণ্টের অধ্যক্ষেরা, ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন নাই। কিন্তু, এক্ষণে কোম্পানির বিষয়কর্মের এবম্প্রকার দুরবস্থা প্রকাশিত হওয়াতে, তাঁহারা সমুদায় ব্যাপার আপনাদের হস্তে আনিতে মনন করিলেন। কোম্পানির শাসনে যে সকল অন্যায় আচরণ হইয়াছিল, তাহার পরীক্ষার্থে এক কমিটী নিয়োজিত হইল। ঐ কমিটী বিজ্ঞাপনী প্রদান করিলে, রাজমন্ত্রীরা বুঝিতে পারিলেন, সম্পূর্ণরূপে নিয়ম-পরিবর্ত না হইলে, কোম্পানির পরিত্রাণের উপায় নাই। তাঁহারা, সমস্ত দোষের সংশোধনার্থে, পার্লিমেণ্টে নানা প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। ডিরেক্টরেরা তদ্বিষয়ে, যত দূব পারেন, আপত্তি করিলেন ; কিন্তু, তাঁহাদের অসদাচরণ এত স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল, ও তাহাতে মনুষ্য মাত্রেরই এমন ঘৃণা জন্মিয়াছিল যে, পার্লিমেণ্টের অধ্যক্ষেরা, তাঁহাদের সমস্ত আপত্তির উল্লঙ্ঘন করিয়া, রাজমন্ত্রীর প্রস্তাবিত প্রণালীরই পোষকতা করিলেন।

অতঃপর, ভারতবর্ষীয় রাজকর্মের সমুদয় প্রণালী, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয় স্থানেই, পরিবর্তিত হইল। ডিরেক্টর মনোনীত করণের প্রণালীও কিয়ৎ অংশে পরিবর্তিত হইল। ইংলণ্ডে কোম্পানির কার্যে যে সমস্ত দোষ ঘটিয়াছিল, ইহা দ্বারা তাহার অনেক সংশোধন হইল। ইহাও আদিষ্ট হইল যে, প্রতি বৎসর, ছয় জন ডিরেক্টরকে পদ ত্যাগ করিতে হইবেক, এবং তাঁহাদের পরিবর্তে, আর ছয়জনকে মনোনীত করা যাইবেক। আর, ইহাও আদিষ্ট হইল যে, বাঙ্গালার গবর্ণর ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইবেন, অন্যান্য রাজধানীর রাজনীতিঘটিত যাবতীয় ব্যাপার তাঁহার অধীনে থাকিবেক। গবর্ণর

ও কৌন্সিলের মেম্বরদিগের ক্ষমতা বিষয়ে, সর্বদা বিবাদ উপস্থিত হইত ; অতএব নিয়ম হইল, গবর্ণর জেনেরল ফোর্ট উইলিয়মের একমাত্র গবর্ণর ও সেনানী হইবেন। গবর্ণর জেনেরল, কৌন্সিলের মেম্বর, ও জজদিগের বাণিজ্য নিষিদ্ধ হইল। এজন্য, গবর্ণর জেনেরলের আড়াই লক্ষ, ও কৌন্সিলের মেম্বরদিগের আশী হাজার টাকা, বার্ষিক বেতন নির্ধারিত হইল। ইহাও আজ্ঞপ্ত হইল যে, কোম্পানির অথবা রাজার কার্যে নিযুক্ত কোনও ব্যক্তি উপঢৌকন লইতে পারিবেন না। আর, ডিরেক্টরদিগের প্রতি আদেশ হইল যে, ভারতবর্ষ হইতে রাজশাসন সংক্রান্ত যে সকল কাগজপত্র আসিবেক, সে সমুদয় তাঁহারা রাজ-মন্ত্রিগণের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন। বিচারনির্বাহ বিষয়ে, এই নিয়ম নির্ধারিত হইল যে, কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট নামে এক বিচারালয় স্থাপিত হইবেক। তথায়, বার্ষিক অশীতি সহস্র মুদ্রা বেতনে, একজন চীফ জষ্টিস, অর্থাৎ প্রধান বিচারকর্তা, ও ষষ্টি সহস্র মুদ্রা বেতনে, তিন জন পিউনি জজ, অর্থাৎ কনিষ্ঠ বিচারকর্তা থাকিবেন। এই জজেরা কোম্পানির অধীন হইবেন না, রাজা স্বয়ং তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিবেন। আর, ঐ ধর্মাধিকরণে, ইংলণ্ডীয় ব্যবহারসংহিতা অনুসারে, ব্রিটিশ সব্জেক্ট-দিগের বিবাদ নিষ্পত্তি করা যাইবেক। পরিশেষে, এই অনুমতি হইল যে, ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কার্যের নির্বাহ বিষয়ে, পার্লিমেণ্টের অধ্যক্ষেরা প্রথম এই যে নিয়ম নির্ধারিত করিলেন, ১৭৭৪ সালে, ১লা আগষ্ট, তদনুযায়ী কার্যারম্ভ হইবেক।

হেষ্টিংস সাহেব, বাঙ্গালার রাজকার্যনির্বাহ বিষয়ে, সবিশেষ ক্ষমতাপ্রকাশ করিয়াছিলেন ; এজন্য, তিনি গবর্ণর জেনেরলের পদ প্রাপ্ত হইলেন। সুপ্রীম কৌন্সিলে তাঁহার সহিত রাজকার্যের পর্যালোচনার্থে, চারিজন মেম্বর নিযুক্ত হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে, বারওয়েল সাহেব, বহুকাল অবধি, এতদ্দেশে রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন ; আর, কর্ণেল মন্সন, সর জন ক্লবরিং ও ফ্রান্সিস সাহেব, এই তিন জন, ইহার পূর্বে, কখনও এদেশে আইসেন নাই।

হেষ্টিংস, এই তিন নূতন মেম্বরের মান্দ্রাজে পঁহুছিবার সংবাদ শ্রবণ মাত্র, তাঁহাদিগকে এক অনুরাগসূচক পত্র লিখিলেন, তাঁহারা খাজরীতে পঁহুছিলে, কৌন্সিলের প্রধান মেম্বরকে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাঠাইলেন, এবং তাঁহার একজন নিজ পারিষদও, স্বাগতজিজ্ঞাসার্থে, প্রেরিত হইলেন। কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলে, তাঁহাদের যেরূপ সমাদর হইয়াছিল, লার্ড ক্লাইব ও বান্সিটার্ট সাহেবেরও সেরূপ হয় নাই। আসিবা মাত্র, সতরটা সেলামী তোপ হয় ও তাঁহাদের সংবর্ধনা করিবার নিমিত্ত, কৌন্সিলের সমুদয় মেম্বর একত্র হন। তথাপি তাঁহাদের মন উঠিল না।

তাঁহারা ডিরেক্টরদিগের নিকট এই অভিযোগ করিয়া পাঠাইলেন, আমরা সমুচিত সমাদর প্রাপ্ত হই নাই ; আমাদের সংবর্ধনা করিবার নিমিত্ত, সৈন্য বহিষ্কৃত করা যায়

নাই ; সেলামী তোপও উপযুক্ত সংখ্যায় হয় নাই, আমাদের সংবর্ধনা কৌন্সিলগৃহে না করিয়া, হেষ্টিংসের বাটীতে করা হইয়াছিল ; আর আমরা যে নূতন গবর্ণমেণ্টের অবয়ব স্বরূপ আসিয়াছি, উপযুক্ত সমারোহপূর্বক, তাহার ঘোষণা করা হয় নাই।

২০শে অক্টোবর, কৌন্সিলের প্রথম সভা হইল ; কিন্তু বারওয়েল সাহেব তখন পর্যন্ত না পঁহুছিবাতে, সে দিবস কেবল নূতন গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা মাত্র হইল ; অন্যান্য সমুদয় কর্ম, আগামী সোমবার ২৪শে তারিখে বিবেচনার নিমিত্ত, রহিল। নূতন মেম্বরেরা ভারতবর্ষের কার্য কিছুই অবগত ছিলেন না ; অতএব, সভার আরম্ভ হইলেঁ, হেষ্টিংস সাহেব কোম্পানির সমুদয় কার্য যে অবস্থায় চলিতেছিল, তাহার এক সবিশেষ বিবরণ তাঁহাদের সম্মুখে ধরিলেন। কিন্তু, প্রথম সভাতেই, এমন বিবাদ উপস্থিত হইল যে, ভারতবর্ষের রাজশাসন, তদবধি প্রায় সাত বৎসর পর্যন্ত, অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়াছিল। বারওয়েল সাহেব একাকী গবর্ণর জেনেরলের পক্ষে ছিলেন ; অন্য তিন মেম্বর, সকল বিষয়ে, সর্বদা, তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষেই মত দিতেন। তাঁহাদের সংখ্যা অধিক ; সুতরাং, গবর্ণব জেনেরল কেবল সাক্ষিগোপাল হইলেন ; কাবণ, যে স্থলে বহুসংখ্যক ব্যক্তিব উপর কোনও বিষয়ের ভার থাকে, তথায় মতভেদ হইলে, অধিকাংশ ব্যক্তির মত-অনুসারেই, সমস্ত কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, সমস্ত ক্ষমতা তাঁহাদের হস্তেই পতিত হইল। তাঁহাদের ভারতবর্ষে আসিবার পূর্বে, হেষ্টিংস এতদ্দেশে যে সকল ঘোরতর অত্যাচার ও অন্যায়াচবণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তৎসমুদায় সবিশেষ অবগত ছিলেন, এবং হেষ্টিংসকে অতি অপকৃষ্ট লোক স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন ; এজন্য, হেষ্টিংস যাহা কহিতেন, ন্যায় অন্যায় বিবেচনা না করিয়া, এক বারে তাহা অগ্রাহ্য করিতেন ; সুতরাং, তাঁহারা যে রাগদ্বেষশূন্য হইয়া কার্য করিবেন, তাহাব সম্ভাবনা ছিল না।

হেষ্টিংস সাহেব, কিয়ৎ দিবস পূর্বে, মিডিল্টন সাহেবকে লক্ষ্ণৌ রাজধানীতে বেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছিলেন ; এক্ষণে, নূতন মেম্বররা তাঁহাকে, সে কর্ম পরিত্যাগ করিয়া, কলিকাতায় আসিতে আজ্ঞা দিলেন, আব, হেষ্টিংস সাহেব নবাবের সহিত যে সকল বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, সে সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া, তাঁহার নিকট নূতন বন্দোবস্তের প্রস্তাব কবিয়া পাঠাইলেন। হেষ্টিংস তাঁহাদিগকে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিলেন, এবং কহিলেন, এরূপ হইলে সর্বত্র প্রকাশ হইবেক যে, গবর্ণমেণ্ট মধ্যে অনৈক্য উপস্থিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় লোকেরা গবর্ণরকে গবর্ণমেণ্টের প্রধান বিবেচনা করিয়া থাকে ; এক্ষণে, তাঁহাকে এরূপ ক্ষমতাশূন্য দেখিলে, সহজে বোধ করিতে পারে যে, বাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু, ফ্রান্সিস ও তৎপক্ষীয়েরা, রোষ ও দ্বেষের বশবর্তী হইয়া, তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না।

দেশীয় লোকেরা, অল্প কাল মধ্যে, কৌন্সিলের এবংবিধ বিবাদের বিষয় অবগত হইলেন,

এবং ইহাও জানিতে পারিলেন, হেষ্টিংস সাহেব এত কাল সকলের প্রধান ছিলেন, এক্ষণে আর তাঁহার কোনও ক্ষমতা নাই। অতএব, যে সকল লোক তৎকৃত কোনও কোনও ব্যাপারে অসন্তুষ্ট ছিল, তাহারা, ফ্রান্সিস ও তৎপক্ষীয় মেম্বরদিগের নিকট, তাঁহার নামে অভিযোগ করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহারাও আন্তরিক যত্ন ও উৎসাহ সহকারে, তাহাদের অভিযোগ গ্রাহ্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময়েই, বর্ধমানের অধিপতি মৃত তিলকচন্দ্রের বনিতা, স্বীয় তনয়কে সমভিব্যাহারে করিয়া, কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। তিনি এই আবেদনপত্র প্রদান করিলেন, আমি রাজার মৃত্যুর পর, কোম্পানির ইংরেজ ও দেশীয় কর্মচারীদিগকে নয় লক্ষ টাকা উৎকোচ দিয়াছি, তন্মধ্যে হেষ্টিংস সাহেব ১৫০০০ টাকা লইয়াছিলেন। হেষ্টিংস বাঙ্গালা পারসীতে হিসাব দেখিতে চাহিলেন ; কিন্তু রাণী কিছুই দেখাইলেন না। কোনও ব্যক্তিকে সম্মান দান করা এ পর্যন্ত গবর্ণমেণ্টের প্রধান ব্যক্তির অধিকার ছিল ; কিন্তু হেষ্টিংসের বিপক্ষেরা, তাঁহাকে তুচ্ছ করিয়া, আপনারা শিশুরাজাকে খেলাত দিলেন।

অতি শীঘ্র শীঘ্র, হেষ্টিংসের নামে ভূরি ভূরি অভিযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। এক-জন এই বলিয়া দরখাস্ত দিল যে, হুগলীর ফৌজদার বৎসরে ৭২০০০ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন, তন্মধ্যে তিনি হেষ্টিংস সাহেবকে ৩৬০০০ ও তাঁহার দেওয়ানকে ৪০০০ টাকা দেন। আমি বার্ষিক, ৩২০০০ টাকা পাইলেই, ঐ কর্ম সম্পন্ন করিতে পারি। উপস্থিত অভিযোগ গ্রাহ্য করিয়া, সাক্ষ্য লওয়া গেল। হেষ্টিংসের বিপক্ষ মেম্বরেরা কহিলেন, যথেষ্ট প্রমাণ হইয়াছে। তদনুসারে, ফৌজদার পদচ্যুত হইলেন। অন্য এক ব্যক্তি, ন্যূন বেতনে, ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন ; কিন্তু অভিযোক্তার কিছুই হইল না।

এক মাস অতীত না হইতেই, আর এই এক অভিযোগ উপস্থিত হইল, মণিবেগম নয় লক্ষ টাকার হিসাব দেন নাই। পীড়াপীড়ি করাতে, বেগম কহিলেন, হেষ্টিংস সাহেব যখন আমাকে নিযুক্ত করিতে আইসেন, আমোদ উপলক্ষে ব্যয় করিবার নিমিত্ত, তাঁহাকে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা উৎকোচ দিয়াছি। হেষ্টিংস কহিলেন, আমি ঐ টাকা লইয়াছি বটে, কিন্তু সরকারী হিসাবে খরচ করিয়া কোম্পানির দেড় লক্ষ টাকা বাঁচাইয়াছি। হেষ্টিংস সাহেবের এই হেতুবিন্যাস কাহারও মনোনীত হইল না।

এক্ষণে স্পষ্ট দৃষ্ট হইল, অভিযোগ করিলেই গ্রাহ্য হইতে পারে। এই সুযোগ দেখিয়া, নন্দকুমার হেষ্টিংসের নামে এই অভিযোগ উপস্থিত করিলেন যে, গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর, সাড়ে তিন লক্ষ টাকা লইয়া, মণিবেগমকে ও আমার পুত্র গুরুদাসকে, মুরশিদাবাদে নবাবের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যে, নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ফ্রান্সিস ও তৎপক্ষীয়েরা প্রস্তাব করিলেন, সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত, নন্দকুমারকে কৌন্সিলের সম্মুখে আনীত করা যাউক। হেষ্টিংস উত্তর করিলেন, আমি যে সভায় অধিপতি, তথায় আমার অভি-

যোক্তাকে আসিতে দিব না, বিশেষতঃ এমন বিষয়ে অপদার্থ ব্যক্তির ন্যায় সম্মত হইয়া গবর্ণর জেনেরলের পদের অমর্যাদা করিব না; এই সমস্ত ব্যাপার সুপ্রীম কোর্টে প্রেরণ করা যাউক। ইহা কহিয়া, হেষ্টিংস, গাত্রোত্থান করিয়া, কৌন্সিলগৃহ হইতে চলিয়া গেলেন; বারওয়েল সাহেবও তাঁহার অনুগামী হইলেন।

তাঁহাদের প্রস্থানের পর, ফ্রান্সিস ও তৎপক্ষীয়েরা নন্দকুমারকে কৌন্সিলগৃহে আহ্বান করিলে, তিনি এক পত্র পাঠ করিয়া কহিলেন, মণিবেগম যখন যাহা ঘুস দিয়াছেন, তদ্বিষয়ে এই পত্র লিখিয়াছেন। কিছু দিন পূর্বে, বেগম গবর্ণমেণ্টে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, সর জন ডাইলি সাহেব, নন্দকুমারের পঠিত পত্রের সহিত মিলাইবার নিমিত্ত, ঐ পত্র বাহির করিয়া দিলেন। মোহর মিলিল, হস্তাক্ষরের ঐক্য হইল না। যাহা হউক, কৌন্সিলের মেম্বরেরা নন্দকুমারের অভিযোগ যথার্থ বলিয়া স্থির করিলেন এবং হেষ্টিংসকে ঐ টাকা ফিরিয়া দিতে কহিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে কোনও মতে সম্মত হইলেন না।

এই বিষয়ের নিষ্পত্তি না হইতেই, হেষ্টিংস নন্দকুমারের নামে, চক্রান্তকারী বলিয়া, সুপ্রীম কোর্টে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। এই অভিযোগের কিছু দিন পরেই, কামালউদ্দীন নামে একজন মুসলমান এই অভিযোগ উপস্থিত করিল, নন্দকুমার এক কাগজে আমার নাম জাল করিয়াছেন। সুপ্রীম কোর্টের জজেরা, উক্ত অভিযোগ গ্রাহ্য করিয়া, নন্দকুমারকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। ফ্রান্সিস ও তৎপক্ষীয়েরা জজদিগের নিকট বারংবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, জামীন লইয়া নন্দকুমারকে কারাগার হইতে মুক্ত করিতে হইবেক। কিন্তু জজেরা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন পূর্বক তাহা অস্বীকার করিলেন। বিচারের সময় উপস্থিত হইলে, জজেরা ধর্মাসনে অধিষ্ঠান করিলেন; জুরীরা নন্দকুমারকে দোষী নির্ধারিত করিয়া দিলেন; জজেরা নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন। তদনুসারে, ১৭৭৫ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে, তাঁহার ফাঁসি হইল।

যে দোষে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারে, নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড হইল, তাহা যদি তিনি যথার্থই করিয়া থাকেন, সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইবার ছয় বৎসর পূর্বে করিয়াছিলেন; সুতরাং, তৎসংক্রান্ত অভিযোগ, কোনও ক্রমে, সুপ্রীম কোর্টের গ্রাহ্য ও বিচার্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ যে আইন অনুসারে এই সুবিচার হইল, ন্যায়পরায়ণ হইলে, প্রধান জজ সর ইলাইজা ইম্পি, কদাচ উপস্থিত ব্যাপারে, ঐ আইনের মর্ম অনুসারে, কর্ম করিতেন না। কারণ, ঐ আইন ভারতবর্ষীয় লোকদিগের বিষয়ে প্রচলিত হইবেক বলিয়া নির্দিষ্ট হয় নাই। ফলতঃ নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড ন্যায়মার্গ অনুসারে বিহিত হইয়াছে, ইহা কোনও ক্রমে প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

এতদ্দেশীয় লোকেরা, এই অভূতপূর্ব ব্যাপার দর্শনে, এক বারে হতবুদ্ধি হইলেন, কলিকাতাবাসী ইংরেজেরা প্রায় সকলেই গবর্ণর জেনেরলের পক্ষ ও তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন ; তাঁহারও, অবিচারে নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি আক্ষেপ ও বিরাগপ্রদর্শন করিয়াছিলেন।

নন্দকুমার এতদ্দেশের একজন অতি প্রধান লোক ছিলেন। ইংরেজদিগের সৌভাগ্যদশা উদিত হইবার পূর্বে, তাঁহার এরূপ আধিপত্য ছিল যে, ইংরেজেরাও বিপদ পড়িলে, সময়ে সময়ে, তাঁহার আনুগত্য করিতেন ও শরণাগত হইতেন। নন্দকুমার দুরাচার ছিলেন, যথার্থ বটে ; কিন্তু, ইম্পি ও হেষ্টিংস তাঁহা অপেক্ষা অধিক দুরাচার, তাহার সন্দেহ নাই। . . .

নন্দকুমার, হেষ্টিংসের নামে, নানা অভিযোগ উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস দেখিলেন, নন্দকুমার জীবিত থাকিতে তাঁহার ভদ্রস্থতা নাই ; অতএব, যে কোনও উপায়ে, উঁহার প্রাণবধ করা নিতান্ত আবশ্যক। তদনুসারে, কামালউদ্দীনকে উপলক্ষ করিয়া, সুপ্রীম কোর্টে পূর্বোক্ত অভিযোগ উপস্থিত করেন। ধর্মাসনারূঢ় ইম্পি, গবর্ণর জেনেরলের পদারূঢ় হেষ্টিংসের পরিতোষার্থে, এক বারেই ধর্মাধর্মজ্ঞান ও ন্যায় অন্যায় বিবেচনায় শূন্য হইয়া, নন্দকুমারের প্রাণবধ করিলেন। হেষ্টিংস, তিন চারি বৎসর পরে, এক পত্র লিখিয়াছিলেন ; তাহাতে ইম্পিকৃত এই মহোপকারের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছিল। ঐ পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল, এক সময়ে, ইম্পির আনুকূল্যে, আমার সৌভাগ্য ও সম্ভ্রম রক্ষা পাইয়াছে। এই লিখন দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইতে পারে, নন্দকুমার হেষ্টিংসেব নামে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন, সে সমস্ত অমূলক নহে ; আর, সুপ্রীম কোর্টের অবিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড না হইলে, তিনি সে সমুদায় সপ্রমাণও করিয়া দিতেন, সেই ভয়েই হেষ্টিংস ইম্পির সহিত পরামর্শ করিয়া, নন্দকুমারের প্রাণবধসাধন করেন।

মহম্মদ রেজা খাঁর পরীক্ষার ফলিতার্থের সংবাদ ইংলণ্ডে পঁহুছিলে, ডিরেক্টরেরা কহিলেন, আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, মহম্মদ রেজা খাঁ সম্পূর্ণ নিরপরাধ। অতএব, তাঁহারা, নবাবের সাংসারিক কর্ম হইতে গুরুদাসকে বহিষ্কৃত করিয়া, তৎপদে মহম্মদ রেজা খাঁকে নিযুক্ত করিতে আদেশপ্রদান করিলেন।

সুপ্রীম কৌন্সিলের সাহেবেরা দেখিলেন, তাঁহাদের এমন অবসর নাই যে, কলিকাতা সদর নিজামত আদালতে স্বয়ং অধ্যক্ষতা করিতে পারেন। এজন্য, পূর্বপ্রণালী অনুসারে, পুনর্বার ফৌজদারী আদালত ও পুলিসের ভার একজন দেশীয় লোকের হস্তে সমর্পিত করিতে মানস করিলেন। তদনুসারে ঐ আদালত কলিকাতা হইতে মুরশিদাবাদে নীত হইল, এবং মহম্মদ রেজা খাঁ তথাকার প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

সপ্তম অধ্যায়

ক্রমে ক্রমে রাজস্বের বৃদ্ধি হইতে পারিবেক, এই অভিপ্রায়ে, ১৭৭২ সালে, পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত, জমি সকল ইজারা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম বৎসরেই দৃষ্ট হইল, জমিদারেরা যত কর দিতে সমর্থ, তাহার অধিক ইজারা লইয়াছেন। খাজানা, ক্রমে ক্রমে, বিস্তর বাকী পড়িল। ফলতঃ, এই পাঁচ বৎসরে, এক কোটি আঠার লক্ষ টাকা রেহাই দিয়াও, ইজারাদারদিগের নিকট এক কোটি বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব বাকী রহিল; তন্মধ্যে অধিকাংশেরই আদায় হইবার সম্ভাবনা ছিল না। অতএব, কৌন্সিলের উভয় পক্ষীয়েরাই, নূতন বন্দোবস্তের নিমিত্ত, এক এক প্রণালী প্রস্তুত করিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু ডিরেক্টরেরা উভয়ই অগ্রাহ্য করিলেন। ১৭৭৭ সালে পাট্টার মিয়াদ গত হইলে, ডিরেক্টরেরা, এক বৎসরের নিমিত্ত, ইজারা দিতে আজ্ঞা করিলেন। এইরূপ বৎসরে বৎসরে ইজারা দিবার নিয়ম, ১৭৮২ সাল পর্যন্ত, প্রবল ছিল।

১৭৭৬ সালে, সেপ্টেম্বর মাসে, কর্ণেল মন্সন সাহেবের মৃত্যু হইল; সুতরাং, তাঁহার পক্ষের দুইজন মেম্বর অবশিষ্ট থাকাতে, হেষ্টিংস সাহেব কৌন্সিলে পুনর্বার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন; কারণ, সমসংখ্যক স্থলে, গবর্ণর জেনেরলের মতই বলবৎ হইত।

১৭৭৮ সালের শেষ ভাগে, নবাব মুবারিকউদ্দৌলা, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, এই প্রার্থনায় কলিকাতার কৌন্সিলে পত্র লিখিলেন যে, মহম্মদ রেজা খাঁ আমার সহিত সর্বদা কর্কশ ব্যবহার করেন; অতএব, ইঁহাকে স্থানান্তরিত করা যায়। তদনুসারে, হেষ্টিংস সাহেবের মতক্রমে, তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া, নায়েব সুবাদারের পদ রহিত করা গেল, এবং নবাবের রক্ষণাবেক্ষণ এবং আয় ও ব্যয়ের পর্যবেক্ষণ কার্যের ভার মণিবেগমের হস্তে অর্পিত হইল। ডিরেক্টরেরা এই বন্দোবস্তে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং অতি ত্বরায় এই আদেশ পাঠাইলেন, নায়েব সুবাদারের পদ পুনর্বার স্থাপিত করিয়া, তাহাতে মহম্মদ রেজা খাঁকে নিযুক্ত ও মণিবেগমকে পদচ্যুত, করা যায়।

১৭৭৮ খৃঃ অব্দে, বাঙ্গালা অক্ষরে সর্বপ্রথম এক পুস্তক মুদ্রিত হয়। অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি সম্পন্ন হালহেড সাহেব, সিবিল কর্মে নিযুক্ত হইয়া, ১৭৭০ খৃঃ অব্দে, এতদ্দেশে আসিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি যেরূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন, পূর্বে কোনও য়ুরোপীয় সেরূপ শিখিতে পারেন নাই। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে, রাজকার্যনির্বাহের ভার য়ুরোপীয় কর্মচারীদিগের হস্তে অর্পিত হইলে হেষ্টিংস সাহেব বিবেচনা করিলেন, এতদ্দেশীয় ব্যবহারশাস্ত্রে তাঁহাদের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। পরে, তদীয় আদেশে ও আনুকূল্যে, হালহেড সাহেব, হিন্দু ও মুসলমানদিগের সমুদয় ব্যবহারশাস্ত্র দৃষ্টে, ইংরেজী ভাষাতে এক গ্রন্থ সঙ্কলিত করেন। ঐ গ্রন্থ, ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে, মুদ্রিত হয়। তিনি

সাতিশয় পরিশ্রম সহকারে, বাঙ্গালা ভাষা শিখিয়াছিলেন ; এবং বোধ হয়, ইংরেজদের মধ্যে, তিনিই প্রথমে এই ভাষায় বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে, তিনি বাঙ্গালাভাষায় এক ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন। উহাই সর্বপ্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ। তৎকালে রাজধানীতে ছাপার যন্ত্র ছিল না ; উক্ত গ্রন্থ হুগলীতে মুদ্রিত হইল। বিখ্যাত চার্লস উইল্কিন্স সাহেব এদেশের নানা ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি অতিশয় শিল্পদক্ষ ও বিলক্ষণ উৎসাহশালী ছিলেন। তিনিই সর্বাগ্রে, স্বহস্তে খুদিয়া ও ঢালিয়া, বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করেন। ঐ অক্ষরে তাঁহার বন্ধু হালহেড সাহেবের ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়।

সুপ্রীম কোর্ট নামক বিচাবালয়ের সহিত গবর্ণমেণ্টের বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে, অনেক বৎসর পর্যন্ত, দেশের পক্ষে অনেক অমঙ্গল ঘটিয়াছিল। ঐ বিচারালয়, ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে, স্থাপিত হয়, কোম্পানির রাজশাসনের সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক ছিল না। ভারতবর্ষে আসিবার সময়, জজদের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, প্রজাদিগের উপব ঘোরতর অত্যাচার হইতেছে ; সুপ্রীম কোর্ট তাহাদের ক্লেশনিবারণেব একমাত্র উপায়। তাঁহারা, চাঁদপাল ঘাটে, জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন, দেশীয় লোকেরা রিক্ত পদে গমনাগমন করিতেছে। তখন তাঁহাদের মধ্যে একজন কহিতে লাগিলেন, দেখ ভাই। প্রজাদের ক্লেশের পরিসীমা নাই ; আবশ্যক না হইলে আর সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয় নাই। আমি সাহস করিয়া বলিতেছি, আমাদের কোর্ট ছয়মাস চলিলেই, এই হতভাগ্যদিগকে জুতা ও মোজা পরাইতে পারিব।

ব্রিটিশ সব্জেক্ট, অর্থাৎ ভারতবর্ষবাসী সমুদায় ইংবেজ, ও মহারাষ্ট্র খাতের অন্তবর্তী সমস্ত লোক, ঐ কোর্টের এলাকার মধ্যে ছিলেন। আব ইহাও নির্দিষ্ট হইয়াছিল, যে সকল লোক, সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায়, কোম্পানি অথবা ব্রিটিশ সব্জেক্টের কার্যে নিযুক্ত থাকিবেক। তাহারাও ঐ বিচারালয়ের অধীন হইবেক। সুপ্রীম কোর্টের জজেরা, এই বিধি অবলম্বন করিয়া, এতদ্দেশীয় দূরবর্তী লোকদিগের বিষয়েও হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কহিতেন, যে সকল লোক কোম্পানিকে কর দেয়, তাহারাও কোম্পানির চাকর। পার্লিমেণ্টের অত্যন্ত ত্রুটি হইয়াছিল যে, কোর্টের ক্ষমতার বিষয় স্পষ্টরূপে নির্ধারিত করিয়া দেন নাই। তাঁহারা, এক দেশের মধ্যে, পরস্পর নিরপেক্ষ অথচ পরস্পর প্রতীদ্বন্দ্বী, দুই পরাক্রম স্থাপিত করিয়া, সাতিশয় অবিবেচনার কার্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে, উভয় পক্ষের পরস্পর বিবাদানল বিলক্ষণ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

সুপ্রীম কোর্টের কার্যারম্ভ হইবামাত্র, তথাকার বিচারকেরা আপনাদের অধিকার বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। যদি কোনও ব্যক্তি, ঐ আদালতে গিয়া, শপথ করিয়া বলিত, অমুক জমিদার আমার টাকা ধারেন, তিনি শতক্রোশ দূরবর্তী হইলেও, তাঁহার নামে

তৎক্ষণাৎ পরোয়ানা বাহির হইত, এবং কোন, ওজর না শুনিয়া, তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া জেলখানায় রাখা যাইত ; পরিশেষে, আমি সুপ্রীম কোর্টের অধীন নহি, এই বাক্য বারংবার কহিলেই, সে ব্যক্তি অব্যাহতি পাইতেন ; কিন্তু তাহাতে তাঁহার যে ক্ষতি ও অপমান হইত, তাহার কোনও প্রতিবিধান হইত না। এই কুরীতির দোষ, অল্পকাল মধ্যেই, প্রকাশ পাইতে লাগিল। যে সকল প্রজা ইচ্ছাপূর্বক কর দিত না ; তাহারা, জমীদার ও তালুকদারদিগকে পূর্বোক্ত প্রকারে কলিকাতায় লইয়া যাইতে দেখিয়া, রাজস্ব দেওয়া একবারেই রহিত করিল। প্রথম বৎসর, সুপ্রীম কোর্টের জজেরা সকল জিলাতেই, এইরূপ পরোয়ানা পাঠায়াছিলেন। তদ্দৃষ্টে, দেশ মধ্যে, সমুদয় লোকেবই চিত্তে যৎপরোনাস্তি ত্রাস ও উদ্বেগের সঞ্চার হইল। জমীদারেরা, এই ঘোরতর নূতন বিপদ উপস্থিত দেখিয়া, সাতিশয় শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন। যে আইন অনুসারে, তাঁহারা বিচারার্থে কলিকাতায় আনীত হইতেন, তাঁহারা তাহার কিছুই জানিতেন না।

সুপ্রীম কোর্ট, ক্রমে ক্রমে, এরূপ ক্ষমতাবিস্তার করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে রাজস্ব আদায়ের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল। তৎকালে রাজস্ব কার্যের ভার প্রবিন্সল কোর্ট অর্থাৎ প্রদেশীয় বিচারালয়ের প্রতি অর্পিত ছিল। পূর্বাবধি এই রীতি ছিল, জমিদারেরা করদান বিষয়ে অন্যথাচরণ করিলে, তাঁহাদিগকে কয়েদ করিয়া আদায় করা যাইত। এই পুরাতন নিয়ম, তৎকাল পর্যন্ত, প্রবল ও প্রচলিত ছিল। সুপ্রীম কোর্ট এবিষয়েও হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। করদানে অমনোযোগী ব্যক্তিরা এইরূপে কয়েদ হইলে, সকলে তাহাদিগকে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করিতে পরামর্শ দিত। তাহারাও, আপীল করিবামাত্র, জামিন দিয়া খালাস পাইত। জমিদারেরা দেখিলেন, সুপ্রীম কোর্টে দরখাস্ত করিলেই, আর কয়েদ থাকিতে হয় না। অতএব, সকলেই কর দেওয়া রহিত করিলেন। এইরূপে রাজস্ব সংগ্রহ প্রায় এক প্রকার রহিত হইয়া আসিল।

সুপ্রীম কোর্ট ক্রমে সর্বপ্রকার বিষয়েই হস্তার্পণ করিতে লাগিলেন। মফঃসলের ভূমি সংক্রান্ত মোকদ্দমাও তথায় উপস্থিত হইতে লাগিল ; এবং জজেরাও, জিলা আদালতে কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, ইচ্ছাক্রমে ডিক্রী দিতে ও হুকুম জারী করিতে লাগিলেন। পূর্বে, ইজারদার অঙ্গীকৃত কর দিতে অসম্মত হইলে, তাহার ইজারা বিক্রীত হইত। কিন্তু সে, নূতন ইজারাদারকে সুপ্রীম কোর্টে আনিয়া, তাহার সর্বনাশ করিত। জমিদার কোনও বিষয় কিনিলে, যোত্রহীনেরা সুপ্রীম কোর্টে তাঁহার নামে নালিশ করিত, এবং তিনি আইন মতে খাজানা আদায় করিয়াছেন, এই অপরাধে, দণ্ডনীয় ও অবমানিত হইতেন।

সুপ্রীম কোর্ট প্রদেশীয় ফৌজদারী আদালতের উপরেও ক্ষমতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল আদালতের কার্য মুরশিদাবাদের নবাবের হস্তে রাখিয়াছিলেন। সুপ্রীম কোর্টের জজেরা কহিলেন, নবাব মুবারিকউদ্দৌলা সাক্ষিগোপাল মাত্র, সে কিসের রাজা, তাহার সমুদয় রাজ্য মধ্যে আমাদের অধিকার। নবাব ইংলণ্ডের অধিপতির অথবা ইংলণ্ডের আইনের অধীন ছিলেন না; তথাপি সুপ্রীম কোর্ট তাঁহার নামে পরোয়ানা জারী করা ন্যায্য বিবেচনা করিলেন। জজেরা স্পষ্টই বলিতেন, রাজশাসন অথবা রাজস্ব কার্যের সহিত যে যে বিষয়ের সম্পর্ক আছে, আমরা সে সমুদয়েরই কর্তা; যে ব্যক্তি আমাদের আজ্ঞালঙ্ঘন করিবেক, ইংলণ্ডের আইন অনুসারে, তাহার দণ্ডবিধান করিব। কোম্পানির কর্মচারীদিগের অবিচার ও অত্যাচার হইতে দেশীয় লোকদিগের পরিত্রাণ করিবার জন্য, এই বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছে; এত অধিক ক্ষমতাবিশিষ্ট না হইলে, সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে না। ফলতঃ সুপ্রীম কোর্টকে সর্বপ্রধান ও সুপ্রীম গবর্ণমেণ্টকে অকিঞ্চিৎকর করাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

উপরি লিখিত বিষয়ের উদাহরণস্বরূপ একটি দেওয়ানী ও একটি ফৌজদারী মোকদ্দমা উল্লিখিত হইতেছে।

পাটনানিবাসী এক ধনবান মুসলমান, আপন পত্নী ও ভ্রাতৃপুত্র রাখিয়া, পরলোক যাত্রা করেন। এইরূপ জনরব হইয়াছিল যে, ধনী ভ্রাতৃপুত্রকে দত্তকপুত্র করিয়া যান। ধনীর পত্নী ও ভ্রাতৃপুত্র উভয়ে, ধনাধিকার বিষয়ে বিবদমান হইয়া, পাটনার প্রবিন্সল কোর্টে মোকদ্দমার উপস্থিত করেন। জজেরা, কার্যনির্বাহের প্রচলিত রীতি অনুসারে, কাজী ও মুফতীকে ভার দেন যে, তাঁহারা, সাক্ষীর জবানবন্দী লইয়া, মুসলমানদিগের সরা অনুসারে, মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন। তদনুসারে, তাঁহারা অনুসন্ধান দ্বারা, অবগত হইলেন, বাদী ও প্রতিবাদী যে সকল দলীল দেখায়, সে সমুদায় জাল; তাহাদের এক ব্যক্তিও প্রকৃত উত্তরাধিকারী নহে। সুতরাং ঐ সম্পত্তি বিভাগ সরা অনুসারে করা আবশ্যক। তাঁহারা, তদীয় সমস্ত ধনের চতুর্থ অংশ তাঁহার পত্নীকে দিয়া, অবশিষ্ট বার আনা তাঁহার ভ্রাতাকে দিলেন। এই ভ্রাতার পুত্রকে ধনী দত্তক করিয়া যান।

ঐ অবীরা সুপ্রীম কোর্টে আপীল করিল। এই মোকদ্দমা যে স্পষ্টই সুপ্রীম কোর্টের এলাকার বহির্ভূত, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জজেরা, আপনাদের অধিকারভুক্ত করিবার নিমিত্ত, কহিলেন, মৃত ব্যক্তি সরকারী জমা রাখিত, সুতরাং সে কোম্পানির কর্মকারক; সমুদয় সরকারী কর্মকারকের উপর আমাদের অধিকার আছে। তাঁহারা ইহাও কহিলেন, ইংলণ্ডের আইন অনুসারে, পাটনার প্রবিন্সল জজদিগের এরূপ ক্ষমতা নাই যে, তাঁহারা কোনও মোকদ্দমা, নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্ত, কাহাকেও সোপর্দ করিতে

পারেন। অতএব তাঁহারা স্থির করিলেন, এই মোকদ্দমার সানি তজবীজ আবশ্যক। পরে, তাঁহাদের বিচারে ঐ অবীরার পক্ষে জয় হইল, এবং সে তিন লক্ষ টাকা পাইল।

তাঁহারা এই পর্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন, এমন নহে ; কাজী, মুফতী, ও ধনীব ভ্রাতৃপুত্রকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্ত, একজন সারজন পাঠাইলেন ; কহিয়া দিলেন যদি চারি লক্ষ টাকার জামীন দিতে পারে, তবেই ছাড়িবে, নতুবা গ্রেপ্তার করিয়া আনিবে। কাজী আপন কাছাবী হইতে বাটী যাইতেছেন, এমন সময়ে, সুপ্রীম কোর্টের লোক, তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল।

এইরূপ ব্যাপার দর্শনে প্রজাদের অন্তঃকরণে অবশ্যই বিরুদ্ধ ভাব জন্মিতে পারে ; এই নিমিত্ত, প্রবিন্সল কোর্টের জজেরা অতিশয় ব্যাকুল ও উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা লোপ পাইল, এবং রাজকার্যনির্বাহ একবারেই রহিত হইল। অনন্তর, আব অধিক অনিষ্ট না ঘটে, এজন্য তাঁহারা তৎকালে কাজীব জামীন হইলেন।

যে যে ব্যক্তি, প্রবিন্সল কোর্টেব হুকুম অনুসাবে, ঐ মোকদ্দমার বিচাব কবিয়াছিলেন, সুপ্রীম কোর্ট তাঁহাদের সকলকেই অপরাধী কবিলেন, এবং, সকলকেই রুদ্ধ কবিয়া আনিবাব নিমিত্ত, সিপাই পাঠাইয়া দিলেন ; কাজী বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, কলিকাতায় আসিবার কালে, পথি মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইল। মুফতীও অন্যূন চারি বৎসর জেলে থাকিলেন ; পবিশেষে পার্লিমেণ্টেব আদেশ অনুসাবে, মুক্তি পাইলেন। তাঁহাদের অপবাধ এই, তাঁহারা আপন কর্তব্য কর্মের সম্পাদন কবিয়াছিলেন।

জজেবা, ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া, প্রবিন্সল কোর্টের জজেব নামেও সুপ্রীম কোর্টে নালিশ উপস্থিত কবিযা, তাঁহাব ১৫০০০ টাকা দণ্ড করিলেন ; ঐ টাকা কোম্পানিব ধনাগাব হইতে দত্ত হইল।

সুপ্রীম কোর্টের জজেবা, ফৌজদারী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি বিষযে, যেরূপে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন ; নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত তাহার এক উত্তম দৃষ্টান্ত। সুপ্রীম কোর্টের এক যুরোপীয় উকীল ঢাকায় থাকিতেন। একজন সামান্য পেয়াদা কোনও কুকর্ম করাতে, ঐ নগরেব ফৌজদাবী আদালতে তাহার নামে নালিশ হয়। তাহার দোষ সপ্রমাণ হইলে, এই আদেশ হইল, সে ব্যক্তি যাবৎ না আত্মদোষের ক্ষালন করে, তাবৎ তাহাবে কারাগারে রুদ্ধ থাকিতে হইবেক।

সকলে, তাহাকে পরামর্শ দিয়া, সুপ্রীম কোর্টে দরখাস্ত করাইল। অনন্তর, পেয়াদাকে অকারণে রুদ্ধ করিয়াছে, এই সূত্র ধরিয়া, সুপ্রীম কোর্টের একজন জজ, ফৌজদারী আদালতের দেওয়ানকে কয়েদ করিয়া আনিবার নিমিত্ত, পরোয়ানা বাহির করিলেন। ফৌজদার, আপন বন্ধুবর্গ ও আদালতের আমলাগণ লইয়া, বসিয়া আছেন, এমন সময়ে পূর্বোক্ত যুরোপীয় উকীল একজন বাঙ্গালিকে তাঁহার বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। সে

ব্যক্তি, বাটীতে প্রবেশপূর্বক, তাঁহার দেওয়ানকে কয়েদ করিবার উপক্রম করিল ; কিন্তু, সকলে প্রতিবাদী হওয়ায়, তাহাকে আপন মনিবের নিকট ফিরিয়া যাইতে হইল। উকীল, এই বৃত্তান্ত শুনিবামাত্র, কতকগুলি অস্ত্রধারী পুরুষ সঙ্গে লইয়া, বলপূর্বক ফৌজদারের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার উদ্যম করিলেন। সেই বাটীতে ফৌজদারের পরিবার থাকিত, এজন্য তিনি তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দিলেন না। তাহাতে ভয়ানক দাঙ্গা উপস্থিত হইল। উকীলের একজন অনুচর ফৌজদারের পিতার মস্তকে আঘাত করিল ; এবং উকীলও নিজে, এক পিস্তল বাহির করিয়া, ফৌজদারেব সম্বন্ধীকে গুলি করিলেন ; কিন্তু, দৈবযোগে, তাহা মারাত্মক হইল না। সুপ্রীম কোর্টের জজ হাইড সাহেব, এই ব্যাপার শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ ঢাকার সৈন্যাধ্যক্ষকে লিখিয়া পাঠাইলেন, আপনি উকীলের সাহায্য করিবেন ; আব ইহাও লিখিলেন, আপনি উকীলকে জানাইবেন, তিনি যে কর্ম করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের যথেষ্ট তুষ্টি জন্মিয়াছে ; সুপ্রীম কোর্টে, তাঁহার যথোচিত সহায়তা কবিবেন। ঢাকার প্রবিন্সল কৌন্সিলের সাহেবেরা গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরকে পত্র লিখিলেন, ফৌজদারী আদালতের সমুদয় কার্য এককালে স্থগিত হইল ; এরূপ অত্যাচারের পর, সবকারী কর্মের নির্বাহ কবিতে আর লোক পাওয়া দুষ্কর হইবেক। গবর্ণব জেনেবল ও কৌন্সিলের মেম্বরেরা দেখিলেন, সুপ্রীম কোর্ট হইতেই গবর্ণমেণ্টের সমুদয় ক্ষমতা লোপ পাইল। কিন্তু, কোনও প্রকারে, তাঁহাদের সাহস হইল না যে, কোনও প্রতিবিধান করেন। জজেরা বলিতেন, আমরা ইংলণ্ডেশ্বরের নিযুক্ত ; কোম্পানিব সমুদয় কর্মকারক অপেক্ষা আমাদেব ক্ষমতা অনেক অধিক ; যে সকল ব্যক্তি আমাদের আজ্ঞালঙ্ঘন করিবেক, তাহাদিগকে রাজবিদ্রোহীর দণ্ড দিব। যাহা হউক, পরিশেষে এমন এক বিষয় ঘটিয়া উঠিল যে, উভয় পক্ষকেই পবস্পর স্পষ্ট বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

কাশিজোড়ার রাজার কলিকাতাস্থ কর্মাধ্যক্ষ কাশীনাথবাবু, ১৭৭৯ সালের ১৩ই আগষ্ট, রাজার নামে সুপ্রীম কোর্টে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। তাহাতে রাজার উপর এক পরোয়ানা বাহির হইল এবং তিন লক্ষ টাকার জামিন চাহা গেল। সেই পরোয়ানা এড়াইবার নিমিত্ত, বাজা অন্তর্হিত হওয়াতে, উহা জারী না হইয়া ফিরিয়া আসিল। তদনন্তর, তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তি ক্রোক করিবার জন্য, আর এক পরোয়ানা বাহির হইল। সরিফ সাহেব, ঐ ব্যাপারের সমাধা করিবার নিমিত্ত, একজন সারজন ও ষাটিজন অস্ত্রধারী পুরুষ পাঠাইয়া দিলেন।

রাজা গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিলেন, সুপ্রীম কোর্টের লোকেরা আসিয়া আমার লোক জনকে প্রহার ও আঘাত করিয়াছে, বাড়ী ভাঙ্গিয়াছে, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে, জিনিসপত্র লুঠ করিয়াছে, দেবালয় অপবিত্র করিয়াছে, দেবতার অঙ্গ হইতে আভরণ

খুলিয়া লইয়াছে, খাজানা আদায় বন্ধ করিয়াছে, এবং রাইতদিগকে খাজনা দিতে মানা করিয়াছে।

গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সিলের বৈঠকে এই নিধার্য করিলেন, অতঃপর সতর্ক হওয়া উচিত ; এমন সকল বিষয়েও ক্ষান্ত থাকিলে, রাজশাসনের এককালে লোপাপত্তি হয় ; অনন্তর, রাজাকে সুপ্রীম কোর্টের আজ্ঞাপ্রতিপালন করিতে নিষেধ করিয়া, তিনি মেদিনীপুরের সেনাপতিকে এই আজ্ঞাপত্র লিখিলেন, তুমি সরিফের লোক সকল আটক কবিবে। এই আজ্ঞা পঁহুছিতে অধিক বিলম্ব হওয়ায়, তাহাদের দৌরাত্ম্য ও বাজার বাটীলুঠের নিবারণ হইতে পারিল না ; কিন্তু ফিরিয়া আসিবার কালে সকলে কয়েদ হইল।

সেই সময়ে গবর্ণব জেনেরল এরূপ আদেশও কবিলেন যে, যে সমুদয় জমিদার, তালুকদার ও চৌধুবী ব্রিটিশ সবজেক্ট অথবা বিশেষ নিযমে আবদ্ধ নহেন, তাঁহারা যেন সুপ্রীম কোর্টের আজ্ঞাপ্রতিপালন না করেন ; আর, প্রদেশীয় সেনাধ্যক্ষদিগকে নিষেধ করিলেন, আপনাবা সৈন্য দ্বারা সুপ্রীম কোর্টের সাহায্য কবিবেন না।

সারজন ও তাঁহাদেব সঙ্গী লোকদিগেব কয়েদ হইবার সংবাদ সুপ্রীম কোর্টে পঁহুছিবামাত্র, জজেরা, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, প্রথমতঃ কোম্পানির উকীলকে, তুমি সংবাদ দিয়াছ, তাহাতেই আমাদের লোক সকল কয়েদ হইল, এই বলিয়া জেলখানায় পুরিয়া চাবি দিয়া বাখিলেন। পরিশেষে, গবর্ণর জেনেরল ও কৌন্সিলের মেম্বরদিগেব নামেও এই বলিযা সমন কবিলেন যে, আপনারা কাশীনাথবাবুর মোকদ্দমা উপলক্ষে, সুপ্রীম, কোর্টের লোকদিগকে রুদ্ধ করিয়া, কোর্টের হুকুম অমান্য করিয়াছেন। কিন্তু হেষ্টিংস সাহেব স্পষ্ট উত্তর দিলেন, আমরা, আপন পদের ক্ষমতা অনুসারে, যে কর্ম করিয়াছি, সে বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের হুকুম মান্য করিব না। এই ব্যাপার ১৭৮০ সালের মার্চ মাসে ঘটে।

এই সময়ে কলিকাতাবাসী সমুদয় ইংরেজ ও স্বয়ং গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর সুপ্রীম কোর্টের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রার্থনায়, পার্লিমেণ্টে এক আবেদন পত্র পাঠাইলেন। এ বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা হইয়া, নূতন আইন জারী হইল। তাহাতে, সুপ্রীম কোর্টের জজেরা, সমস্ত দেশের উপর কর্তৃত্ব চালাইবার নিমিত্ত, যে ঔদ্ধত্য করিবেন, তাহা রহিত হইয়া গেল।

এই আইন জারী হইবার পূর্বেই, হেষ্টিংস সাহেব জজদিগের বদনে মধু দান করিয়া, সুপ্রীম কোর্টকে ঠাণ্ডা করিয়াছিলেন। তিনি চীফ জষ্টিস সর ইলাইজা ইম্পি সাহেবকে, মাসিক ৫০০০ টাকা বেতন দিয়া, সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান জজ করেন, এবং আফিসের ভাডা বলিয়া, মাসে ৬০০ টাকা দিতে আরম্ভ করেন ; আর, একজন ছোট

জজকে, চুঁচুড়ায় এক নূতন কর্ম দিয়া, বড় মানুষ করিয়া দেন। ইহার পর কিছুকাল, সুপ্রীম কোর্টের কোনও অত্যাচার শুনিতে পাওয়া যায় নাই।

এই সময়ে, হেষ্টিংস সাহেব, দেশীয় বিচারালয়ের অনেক সুধারা করিলেন, দেওয়ানী মোকদ্দমা শুনিবার নিমিত্ত, নানা জিলাতে দেওয়ানী আদালত স্থাপিত করিলেন; প্রবিন্সল কোর্টে কেবল রাজস্ব সংক্রান্ত কার্যের ভার রাখিলেন। চীফ জষ্টিস, সদর দেওয়ানী আদালতের কর্মে বসিয়া, জিলা আদালতের কর্মনির্বাহার্থে কতকগুলি আইন প্রস্তুত করিলেন। এইরূপে, ক্রমে ক্রমে, নব্বইটি আইন প্রস্তুত হয়। ঐ মূল অবলম্বন করিয়াই, কিয়ৎকাল পরে, লার্ড কর্ণওয়ালিস দেওয়ানী আইন প্রস্তুত করেন।

সর ইলাইজা ইম্পি সাহেবের সদর দেওয়ানীতে কর্মস্বীকারের সংবাদ ইংলণ্ডে পঁহুছিলে, ডিরেক্টরেরা, অত্যন্ত অসন্তোষ প্রদর্শনপূর্বক, ঐ বিষয় অস্বীকার করিলেন। কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, হেষ্টিংস, কেবল শান্তিরক্ষার্থেই, তদ্বিষয়ে সম্মত হইয়াছে। রাজমন্ত্রীরাও, সদর দেওয়ানীতে কর্ম স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া, সর ইলাইজা ইম্পি সাহেবকে, কর্ম পরিত্যাগ করিয়া, ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিতে আদেশ দিলেন, এবং তিনি পূর্বোক্ত কর্ম স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া, তাহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। সর গিলবর্ট এলিয়ট সাহেব তাঁহার অভিযোক্তা নিযুক্ত হইলেন। ইনিই, কিছুকাল পরে, লার্ড মিণ্টো নামে, ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়াছিলেন।

১৭৮০ সালের ১৯শে জানুয়ারি, কলিকাতায় এক সংবাদপত্র প্রচারিত হইল; তৎপূর্বে ভারতবর্ষে উহা কখনও দৃষ্ট হয় নাই।

হেষ্টিংস সাহেব, ইহার পর চারি বৎসর, বাঙ্গালার কার্য হইতে অবসৃত হইয়া, বারাণসী ও অযোধ্যার রাজকার্যের বন্দোবস্ত, মহীসুরের রাজা হায়দার আলির সহিত যুদ্ধ, ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশে সন্ধি স্থাপন, ইত্যাদি কার্যেই অধিকাংশ ব্যাপৃত রহিলেন। তিনি অযোধ্যা ও বারাণসীতে যে সমস্ত ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিলেন, সে সমুদয় প্রচারিত হওয়াতে, ইংলণ্ডে তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষগণের সম্মতি না হওয়াতে, তিনি স্বপদেই থাকিলেন। হেষ্টিংস, ১৭৮৪ সালের শেষ ভাগে, আর একবার অযোধ্যাযাত্রা করিলেন। ১৭৮৫ সালের আরম্ভে, তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, তিনি আপন পদের উত্তরাধিকারী মেকফর্সন সাহেবের হস্তে ত্রেজরি ও ফোর্ট উইলিয়মের চাবি সমর্পণ করিলেন, এবং, জাহাজে আরোহণ করিয়া, জুন মাসে, ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেন।

১৭৮৪ সালে, এই দেশের পরম হিতকারী ক্লীবলণ্ড সাহেবের মৃত্যু হয়। তিনি, অতি অল্প বয়সে, সিবিল কর্মে নিযুক্ত হইয়া, ভারতবর্ষে আইসেন। পঁহুছিবার পরেই, ভাগলপুর অঞ্চলের সমস্ত রাজকার্যের ভার তাঁহার হস্তে সমর্পিত হয়। এই প্রদেশের

দক্ষিণ অংশে এক পর্বতশ্রেণী আছে, তাহার অধিত্যকাতে অসভ্য পুলিন্দজাতিরা বাস করিত। সন্নিকৃষ্ট জাতিরা সর্বদাই তাহাদের উপর অত্যাচার করিত; তাহারাও, সময়ে সময়ে পর্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া, অত্যাচারীদিগের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিত। ক্লীবলণ্ড, তাহাদের অবস্থার সংশোধন বিষয়ে, নিরতিশয় যত্নবান হইয়াছিলেন; এবং যাহাতে তাহারা সুখী হইতে পারে, সাধ্যানুসারে তাহার চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার এই প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছিল। ক্রমে তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত প্রদেশের অবস্থার পবিবর্তন হইল; পার্বতীয় অসভ্য পুলিন্দজাতিরাও, সভ্য জাতির ন্যায়, শান্ত স্বভাব হইয়া উঠিল।

আবাদ না থাকাতে, ঐ প্রদেশেব জলবায়ু অতিশয় পীড়াকর ছিল। তাহাতে ক্লীবলণ্ড সাহেব, শারীরিক অত্যন্ত অসুস্থ হইযা, স্বাস্থ্যলাভেব প্রত্যাশায, সমুদ্রযাত্রা করিলেন। তথায় তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে তাঁহাব ঊনত্রিংশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম ছিল। ডিরেক্টবেবা তদীয় সদ্‌গুণে এমন প্রীত ছিলেন যে, তাঁহার স্মরণার্থে সমাধিস্তম্ভ নির্মাণের আদেশ প্রদান করিলেন। তিনি যে অসভ্য অকিঞ্চন পার্বতীয়দিগকে সভ্য করিয়াছিলেন, তাহারাও অনুমতি লইযা, তদীয় গুণগ্রামের চিরস্মরণীয়তাসম্পাদনার্থে, এক কীর্তিস্তম্ভ নির্মিত করিল। এতদ্দেশীয় লোকেরা, ইহার পূর্বে, আব কখনও, কোন য়ুরোপীয়েব স্মবণার্থে, কীর্তিস্তম্ভ নির্মিত করেন নাই।

১৭৮৩ সালে, সর উইলিয়ম জোন্স, সুপ্রীম কোর্টের জজ হইয়া, এতদ্দেশে আগমন করেন। তিনি, বিদ্যানুশীলন দ্বারা, স্বদেশে বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভারতবর্ষে আসিবার মুখ্য অভিপ্রায় এই যে, তিনি এতদ্দেশের আচার, ব্যবহার, পুরাবৃত্ত, ও ধর্ম বিষযে বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিতে পারিবেন। তিনি, এদেশে আসিয়াই, সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করিতে আরম্ভ কবিলেন। কিন্তু পড়াইবার নিমিত্ত পণ্ডিত পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল। তৎকালীন ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা ম্লেচ্ছজাতিকে পবিত্র সংস্কৃত ভাষা অথবা শাস্ত্রীয় বিষয়ে উপদেশ দিতে সম্মত হইতেন না। অনেক অনুসন্ধানের পর, একজন উত্তম সংস্কৃত বৈদ্য, মাসিক পাঁচ শত টাকা বেতনে, তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষা শিখাইতে সম্মত হইলেন। সর উইলিয়ম জোন্স, স্বল্প দিনেই, উক্ত ভাষায় এমন ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন যে, অনায়াসে, ইংরেজীতে শকুন্তলা নাটকের ও মনুসংহিতার অনুবাদ করিতে পারিলেন।

তিনি, ১৭৮৪ সালে, ভারতবর্ষের পূর্বকালীন আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, ভাষা, শাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ের অনুসন্ধানের অভিপ্রায়ে, কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটি নামক এক সভা স্থাপিত করিলেন। যে সকল লোক, এ বিষয়ে, তাঁহার ন্যায়, একান্ত অনুরক্ত ছিলেন, তাঁহারা এই সোসাইটির মেম্বর হইলেন। হেষ্টিংস সাহেব এই সভার

প্রথম অধিপতি হয়েন, এবং, প্রগাঢ় অনুরাগ সহকারে, সভার সভ্যগণের উৎসাহবর্ধন করেন। সর উইলিয়ম জোন্সের তুল্য সর্বগুণাকর ইংরেজ এ পর্যন্ত ভারতবর্ষে আইসেন নাই। তিনি, এতদ্দেশে, দশ বৎসর বাস করিয়া, ঊনপঞ্চাশ বর্ষ বয়ঃক্রমে, পরলোক-যাত্রা করেন।

১৭৮৩ সালে, কোম্পানির কার্যনির্বাহক প্রণালী পার্লিমেণ্টের গোচর হইলে, প্রধান অমাত্য ফক্স সাহেব, ভারতবর্ষীয় রাজশাসন বিষয়ে, এক নূতন প্রণালী প্রস্তুত করিলেন। ঐ প্রণালী স্বীকৃতি হইলে, ভারতবর্ষে কোম্পানির কোনও সংস্রব থাকিত না। কিন্তু ইংলণ্ডেশ্বর তাহাতে সম্মত হইলেন না। প্রধান অমাত্য ফক্স সাহেব পদচ্যুত হইলেন। উইলিয়ম পিট সাহেব, তাঁহার পরিবর্তে, প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম চব্বিশ বৎসর মাত্র। কিন্তু তিনি, রাজকার্য নির্বাহ বিষয়ে, অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। তিনি এতদ্দেশীয় রাজশাসনের এক নূতন প্রণালী প্রস্তুত করিলেন। ঐ প্রণালী, পার্লিমেণ্টে ও রাজসমীপে, উভয়ত্রই স্বীকৃত হইল।

এ পর্যন্ত, ডিরেক্টরেরাই এতদ্দেশীয় সমস্ত কার্যের নির্বাহ কবিতেন; রাজমন্ত্রীরা কোনও বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না। কিন্তু, ১৭৮৪ সালে, পিট সাহেবের প্রণালী প্রচলিত হইলে, ভারতবর্ষীয় সমস্ত বিষয়ের পর্যবেক্ষণ নিমিত্ত, বোর্ড অব কণ্ট্রোল নামে এক সমাজ স্থাপিত হইল। রাজা স্বয়ং এই বোর্ডের সমুদয় মেম্বর নিযুক্ত কবিতেন। কোম্পানির বাণিজ্য ভিন্ন, ভারতবর্ষীয় সমস্ত বিষয়েই তাঁহাদের হস্তার্পণের অধিকার হইল।

অষ্টম অধ্যায়

হেষ্টিংস সাহেব মেকফর্সন সাহেবের হস্তে গবর্ণমেণ্টের ভারার্পণ করিয়া যান। ডিরেক্টরেরা, তাঁহার প্রস্থান সংবাদ অবগত হইবামাত্র, লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবকে, গবর্ণর জেনেরল ও কমাণ্ডর ইন চীফ, উভয় পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। কর্ণওয়ালিস পুরুষানুক্রমে বড় মানুষের সন্তান, ঐশ্বর্যশালী, ও অসাধারণ বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন; এবং পৃথিবীর নানাস্থানে নানা প্রধান প্রধান কর্ম করিয়া, সকল বিষয়েই বিশেষরূপ পারদর্শী হইয়াছিলেন।

তিনি, ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে, ভারতবর্ষে পঁহুছিলেন। যে সকল বিবাদ উপস্থিত থাকাতে, হেষ্টিংস সাহেবের শাসন অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছিল, লার্ড কর্ণওয়ালিসের নামে ও প্রবল প্রতাপে, সে সমুদয়ের সত্বর নিষ্পত্তি হইল। তিনি, সাত বৎসর নির্বিবাদে, রাজশাসন কার্য সম্পন্ন করিলেন; অনন্তর, মহীশূরের অধিপতি হায়দর আলির পুত্র টিপু

সুলতানের সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাঁহার গর্ব খর্ব করিলেন ; পরিশেষে সুলতানের প্রার্থনায়, তাঁহার রাজ্যের অনেক অংশ ও যুদ্ধের সমুদয় ব্যয় লইয়া, সন্ধি স্থাপন করিলেন।

লার্ড কর্ণওয়ালিস, বাঙ্গালা ও বিহারের রাজস্ব বিষয়ে, যে বন্দোবস্ত করেন, তাহা দ্বারাই ভারতবর্ষে তাঁহার নাম বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছে। ডিরেক্টরেরা দেখিলেন, রাজস্ব—সংগ্রহ বিষয়ে নিত্য নূতন বন্দোবস্ত করাতে, দেশের পক্ষে অনেক অপকার হইতেছে ; তাঁহারা বোধ করিলেন, প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল, আমরা দেওয়ানী পাইয়াছি, এতদিনে আমাদের য়ুরোপীয় কর্মচারীরা, অবশ্যই, ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ের সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়াছেন। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, রাজা ও প্রজা উভয়েরই হানিকর না হয়, এমন কোনও দীর্ঘকাল স্থায়ী ন্যায্য বন্দোবস্ত করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহাদের নিতান্ত বাসনা হইয়াছিল, চিরকালের নিমিত্ত একবিধ রাজস্ব নির্ধারিত হয়। কিন্তু লার্ড কর্ণওয়ালিস দেখিলেন, তৎকাল পর্যন্ত, এ বিষয়ের কিছুই নিশ্চিন্ত জানিতে পারা যায় নাই ; অতএব, অগত্যা, পূর্ব প্রচলিত বার্ষিক বন্দোবস্তই আপাততঃ বজায় রাখিলেন।

ঐ সময়ে তিনি, কতকগুলি প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়া, এই অভিপ্রায়ে কালেক্টর সাহেবদিগের নিকট পাঠাইয়া দিলেন যে, তাঁহারা ঐ সকল প্রশ্নের যে উত্তর লিখিবেন, তদ্দ্বারা ভূমির রাজস্ব বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন। তাঁহারা যে বিজ্ঞাপনী দিলেন, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর ; অতি অকিঞ্চিৎকর বটে ; কিন্তু, তৎকালে, তদপেক্ষায় উত্তম পাইবার কোনও আশা ছিল না। অতএব, কর্ণওয়ালিস, আপাততঃ দশ বৎসরের নিমিত্ত বন্দোবস্ত করিয়া, এই ঘোষণা করিলেন, যদি ডিরেক্টরেরা স্বীকার করেন, তবে ইহাই চিরস্থায়ী করা যাইবেক। অনন্তর, বিখ্যাত সিবিল সরবেণ্ট জন শোর সাহেবের প্রতি, রাজস্ব বিষয়ে, এক নূতন প্রণালী প্রস্তুত করিবার ভার অর্পিত হইল। তিনি উক্ত বিষয়ে সবিশেষ অভিজ্ঞ ও নিপুণ ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিষয়ে তাঁহার নিজের মত ছিল না ; তথাপি তিনি ঐ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই দশসালা বন্দোবস্তে ইহাই নির্ধারিত হইল, এ পর্যন্ত যে সকল জমিদার কেবল রাজস্ব সংগ্রহ করিতেছেন ; অতঃপর তাঁহারাই ভূমির স্বামী হইবেন ; প্রজারা তাঁহাদের সহিত রাজস্বের বন্দোবস্ত করিবেক।

দেশীয় কর্মচারীরা রাজস্ব সংক্রান্ত প্রায় সমুদায় পুরাতন কাগজপত্র নষ্ট করিয়াছিল ; অবশিষ্ট যাহা পাওয়া গেল, সমুদয়ের পরীক্ষা করিয়া এবং ইতিপূর্বে কয়েক বৎসরে যাহা আদায় হইয়াছিল, তাহার গড় ধরিয়া, কর নির্ধারিত করা গেল। গবর্ণমেণ্ট এরূপও ঘোষণা করিয়া দিলেন, নিষ্কর ভূমির সহিত এ বন্দোবস্তের কোনও সম্পর্ক নাই ; কিন্তু আদালতে ঐ সকল ভূমির দলীলের পরীক্ষা করা যাইবেক ; যে সকল

ভূমির দলীল অকৃত্রিম হইবেক; সে সমুদয় বাহাল থাকিবেক ; আর কৃত্রিম বোধ হইলে, তাহা বাতিল করিয়া, ভূমি সকল বাজেয়াপ্ত করা যাইবেক।

এই সমুদয় প্রণালী ডিরেক্টরদিগের সমাজে সমর্পিত হইলে, তাঁহারা তাহাতে সম্মত হইলেন এবং ঐ বন্দোবস্তই নির্ধারিত ও চিরস্থায়ী করিবার নিমিত্ত, কর্ণওয়ালিস সাহেবকে অনুমতি দিলেন। তদনুসারে, ১৭৯৩ সালের ২২শে মার্চ, এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল যে, বাঙ্গালা ও বিহারের রাজস্ব ৩১০৮৯১৫০ টাকা ও বারণসীর রাজস্ব ৪০০০৬১৫ টাকা, চিরকালের নিমিত্ত নির্ধারিত হইল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়াতে, বাঙ্গালা দেশের যে সবিশেষ উপকার দর্শিয়াছে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এরূপ না হইয়া, যদি, পূর্বের ন্যায় রাজস্ব বিষয়ে নিত্য নূতন পরিবর্তের প্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে, এদেশের কখনই মঙ্গল হইত না। কিন্তু ইহাতে দুই অমঙ্গল ঘটিয়াছে ; প্রথম এই যে ভূমি ও ভূমির মূল্য নিশ্চিত না জানিয়া বন্দোবস্ত করা হইয়াছে ; তাহাতে কোনও কোনও ভূমিতে অত্যন্ত অধিক, কোনও কোনও ভূমিতে অতি সামান্য, কর নির্ধারিত হইয়াছে ; দ্বিতীয় এই যে, সমুদয় ভূমি যখন বন্দোবস্ত কবিয়া দেওয়া গেল, তখন যে সকল প্রজারা, আবাদ করিয়া, চিরকাল, ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছিল, নূতন ভূমধ্যকারীদিগকে স্বেচ্ছাচার হইতে তাহাদের পরিত্রাণের কোনও বিশিষ্ট উপায় নির্দিষ্ট করা হয় নাই।

১৭৯৩ সালে, বাঙ্গালার শাসন নিমিত্ত আইন প্রস্তুত হয়। পূর্বে যে যে আইন প্রচলিত করা গিয়াছিল, লার্ড কর্ণওয়ালিস সে সমুদয়ের একত্র সঙ্কলন করিলেন, এবং সংশোধন ও অনেক নূতন আইনের যোগ করিয়া, তাহা এক গ্রন্থের আকারে প্রচারিত করিলেন। ইহাই উত্তরকালীন যাবতীয় আইনের মূলস্বরূপ। ১৭৯৩ সালের আইন সকল এরূপ সহজ ও তাহাতে এরূপ গুণবত্তা প্রকাশিত হইয়াছে যে তৎপ্রণেতার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়। ঐ সমুদয় আইন দেশীয় কতিপয় ভাষাতে অনুবাদিত হইয়া সর্বত্র প্রচারিত হইল।

তৎকালে ফরস্টর সাহেব সর্বাপেক্ষায় উত্তম বাঙ্গালা জানিতেন ; তিনি, বাঙ্গালা ভাষায় ঐ সমুদয় আইনের অনুবাদ করেন। এই সাহেব, কিঞ্চিৎকাল পরে, বাঙ্গালা ভাষায় সর্বপ্রথম, এক অভিধান প্রস্তুত করেন। পারসী ভাষায় সবিশেষ নিপুণ এডমনস্টন সাহেব, ঐ ভাষাতে আইনের তরজমা করেন। এই অনুবাদ এমন উত্তম হইয়াছিল যে, গবর্ণমেণ্ট, সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে দশহাজার টাকা পারিতোষিক দেন। এই সমস্ত আইন অনুসারে, বিচারালয়ে যে সকল প্রথা প্রচলিত হয়, তাহা প্রায় চব্বিশ বৎসর পর্যন্ত প্রবল থাকে। পরে, দেশীয় লোকদিগকে বিচার সংক্রান্ত উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করা নির্ধারিত হওয়াতে, তাহার কোনও কোনও অংশ পরিবর্তিত হয়।

লার্ড কর্ণওয়ালিস বিচারালয়ে পাঁচ সোপান স্থাপিত করেন। প্রথম, মুন্সেফ ও সদর আমীন ; দ্বিতীয়, রেজিস্টর ; তৃতীয়, জিলা জজ ; চতুর্থ, প্রবিন্সল কোর্ট ; পঞ্চম, সদর দেওয়ানী আদালত। তিনি এই অভিপ্রায়ে সমুদয় সিবিল সরবেণ্টদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন যে, আর তাঁহারা উৎকোচগ্রহণের লোভ করিবেন না। কিন্তু বিচারালয়ের দেশীয় কর্মচারীদিগের বেতন পূর্ববৎ অতি সামান্যই রহিল। উচ্চপদাভিষিক্ত য়ুরোপীয় কর্মচারীরা পূর্বে কতিপয় শত টাকা মাত্র মাসিক বেতন পাইতেন ; কিন্তু, এক্ষণে তাঁহারা অনেক সহস্র টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। পূর্বে, দেশীয় লোকেরা উচ্চ উচ্চ বেতন পাইয়া আসিয়াছিলেন। ফৌজদার বৎসরে ষাটি সত্তর হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন পাইতেন ; এক এক সুবার নায়েব দেওয়ান বার্ষিক নয় লক্ষ টাকার ন্যূন বেতন পাইতেন না। কিন্তু, ১৭৯৩ সালে, দেশীয় লোকদিগের অত্যুচ্চ বেতন একশত টাকাব অধিক ছিল না।

লার্ড কর্ণওয়ালিস বাজশাসন দৃঢীভূত করিযাছেন, এবং, চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা, দেশীয় লোকদিগের মঙ্গল কবিয়াছেন। দেশীয় লোকেরা, তাঁহার দয়ালুতা ও বিজ্ঞতাব নিমিত্ত, যে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা অপাত্রে বিন্যস্ত হয় নাই। ডিরেক্টরেবা, তাঁহাব অসাধারণ গুণদর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, ইণ্ডিয়া হৌসে তাঁহার প্রতিমূর্তি সংস্থাপিত করেন, এবং ভাবতবর্ষ পরিত্যাগ দিবস অবধি বিংশতি বৎসর পর্যন্ত, তাঁহার বার্ষিক পঞ্চাশ সহস্র টাকা বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দেন।

২৮শে অক্টোবর, সর জন শোব সাহেব গবর্ণর জেনেরলেব পদে অধিরূঢ় হইলেন। তিনি, সিবিল কর্মে নিযুক্ত হইয়া, অতি অল্প বয়সে, ভারতবর্ষে আগমন করেন ; কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই, অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রগাঢ় বিবেচনা শক্তি দ্বারা, বিখ্যাত হইয়া উঠেন। দশসালা বন্দোবস্তের সময়, তিনি রাজস্ব বিষযে এক উৎকৃষ্ট পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করেন। ঐ পাণ্ডুলেখ্যে এমন প্রগাঢ় বিদ্যা ও দূরদর্শিতা প্রদর্শিত হয় যে, উহা ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী পিট সাহেবের সম্মুখে উপনীত হইলে, তিনি তদ্দর্শনে সাতিশয় চমৎকৃত হন, এবং, ডিরেক্টরদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, পরামর্শপূর্বক স্থির করেন যে, লার্ড কর্ণওয়ালিসের পরে, ইহাকেই গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিতে হইবেক।

তাঁহার নিয়োগের পর বৎসর, অতি প্রসিদ্ধ বিদ্যাবান্, সুপ্রীম কোর্টের অপক্ষপাতী জজ, সর উইলিয়ম জোন্স, আটচল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, কালগ্রাসে পতিত হন। সর জন শোর সাহেবের সহিত তাঁহাব বিলক্ষণ সৌহৃদ্য ছিল ; শোর সাহেব তদীয় জীবনবৃত্তান্তের সঙ্কলন করিয়া, এক উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রস্তুত ও প্রচাবিত কবেন।

১৭৯৫ সালে, নবাব মুবারিকউদ্দৌলার মৃত্যু হইলে, তদীয় পুত্র নাজির উলমুলুক মুরশিদাবাদের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। কিন্তু তৎকালে, মুরশিদাবাদের নবাব

নিযুক্ত করা অতি সামান্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। অতএব, এই মাত্র বলিলেই পর্যাপ্ত হইবেক, পিতা যেরূপ মাসহারা পাইতেন, পুত্রও সেইরূপ পাইতে লাগিলেন।

সর জন শোর সাহেব, নির্বিরোধে, পাঁচ বৎসর ভারতবর্ষের শাসনকার্য সম্পন্ন করিয়া, কর্ম পরিত্যাগের প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার অধিকার কালে, বাঙ্গালা দেশে লিখনোপযুক্ত কোনও ব্যাপার ঘটে নাই। কিন্তু, তদীয় শাসনকাল শেষ হইবার সময়ে, এক ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল। সৈন্যেরা অসন্তোষের চিহ্ন দর্শাইতে লাগিল। ঐ সময়ে, মহীশূরের অধিপতি টিপু সুলতান, সৈন্য দ্বারা আনুকূল্য পাইবার প্রার্থনায়, ফরাসিদিগের নিকট বারংবার আবেদন করিতে লাগিলেন। গত যুদ্ধে ইংরেজেরা তাঁহাকে যেরূপ খর্ব করিয়াছিলেন, তাহা তিনি, এক নিমিষের নিমিত্তেও, ভুলিতে পারেন নাই; অহোরাত্র, কেবল বৈরনির্যাতনের উপায় চিন্তা করিতেন। তিনি এমন আশা করিয়াছিলেন, ফরাসিদিগের সাহায্য লইয়া, ইংরেজদিগকে একবারে ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিবেন। ডিরেক্টরেরা, এই সমস্ত বিষয়ের সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া, স্থির করিলেন যে, এমন সময়ে কোনও বিচক্ষণ ক্ষমতাপন্ন লোককে গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠান উচিত। অনন্তর, তাঁহারা লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবকে পুনর্বার ভারতবর্ষীয় রাজশাসনের ভারগ্রহণার্থ অনুরোধ করিলেন; এবং তিনিও তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

কিন্তু, আসিবার সমুদয় আয়োজন হইয়াছে, এমন সময়ে তিনি আয়র্লণ্ডে রাজপ্রতিনিধির পদে নিযুক্ত হইলেন। ডিরেক্টরেরা, বিলম্ব না করিয়া, লার্ড ওয়েলেসলিকে গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। ইহারই নামান্তর লার্ড মর্নিঙ্গটন। এই লার্ড বাহাদুর লার্ড কর্ণওয়ালিস মহোদয়ের ভ্রাতার নিকট শিক্ষা পাইয়াছিলেন; এবং, সবিশেষ অনুরাগ ও পরিশ্রম সহকারে, ভারতবর্ষীয় রাজনীতি বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি ১৭৯৮ সালের ১৮ই মে, কলিকাতায় পঁহুছিলেন। গোলযোগের সময়ে, যেরূপ দূরদৃষ্টি, পরাক্রম ও বিজ্ঞতা সহকারে কার্য করা আবশ্যক, সে সমুদায়ই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষীয় শাসনকার্যের ভারগ্রহণ করিবামাত্র, ইংরেজদিগের সাম্রাজ্য বিষয়ক সমস্ত আশঙ্কা একবারে অন্তর্হিত হইল।

তিনি ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া, দেখিলেন, টাকা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য; সৈন্য সকল একে অকর্মণ্য, তাহাতে আবার অসন্তুষ্ট হইয়া আছে; উত্তরে সিন্ধিয়া, দক্ষিণে টিপু সুলতান, পূর্ণ শত্রু হইয়া, বিভীষিকা দর্শাইতেছেন; ফরাসিদিগের, দিন দিন, ভারতবর্ষে বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব বাড়িতেছে। তিনি, অতি ত্বরায়, সৈন্য সকল সম্যক্ কর্মণ্য করিয়া তুলিলেন; যে সকল ফরাসিসেনাপতি, বহু সৈন্য সহিত, হায়দরাবাদে বাস করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে দূরীভূত করিলেন; আর, তাঁহারা যে সকল সৈন্যের সংগ্রহ করিয়া-

ছিলেন, সে সমুদয়ের শ্রেণীভঙ্গ করিয়া দিলেন ; তাহাদের পরিবর্তে, সেই স্থানে ইংরেজী সেনা স্থাপিত করিলেন ; এবং, একবারেই টিপুর সহিত যুদ্ধের ঘোষণা করিয়া দিলেন। সমুদয় শত্রু মধ্যে, তিনিই অত্যন্ত উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

মান্দ্রাজের কৌন্সিলের সাহেবেরা, লার্ড ওয়েলেসলির মতের পোষকতা না করিয়া, বরং তাঁহার প্রতিকূলবর্তী হইয়াছিলেন। তিনি, অবিলম্বে, মান্দ্রাজে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদের তাদৃশ ব্যবহারের নিমিত্ত যথোচিত তিরস্কার করিয়া, স্বয়ং, সমস্ত বিষয়ের নির্বাহ করিতে লাগিলেন ; এবং, সত্বর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, ১৭৯৯ খৃঃ অব্দের ২৭শে মার্চ, টিপু স্থলতানকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত, সৈন্যপ্রেরণ করিলেন। টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন, মে মাসের চতুর্থ দিবসে, ইংরেজদিগের হস্তগত হইল। এই যুদ্ধে টিপু প্রাণ-ত্যাগ করিলেন। হায়দর পরিবারের রাজ্যাধিকার শেষ হইল। ডিরেক্টরেরা, এই সংগ্রামের সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া, গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরকে বার্ষিক পঞ্চাশ সহস্র টাকার পেনশন প্রদান করিলেন।

লার্ড ওয়েলেসলি, সিবিল সরবেণ্টদিগকে দেশীয় ভাষায় নিতান্ত অজ্ঞ দেখিয়া, ১৮০০খৃঃ অব্দে, কলিকাতায় কালেজ অব ফোর্ট উইলিয়ম নামক বিদ্যালয় স্থাপিত করিলেন। সিবিলেরা ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় পঁহুছিলে, তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ এই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে হইত। তাঁহারা যাবৎ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইতেন, তাবৎ কর্মে নিযুক্ত হইতে পারিতেন না। এই বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থে, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষাতে, কতিপয় পুস্তক সংগৃহীত ও মুদ্রিত হইল। এই বিদ্যালয়ের সংস্থাপন সংবাদ ডিরেক্টরদিগের নিকটে পঁহুছিলে, তাঁহারা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন ; কিন্তু, বহুব্যয়সাধ্য হইয়াছে বলিয়া, সকল বিষয়ের সংক্ষেপ করিতে আজ্ঞাপ্রদান কবিলেন।

১৮০৩ খৃঃ অব্দে, লার্ড ওয়েলেসলি বাহাদুরকে সিন্ধিয়া ও হোলকারের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। এই দুই পরাক্রান্ত রাজ, অল্প দিনেই, পরাজিত ও খর্বীকৃত হইলেন। তাঁহাদের রাজ্যের অনেক অংশ ইংরেজদিগের সাম্রাজ্যে যোজিত হইল। সেপ্টেম্বর মাসে, ইংরেজেরা মুসলমানদিগের প্রাচীন রাজধানী দিল্লীনগর প্রথম অধিকার করিলেন। পূর্বে, মহারাষ্ট্রীয়েরা দিল্লীশ্বরের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন। এক্ষণে, ইংরেজেরা তাঁহাকে সম্রাটের পদে পুনঃস্থাপিত করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রভুশক্তি রহিল না। তিনি কেবল বার্ষিক পনর লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইতে লাগিলেন।

এই সময়ে নাগপুরের রাজার সহিত বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে, লার্ড ওয়েলেসলি বাহাদুর, অবিলম্বে, উড়িষ্যায় সৈন্যপ্রেরণ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা যুদ্ধে ভঙ্গ দেওয়াতে, ১৮০৩ খৃঃ অব্দে, সেপ্টেম্বরের অষ্টাদশ দিবসে, ইংরেজদিগের সেনা জগন্নাথের মন্দির অধিকার করিল। তদবধি সমুদয় উড়িষ্যা দেশ পুনরায় বাঙ্গালারাজ্যের অন্তর্ভূত হইল। ৪৮ বৎসর

পূর্বে, আলিবর্দি খাঁ, আপন অধিকারের শেষ বৎসরে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে এই দেশ সমর্পণ করেন। ইংরেজেরা, পুরীর পুরোহিতদিগের প্রতি, অতিশয় দয়া ও সমাদর প্রদর্শন করিলেন এবং পুরী সংক্রান্ত আয় ব্যয় প্রভৃতি তাবৎ ব্যাপারই, পূর্ববৎ, তাঁহাদিগকে আপন বিবেচনা অনুসারে সম্পন্ন করিতে কহিলেন। কিন্তু, তিন বৎসর পরে, ইংরেজেরা, করবৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে, মন্দিরের অধ্যক্ষতাগ্রহণ ও নিজের লোক দ্বারা কর সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সংগৃহীত ধনের কিয়দংশ মাত্র দেবসেবায় নিযোজিত হইত, অবশিষ্ট সমুদয় কোম্পানির ধনাগারে প্রবেশ করিত।

বহুকাল অবধি ব্যবহাব ছিল, পিতা মাতা, গঙ্গাসাগরে গিয়া, শিশু সন্তান সাগর জলে নিক্ষিপ্ত কবিতেন। তাঁহাবা এই কর্ম ধর্মবোধে কবিতেন বটে; কিন্তু ধর্মশাস্ত্রে ইহার কোনও বিধি নাই। গবর্ণব জেনেবল বাহাদুর, এই নৃশংস ব্যবহাব একেবাবে উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত, ১৮০২ সালের ২০শে আগষ্ট, এক আইনজারী কবিলেন ও তাহার পোষকতাব নিমিত্ত, গঙ্গাসাগবে এক দল সিপাই পাঠাইয়া দিলেন। তদবধি এই নৃশংস ব্যবহার একেবারে বহিত হইয়া গিয়াছে।

লার্ড ওয়েলেসলি এই মহারাজ্যের প্রায় তৃতীযাংশ বৃদ্ধি কবেন এবং, রাজস্ববৃদ্ধি করিয়া, পনর কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা স্থিত করেন। কিন্তু, তিনি নিয়ত সংগ্রামে লিপ্ত থাকাতে, রাজস্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, ঋণেরও বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছিল। ডিরেক্টরেরা, তাঁহাব এরূপ যুদ্ধবিষয়ক অনুরাগ দর্শনে, যৎপরোনাস্তি অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন, এবং যাহাতে শান্তি-সংস্থাপনপূর্বক রাজশাসন সম্পন্ন হয়, এমন কোনও উপায় অবলম্বন করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ ব্যগ্র হইলেন।

লার্ড ওয়েলেসলি দেখিলেন, আর তাঁহার উপর ডিরেক্টরদিগের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নাই। এজন্য, তিনি, তাঁহাদেব লিখিত পত্রের উত্তর লিখিয়া, কর্ম পরিত্যাগ করিলেন; এবং, ১৮০৫ খৃঃ অব্দের শেষে, ইংলণ্ড গমনার্থ জাহাজে আরোহণ করিলেন।

ডিরেক্টরেরা, ক্ষতিস্বীকার করিয়াও, শান্তিস্থাপন ও ব্যয়লাঘব করা কর্তব্য স্থির করিয়া, লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবকে পুনর্বার গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিলেন। তৎকালে তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং, জাহাজে আরোহণ করিয়া, ১৮০৫ খৃঃ অব্দের ৩০শে জুলাই, কলিকাতায উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি, কালবিলম্ব না করিয়া, ভারতবর্ষীয় ভূপতিদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবাব নিমিত্ত, পশ্চিম অঞ্চলে গমন করিলেন। কিন্তু তিনি পশ্চিম অভিমুখে যত গমন করিতে লাগিলেন, ততই শারীরিক দুর্বল হইতে লাগিলেন; পরিশেষে, গাজীপুরে উপস্থিত হইয়া ঐ বৎসরের ৫ই অক্টোবর, কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। ইংলণ্ডে তাঁহার মৃত্যু

সংবাদ পঁহুছিলে, ডিরেক্টরেরা, তাঁহার উপর আপনাদের অনুরাগ দর্শাইবার নিমিত্ত, তাঁহার পুত্রকে চারি লক্ষ টাকা উপহার দিলেন।

কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর সর জর্জ বার্লো সাহেব গবর্ণর জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ডিরেক্টরেরা তাঁহাকে এই উচ্চ পদে নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু রাজমন্ত্রীরা কহিলেন, এই পদে লোক নিযুক্ত করা আমাদের অধিকার। এই বিষয়ে বিস্তর বাদানুবাদ উপস্থিত হইল। পরিশেষে, লার্ড মিণ্টোকে গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করাতে, সে সমুদয়ের মীমাংসা হইয়া গেল। সর জর্জ বার্লো সাহেবের অধিকারকালে, গবর্ণমেণ্ট শ্রীক্ষেত্রযাত্রীদিগের নিকট মাসুল আদায়ের ও মন্দিরের অধ্যক্ষতার ভার স্বহস্তে লইয়াছিলেন। যাত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধির নিমিত্ত, নানা উপায় করা হইয়াছিল। ইহাতে রাজস্বের যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়। তৎকালে এই যে প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, উহা প্রায় ত্রিশ বৎসরের অধিক প্রবল থাকে।

লার্ড মিণ্টো বাহাদুর, ১৮০৭ খৃঃ অব্দের ৩১শে জুলাই, কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি, ১৮১৩ খৃঃ অব্দের শেষ পর্যন্ত, রাজশাসন সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই সময় মধ্যে, বাঙ্গালাদেশে রাজকার্যের কোনও বিশেষ পরিবর্ত হয় নাই; কেবল পঞ্চোত্তরা মাসুল বিষয়ে, পূর্ব অপেক্ষা কঠিন নিয়মে, নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছিল। লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব, ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে, এই নিয়ম রহিত করিয়া যান; পরে ১৮০১ খৃঃ অব্দে, পুনর্বার প্রবর্তিত হয়। এইরূপে রাজস্বের বৃদ্ধি হইল বটে; কিন্তু বাণিজ্যের বিস্তর ব্যাঘাত জন্মিতে ও প্রজাদের উপর ঘোরতর অত্যাচার হইতে লাগিল।

১৮১০ খৃঃ অব্দে, ইংরেজেরা, ফরাসিদিগকে পরাজিত করিয়া, বুর্বোঁ ও মরিশস নামক দুই উপদ্বীপ অধিকার করিলেন, এবং তৎপর বৎসর, ওলন্দাজদিগকে পরাজিত করিয়া জাবা নামক সমৃদ্ধ উপদ্বীপের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

বিংশতি বৎসর পূর্বে কোম্পানি বাহাদুর যে চার্টর অর্থাৎ সনন্দ লইয়াছিলেন, তাহার মিয়াদ পূর্ণ হওয়াতে, ১৮১৩ খৃঃ অব্দে, নূতন চার্টর গৃহীত হইল। এই উপলক্ষে এতদ্দেশীয় রাজকার্য সংক্রান্ত কয়েকটি নিয়মের পরিবর্ত হইয়াছিল। দুইশত বৎসরের অধিক কাল অবধি, ইংলণ্ডের মধ্যে কেবল কোম্পানি বাহাদুরের ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার অধিকার ছিল। কিন্তু এক্ষণে কোম্পানি বাহাদুর ভারতবর্ষের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রাজ্যেশ্বরের বাণিজ্য করা উচিত নহে, এই বিবেচনায়, নূতন বন্দোবস্তের সময়, কোম্পানি বাহাদুরের কেবল রাজ্যশাসনের ভার রহিল। আর অন্যান্য বণিকদিগের বাণিজ্যে অধিকার হইল। পূর্বে কোম্পানির কর্মচারী ভিন্ন অন্যান্য য়ুরোপীয়দিগকে, ভারতবর্ষে আসিবার অনুমতি প্রাপ্তি বিষয়ে, যে ক্লেশ পাইতে হইত, তাহা একবারে নিবারিত হইল। এক্ষণে, ডিরেক্টরেরা যাহাদিগকে অনুমতি দিতে চাহিতেন

না, তাহারা বোর্ড অব কণ্ট্রোল নামক সভাতে আবেদন করিয়া, কৃতকার্য হইতে লাগিল।

১৮১৩ খৃঃ অব্দের ৪ঠা অক্টোবর, লার্ড মিণ্টো বাহাদুর, লার্ড ময়রা বাহাদুরের হস্তে ভারতবর্ষীয় রাজ্যশাসনের ভারসমর্পণ করিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন; কিন্তু আপন আলয়ে উপস্থিত হইবার পূর্বেই, তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল। পরিশেষে, লার্ড ময়রা বাহাদুরের নাম মারকুইস অব হেষ্টিংস হইয়াছিল।

নবম অধ্যায়

লার্ড হেষ্টিংস গবর্ণমেণ্টের ভার গ্রহণ করিয়া দেখিলেন, নেপালীয়েরা, ক্রমে ক্রমে, ইংরেজদিগের অধিকৃত দেশ আক্রমণ করিয়া আসিতেছেন। সিংহাসনারূঢ় রাজপরিবার, একশত বৎসরের মধ্যে নেপালে আধিপত্য স্থাপন করিয়া, ক্রমে ক্রমে রাজ্যের বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। লার্ড মিণ্টো বাহাদুরের অধিকারকালে, নানা বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। লার্ড হেষ্টিংস দেখিলেন, নেপালাধিপতির সহিত যুদ্ধ অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। তিনি প্রথমতঃ, সন্ধিরক্ষার্থে যথোচিত চেষ্টা করিলেন; কিন্তু নেপালেশ্বরের অসহনীয় প্রগল্‌ভতা দর্শনে পরিশেষে, ১৮১৪ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। প্রথম যুদ্ধে কোনও ফলোদয় হইল না; কিন্তু ১৮১৫ খৃঃ অব্দের যুদ্ধে, ইংরেজদিগের সেনাপতি অক্টরলোনি বাহাদুর সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন। তখন, আপন রাজ্যের এক বৃহৎ অংশ পণ দিয়া, নেপালাধিপতিকে সন্ধিক্রয় করিতে হইল।

ভারতবর্ষের মধ্যভাগে, পিণ্ডারী নামে প্রসিদ্ধ বহুসংখ্যক অশ্বারোহ দস্যু বাস করিত। অনেক বৎসর অবধি, ঐ অঞ্চলের দেশলুণ্ঠন তাহাদের ব্যবসায় হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে, তাহারা ইংরেজদিগের অধিকার মধ্যে প্রবেশ করে। ঐ অঞ্চলের অনেক রাজা তাহাদের সম্পূর্ণ সহায়তা করিতেন। তাহারা পাঁচশত ক্রোশের অধিক দেশ ব্যাপিয়া, লুঠ করিত। তাহাদের নিবারণের নিমিত্ত, ইংরেজদিগকে একদল সৈন্য রাখিতে হইয়াছিল। তাহাতে প্রতিবৎসর যে খরচ পড়িতে লাগিল, তাহা অত্যন্ত অধিক বোধ হওয়াতে, পরিশেষে ইহাই যুক্তিযুক্ত ও পরামর্শসিদ্ধ স্থির হইল যে, সর্বদা এরূপ করা অপেক্ষা, একবার এক মহাদ্যোগ করিয়া, তাহাদিগকে নির্মূল করা আবশ্যক।

অনন্তর, লার্ড হেষ্টিংস বাহাদুর, ডিরেক্টর সমাজের অনুমতি লইয়া, তিন রাজধানী হইতে বহুসংখ্যক সৈন্যের সংগ্রহ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। সংগৃহীত সৈন্য, এই দুর্বৃত্ত দস্যুদিগের বাসস্থান রুদ্ধ করিয়া, একে একে, তাহাদের সকল দলকেই উচ্ছিন্ন করিল।

ইংরেজদের সেনা, পিণ্ডারীদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে নিযুক্ত আছে, এমন সময়ে, পেশোয়া, হোলকার ও নাগপুরের রাজা, ইহারা সকলে, এককালে এক পরামর্শ হইয়া, এই আশায় ইংরেজদিগের প্রতিকূলবর্তী হইয়া উঠিলেন যে সকলেই একবিধ যত্ন করিলে, ইংরেজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু ইহারা সকলেই পরাজিত হইলেন। নাগপুরের রাজা ও পেশোয়া সিংহাসনচ্যুত হইলেন। তাঁহাদের রাজ্যের অধিকাংশ ইংরেজদিগের অধিকারভুক্ত হইল। উল্লিখিত ব্যাপারের নির্বাহকালে, লার্ড হেষ্টিংসের পঁয়ষট্টি বৎসর বয়ঃক্রম; তথাপি, তাদৃশ গুরুতর কার্যের নির্বাহ বিষয়ে যেরূপ বিবেচনা ও উৎসাহের আবশ্যকতা, তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত করিয়াছিলেন। পিণ্ডারী ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের পরাক্রম একবারে লুপ্ত হইল, এবং ইংরেজেরা ভারতবর্ষে সর্বপ্রধান হইয়া উঠিলেন।

লার্ড হেষ্টিংস বাহাদুরের অধিকারের পূর্বে, প্রজাদিগকে বিদ্যাদান করিবার কোনও অনুষ্ঠান হয় নাই। প্রজাবা অজ্ঞান কূপে পতিত থাকিলে, কোনও কালে, রাজ্যভঙ্গের আশঙ্কা থাকে না; এই নিমিত্ত, তাহাদিগকে বিদ্যাদাম করা রাজনীতির বিরুদ্ধ বলিয়াই পূর্বে বিবেচিত হইত। কিন্তু লার্ড হেষ্টিংস বাহাদুব, এই সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়া, কহিলেন, ইংবেজরা, প্রজাদের মঙ্গলেব নিমিত্তই, ভারতবর্ষে রাজ্যাধিকার স্থাপিত কবিযাছেন; অতএব, সর্বপ্রযত্নে, প্রজার সভ্যতাসম্পাদন ইংরেজ জাতিব অবশ্যকর্তব্য। অনন্তর, তদীয় আদেশ অনুসারে, স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে লাগিল।

১৮২৩ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে, হেষ্টিংস ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি, নয় বৎসর কাল গুরুতর পরিশ্রম করিয়া, কোম্পানির রাজ্য ও রাজস্বের বিলক্ষণ বৃদ্ধি ও ঋণের পরিশোধ করেন। ইহার পূর্বে, ইংরেজদের ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্যের এরূপ সমৃদ্ধি কদাপি দৃষ্ট হয় নাই। ধনাগাব ধনে পরিপূর্ণ, এবং সমস্ত ব্যয়ের সমাধা করিয়া, বৎসরে প্রায় দুই কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইতে লাগিল।

অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন রাজমন্ত্রী জর্জ ক্যানিং ভারতবর্ষীয় রাজকার্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন। লার্ড হেষ্টিংস বাহাদুর কর্মপরিত্যাগ করিলে, তিনি গবর্ণর জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

তাঁহার আসিবার সমুদয় উদ্যোগ হইয়াছে, এমন সময়ে অন্য এক রাজমন্ত্রীর মৃত্যু হওয়াতে, ইংলণ্ডে এক অতি প্রধান পদ শূন্য হইল, এবং ঐ পদে তিনিই নিযুক্ত হইলেন। তখন ডিরেক্টরেরা লার্ড আমহার্স্ট বাহাদুরকে, গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিয়া, ভারতবর্ষে পাঠাইলেন। এই মহোদয়, দশ বৎসর পূর্বে, ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া, চীনদেশের রাজধানী পেকিন নগরে গমন করিয়াছিলেন। তিনি, ১৮২৩ খৃঃ অব্দের ১লা আগস্ট, কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলেন। লার্ড হেষ্টিংস বাহাদুরের প্রস্থান

অবধি, লার্ড আমহর্স্ট বাহাদুরের উপস্থিতি পর্যন্ত, কয়েকমাস, কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর জন আদম সাহেব গবর্ণর জেনেরলের কার্যনির্বাহ করেন। তাঁহার অধিকার কালে, বিশেষ কার্যের মধ্যে, কেবল মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার উচ্ছেদ হইয়াছিল।

লার্ড আমহর্স্ট বাহাদুর, কলিকাতায় পঁহুছিয়া, দেখিলেন, ব্রহ্মদেশীয়েরা অত্যন্ত অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইংরেজেরা যে সময়ে বাঙ্গালাদেশে অধিকার স্থাপন করেন, ব্রহ্মদেশের তৎকালীন রাজাও, প্রায় সেই সময়েই, তত্রত্য সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি মণিপুর ও আসাম অনায়াসে হস্তগত করেন, এবং, সেই গর্বে উদ্ধত হইয়া, মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে, বাঙ্গালাদেশও হস্তগত করিবেন। তিনি, ইংরেজদের সহিত সন্ধি সত্ত্বেও, সন্ধির নিয়মলঙ্ঘন করিয়া কোম্পানির অধিকারভুক্ত কাচার ও আরাকান দেশে স্বীয় সৈন্য পাঠাইয়া দেন। আরাকান উপকূলে, টিকনাফ নদীর শিরোভাগে, শাপুরী নামে যে উপদ্বীপ আছে, ব্রহ্মেশ্বর তাহা আক্রমণ করিয়া, তথায় ইংরেজদিগের যে অল্পসংখ্যক রক্ষক ছিল, তাহাদের প্রাণবধ করেন। আরায় দূতপ্রেরণ করিয়া, এরূপ অনুষ্ঠানের হেতুজিজ্ঞাসা করাতে, তিনি সাতিশয় গর্বিত বাক্যে এই উত্তর দেন, ঐ উপদ্বীপ আমার অধিকারে থাকিবেক, ইহার অন্যথা হইলে, আমি বাঙ্গালা আক্রমণ করিব।

এই সমস্ত অত্যাচার দেখিয়া, গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর, ১৮২৪ খৃঃ অব্দের ৬ই মে, ব্রহ্মাধিপতির সহিত যুদ্ধের ঘোষণা করিলেন। ইংরেজেরা, ১১ই মে, ব্রহ্মরাজ্যে সৈন্য উত্তীর্ণ করিয়া, রেঙ্গুনের বন্দর অধিকার করিলেন। তৎপরে, আসাম, আরাকান, ও মরগুই নামক উপকূল তাঁহাদের হস্তগত হইল। ইংরেজদিগের সেনা, ক্রমে ক্রমে, আরা রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিল, এবং প্রয়াণকালে, বহুতর গ্রাম, নগর অধিকারপূর্বক, ব্রহ্মরাজের সেনাদিগকে পদে পদে পরাজিত করিতে লাগিল। ১৮২৬ খৃঃ অব্দের আরম্ভে, ইংরেজদিগের সেনা অমরপুরের প্রত্যাসন্ন হইলে, রাজা, নিজ রাজধানীর রক্ষার্থে, ইংরেজদিগের প্রস্তাবিত পণেই, সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন। অনন্তর, এক সন্ধিপত্র প্রস্তুত হইল; ঐ সন্ধিপত্র যান্দাবুসন্ধিপত্র নামে প্রসিদ্ধ। তদ্দ্বারা ব্রহ্মাধিপতি ইংরেজদিগকে মণিপুর, আসাম, আরাকান, ও সমুদয় মার্তাবান উপকূল ছাড়িয়া দিলেন; এবং যুদ্ধের ব্যয় ধরিয়া দিবার নিমিত্ত, এক কোটি টাকা দিতে সম্মত হইলেন।

যৎকালে ব্রহ্মদেশীয়দিগের সহিত যুদ্ধ হইতেছিল, ঐ সময়ে ভরতপুরের অধিপতি দুর্জনশালের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। তিনি, আপন ভ্রাতা মাধু সিংহের সহিত পরামর্শ করিয়া, নিজ পিতৃব্যপুত্র অপ্রাপ্ত ব্যবহার বলবন্ত সিংহের হস্ত হইতে রাজ্যাধিকার গ্রহণ করিবার উদ্যম করিয়াছিলেন। সর চার্লস মেটকাফ সাহেব, দুর্জনশালকে বুঝাইবার জন্য, বিস্তর চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু কোনও ফলোদয় হইল না। তখন

স্পষ্ট বোধ হইল, শস্ত্রগ্রহণ ব্যতিরেকে এ বিষয়ের মীমাংসা হইবেক না। বিশেষতঃ, এই স্থান অধিকার করা ইংরেজেরা অত্যন্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন। ১৮০৫ খৃঃ অব্দে, ইংরেজদিগের সেনাপতি, লার্ড লেক, ঐ স্থান অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে অধিক সেনা ও অনেক সেনাপতির প্রাণবিনাশ হয়। ইংরেজেরা, এ পর্যন্ত, যত দুর্গের অবরোধ করেন, তন্মধ্যে কেবল ভরতপুরের দুর্গই অধিকার করিতে পারেন নাই। ইহাতে, সমস্ত ভারতবর্ষ মধ্যে, এই জনরব হইয়াছিল, ইংরেজেরা এই দুর্গ কখনই অধিকার করিতে পারিবেন না। উহার চতুর্দিকে, অতি প্রশস্ত মৃণ্ময় পাদদেশে, এক বৃহৎ পরিখা ছিল।

তৎকালে অনেক সৈন্য ব্রহ্মদেশীয় যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিলেও, বিংশতি সহস্র সৈন্য ও একশত কামান ভরতপুরের সম্মুখে অবিলম্বে নীত হইল। ভারতবর্ষীয় সমুদায় লোক, প্রগাঢ় ঔৎসুক্য সহকারে, এই ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ২৩শে ডিসেম্বর, যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১৮২৬ খৃঃ অব্দের ১৮ই জানুয়ারী, প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ, লার্ড কম্বরমীর বাহাদুর, ঐ স্থান অধিকার করিলেন। দুর্জনশাল ইংরেজদিগের হস্তে পতিত হওয়াতে, তাঁহারা তাঁহাকে এলাহাবাদের দুর্গে রুদ্ধ করিলেন।

১৮২৭ খৃঃ অব্দে, লার্ড আমহর্স্ট বাহাদুর, পশ্চিম অঞ্চলে গমন করিয়া, দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। বাদশাহের সহিত, কোম্পানির ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্য বিষয়ে, কথোপকথন উপস্থিত হওয়াতে, গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর স্পষ্ট বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, ইংরেজেরা আর এখন তৈমুরবংশীয়দিগের অধীন নহেন; রাজসিংহাসন এক্ষণে তাঁহাদের হইয়াছে। দিল্লীর রাজপরিবার এই কথা শুনিয়া বিষাদসমুদ্রে মগ্ন হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট, অশেষ প্রকারে, অবমানিত হইয়াছিলাম বটে; কিন্তু হিন্দুস্থানের বাদশাহনামের অন্যথা হয় নাই। এক্ষণে, রাজ্যাধিকার চিরকালের নিমিত্ত হস্তবহির্ভূত হইল। ইংরেজদের এই ব্যবহারে ভারতবর্ষবাসী সমুদয় লোক অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন।

লার্ড আমহার্স্ট বাহাদুর উইলিয়ম বটরওয়ার্থ বেলিসাহেবের হস্তে গবর্ণমেণ্টের ভারার্পণ করিয়া, ১৮২৮ খৃঃ অব্দের মার্চ মাসে, ইংলণ্ডে গমন করিলেন; তাঁহার কর্মপরিত্যাগের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইলে, লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক উক্ত পদের নিমিত্ত, ডিরেক্টরদিগের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। বিংশতি বৎসর পূর্বে, তিনি মান্দ্রাজের গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ডিরেক্টরেরা, কোনও কারণবশতঃ উদ্ধত হইয়া, অন্যায় করিয়া, তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। এক্ষণে তাঁহারা, উপস্থিত বিষয়ে তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া, ১৮২৭ সালে, গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিলেন। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক, তৎকালে ইংলণ্ডে, এই প্রধান পদের নিমিত্ত, তত্তুল্য উপযুক্ত ব্যক্তি অতি অল্প পাওয়া যাইত।

লার্ড বেন্টিক বাহাদুর, ১৮২৮ সালের ৪ঠা জুলাই, কলিকাতায় পঁহুছিলেন। ছয় বৎসর পূর্বে, লার্ড হেষ্টিংসের অধিকার কালে, ভারতবর্ষের ধনাগার ধনে পরিপূর্ণ হয়; এই সময়ে, তাহা একেবারে শূন্য হইয়াছিল। আয় অপেক্ষা ব্যয় অনেক অধিক। লার্ড উইলিয়ম বেন্টিক ডিরেক্টরদিগের নিকট প্রতিজ্ঞা করেন, আমি নিঃসন্দেহ ব্যয়ের লাঘব করিব। তিনি, কলিকাতায় পঁহুছিবার অব্যবহিত পরেই, রাজস্ব বিষয়ে দুই কমিটিস্থাপিত করিলেন। তাঁহাদের উপর এই ভার হইল যে, সিবিল ও মিলিটারি বিষয়ে যে ব্যয় হইয়া থাকে, তাহার পরীক্ষা করিবেন, এবং তন্মধ্যে কি কমান যাইতে পারে, তাহা দেখাইয়া দিবেন। তাঁহারা যেরূপ পরামর্শ দিলেন, তদনুসারে সমুদয় কর্মস্থানে, ব্যয়ের লাঘব করা গেল। এরূপ কর্ম করিলে, কাজে কাজেই, অপ্রিয় হইতে হয়। লার্ড উইলিয়ম বেন্টিক, ব্যয়-লাঘব করিয়া, কোর্টের যে আদেশ প্রতিপালন করিলেন, তাহাতে যাহাদের ক্ষতি হইল, তাহারা তাঁহাকে বিস্তর গালি দিয়াছিল। ফলতঃ যে রাজকর্মচারীকে রাজ্যের ব্যয় লাঘব করিবার ভারগ্রহণ করিতে হয়, তিনি কখনই, তদানীন্তন লোকের নিকট, সুখ্যাতি লাভের প্রত্যাশা করিতে পারেন না। সকলেই, তাঁহার বিপক্ষ হইয়া, চারিদিক কোলাহল করিতে লাগিল। তিনি, তাহাতে ক্ষুব্ধ বা চলচিত্ত না হইয়া, কেবল ব্যয়-লাঘব ও ঋণপরিশোধের উপায় দেখিতে লাগিলেন।

অনেক বৎসর অবধি, গবর্ণমেণ্ট সহগমননিবারণার্থে সবিশেষ উৎসুক হইয়াছিলেন, এবং কত স্ত্রী সহমৃতা হয়, এবং দেশীয় লোকদিগেরই বা তদ্বিষয়ে কিরূপ অভিপ্রায়, ইহার নির্ণয় করিবার নিমিত্ত, অনেক অনুসন্ধানও হইয়াছিল। রাজপুরুষেরা অনেকেই কহিয়াছিলেন, দেশীয় লোকদিগের এ বিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগ আছে; ইহা রহিত করিলে অনর্থ ঘটিতে পারে। লার্ড উইলিয়ম বেন্টিক, কলিকাতায় পঁহুছিয়া, এই বিষয়ে বিশিষ্টরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, ইহা অনায়াসে রহিত করা যাইতে পারে। কৌন্সিলের সমুদয় সাহেবরা তাঁহার মতে সম্মত হইলেন। তদনন্তর, ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর, এক আইন জারী হইল; তদনুসারে, ইংরেজদিগের অধিকার মধ্যে, এই নৃশংস ব্যাপার একবারে রহিত হইয়া গেল।

কতকগুলি ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালি, এই হিতানুষ্ঠানকে অহিত জ্ঞান করিলেন, এবং তাঁহাদের ধর্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইল বলিয়া, গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের নিকট এই প্রার্থনায় আবেদন করিলেন যে, ঐ আইন রদ করা যায়। লার্ড উইলিয়ম, এই ধর্ম রহিত করিবার বহুবিধ প্রবল যুক্তির প্রদর্শন পূর্বক, তাঁহাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। সেই সময়ে, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায়চৌধুরী প্রভৃতি, কতকগুলি সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালি লার্ড উইলিয়ম বেন্টিক বাহাদুরকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন; তাহার মর্ম এই, আমরা, শ্রীযুতের এই দয়ার কার্যে অনুগৃহীত হইয়া, ধন্যবাদ করিতেছি।

যাঁহারা সহগমনের পক্ষ ছিলেন, তাঁহারা, অবিলম্বে, কলিকাতায় এক ধর্মসভার স্থাপন ও চাঁদা করিয়া অর্থসংগ্রহ করিলেন, এবং, এই বিধি পুনঃস্থাপিত হয়, এই প্রার্থনায়, ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট দরখাস্ত দিবার নিমিত্ত, একজন ইংরেজ উকীলকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু তথাকার রাজমন্ত্রীরা, সহগমনের অনুকূল যুক্তি সকল শ্রবণ-গোচর করিয়া, পরিশেষে নিবারণ পক্ষই দৃঢ় করিলেন। বহুকাল অতীত হইল, সহমরণ রহিত হইয়াছে, এই দীর্ঘকাল মধ্যে, প্রজাদিগেব অসন্তোষের কোনও লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই। ফলতঃ, এক্ষণে এই নিষ্ঠুব ব্যবহাব প্রায সকলে বিস্মৃত হইয়াছেন। যদি ইহা ইতিহাস গ্রন্থে উল্লিখিত না থাকে, তাহা হইলে, উত্তরকালীন লোকেরা, এরূপ নৃশংস ব্যবহাব কোনও কালে প্রচলিত ছিল, এ বিষয়ে, বোধ হয়, প্রত্যয় করিবেক না।

১৮৩১ সালে, বিচারালযেব রীতিব অনেক পবিবর্ত আবব্ধ হইল। বাঙ্গালিবা, এ পর্যন্ত, অতি সামান্য বেতনে নিযুক্ত হইযা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমাব বিচার কবিতেন। লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, দেশীয লোকদিগেব মান সম্ভ্রম বাডাইবাব নিমিত্ত, তাঁহাদিগকে উচ্চ বেতনে উচ্চপদে নিযুক্ত করিতে মনন কবিলেন। এই বৎসবে, মুন্সেফ ও সদর আমীনদিগেব বেতন ও ক্ষমতাব বৃদ্ধি হইল, এবং উচ্চতব বেতনে, অতি সম্ভ্রান্ত প্রধান সদব আমীনী পদ নতন সংস্থাপিত হইল। দেওয়ানী বিষয়ে প্রধান সদর আমীনদিগের যথেষ্ট ক্ষমতা হইল। বেজিস্টাবেব পদ ও প্রবিন্সল কোর্ট উঠিয়া গেল; কেবল দেশীয় বিচাবকেব ও জিলাজজেব পদ এবং সদব দেওযানী আদালত, বজায় থাকিল। ফলিতার্থ এই যে, মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণ ও তাহার নিষ্পত্তি কবণেব ভাব দেশীয় বিচাবকদিগেব হস্তে অর্পিত হইল; আব, জিলাব ইংরেজ জজদিগের উপর কেবল আপীল শুনিবার ভাব রহিল।

লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক ফৌজদারী আদালতেও অনেক সুরীতির স্থাপন করেন। পূর্বে, দায়রার সাহেবরা ছয় মাসে একবার আদালত করিতেন; কিয়ৎকাল পরে, কমিশনর সাহেবেরা তিনমাসে একবার। এক্ষণে এই হুকুম হইল, সিবিল ও সেশন জজেরা প্রতি-মাসে, এক একবার বৈঠক করিবেন। কয়েদী আসামী ও সাক্ষীদিগকে যে অধিক দিন ক্লেশ পাইতে হইত, তাহার অনেক নিবারণ হইল। ফলতঃ কার্যদক্ষ লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক বাহাদুরের অধিকারকালে, যে নানা সুনিয়ম সংস্থাপিত হয়, সে সমুদয়েরই প্রধান উদ্দেশ্য এই, দেশীয় লোকদিগের মান সম্ভ্রম বাড়ে ও সুশৃঙ্খলরূপে কার্যনির্বাহ হয়।

১৮৩১ খৃঃ অব্দে, রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ডে গমন করেন। তিনি কোম্পানি সংক্রান্ত অনেক সম্ভ্রান্ত কর্ম করিয়াছিলেন; সংস্কৃত, আরবী, পারসী, উর্দু, হিব্রু, গ্রীক, লাটিন, ইংরেজী, ফরাসি এই নয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন ও বিলক্ষণ বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, এবং স্বদেশীয় লোকদিগকে, দেব, দেবীর আরাধনা হইতে বিরত করিয়া, বেদান্তপ্রতিপাদিত

পরব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন। যে সকল ব্যক্তির সহিত তাঁহার মতের ঐক্য ছিল না, তাঁহারাও তদীয় বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতেন। রামমোহন রায় এ দেশের একজন অসাধারণ মনুষ্য ছিলেন, সন্দেহ নাই।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, লার্ড আমহর্স্ট বাহাদুরের অধিকারকালে, তৈমুরবংশীয়দিগের সাম্রাজ্যনিবন্ধন প্রাধান্য রহিত হয়। সম্রাট, অপহারিত মর্যাদার উদ্ধারবাসনায়, ইংলণ্ডে আপীল করিবার নিশ্চয় করিয়া, রাজা রামমোহন রায়কে উকীল স্থির করেন। পূর্বকালে, সমুদ্রযাত্রাস্বীকারে, ভারতবর্ষীয়দিগের নিন্দা ও অধর্ম হইত না; ইদানীন্তন সময়ে, কোনও ব্যক্তি জাহাজে গমন করিলে, তাহাকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয়। কিন্তু, রাজা রামমোহন রায়, অসঙ্কুচিত চিত্তে, জাহাজে আরোহণপূর্বক, ইংলণ্ডে গমন করেন। তিনি, তথায় উপস্থিত হইয়া, যার পর নাই সমাদর প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার এই যাত্রার প্রয়োজন সিদ্ধ হয় নাই। ইংলণ্ডেশ্বর, ত্রিশ বৎসরের বৃত্তিভোগী তৈমুরবংশীয়দিগের আধিপত্যের পুনঃস্থাপন বিষয়ে, সম্মত হইলেন না। কিন্তু, তাঁহাদের যে বৃত্তি নিরূপিত ছিল, রামমোহন রায় তাহার আর তিন লক্ষ টাকা বৃদ্ধির অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি স্বদেশ প্রত্যাগমনের পূর্বেই, দেহযাত্রাসংবরণপূর্বক, ব্রিস্টল নগরের সন্নিকৃষ্ট সমাধিক্ষেত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছেন।

১৮৩২ সাল অতিশয় দুর্ঘটনার বৎসর। যে সকল সওদাগরের হৌস, ন্যূনাধিক পঞ্চাশ বৎসর, চলিয়া আসিতেছিল, এই বৎসরে সে সকল দেউলিয়া হইতে লাগিল। সর্বপ্রথমে পামর কোম্পানির হৌস, ১৮৩০ সালে, দেউলিয়া হয়। আর পাঁচটার তৎপরে তিন চারি বৎসর পর্যন্ত কর্ম চলিয়াছিল; পরিশেষে, তাহারাও দেউলিয়া হইল। এই ব্যাপার ঘটাতে, সর্বসাধারণ লোকের ষোল কোটি টাকা ক্ষতি হয়। তন্মধ্যে, দেউলিয়াদিগের অবশিষ্ট সম্পত্তি হইতে, দুই কোটি টাকাও আদায় হয় নাই।

পূর্ব মেয়াদ অতীত হইলে, ১৮৩৩ সালে, কোম্পানি বাহাদুর পুনর্বার, বিংশতি বৎসরের নিমিত্ত, সনন্দ পাইলেন। এই উপলক্ষে, এতদ্দেশীয় রাজশাসনের অনেক নিয়ম পরিবর্তিত হইল। কোম্পানীকে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যে একবারে নিঃসম্পর্ক হইতে, ও সমুদায় কুঠী বেচিয়া ফেলিতে হইল। তৎপূর্ব বিশ বৎসর, চীনদেশীয় বাণিজ্যই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল; এক্ষণে, তাহাও ছাড়িয়া দিতে হইল। ফলতঃ দুইশত তেত্রিশ বৎসর পর্যন্ত, তাঁহারা যে বণিগ্‌বৃত্তি করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাতে একেবারে নিঃসম্বন্ধ হইয়া, রাজশাসন কার্যেই ব্যাপৃত হইতে হইল। কলিকাতায় এক বিধিদায়িনী সভার সংস্থাপনের অনুমতি হইল। এই নিয়ম হইল, তাহাতে কৌন্সিলের নিয়মত মেম্বরেরা, ও কোম্পানির কর্মচারী ভিন্ন আর একজন মেম্বর, বৈঠক করিবেন। এই নূতন সভার কর্তব্য এই নির্ধারিত হইল, যখন যেরূপ আবশ্যক হইবেক, ভারতবর্ষে তখন তদনুরূপ

আইন প্রচলিত করিবেন, এবং সুপ্রীম কোর্টের উপর কর্তৃত্ব ও তথাকার বন্দোবস্ত করিবেন। আর, সমুদয় দেশের জন্য এক আইন প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, লা কমিশন নামে এক সভা স্থাপিত হইল। গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর, সমুদয় ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান অধিপতি হইলেন; অন্যান্য রাজধানী তাঁহার অধীন হইল। বাঙ্গালার রাজধানী বিভক্ত হইয়া, কলিকাতা ও আগরা, দুই স্বতন্ত্র রাজধানী হইল।

লার্ড উইলিয়ম বেন্টিক, প্রজাগণের বিদ্যাবৃদ্ধি বিষয়ে যত্নবান হইয়া, ইংরেজী শিক্ষায় সবিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন। ১৮১৩ সালে, পার্লিমেণ্টের অনুমতি হয়, প্রজাদিগের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে, রাজস্ব হইতে, প্রতিবৎসর, লক্ষ টাকা দেওয়া যাইবেক। এই টাকা, প্রায় সমুদায়ই, সংস্কৃত ও আরবী বিদ্যার অনুশীলনে ব্যয়িত হইত। লার্ড উইলিয়ম বেন্টিক, ইংরেজী ভাষার অনুশীলনে তদপেক্ষা অধিক উপকার বিবেচনা করিয়া, উক্ত উভয় বিষয়ের ব্যয়সংক্ষেপ, ও স্থানে স্থানে ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন, করিবার অনুমতি দিলেন। তদবধি, এতদ্দেশে, ইংরেজী ভাষার বিশিষ্টরূপ অনুশীলন হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

লার্ড উইলিয়ম বেন্টিক, দেশীয় লোকদিগকে য়ুরোপীয় চিকিৎসা বিদ্যা শিখাইবার নিমিত্ত, কলিকাতায়, মেডিকেল কলেজ নামক বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া, দেশের সাতিশয় মঙ্গল-বিধান করিয়াছেন। চিকিৎসা বিষয়ে নিপুণ হইবার নিমিত্ত, ছাত্রদিগের যে যে বিদ্যার শিক্ষা আবশ্যক, সে সমুদয়ের পৃথক পৃথক অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন।

সকল ব্যক্তিই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিতে পারিবেক, এই অভিপ্রায়ে, লার্ড উইলিয়ম বেন্টিকের অধিকার সময়ে, সেবিংস বেঙ্ক স্থাপিত হয়। যদর্থে উহা স্থাপিত হয়, সম্পূর্ণরূপে তাহা সফল হইয়াছে।

লার্ড বেন্টিক বাহাদুর পঞ্চোত্তরা মাসুল বিষয়েও মনোযোগ দিয়াছিলেন। বহুকাল অবধি এই রীতি ছিল, দেশের এক স্থান হইতে স্থানান্তরে কোন দ্রব্য লইয়া যাইতে হইলে, মাসুল দিতে হইত; তদনুসারে, কি জলপথ কি স্থলপথ, সর্বত্র এক এক পরমিট স্থাপিত হয়। তথায়, দ্রব্য সকল আটকাইয়া তদারক করিবার নিমিত্ত, অনেক কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। পরমিটের কর্মচারীরা যে স্থলে গবর্ণমেণ্টের মাসুল এক টাকা আদায় করিত, সেখানে আপনারা নিজে অন্ততঃ দুই টাকা লইত। ফলতঃ, তাহারা প্রজার উপর এমন দারুণ অত্যাচার করিত যে, এ বিষয়ে অধিকৃত একজন বিচক্ষণ য়ুরোপীয়, যথার্থ বিবেচনাপূর্বক, এই ব্যাপারকে অভিসম্পাত নামে নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন।

ইংরেজেরা যখন মুসলমানদের হস্ত হইতে রাজশাসনের ভারগ্রহণ করেন, তখন এই ব্যাপার প্রচলিত ছিল; এবং তাঁহারাও নিজে এ পর্যন্ত প্রচলিত রাখিয়া ছিলেন। কিন্তু, বিচক্ষণ লার্ড কর্নওয়ালিস বাহাদুর, ওই ব্যাপারকে দেশের বিশেষ ক্ষতিকর বোধ করিয়া,

১৭৮৮ সালে, একবারে রহিত করেন, এবং দেশের মধ্যে যেখানে যত পরমিটঘর ছিল, সমুদয় উঠাইয়া দেন। ইহার তের বৎসর পরে গবর্ণমেণ্ট, কর সংগ্রহের নূতন নূতন পন্থা বহিষ্কৃত করিতে উদ্যত হইয়া, পুনর্বার এই মাস্থলের নিয়ম প্রবর্তিত করেন। এক্ষণে, লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, সি, ই, ট্রিবিলিয়ন সাহেবকে, এই বিষয়ে, সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, রিপোর্ট করিতে আজ্ঞা দিলেন; পরে, এই মাস্থল উঠাইবার সদুপায় স্থির করিবার সিমিত্ত, একটি কমিটি স্থাপিত করিলেন। এই ব্যাপার, উক্ত লাট বাহাদুরের অধিকার কালে, রহিত হয় নাই বটে; কিন্তু তিনি, ইহার প্রথম উদ্যোগী বলিয়া, অশেষ প্রকারে প্রশংসাভাজন হইতে পারেন।

লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, আপন অধিকারের প্রারম্ভ অবধি, এতদ্দেশে সমুদ্রে ও নদীতে বাষ্প নাবিককর্ম প্রচলিত করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ যত্নবান ছিলেন। যাহাতে ইংলণ্ডের ও ভারতবর্ষের সংবাদ, মাসে মাসে, উভয়ত্র পঁহুছিতে পারে, তিনি তাহার যথোচিত চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু ডিরেক্টরেরা এবিষয়ে বিস্তর বাধা দিয়াছিলেন। তিনি, বোম্বাই হইতে স্থয়েজ পর্যন্ত পুলিন্দা লইয়া যাইবার নিমিত্ত, বাষ্পনৌকা নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তন্নিমিত্ত তাঁহারা যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করেন। যাহা হউক, লার্ড বেণ্টিক, বাঙ্গালা ও পশ্চিমাঞ্চলের নদ নদীতে, লৌহ নির্মিত বাষ্পজাহাজ চালাইবার বিষয়ে, তাঁহাদিগকে সম্মত করিলেন। এই বিষয়ে, য়ুরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোকদিগের পক্ষে, বিলক্ষণ উপকারক হইয়াছে।

১৮৩৫ সালের মার্চ মাসে, লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক বাহাদুরের অধিকার সমাপ্ত হয়। তাঁহার অধিকারকালে, ভিন্নদেশীয় নরপতিগণের সহিত যুদ্ধনিবন্ধন কোনও উদ্বেগ ছিল না। এক দিবসেব জন্যেও, সন্ধি ও শান্তিব ব্যাঘাত ঘটে নাই। তাঁহার অধিকার কাল কেবল প্রজাদিগেব শ্রীবৃদ্ধিকল্পে সঙ্কল্পিত হইয়াছিল।

জীবন চরিত

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন

জীবনচরিতপাঠে দ্বিবিধ মহোপকার লাভ হয়। প্রথমতঃ, কোন কোন মহাত্মারা অভিপ্রেতার্থসম্পাদনে কৃতকার্য্য হইবার নিমিত্ত যেরূপ অক্লিষ্ট পরিশ্রম, অবিচলিত উৎসাহ, মহীয়সী সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তর অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছেন এবং কেহ বহুতর দুর্ব্বিষহ নিগ্রহ ও দারিদ্র্যনিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ভোগ করিযাও যে ব্যবসায় হইতে বিচলিত হয়েন নাই তৎসমুদায় আলোচনা করিলে এক কালে সহস্র উপদেশেব ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, আনুষঙ্গিক তত্তদ্দেশের তত্তৎকালীন রীতি, নীতি, ইতিহাস ও আচাব পবিজ্ঞান হয়। অতএব যে বিষয়ের অনুশীলনে এতাদৃশ মহার্থ লাভ সম্পন্ন হইতে পারে তাহাকে অবশ্যই শিক্ষা কর্ম্মের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবেক।

রবর্ট ও উইলিয়ম চেম্বর্স বহুসংখ্যক সুপ্রসিদ্ধ মহানুভব মহাশয়দিগেব বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া ইঙ্গবেজি ভাষায় যে জীবনচরিত পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত হইলে এতদ্দেশীয় বিদ্যার্থিগণের পক্ষে বিশিষ্টরূপ উপকার দর্শিতে পারে এই আশয়ে আমি ঐ পুস্তকেব অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু সময়াভাব ও অন্যান্য কতিপয় প্রতিবন্ধক বশতঃ তন্মধ্যে আপাততঃ কেবল কোপর্নিকস, গালিলিয়, নিউটন, হর্শেল, গ্রোশ্যস্, লিনিয়স্, ডুবাল, জেঙ্কিন্স ও জোন্স এই কয়েক মহাত্মার চরিত অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইল।

ইউবোপীয় পদার্থবিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যা সংক্রান্ত অনেক কথার বাঙ্গলা ভাষায় অসঙ্গতি আছে; ঐ অসঙ্গতি পূরণার্থে কোন কোন স্থানে দুরূহ সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ ও স্থান বিশেষে তত্তৎ কথার অর্থ ও তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া তৎপ্রতিরূপ নূতন শব্দ সঙ্কলন করিতে হইয়াছে; পাঠকগণের বোধ সৌকর্য্যার্থে পুস্তকের শেষে তাহাদিগের অর্থ ও ব্যুৎপত্তিক্রম প্রদর্শিত হইল। কিন্তু সঙ্কলিত শব্দ সকল বিশুদ্ধ ও অবিসম্বাদিত হইয়াছে কি না সে বিষয়ে আমি অপরিতৃপ্ত রহিলাম।

বাঙ্গালায় ইঙ্গরেজির অবিকল অনুবাদ করা অত্যন্ত দুরূহ কর্ম; ভাষাদ্বয়ের রীতি ও রচনা পবস্পর নিতান্ত বিপরীত; এই নিমিত্ত, অনুবাদক অত্যন্ত সাবধান ও যত্নবান্ হইলেও অনুবাদিত গ্রন্থে রীতিবৈলক্ষণ্য, অর্থ প্রতীতির ব্যতিক্রম ও মূলার্থের বৈকল্য ঘটিয়া থাকে। অতএব আমি ঐ সমস্ত দোষ অতিক্রম কবিবার আশয়ে অনেক স্থানে অবিকল অনুবাদ করি নাই; তথাপি এই অনুবাদে ঐ সকল দোষের ভূয়সী সম্ভাবনা

আছে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ইহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে এই অনুবাদ বিদ্যার্থিগণের পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবেক না।

পরিশেষে, অবশ্যকর্ত্তব্য কৃতজ্ঞতাস্বীকারের অন্যথা ভাবে অধর্ম্ম জানিয়া, অঙ্গীকার করিতেছি শ্রীযুত মদনমোহন তর্কালঙ্কার শ্রীযুত নীলমাধব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েক জন বিচক্ষণ বন্ধু এ বিষয়ে যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন।

কলিকাতা।
২৭এ ভাদ্র। শকাব্দাঃ ১৭৭১।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন

প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল জীবনচরিত প্রথম মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। যৎকালে প্রথম প্রচারিত হয় আমার এমত আশা ছিল না ইহা সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইবেক। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ছয় মাসের অনধিক কাল মধ্যেই প্রথম মুদ্রিত সমুদায় পুস্তক নিঃশেষিত হয়। সমুদায় পুস্তক নিঃশেষিত হয় কিন্তু গ্রাহকবর্গের আগ্রহ নিবৃত্ত হয় নাই। সুতরাং অবিলম্বে পুনর্ম্মুদ্রিত কবা অত্যাবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু নানা হেতুবশতঃ আমি অনেক দিন পর্য্যন্ত পুনর্ম্মুদ্রিতকরণ স্থগিত রাখিয়াছিলাম।

বাঙ্গলা ভাষায় ইঙ্গরেজী পুস্তকের অনুবাদ করিতে প্রায় সুস্পষ্ট ও অনায়াসে বোধগম্য হয় না এবং ভাষার রীতির ভূরি ভূরি ব্যতিক্রম ঘটে। আমি ঐ সমস্ত দোষ অতিক্রম কবিবাব নিমিত্ত বিস্তব প্রয়াস পাইয়াছিলাম এবং আমার পরম বন্ধু সুপণ্ডিত শ্রীযুত মদনমোহন তর্কালঙ্কারও আমার অভিপ্রেত সিদ্ধির নিমিত্ত যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তথাপি মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত দুর্ব্বোধ ও অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল এবং স্থানে স্থানে ভাষার রীতিরও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল।

প্রথমবারেব মুদ্রিত সমুদায় পুস্তক নিঃশেষিত হইলে যখন জীবনচরিত পুনর্ম্মুদ্রিত কবিবার কল্পনা হয় আমি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া স্থিব করিয়াছিলাম, পুনর্ব্বার পরিশ্রম করিলেও ইহা পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট দোষ সমুদায় হইতে মুক্ত হওয়া দুর্ঘট। সুতরাং সঙ্কল্প করিযাছিলাম আর কখন ইঙ্গরেজী পুস্তকের অনুবাদ করিব না এবং এই পুস্তকও পুনর্ম্মুদ্রিত করিব না। এবং এই নিমিত্ত বাঙ্গলায় এক নূতন জীবনচরিত পুস্তক সঙ্কলন কবিবার বাসনা ও উদ্যোগ করিয়াছিলাম কিন্তু গত দুই বৎসর কাল বিষয়ান্তরে একান্ত ব্যাপৃত হইয়া এমত অবকাশশূন্য হইয়াছি যে সে বাসনা সম্পন্ন করিতে পারি নাই এবং ত্বরায় সম্পন্ন করিতে পারিব এমত সম্ভাবনাও নাই।

কিন্তু যাবৎ নূতন জীবনচরিত পুস্তক প্রস্তুত না হইতেছে এই পুস্তক পুনর্ম্মুদ্রিত করিলে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবেক না এই বিবেচনায় পুনর্ম্মুদ্রিত করা আবশ্যক স্থির হওয়াতে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। কোন কোন অংশ এক বারেই পরিত্যাগ করিয়াছি, স্থানে স্থানে অনেক পরিবর্ত্ত করিয়াছি, এবং মূলগ্রন্থ বিশদ করিবার আশয়ে মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ টীকাও লিখিয়া দিয়াছি। ফলতঃ সুস্পষ্ট ও অনায়াসে বোধগম্য করিবার নিমিত্ত বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছি। তথাপি আদ্যোপান্ত সুস্পষ্ট ও

অনায়াসে বোধগম্য হইয়াছে কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। যাহা হউক ইহা অনায়াসে নির্দ্দেশ কবিতে পারা যায় জীবনচরিত প্রথম বার যেরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল দ্বিতীয়বারে তদপেক্ষায় অনেক অংশে সুস্পষ্ট হইয়াছে।

কলিকাতা। সংস্কৃত কলেজ।
২০এ চৈত্র।, শকাব্দাঃ ১৭৭৩।

জীবন চরিত

নিকলাস কোপর্নিকস

পূর্ব কালে কাল্ডিয়া, ইজিপ্‌ট, গ্রীস, ভারতবর্ষ, প্রভৃতি নানা জনপদে জ্যোতির্বিদ্যার বিলক্ষণ অনুশীলন ছিল; কিন্তু খৃষ্টীয় শাকের ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে, জ্যোতির্মণ্ডলীর বিষয় বিশুদ্ধ রূপে বিদিত হয় নাই। পূর্বকালীন পণ্ডিতগণের এই স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, পৃথিবী স্থির ও অন্তরীক্ষবিক্ষিপ্ত জ্যোতিষ্কসমুদায়ের মধ্যস্থিত; চন্দ্র, শুক্র, মঙ্গল, সূর্য, অন্যান্য গ্রহগণ ও নক্ষত্রমণ্ডল তাহার চতুর্দিকে এক এক মণ্ডলাকার পথে পরিভ্রমণ করে; তাহাদের দূরত্ব ও বেগের বিভিন্নতা প্রযুক্ত, দিবসে ও রজনীতে নভোমণ্ডলের বিচিত্র আকার দেখিতে পাওয়া যায়। এই মত বহু কাল পর্যন্ত প্রবল ও প্রচলিত ছিল।

খৃষ্টীয়শাকপ্রারম্ভের ছয় শত বৎসর পূর্বে, এনাক্‌সিমেণ্ডর, পিথাগোরস প্রভৃতি গ্রীসদেশীয় পণ্ডিতগণের মনে অনতিপরিস্ফুট রূপে এই উদয় হইয়াছিল যে, সূর্য অচল পদার্থ; পৃথিবী একটি গ্রহ, অন্যান্য গ্রহবৎ যথানিয়মে সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে। তাঁহারা সাহস পূর্বক আপনাদের এই বিশুদ্ধ মত প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালপ্রচলিত ধর্মশাস্ত্রের সহিত সম্পূর্ণ বিসংবাদিতা প্রযুক্ত, সর্বসাধারণ লোকে যৎপরোনাস্তি বিদ্বেষ প্রদর্শন করাতে, বদ্ধমূল করিতে পারেন নাই।

চতুর্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালিদেশে বিদ্যানুশীলনের পুনরারম্ভ হইলে (১) তত্রত্য যাবতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্বিদ্যার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আদর হইতে লাগিল। কিন্তু তৎকালে যে মত প্রচলিত ছিল, তাহা অরিস্টটল, টলেমি ও অপরাপর প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণের অনুমোদিত প্রণালী বিশুদ্ধ ছিল না। তাহাতে এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন ছিল, সূর্য ও গ্রহমণ্ডল ভূমণ্ডলের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে। যাহা হউক, পরিশেষে, এনাক্‌সিমেণ্ডর ও পিথাগোরসের বিশুদ্ধ মত পুনরুজ্জীবিত হইবার শুভ সময় উপস্থিত হইল।

যে অধুনাতন পণ্ডিত পূর্বনির্দিষ্ট বিলুপ্তপ্রায় বিশুদ্ধ মত পুনরুজ্জীবিত করেন, তাঁহার নাম নিকলাস কোপর্নিকস। তিনি ১৪১৭ খৃঃ অব্দে, ফেব্রুয়ারির ঊনবিংশ দিবসে, বিষ্টুলানদীর তীরবর্তী থরননগরে জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত স্থান এক্ষণে প্রুসিয়ার রাজার অধিকারের অন্তর্গত। জর্মনির অন্তঃপাতী ওয়েষ্টফেলিয়াপ্রদেশ কোপর্নিকসের পিতার

(১) পূর্বকালে ইয়ুরোপের মধ্যে গ্রীকদেশে ও রোমরাজ্যে বিদ্যার বিলক্ষণ অনুশীলন ছিল। পরে রোমরাজ্যের উচ্ছেদ হইলে, ক্রমে ক্রমে বিদ্যানুশীলনের লোপ হইয়া যায়। অনন্তর, এই সময়ে ইটালিদেশে পুনর্বার বিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ হয়।

জন্মভূমি। তিনি থরননগরে চিকিৎসকের কার্যে নিযুক্ত হইয়া তথায় বাস করেন। তৎপরে, প্রায় দশ বৎসর অতীত হইলে, কোপর্নিকসের জন্ম হয়।

কোপর্নিকস বাল্যকালে ক্রাকোর বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু গণিত, পরিপ্রেক্ষিত, জ্যোতিষ ও চিত্রকর্ম এই কয়েক বিদ্যায় স্বভাবতঃ অতিশয় অনুরাগী ছিলেন। শৈশবকালেই জ্যোতিষবিষয়ে বিশিষ্টরূপ প্রতিপত্তিলাভার্থে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া তিনি ইটালির অন্তর্বর্তী বলগ্না নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। সকলে অনুমান করেন, তাঁহার অধ্যাপক ডোমিনিক মেরিয়া পৃথিবীর মেরুদণ্ডপরিবর্তবিষয়ে যে আবিষ্ক্রিয়া করেন, তদ্দ্বারাই তৎকালপ্রচলিত জ্যোতির্বিদ্যা ভ্রান্তিসঙ্কুল বলিয়া তাঁহার প্রথম উদ্বোধ হয়। অনন্তর, বলগ্না হইতে রোমনগরী প্রস্থান করিয়া, তিনি তথায় কিয়ৎ দিবস সুচারু রূপে গণিতশাস্ত্রের শিক্ষকতাকার্য সম্পাদন করিলেন।

কিয়ৎ দিন পরে, কোপর্নিকস স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন। তৎকালে তাঁহার মাতুল অর্মিলণ্ডের বিশপ অর্থাৎ ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন; তিনি তাঁহাকে ফ্রায়নবর্গের প্রধান দেবালয়ের যাজকপদে নিযুক্ত করিলেন। সেই সময়ে থরননগরের লোকেরাও তাঁহাকে আপনাদের এক দেবালয়ে দ্বিতীয় ধর্মাধ্যক্ষের পদে নিরূপিত করেন। এক্ষণে তিনি এই সঙ্কল্প করিলেন, দেবালয়সংক্রান্ত কর্ম, বিনা বেতনে দরিদ্র লোকের চিকিৎসা, অভিলষিত বিদ্যাব অনুশীলন এই তিন বিষয় অবলম্বন করিয়া জীবনক্ষেপণ করিব। প্রধান দেবালয়ের অদূরবর্তী এক উন্নত ভূভাগের উপর ফ্রায়নবর্গের যাজকদিগের নিমিত্ত যে সমস্ত বাসস্থান নিয়োজিত ছিল, তথা হইতে অত্যুৎকৃষ্ট রূপে গ্রহনক্ষত্রাদির পর্যবেক্ষণ করিতে পারা যায়। কোপর্নিকস তাহার অন্যতম স্থানে অবস্থিতি করিলেন।

অনুমান হয়, ১৫০৭ খৃঃ অব্দে, পিথাগোরসের মত অভ্রান্ত বলিয়া কোপর্নিকসের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে। কিন্তু তৎকালীন লোকের যেরূপ সংস্কার ছিল, উক্ত মত তাহার নিতান্ত বিপরীত। এ নিমিত্ত, তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, এই মতের অবলম্বন অথবা প্রচার বিষয়ে সাবধান হইতে হইবেক। তৎকালে দূরবীক্ষণের সৃষ্টি হয় নাই। তদ্ভিন্ন, গণিতবিদ্যাসংক্রান্ত আর যে সকল যন্ত্র ছিল, তাহাও অত্যন্ত অপকৃষ্ট ও অকর্মণ্য। কোপর্নিকস পর্যবেক্ষণসাধননিমিত্ত যে দুইটি যন্ত্র পাইয়াছিলেন, তাহা দেবদারুকাষ্ঠে অতি সামান্য রূপে নির্মিত ও পরিমাণচিহ্নস্থলে মসীরেখায় অঙ্কিত। এই মাত্র উপকরণ সম্পন্ন হইয়া, স্বাবলম্বিত মত প্রমাণসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত, সে সমস্ত গবেষণা আবশ্যক, কয়েক বৎসর তিনি তৎসম্পাদনবিষয়ে মনোনিবেশ করেন। পরিশেষে, ১৫৩০ খৃঃ অব্দে, তিনি এক গ্রন্থ প্রস্তুত করিলেন। তাহাতে এই নূতন প্রণালী বিশিষ্ট রূপে ব্যাখ্যাত হইল।

অন্যান্য লোক অপেক্ষা অধিকতরজ্ঞানালোকসম্পন্ন বহুসংখ্যক বিদ্বান ব্যক্তি পূর্বাবধি কোপর্নিকসের মত অবগত ছিলেন ; এক্ষণে, তাঁহারা সমুচিত সমাদর ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্বক তাহা গ্রাহ্য করিলেন। এতদ্ভিন্ন সমুদায় লোক ও ধর্মোপদেশকগণ অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ ও কুসংস্কারাবিষ্ট ছিলেন ; সুতরাং তাঁহাদের তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধা জন্মিবার বিষয় কি। পূর্বকালীন লোকেরা বিচারের সময় চিরাগত কতিপয় নির্ধারিত নিয়মের অনুবর্তী হইয়া চলিতেন ; সুতরাং স্বয়ং তত্ত্বনির্ণয় করিতে পারিতেন না, এবং অন্যে সুস্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দিলে, তাহা স্বীকার করিয়া লইতেন না। তৎকালীন লোকদিগেব এই রীতি ছিল, পূর্বাচার্যেরা যাহা নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন, কোনও বিষয়, তাহার বিরুদ্ধ বা বিরুদ্ধবৎ আভাসমান হইলে, তাঁহারা শুনিতে চাহিতেন না। বস্তুতঃ, তাঁহাবা কেবল প্রমাণপ্রয়োগেরই বিধেয় ছিলেন, তত্ত্বনির্ণয়নিমিত্ত স্বযং অনুধ্যান বা বিবেচনা করিতেন না। ইহাতে এই ফল জন্মিয়াছিল, নির্মলমনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিরা অভিজ্ঞতা বা অনুসন্ধান দ্বারা যে নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবিত করিতেন তাহা, চিরসেবিত মতের বিসংবাদী বলিয়া, অবজ্ঞারূপ অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হইত। এই এক সিদ্ধান্ত তাঁহাদের বিশ্বাসক্ষেত্রে বদ্ধমূল হইয়া ছিল যে, পৃথিবী অচলা ও অপবিচ্ছিন্ন বিশ্বের কেন্দ্রভূতা। এই মত পূর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা প্রামাণিক বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন, বহুকালাবধি প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, এবং বস্তু সকল স্থূলদৃষ্টিতে আপাততঃ যেরূপ প্রতীয়মান হয়, তাহার সহিতও অবিরুদ্ধ ; বিশেষতঃ তৎকালীন ইয়ুরোপীয় লোকেরা বোধ করিতেন, বায়বলেরও স্থানে স্থানে উহার পোষকতা আছে। এই সকল পর্যালোচনা করিয়া, কোপর্নিকস সেই অনেক বৎসরের আয়াস-সম্পাদিত গ্রন্থ সহসা প্রচার করিতে পারিলেন না।

পরিশেষে, রেটিকস নামে তাঁহার এক বান্ধব, সংক্ষেপে তদীয় গ্রন্থের মর্মসঙ্কলন পূর্বক, সাহস করিয়া, ১৫৪০ খৃঃ অব্দে এক ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন ; কিন্তু তাহাতে স্বীয় নাম নির্দেশ করিলেন না। ইহাতে কেহ বিদ্বেষ প্রদর্শন না করাতে, ঐ ব্যক্তিই পর বৎসর আপন নাম সমেত উক্ত পুস্তক পুনর্মুদ্রিত করিলেন। উভয় বারেই এই মত কোপর্নিকসের বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ ছিল। সেই সময়ে ইরাস্মস রেন্‌হোল্‌ডনামক এক পণ্ডিত একখানি পুস্তক প্রচার করিলেন। তাহাতে তিনি, এই নূতন মতের ভূয়সী প্রশংসা লিখিয়া, তৎপ্রবর্তককে দ্বিতীয় টলেমি বলিয়া নির্দেশ করেন। সর্বদা এরূপ ঘটিয়া থাকে, কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভ্রান্তিপ্রবর্তকের সহিত তুল্যমূল্য করিয়া নির্দেশ করিলেই, তত্ত্বপ্রদর্শকের যথেষ্ট প্রশংসা করা হয়।

তখন কোপর্নিকস, আত্মীয়বর্গের প্রবর্তনাপরতন্ত্র হইয়া, আপন গ্রন্থ প্রচার করিতে সম্মত হইলেন। তদনুসারে, নরম্বর্গবাসী কতিপয় পণ্ডিতের অধ্যক্ষতায়, তন্নগরস্থ যন্ত্রে

গ্রন্থ মুদ্রিত হইতে লাগিল। তৎকালে তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; জীবিত থাকিয়া আপন গ্রন্থ প্রচারিত দেখা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। গ্রন্থ মুদ্রিত হইবামাত্র, তাঁহার বন্ধু রেটিকস একখানি পুস্তক পাঠাইয়া দিলেন। ঐ পুস্তক, তদীয় তনুত্যাগের কয়েক দণ্ডমাত্র পূর্বে, তাঁহার নিকট পঁহুছিল। সুতরাং তিনি, গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া জানিয়া যাইতে পারিলেন না। তিনি, ১৫৪৩ খৃঃ অব্দে, মে মাসের ত্রয়োবিংশ দিবসে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এই রূপে, কোপর্নিকসের মত ভূমণ্ডলে প্রচারিত হইল। কিন্তু গ্রন্থকর্তার মৃত্যু হইয়াছিল এই বলিয়াই হউক, কিংবা তাদৃশ প্রগাঢ় গ্রন্থ সচরাচর সকলের বুদ্ধিগম্য হইবার বিষয় নহে সুতরাং তদ্দ্বারা সাধারণ লোকের বুদ্ধিব্যতিক্রম বা মতপরিবর্তের সম্ভাবনা নাই এই বোধ করিয়াই হউক, অথবা অন্য কোনও অনির্ণীত হেতু বশতই হউক, কোনও সমাজ বা সম্প্রদায়ের লোক তদ্বিষয়ে বিদ্বেষ প্রদর্শন করেন নাই।

গালিলিয় (১)

ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, কোপর্নিকসের পরলোক যাত্রার চল্লিশ বৎসর পরে, ইয়ুরোপের অতিপ্রধান জ্যোতির্বিদ টাইকো ব্রেহি, ক্রমাগত ত্রিংশৎ বৎসর, জ্যোতির্বিদ্যার অনুশীলন করিয়াছিলেন, তথাপি কোপর্নিকসের প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করেন নাই। যাহা হউক, অনন্তর যে ইটালিদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া, তাহার যথোচিত পোষকতা করেন, এক্ষণে সংক্ষেপে তদীয় চরিত লিপিবদ্ধ হইতেছে।

ইটালির অন্তঃপাতী পিসানগরে, ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে, গালিলিয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা টস্কানিদেশের এক জন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন, কিন্তু তাদৃশ ঐশ্বর্যশালী ছিলেন না। তিনি গালিলিয়কে, চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করাইবার নিমিত্ত, সেই নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োজিত করেন। পঠদ্দশাতেই অরিস্টটলের দর্শনশাস্ত্র নিতান্ত যুক্তিবহির্ভূত বলিয়া, তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল; সুতরাং তদবধি তিনি তন্মতের ঘোরতর প্রতিপক্ষ হইয়া উঠিলেন। গণিতশাস্ত্রে বিশিষ্টরূপ প্রতিপত্তি হওয়াতে ১৫৮৯ খৃঃ অব্দে, তিনি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত বিদ্যার অধ্যাপকপদে অধিরূঢ় হইলেন। তখন তিনি, সেই অযথাভূত দর্শনশাস্ত্রের অযৌক্তিকতা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত, প্রকৃতির নিয়ম সকল প্রদর্শন করাইতে আরম্ভ করিলেন। একদা, সমবেতবহুসংখ্যকদর্শকসমক্ষে, তিনি তত্রত্য প্রধান

(১) ইঁহার প্রকৃত নাম গালিলিয় গালিলি, কিন্তু ইনি গালিলিয় বলিয়াই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

দেবালয়ের উপরি ভাগে বারংবার পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন, গুরুত্ব পতননিয়ামক নহে (১)। ইহাতে অরিস্টটলের মতাবলম্বীরা তাঁহার এমন বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন যে, দুই বৎসর পরে তাঁহাকে অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে হইল।

এই রূপে পিসানগর হইতে অপসারিত হইয়া, গালিলিয় বিষয়কর্মশূন্য হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইটালির প্রদেশান্তরীয় লোকেরা, তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির উৎকর্ষ বুঝিতে পারিয়া, ১৫৯২ খৃঃ অব্দে, তাঁহাকে পেডুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত করিলেন। এই স্থলে তিনি সুচারু রূপে উপদেশ দিতে লাগিলেন। ইয়ুরোপের দূরতর প্রদেশ হইতেও শিষ্যমণ্ডলী উপস্থিত হইতে লাগিল। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা সর্বত্র লাটিনভাষাতেই উপদেশ দিতেন; গালিলিয় তাহা পরিত্যাগ করিয়া ইটালিয় ভাষায় আরম্ভ করিলেন। তৎকালে এই নূতন প্রণালী অবলম্বন করাও একপ্রকার সাহসের কর্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

পেডুয়াতে অষ্টাদশ বৎসর অবস্থিতি করিয়া, তিনি পদার্থবিদ্যাসংক্রান্ত যে সকল নূতন নূতন নিয়ম উদ্ভাবিত করেন, তাহা তৎকালপ্রচলিত মতের নিতান্ত বিপরীত। তথাপি তিনি, অশঙ্কিত ও অসঙ্কুচিত চিত্তে, শিষ্যদিগকে আনুষঙ্গিক সেই সকল বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

জেন্সননামক এক জন ওলন্দাজ এক অভিনব যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা অবলোকন করিলে দূরবর্তী পদার্থ সকল সন্নিহিত বোধ হয়। গালিলিয় ঐ রূপ যন্ত্রের উদ্ভাবনবিষয়ে প্রস্তুতপ্রায় হইয়াছিলেন; এক্ষণে, ১৬০৯ খৃঃ অব্দে, তিনি শুনিবামাত্র, উহা কি কি উপাদানে নির্মিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং এক দিবসও বিলম্ব না করিয়া, তদপেক্ষা অনেক অংশে উত্তম তথাবিধ এক যন্ত্র নির্মাণ করিলেন। এই রূপে দূরবীক্ষণের সৃষ্টি হইল। ইহা পদার্থ বিদ্যাসংক্রান্ত যাবতীয় যন্ত্র অপেক্ষা অধিক উপকারক।

গালিলিয়, এই দৃষ্টিপোষক নলাকার নূতন যন্ত্র নভোমণ্ডলে প্রয়োগ করিয়া, দেখিতে

(১) অজ্ঞ লোকেরা বোধ করিয়া থাকে, বস্তুর গুরুত্ব অর্থাৎ ভার আছে বলিয়া উহা ভূতলে পতিত হয়, আর যাহার গুরুত্ব যত অধিক তাহা তত শীঘ্র পতিত হয়। পূর্ব কালে অরিস্টটল প্রভৃতি অতি প্রধান ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা এই মত প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছিলেন, এবং আমাদের দেশের নৈয়ায়িকদিগেরও এই মত। কিন্তু ইহা ভ্রান্তিমূলক, প্রকৃতির নিয়মানুগত নহে। পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি আছে, সেই শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বস্তু সকল ভূতলে পতিত হইয়া থাকে, বস্তুর ভারের গৌরব ও লাঘব অগ্র পশ্চাৎ পতিত হইবার নিয়ামক নহে। তবে যে গুরু বস্তু শীঘ্র ও লঘু বস্তু বিলম্বে পতিত হইতে দেখা যায়, সে সকল বায়ুর প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, নির্বাত স্থানে গুরু ও লঘু বস্তু, যুগপৎ পরিত্যক্ত হইলে, যুগপৎ ভূতলে পতিত হয়।

পাইলেন, চন্দ্রমণ্ডলের উপরিভাগ অত্যন্ত বন্ধুর ; সূর্যমণ্ডল সময়ে সময়ে কলঙ্কিত লক্ষ্য হয় ; ছায়াপথ সূক্ষ্মতারকাস্তবকমাত্র ; বৃহস্পতি পারিপার্শ্বিকচতুষ্টয়ে পরিবেষ্টিত ; শুক্র-গ্রহের, চন্দ্রের ন্যায়, হ্রাস বৃদ্ধি আছে ; শনৈশ্চরের উভয় পার্শ্বে পক্ষাকার কোনও পদার্থ আছে। ঐ পক্ষ এক্ষণে অঙ্গুরীয় বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

বোধ হয়, গালিলিয় বহুকালাবধি মনে করিতেন, নভস্তলস্থিত বস্তু সকল যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, বাস্তবিক সেরূপ নহে। কিন্তু কোনও কালে যে এই গূঢ় তত্ত্বের মর্মোদ্ভেদ করিতে পারিবেন, তাঁহার এমন আশা ছিল না। এক্ষণে, এই সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া, তাঁহার অন্তঃকরণ কি অভূতপূর্ব চমৎকার ও অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, তাহা কোনও রূপেই অনুভব করিতে পারা যায় না।

১৬১১ খৃঃ অব্দে, যখন তিনি এই সকল বিষয়ের গবেষণাতে প্রবৃত্ত হন, তৎকালে টস্কানির অধীশ্বরের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া, পিসাপ্রত্যাগমন পূর্বক, সমধিক বেতনে গণিতাধ্যাপকের পদ পুনর্গ্রহণ করেন ; সুতরাং তাঁহার উদ্ভাবিত বিষয় সকল ঐ নগরে প্রথম প্রচারিত হইল। কোপর্নিকস কেবল দৈবগত্যা যে সকল নিগ্রহ অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন, এক্ষণে গালিলিয়কে তৎসমুদায় বিলক্ষণ রূপে ভোগ করিতে হইল। তৎকালে তিনি এক গ্রন্থ প্রচার করেন ; তাহাতে স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন, আমি যাহা যাহা উদ্ভাবিত করিয়াছি, তদ্দ্বারা কোপর্নিকসের প্রদর্শিত প্রণালীর যথার্থতা সপ্রমাণ হইয়াছে। ইহাতে এই ঘটিল যে, যাজকেরা তাঁহার নামে ধর্মবিপ্লাবক বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত করাতে, ১৬১৫ খৃঃ অব্দে, তাঁহাকে রোমনগরীয় ধর্মসভার (১) সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইল। সভাধ্যক্ষেরা তাঁহাকে এই প্রতিজ্ঞাশৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন, আর আমি এরূপ সজ্ঘাতক মত কদাচ মুখে আনিব না। ইহাও নির্দিষ্ট আছে, কিন্তু সত্যাসত্যের নিশ্চয় নাই, সভাধ্যক্ষেরা এই উপলক্ষে তাঁহাকে পাঁচ মাস কারাবদ্ধ করিয়াছিলেন ; আর, টস্কানির অধীশ্বর এ বিষয়ে হস্তার্পণ না করিলে, তাঁহাকে আরও গুরুতর নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত।

গালিলিয় ধর্মসভার অগ্রে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনুসারে কয়েক বৎসর পর্যন্ত ক্ষান্ত হইয়া রহিলেন ; কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যার যে যথার্থ মত অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার অনুশীলনে বিরত হইলেন না। পরিশেষে, তিনি কোপর্নিকসের প্রদর্শিত প্রণালীর

(১) ধর্মবিদ্বেষী নাস্তিকদের পরীক্ষা ও দণ্ডবিধানার্থক সভা। খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের এক সম্প্রদায় আছে, উহার নাম রোমান কাথলিক। ইয়ুরোপের অন্তঃপাতী যে সকল দেশ এই সম্প্রদায়ের মতানুযায়ী, তন্মধ্যে কোনও কোনও দেশে খৃষ্টীয় শাকের দ্বাদশ শতাব্দীতে এই ধর্মাধিকরণ স্থাপিত হয়। ইহা স্থাপন করিবার উদ্দেশ্য এই যে, যাহারা বায়বলের বিরুদ্ধ মত অবলম্বন অথবা প্রচার করিবেক এই ধর্মাধিকরণে তাহাদের পরীক্ষা ও দণ্ডবিধান হইবেক। তাহা হইলেই বায়বলবিদ্বেষী নাস্তিকদের উচ্ছেদ হইয়া যাইবেক।

সবিস্তর বিবরণ ভূমণ্ডলে প্রচার করিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইলেন; কিন্তু কুসংস্কারাবিষ্ট বিপক্ষবর্গের বিদ্বেষভয়ে স্পষ্ট রূপে আত্মমত ব্যক্ত না করিয়া, তিন জনের কথোপকথনাত্মক এক গ্রন্থ লিখিলেন। তাহাতে প্রথম ব্যক্তি কোপর্নিকসের মত রক্ষা করিতেছে; দ্বিতীয় ব্যক্তি টলেমি ও অরিস্টটলের; তৃতীয় ব্যক্তি উভয়পক্ষপ্রদর্শিত যুক্তি ও তর্কের এ রূপে বলাবল বিবেচনা করিতেছে যে, উপস্থিত বিষয় আপাততঃ অনির্ণয়াত্মক বোধ হয়। কিন্তু অভিনিবেশ পূর্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে, কোপর্নিকসের পক্ষে প্রদর্শিত যুক্তির প্রবলতাবিষয়ে ভ্রান্তি হইবার বিষয় নাই।

তৎকালে গালিলিয়ের বয়ঃক্রম ছয়ষট্টি বৎসর, তথাপি স্বয়ং সেই গ্রন্থ লইয়া, ১৬৩০ খৃঃ অব্দে, রোমনগরে গমন করিলেন। তিনি ধর্মাধ্যক্ষদিগের অসম্ভাবনীয় অনুগ্রহোদয় সহকারে গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে অনুমতি পাইলেন। কিন্তু, উক্ত পুস্তক রোম ও ফ্লারেন্স নগরে প্রচারিত হইবামাত্র, অরিস্টটলের মতাবলম্বীরা এক কালে চারি দিক হইতে আক্রমণ করিল; তন্মধ্যে পিসার দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক সর্বাপেক্ষা অধিক বিপক্ষতা ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সমুদায় কার্ডিনল (১), মঙ্ক (২) ও গণিতজ্ঞগণের উপর গালিলিয়ের গ্রন্থ পরীক্ষা করিবার ভার অর্পিত হইল। তাঁহারা, অসন্দিগ্ধ চিত্তে সেই গ্রন্থকে ঘোরতর ধর্মবিপ্লাবক স্থির করিয়া, রোমনগরে ধর্মসভার অগ্রে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

গালিলিয় তৎকালে অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রতিপোষক বন্ধু দ্বিতীয় কস্মো পরলোক যাত্রা করাতে, নিতান্ত নিঃসহায় হইয়াছিলেন; সুতরাং, এই সমস্ত অসম্ভাবিত বিপৎপাত তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া উঠিল। বিপক্ষেরা যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করাতে, ১৬৩৩ খৃঃ অব্দের শীতকালে, তাঁহাকে রোমনগরে গমন করিতে হইল। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র, ধর্মসভার অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। কয়েক মাস তথায় অবস্থিতির পর, বিচারকর্তাদিগের সম্মুখে নীত হইলে, তাঁহারা এই দণ্ডবিধান করিলেন, তোমাকে আমাদের সম্মুখে আঁঠু পাড়িয়া ও বায়বল স্পর্শ করিয়া কহিতে হইবেক, আমি পৃথিবীর গতি প্রভৃতি যাহা যাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি সে সমুদায় অশ্রদ্ধেয়, ধর্মবিদ্বিষ্ট ও ভ্রান্তিমূলক। গালিলিয়, সেই বিষম

(১) রোমানকাথলিক সম্প্রদায়ের সর্বাধ্যক্ষকে পোপ কহে। পোপের নীচের পদের লোকদের পদবী কার্ডিনল। কার্ডিনলেরা পোপের মন্ত্রিস্বরূপ। পোপের মৃত্যু হইলে, কার্ডিনলেরা আপনাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া ঐ সর্বপ্রধান পদে অধিরূঢ় করেন।

(২) খৃষ্টধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে যাহারা সাংসারিক বিষয় হইতে বিরত হইয়া ধর্মকর্মে একান্ত রত হয়, তাহাদিগের মঙ্ক কহে। মঙ্কেরা সচরাচর মঠে থাকেন। কতকগুলি মঙ্ক ভারতবর্ষীয় পূর্বকালীন ঋষিদিগের ন্যায় অরণ্য প্রভৃতি বিজন প্রদেশে আশ্রম নির্মাণ করিয়া অবস্থিতি করেন, আর কতকগুলি মঙ্ক এরূপ আছেন যে, তাঁহাদের নির্ধারিত বাসস্থান নাই, তাঁহারা সন্ন্যাসীদের মত যাবজ্জীবন পদব্রজে পর্যটন করেন।

সময়ে মনের দৃঢ়তা রক্ষা করিতে না পারিয়া, যথোক্ত প্রকারে পূর্বনির্দিষ্ট প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করিলেন। কিন্তু গাত্রোত্থান করিবামাত্র, আন্তরিক দৃঢ় প্রত্যয়ের বিপরীত কর্ম করিলাম, এই ভাবিয়া মনোমধ্যে ঘৃণারোষসহকৃত যৎপরোনাস্তি অনুতাপ উপস্থিত হওয়াতে, তিনি পৃথিবীতে পদাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, ইহা এখনও চলিতেছে। বিচারকর্তারা, গালিলিয়ের নাস্তিক্যবুদ্ধির পুনঃসঞ্চার দেখিয়া, এই উৎকট দণ্ড বিধান করিলেন, তোমাকে যাবজ্জীবন কারাগারে থাকিতে হইবেক এবং তিন বৎসর প্রতিসপ্তাহে অনুতাপসূচক সপ্তস্তুতি পাঠ করিতে হইবেক। তাঁহার গ্রন্থ এক বারেই প্রতিষিদ্ধ ও তাঁহার মত একান্ত অশ্রদ্ধিত হইল।

এই রূপে গালিলিয়েব প্রতি কারাগারাধিবাসের আদেশ হইলে, কোনও কোনও বিচারকর্তারা বিবেচনা কবিলেন, তিনি যেরূপ বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাহাতে কোনও ক্রমেই এরূপ কঠিন দণ্ড সহ্য করিতে পারিবেন না। অতএব তাঁহারা, অনুকম্পাপ্রদর্শনপূর্বক, তাঁহাকে নির্বাসিত করিয়া, ফ্লোরেন্সসন্নিহিত কোনও নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিতি করিতে আজ্ঞাপ্রদান করিলেন। এই রূপে কারানিরুদ্ধ হইয়া, তিনি পদার্থবিদ্যার অনুশীলন দ্বারা কালহরণ করিতে লাগিলেন।

গালিলিয় তৎকালে নেত্ররোগে অত্যন্ত অভিভূত হইয়াছিলেন; একটি চক্ষু এক বারে নষ্ট হইয়া যায়, দ্বিতীয়ও প্রায় অকর্মণ্য হয়; তথাপি, ১৬৩৭ খৃঃ অব্দে, চন্দ্রের তুলামান প্রকাশ করেন। শেষ দশায় তিনি অন্ধতা, বধিরতা, নিদ্রার অভাব ও সর্বাঙ্গব্যাপিনী বেদনাতে অত্যন্ত অভিভূত ও বিকল হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মন তৎকাল পর্যন্ত অনলস ও কর্মণ্য ছিল। তিনি ১৬৩৮ খৃঃ অব্দে, স্বয়ং লিখিয়াছেন, আমি অন্ধ দশাতে এক বার বিশ্বরচনাসংক্রান্ত এক বিষয় অনুধ্যান কবি, আব বাব আর বিষয; আর যত যত্ন করি, কোনও রূপেই অস্থিব চিত্তকে স্থিব করিতে পারি না; এই সার্বক্ষণিক চিত্তব্যাসঙ্গ দ্বারা আমাব এক বাবে নিদ্রাব উচ্ছেদ হইয়াছে।

এই অবস্থাতে, ক্রমশঃ ক্ষযকাবী জ্বরবোগে আক্রান্ত হইয়া, গালিলিয়, অষ্টসপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রম কালে, ১৬৪২ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে, প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার কলেবর ফ্লোরেন্সনগরের এক দেবালয়ে সমাহিত হইল। কিয়ৎ কাল পবে, তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করা উচিত বিবেচনা করিয়া, তত্রত্য লোকেরা, ১৭৩৭ খৃঃ অব্দে, উক্ত স্থানে এক পরমশোভন কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছেন।

সর্ আইজাক নিউটন

যে বৎসর গালিলিয় কলেবর পরিত্যাগ করেন, সেই বৎসরে আইজাক নিউটনের জন্ম হয়। এই মহাপুরুষ, লিঙ্কলনসায়রের অন্তঃপাতী কোল্‌স্টর্‌ওয়ার্থনামক গ্রামে, ১৬৪২ খৃঃ অব্দের ২৫শে ডিসেম্বর, শরীরপরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতা তাদৃশ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন

না, কেবল যৎকিঞ্চিৎ ভূমি কর্ষণ দ্বারা জীবিকাসম্পাদন করিতেন। বোধ হয়, নিউটন কোপর্নিকসের ও গালিলিয়ের উদ্ভাবিত বিষয়সমূহের প্রামাণ্য সংস্থাপনার্থেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি, প্রথমতঃ মাতৃসন্নিধানে কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়া, দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে, গ্রন্থামনগরের লাটিন পাঠশালায় প্রেরিত হন। তথায় শিল্পবিষয়ক নব নব কৌশল প্রকাশ দ্বারা, তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধির লক্ষণ প্রদর্শিত হয়। ঐ সকল শিল্পকৌশল দর্শনে তত্রত্য লোকেরা চমৎকৃত হইয়াছিল। পাঠশালার সকল বালকই, বিরামের অবসর পাইলে, খেলায় আসক্ত হইত; কিন্তু তিনি সেই সময়ে নিবিষ্টমনা হইয়া, ঘরট্ট প্রভৃতি যন্ত্রের প্রতিরূপ নির্মাণ করিতেন। একদা, তিনি একটা পুরাণ বাক্স লইয়া জলের ঘড়ী নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ ঘড়ীর শঙ্কু, বাক্সমধ্য হইতে অনবরতনির্গতজলবিন্দুপাত দ্বারা নিমগ্নকাষ্ঠখণ্ড প্রতিঘাতে, পরিচালিত হইত; বেলাববোধনার্থ তাহাতে একটি প্রকৃত শঙ্কুপট্ট ব্যবস্থাপিত ছিল।

নিউটন পাঠশালা হইতে বহির্গত হইলে, ইহাই স্থির হইয়াছিল, তাহাকে কৃষিকর্ম অবলম্বন করিতে হইবেক। কিন্তু অতি ত্বরায় ব্যক্ত হইল, তিনি ওরূপ পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপারে কোনও ক্রমে সমর্থ নহেন। সর্বদা এরূপ দেখা যাইত, যে সময় তাঁহাকে পশুরক্ষণ ও ভৃত্যগণের প্রত্যবেক্ষণ করিতে হইবেক, তখনও তিনি নিশ্চিন্ত মনে তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া অধ্যয়ন করিতেন। কৃষিলব্ধদ্রব্যজাতবিক্রয়ার্থে গ্রন্থামের আপণে প্রেরিত হইলে, তিনি স্বসমভিব্যাহারী বৃদ্ধ ভৃত্যের উপর সমস্ত কার্যনির্বাহের ভার সমর্পণ করিয়া, পরিশুষ্ক তৃণরাশির উপর উপবেশন পূর্বক, গণিতবিষয়ক প্রশ্ন সমাধান করিতেন। জননী, বিদ্যাভ্যাসবিষয়ে তাঁহার এইরূপ স্বাভাবিক অতি প্রগাঢ় অনুরাগ দর্শনে সমুৎসুকা হইয়া, পুনর্বার আর কয়েক মাসের নিমিত্ত, তাঁহাকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন। পরে, ১৬৬০ খৃঃ অব্দের ৫ই জুন, তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী ত্রিনীতিনামক বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থিরূপে পরিগৃহীত হইলেন।

নিউটন পরিশ্রম, প্রজ্ঞা, সুশীলতা ও অহমিকাশূন্য আচরণ দ্বারা আইজাক বারো প্রভৃতি অধ্যাপকবর্গের অনুগৃহীত ও সহাধ্যায়িগণের প্রশংসাভূমি ও প্রণয়ভাজন হইয়াছিলেন। তিনি কেম্ব্রিজে প্রবিষ্ট হইয়া, প্রথমতঃ সণ্ডর্সনরচিত ন্যায়শাস্ত্র, কেপ্লরপ্রণীত দৃষ্টিবিজ্ঞাপন, ওয়ালিসলিখিত অস্থিতপাটীগণিত এই কয়েক গ্রন্থ পাঠ করেন; সাতিশয়-পরিশ্রমসহকারে ডেকার্টরচিত রেখাগণিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন; আর, তৎকালে নক্ষত্রবিদ্যার কিছু কিছু চর্চা থাকাতে, তাহারও অনুশীলন করিয়াছিলেন। তিনি ইউক্লিডের গ্রন্থ অত্যল্পমাত্র পাঠ করেন। এরূপ প্রসিদ্ধি আছে তিনি, প্রাচীন গণিতজ্ঞদিগের গ্রন্থ উত্তমরূপে পাঠ করা হয় নাই বলিয়া, উত্তরকালে অনুতাপ করিয়াছিলেন।

নিউটন, কেম্ব্রিজ অধ্যয়নকালে, আলোকপদার্থের তত্ত্বনির্ণয়ার্থ অত্যন্ত যত্নবান হইয়াছিলেন। ইহার পূর্বে এই বিষয়ে লোকের অত্যল্প জ্ঞান ছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত ডেকার্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, অন্তরীক্ষব্যাপী স্থিতিস্থাপকগুণোপেত অতিবিরল পদার্থবিশেষের সঞ্চালনবিশেষ দ্বারা আলোকের উৎপত্তি হয়। নিউটন এই মত খণ্ডন করিলেন। তিনি অন্ধকারাবৃতগৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্বক, বহুকোণবিশিষ্ট একখণ্ড কাচ লইয়া, কপাটের ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা তদুপরি সূর্যের কিরণ পাতিত করিতে লাগিলেন। এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে পাইলেন, আলোক কাচেব মধ্য দিয়া গমন করিয়া এ প্রকার ভঙ্গুব হইয়াছে যে, ভিত্তির উপর সপ্তবিধ বিভিন্ন বর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে। অনন্তর, অসাধারণকৌশল পূর্বক অশেষ প্রকারে পরীক্ষা কবিয়া, তিনি এই কয়েক মহোপকাবক বিষয় নির্ধারিত করিলেন—আলোকপদার্থ কিরণাত্মক ; ঐ সকল কিরণকে বিভক্ত করিয়া অণু করা যাইতে পারে ; শুক্ল আলোকের প্রত্যেক কিরণে রক্ত, পীত, নীল এই তিন মূলীভূত কিরণ আছে ; এই ত্রিবিধ কিবণ অপেক্ষাকৃত ন্যূনাধিক ভঙ্গুর হইয়া থাকে। নিউটনের এই অসাধাবণ অভিনব আবিষ্ক্রিয়াকে দৃষ্টিবিজ্ঞানশাস্ত্রের মূলসূত্রস্বরূপ গণনা করিতে হইবেক।

১৬৬৫ খৃঃ অব্দে, কেম্ব্রিজনগরে ঘোরতর মারীভয় উপস্থিত হওয়াতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদায় ছাত্রকে স্থানত্যাগ করিতে হইয়াছিল। নিউটনও ঐ সময়ে আত্মরক্ষার্থে আপন আলয়ে পলায়ন করিলেন। তথায় পুস্তকালয়ের অসদ্ভাবপ্রযুক্ত ইচ্ছানুরূপ পুস্তক পাঠ করিতে পাইতেন না ; এবং পণ্ডিতবর্গের অসন্নিধানপ্রযুক্ত শাস্ত্রীয় আলাপেরও সুযোগ ছিল না, তথাপি তিনি ঐ সময়ে গুরুত্বের নিয়ম অর্থাৎ বস্তুমাত্রের ভূতলাভিমুখে পাতপ্রবণতার বিষয় প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই মহীয়সী আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা, নিউটনের অনধ্যায় বৎসর সকল, তাঁহার জীবনের শ্লাঘ্যতম ভাগ ও বিজ্ঞানশাস্ত্রীয় ইতিবৃত্তের চিরস্মরণীয় ভাগ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

এক দিবস তিনি উপবনমধ্যে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দৈবযোগে তাঁহার সম্মুখবর্তী আতাবৃক্ষ হইতে এক ফল পতিত হইল। তদ্দর্শনে তিনি তৎক্ষণাৎ বস্তুমাত্রের পতননিয়ামকসাধারণ কারণবিষয়িণী পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তব, তিনি এই বিষয় পুনর্বার আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন, যে কারণ বশতঃ আতা ভূতলে পতিত হইল, সেই কারণেই চন্দ্র ও গ্রহমণ্ডলী স্ব স্ব কক্ষে ব্যবস্থাপিত আছে, এবং তাহাই পরমাদ্ভুতশক্তিসহকারে অতি সহজে সমুদয় জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি নিয়মিত করিতেছে। এই রূপে গুরুত্বের নিয়ম আবিষ্কৃত হইল। এই নিয়মের জ্ঞান দ্বারা জ্যোতির্বিদ্যার মহীয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

নিউটন, ১৬৬৭ খৃঃ অব্দে, কেম্ব্রিজে প্রত্যাগমন করিয়া, ত্রিনীতি বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃত্তি

প্রাপ্ত হইলেন। দুই বৎসর পরে, তাঁহার বন্ধু ডাক্তার বারো গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক পরিত্যাগ করিলে, তিনি তাহাতে নিযুক্ত হইলেন। তিনি দৃষ্টিবিজ্ঞানবিষয়ে যে সকল অভিনব মহৎ নিয়ম প্রকাশ করিয়াছিলেন, প্রথমতঃ কিছু কাল ঐ সমস্ত লইয়াই অধিকাংশ উপদেশ প্রদান করিলেন। আলোক ও বর্ণ বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকাতে, আপনার নূতন মত এমন স্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, শ্রোতৃবর্গ সন্তুষ্ট চিত্তে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

১৬৭১ খৃঃ অব্দে, রএল সোসাইটী (১) নামক রাজকীয় সমাজের ফেলো অর্থাৎ সহযোগী হইলেন। কিন্তু প্রসিদ্ধি আছে, অন্যান্য সহযোগীর ন্যায় সভার ব্যয়নির্বাহার্থে প্রতিসপ্তাহে রীতিমত এক এক শিলিং দিতে অসমর্থ হওয়াতে তাঁহাকে অগত্যা অদানের অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। তৎকালে বিদ্যালয়ের বৃত্তি ও অধ্যাপকের বেতন এতদ্ব্যতিরিক্ত তাঁহার আর কোনও প্রকার অর্থাগম ছিল না; আর, পৈতৃক বিষয় হইতে যে কিছু কিছু উৎপন্ন হইত, তাহা তাঁহার জননী ও অন্যান্য পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনেই পর্যবসিত হইত। তাঁহার ভোগতৃষ্ণা এত অল্প ছিল যে, আবশ্যক পুস্তকের ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ক্রয় এবং অন্যের দারিদ্র্যদুঃখবিমোচন এই উভয় সম্পন্ন হইলেই সন্তুষ্ট হইতেন, এতদ্ব্যতিরিক্ত বিষয়ে অর্থাভাব জন্য ক্ষুণ্নমনা হইতেন না।

১৬৮৩ খৃঃ অব্দে, তিনি প্রিন্সিপিয়ানামক অতি প্রধান গ্রন্থ রচনা করিলেন। ঐ পুস্তকে গণিতশাস্ত্রানুসারে পদার্থবিদ্যার মীমাংসা করা হইয়াছে। ১৬৮৮ খৃঃ অব্দে, যখন রাজ-বিপ্লব ঘটে, কেম্ব্রিজ বিদ্যালয়ের প্রতিরূপ হইয়া, পালিমেণ্ট (২) নামক সমাজে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত, সকলে তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছিল; এবং ১৭০১ খৃঃ অব্দেও ঐ মর্যাদার পদ পুনর্বার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে সকল ব্যক্তির যথার্থ উপকার ও পুরস্কার

(১) ইংলণ্ডের অধীশ্বর দ্বিতীয় চার্লস, পদার্থবিদ্যার উন্নতিনিমিত্ত, সপ্তদশ শতাব্দীতে, ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডননগরে এই সমাজ স্থাপন করেন। এই সমাজের লোকদিগকে ফেলো বলে। যাঁহারা অসাধারণ বিদ্যাসম্পন্ন, তাঁহারাই এই সমাজের ফেলো হইতে পারেন। সমুদায়ে সমাজের ফেলো একুশ জন, তন্মধ্যে এক জন সভাপতি, এক জন সহকারী সভাপতি, এক জন ধনাধ্যক্ষ, দুই জন সম্পাদক। এই রাজকীয় সমাজ দ্বারা পদার্থবিদ্যাসংক্রান্ত নানা বিষয়ে অশেষবিধ মহোপকার জন্মিয়াছে।

(২) ইংলণ্ডের রাজকার্য কেবল রাজার ইচ্ছানুসারে সম্পন্ন হয় না, রাজা এই সমাজের মতানুসারে যাবতীয় রাজকার্য নির্বাহ করিয়া থাকেন। এই সমাজ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, প্রথম শ্রেণীতে দেশের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত লোক থাকেন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে সামান্য লোকেরা। এক এক প্রদেশের সামান্য লোকেরা আপনাদের এক এক জন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। ইংলণ্ডের যাবতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও এই সমাজে এক এক জন প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়া থাকেন। সম্ভ্রান্ত লোকেরা এবং সামান্য লোকদিগের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োজিত প্রতিনিধিরা রাজকীয় আদেশানুসারে সময়ে সময়ে এই সমাজে সমাগত হইয়া রাজকার্য চিন্তা করিয়া থাকেন। ইঁহারা যে নিয়ম নির্ধারিত করেন, রাজার অনুমোদিত হইলে, সমুদায় রাজ্যমধ্যে সেই নিয়ম প্রচলিত হয়।

করিবার ক্ষমতা ছিল, নিউটনের অসাধারণ গুণ তাঁহাদের গোচর হওয়াতে, তিনি তদীয় আনুকূল্যবলে টাঁকশালের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধানবিষয়ে অত্যন্ত সহিষ্ণুতা ও সবিশেষ নৈপুণ্য থাকাতে, তিনিই সর্বাপেক্ষায় ঐ পদের উপযুক্ত ছিলেন। নিউটন মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঐ কার্য সম্পাদন করিয়া সর্বত্র সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অতঃপর, নিউটন বহুতর প্রশংসা ও পুরস্কার প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। লিবনিজ নামক এক জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, নিউটনের নব নব আবিষ্ক্রিয়া নিবন্ধন অসাধারণ সম্মান দর্শনে ঈর্ষাপরবশ হইয়া তদ্বিলোপবাসনায় তাঁহার নিকট এক প্রশ্ন প্রেরণ করেন। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, নিউটন কোনও রূপেই ইহার সমাধান করিতে পারিবেন না, তাহা হইলেই তাঁহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবেক। নিউটন টাঁকশালের সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পব সায়াহ্নে ঐ প্রশ্ন পাইলেন এবং শয়নের পূর্বেই তাহার সমাধান করিয়া রাখিলেন। তৎপরে আর কোনও ব্যক্তি কখনও নিউটনের কীর্তিবিলোপের চেষ্টা করেন নাই। ১৭০৫ খৃঃ অব্দে, ইংলণ্ডেশ্বরী এন, নিউটনের মান বর্ধনার্থে, তাঁহাকে নাইট (১) উপাধি প্রদান করেন।

নিউটন উদারস্বভাবতা প্রযুক্ত সামান্য সামান্য লৌকিক ব্যাপারেও সবিশেষ অবহিত ছিলেন। তিনি সর্বদা আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন এবং তাঁহারা সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, সমুচিত সমাদর করিতেন; কথোপকথনকালে কখনও আত্ম-প্রাধান্য প্রখ্যাপন করিতেন না। তিনি স্বভাবতঃ সুশীল, সরল ও প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন; এই নিমিত্ত সকল ব্যক্তি তাঁহার সহবাসবাসনা করিত। লোকের সর্বদা যাতায়াত দ্বারা তাঁহার মহার্হ সময়ের অপক্ষয় হইত, তথাপি তিনি কিঞ্চিন্মাত্র বিরক্ত ভাব প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু প্রত্যূষে গাত্রোত্থানের নিয়ম এবং বিশেষ বিশেষ কার্যে বিশেষ সময় নিরূপিত থাকাতে, অধ্যয়ন ও গ্রন্থরচনার নিমিত্ত তাঁহার সময়াল্পতানিবন্ধন কোনও ক্ষোভ থাকিত না। তিনি অবসর পাইলে হস্তে লেখনী ও সম্মুখে পুস্তক লইয়া বসিতেন।

নিউটন অত্যন্ত দয়ালু ও দানশীল ছিলেন। তিনি কহিতেন, যাঁহারা জীবদ্দশায় দান

(১) বহু কাল পূর্বে, ইয়ুরোপে যে সকল ব্যক্তি কোনও সৈন্যসংক্রান্ত পদে অধিরূঢ় হইত, তাহাদিগকে নাইট বলিত। যাহারা প্রধানবংশজাত ও ঐশ্বর্যশালী লোকের সন্তান, তাহারাই নাইট হইত। এই নিমিত্ত উহা এক্ষণে সম্ভ্রম ও মর্যাদা সূচক উপাধি হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা অসাধারণগুণসম্পন্ন অথবা ক্ষমতাপন্ন, তাঁহারাই অধুনা রাজপ্রাসাদে এই মর্যাদাব উপাধি পাইয়া থাকেন। এই উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিরা আনুষঙ্গিক সর এই উপাধিও প্রাপ্ত হয়েন। এই উপাধি নাইটদের নামের পূর্বে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথাঃ সর আইজাক নিউটন, সর উইলিয়াম হর্শেল, সর উইলিয়ম জোন্স ইত্যাদি।

না করেন, তাঁহাদের দান দানই নয়। অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে তদীয় অদ্ভুত ধীশক্তির কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। আহারনিয়ম, সার্বকালিক প্রফুল্লচিত্ততা ও স্বাভাবিক শরীরপটুতা প্রযুক্ত জরা তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। তিনি নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব, নাতিস্থূলকায় ছিলেন। তাঁহার নয়নে সজীবতা, তীক্ষ্ণতা ও বুদ্ধিমত্তা স্পষ্ট প্রকাশ পাইত। দেখিলেই তাঁহার আকৃতি সজীবতা ও দয়ালুতাতে পরিপূর্ণ বোধ হইত। অন্তিম ক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার দর্শনশক্তি অব্যাহত ছিল। কেশ সকল শেষ বয়সে তুষারের ন্যায় শুভ্র হইয়াছিল। চরম দশাতে তাঁহার অসহ্য দৈহিক যাতনা ঘটে। কিন্তু তিনি স্বভাবসিদ্ধসহিষ্ণুতাপ্রভাবে তাহাতে নিতান্ত কাতর হয়েন নাই। অনন্তর, ১৭২৭ খৃঃ অব্দের ২০শে মার্চ, চতুরশীতিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে, তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

নিউটনের চরিত্র সাধারণ লোকের চরিত্রের ন্যায় নহে। উহা এমন সুন্দর যে, চরিতাখ্যায়ক ব্যক্তি লিখিতে লিখিতে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন। আর, যে উপায়ে তিনি মনুষ্যমণ্ডলীতে অবিসংবাদিত প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা পর্যালোচনা করিলে, মহোপকার ও মহার্থ লাভ হইতে পারে। নিউটন অত্যুৎকৃষ্টবুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন; কিন্তু তদপেক্ষায় ন্যূনবুদ্ধিরাও তদীয়জীবনবৃত্তপাঠে পদে পদে উপদেশ লাভ করিতে পারেন। তিনি অলৌকিক বুদ্ধিশক্তির প্রভাবে গ্রহগণের গতি, ধূমকেতুগণের কক্ষ, সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস, এই সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। নিউটন আলোক ও বর্ণ এই দুই পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে এই বিষয় কোনও ব্যক্তির মনেও উদিত হয় নাই। তিনি সাতিশয় পরিশ্রম ও দক্ষতা সহকারে অদ্ভুত বিশ্বরচনার যথার্থ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন; আর, তাঁহার সমুদয় গবেষণা দ্বারাই সৃষ্টিকর্তার মহিমা, প্রজ্ঞা ও অনুকম্পা প্রকাশ পাইয়াছে।

ঈদৃশলোকোত্তরবুদ্ধিবিদ্যাসম্পন্ন হইয়াও, তিনি স্বভাবতঃ এমন বিনীত ছিলেন যে, আপন বিদ্যার কিঞ্চিন্মাত্র অভিমান করিতেন না। তাঁহার এই এক সুপ্রসিদ্ধ কথা ধরাতলে জাগরূক আছে, আমি বালকের ন্যায় বেলাভূমি হইতে উপলখণ্ড সঙ্কলন করিতেছি, জ্ঞানমহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

সর উইলিয়ম হর্শেল

কোপর্নিকসের সময়াবধি টাইকো ব্রেহি, কেপ্লর, হিগিন্স, নিউটন, হেলি, ডিলাইল, লেলণ্ড ও অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদবর্গের প্রযত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা জ্যোতির্বিদ্যার ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইয়া আসিতেছিল। পরে, যে চিরস্মরণীয় মহানুভাবের আবিষ্ক্রিয়া

দ্বারা উক্ত বিদ্যার এক কালে ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হয়, এক্ষণে তদীয় জীবনবৃত্ত লিখিত হইতেছে।

উইলিয়ম হর্শেল, ১৭৩৮ খৃঃ অব্দের ১৫ই নবেম্বর, হানোবরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা চারি সহোদর; তন্মধ্যে তিনি দ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার পিতা তূর্যাজীবব্যবসায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতেন। সুতরাং, তাঁহারাও চারি সহোদরে, উত্তর কালে ঐ ব্যবসায়ে ব্রতী হইবার নিমিত্ত, তাহাই শিক্ষা করিয়াছিলেন। অল্প বয়সে বিদ্যানুশীলনবিষয়ে হর্শেলের সবিশেষ অনুরাগ প্রকাশ হওয়াতে, তদীয় পিতা তাঁহাকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এক শিক্ষক নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁহার নিকট ন্যায়, নীতি ও মনোবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথমপাঠ্য গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া, উক্ত দুরূহ বিদ্যাত্রিতয়ে একপ্রকার ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু পিতা মাতার অসঙ্গতি ও অন্যান্য কতিপয় প্রতিবন্ধক প্রযুক্ত, ত্বরায় তাঁহার বিদ্যানুশীলনের ব্যাঘাত জন্মিল। তিনি চতুর্দশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সৈনিকদলসংক্রান্ত বাদ্যকরসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ১৭৫৭, অথবা ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে, ঐ সৈনিক দল সমভিব্যাহারে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। তাঁহার পিতাও সেই সঙ্গে ইংলণ্ড গমন করিয়াছিলেন; তিনি কতিপয়মাসান্তে স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন, কিন্তু হর্শেল, ইংলণ্ডে থাকিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত, পিতার সম্মতি লইয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এইরূপ অনেকানেক ধীসমৃদ্ধ বৈদেশিকেরা স্বদেশপরিত্যাগ পূর্বক ইংলণ্ডে বাস করিয়া থাকেন।

হর্শেল কোন সময়ে ও কি প্রকারে উক্ত সৈনিকদলসংক্রান্ত সম্প্রদায় পরিত্যাগ করেন, তাহার নির্ণয় নাই। কিন্তু তাঁহাকে যে, প্রথমতঃ কিয়ৎ কাল দুঃসহক্লেশ-পরম্পরায় কালযাপন করিতে ও ইঙ্গরেজী ভাষায় বিশিষ্টরূপ জ্ঞান না থাকাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইতে হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। পরিশেষে, সৌভাগ্যক্রমে অরল অব ডার্লিংটনের অনুগ্রহোদয় হওয়াতে, তিনি তাঁহাকে এক সৈনিক বাদ্যকরসম্প্রদায়ের অধ্যক্ষতা ও উপদেশকতা কার্যে নিযুক্ত করিলেন। পরে, এই কর্ম সমাধান করিয়া, তিনি ইয়র্কসায়ারে তূর্যাচার্যের কার্যে নিযুক্ত হইয়া কতিপয় বৎসর অতিবাহিত করিলেন। তিনি অবসরকালে প্রধান প্রধান নগরে শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতে এবং দেবালয়সম্পর্কীয় তূর্যাজীবসম্প্রদায়ের অধ্যক্ষের প্রতিনিধি হইয়া তদীয় কার্যনির্বাহ করিতে লাগিলেন।

হর্শেল, এবংবিধ অনিন্দিত পথ অবলম্বন করিয়া, অন্নচিন্তায় একান্ত ব্যাসক্ত হইয়াও, আর আর চিন্তা এক বারে পরিত্যাগ করেন নাই। বিষয়কর্মে অবসর পাইলে, তিনি একাগ্রচিত্ত হইয়া, আগ্রহাতিশয়সহকারে, ইঙ্গরেজী ও ইটালিক ভাষার অনুশীলন এবং বিনা সাহায্যে লাটিন ও গ্রীক ভাষা অভ্যাস করিতেন। তৎকালে, তিনি এই মুখ্য

অভিপ্রায়ে উক্ত সমস্ত বিদ্যার অনুশীলন করিতেন যে, উহা নিজ ব্যবসায়িকী বিদ্যার আলোচনাবিষয়ে বিশেষ উপযোগিনী হইবেক; এবং উত্তর কালেও, এই উদ্দেশে, ডাক্তার রবার্ট স্মিথরচিত তূর্যবিষয়ক গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, সন্দেহ নাই। তৎকালে ইঙ্গরেজী ভাষাতে তূর্যবিদ্যাবিষয়ে যত গ্রন্থ প্রচলিত ছিল, উহা তাহার মধ্যে এক অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

কিন্তু, এই পুস্তকের অনুশীলন অনতিবিলম্বে তাঁহার বর্তমানব্যবসায় পরিত্যাগের এবং অত্যুন্নতব্যবসায়ান্তরাবলম্বনের কারণ হইয়া উঠিল। তিনি ত্বরায় বুঝিতে পারিলেন, গণিতবিদ্যায় ব্যুৎপন্ন না হইলে, ডাক্তার স্মিথের গ্রন্থের অনুশীলনে বিশেষ উপকার দর্শিবে না; অতএব স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগ ও অধ্যবসায় সহকারে, এই নূতন বিদ্যার অনুশীলনে নিবিষ্টমনা হইলেন; এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাহাতে এমন আসক্ত হইয়া উঠিলেন যে, অবসর পাইলে, অন্যান্য যে যে বিষয়ের আলোচনা করিতেন, সে সমুদায় এই অনুরোধে একবারে পরিত্যক্ত হইল।

ইতিপূর্বে, হর্শেল বেট্‌নামক এক ব্যক্তির নিকট বিশিষ্টরূপ পরিচিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে, তাঁহার প্রযত্নে ও আনুকূল্যে, ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগে হালিফাক্‌সের দেবালয়ে তূর্যাজীবের পদে নিযুক্ত হইলেন। পর বৎসর, সামান্যরূপ তূর্যকর্মের অনুরোধে, স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরের সহিত বাথনগরে গমন করিলেন। তথায়, অসাধারণনৈপুণ্যপ্রকাশ দ্বারা শুশ্রূষুদিগকে পরম পরিতোষ প্রদান করাতে, সেই নগরের এক দেবালয়ে তূর্যাজীবের পদ প্রাপ্ত হইলেন। তদবধি তিনি সেই স্থানে গিয়া অবস্থিতি করিলেন।

হর্শেল এক্ষণে যে পদে নিযুক্ত হইলেন, তাহা নিতান্ত সামান্য নহে। এতদ্ব্যতিরিক্ত, বঙ্গভূমি ও অন্যান্য স্থানে তূর্যপ্রয়োগ ও শিষ্যমণ্ডলীকে শিক্ষাপ্রদানাদির উত্তমরূপ অবকাশ ও সুযোগ ছিল। অতএব, অর্থোপার্জন যদি তাঁহার মুখ্য অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে, তিনি অবলম্বিত ব্যবসায় দ্বারা বিলক্ষণ সঙ্গতি করিতে পারিতেন। যাহা হউক এই রূপে কর্মের বাহুল্য হইলেও, বিদ্যানুশীলনবিষয়ে তাঁহার যে গাঢ়তর অনুরাগ ছিল, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম হইল না। প্রত্যহ, তূর্যবিষয়ে ক্রমাগত দ্বাদশ অথবা চতুর্দশ হোরা পরিশ্রম করিয়া, তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইতেন; কিন্তু তৎপরে, এক মুহূর্তও বিশ্রাম না করিয়া, পুনর্বার বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র গণিতবিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ করিতেন।

এই রূপে তিনি ক্রমে ক্রমে রেখাগণিতে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন এবং তখন আপনাকে পদার্থবিদ্যার অনুশীলনে সমর্থ জ্ঞান করিলেন। পদার্থবিদ্যার নানা শাখার মধ্যে, জ্যোতিষ ও দৃষ্টিবিজ্ঞান এই দুই বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ জন্মে। ঐ সময়ে, জ্যোতিষসংক্রান্ত কতিপয় অভিনব আবিষ্ক্রিয়া দর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণে অত্যন্ত কৌতূহল উদ্বুদ্ধ হইল। তদনুসারে, তিনি অবকাশকালে উক্তবিদ্যাবিষয়ক গবেষণাতে মনোনিবেশ করিলেন।

গ্রহমণ্ডলীবিষয়ক যে যে অদ্ভুত ব্যাপার পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত, তিনি কোনও প্রতিবেশবাসীর সন্নিধান হইতে একটি দ্বিপাদপ্রমিত দূরবীক্ষণ চাহিয়া আনিলেন। তদ্দর্শনে অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া, ক্রয় করিবার বাসনায়, তিনি অবিলম্বে ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডননগর হইতে তদপেক্ষায় অনেক বড একটা আনাইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু তিনি যত অনুমান করিয়া ছিলেন ও তাঁহার যত দিবার সঙ্গতি ছিল, তাহার মূল্য তদপেক্ষায় অনেক অধিক হইবাতে ক্রয় করিতে পারিলেন না; সুতরাং যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ পাইলেন, ক্ষোভ পাইলেন বটে, কিন্তু ভগ্নোৎসাহ হইলেন না—তৎক্ষণাৎ সেই অক্রেয় দূরবীক্ষণের তুল্যবলদূরবীক্ষণান্তরনির্ম্মাণ স্বহস্তেই আরম্ভ করিলেন। এই বিষয়ে বারংবার বিফলপ্রযত্ন হইয়াও, তিনি পরিশেষে চরিতার্থতা লাভ করিলেন। প্রযত্নবৈফল্য দ্বারা, তাঁহার উৎসাহভঙ্গ না ঘটিয়া, উৎসাহের উত্তেজনাই হইত।

যে পথে হর্শেলের প্রতিভা দেদীপ্যমান হইবেক, এক্ষণে তিনি সেই পথের পথিক হইলেন। ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে, তিনি স্বহস্তনির্ম্মিত প্রাতিফলিক পাঞ্চপাদিক দূরবীক্ষণ দ্বারা শনৈশ্চরগ্রহ নিরীক্ষণ করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। দূরবীক্ষণনির্ম্মাণ ও জ্যোতিষসংক্রান্ত আবিষ্ক্রিয়াবিষয়ে যে এতাবতী সাধীয়সী সিদ্ধিপরম্পরা ঘটিয়াছে, এই তার সূত্রপাত হইল। অতঃপর হর্শেল, বিদ্যানুশীলন বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর অনুরাগসম্পন্ন হইয়া, সমধিকসময়লাভবাসনায়, অর্থলাভপ্রতিরোধ স্বীকার করিয়াও, স্বীয় ব্যবসায়িক কর্ম্ম ও শিষ্যসংখ্যার ক্রমে ক্রমে সংকোচ করিয়া আনিলেন; এবং সর্ব্ব প্রথম যাদৃশ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, অবকাশকালে ব্যাপারান্তরবিরহিত হইয়া, তদপেক্ষায় অধিকশক্তিকযন্ত্রনির্ম্মাণে ব্যাপৃত রহিলেন। এই রূপে, অচির কালের মধ্যে সপ্ত, দশ ও বিংশতি পাদ আধিশ্রয়ণিকব্যবধিবিশিষ্ট কতিপয় দূরবীক্ষণ নির্ম্মিত হইল।

এই সকল যন্ত্রের মুকুরনির্ম্মাণে তিনি অক্লিষ্ট অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সাপ্তপাদিক দূরবীক্ষণের জন্যে মনোমত একখানি মুকুর প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, তিনি ক্রমে ক্রমে অন্যূন দুইশতখান গঠন ও একে একে তৎপরীক্ষণ অবিরক্ত চিত্তে করিয়াছিলেন। যখন তিনি মুকুরনির্ম্মাণে বসিতেন, ক্রমাগত দ্বাদশ চতুর্দ্দশ হোরা পরিশ্রম করিতেন, মধ্যে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তে বিরত হইতেন না। অন্য কথা দূরে থাকুক, আহারানুরোধেও প্রারব্ধ কর্ম্ম হইতে হস্তোত্তোলন করিতেন না। ঐ কালে তাঁহার সহোদরা যৎকিঞ্চিৎ যাহা মুখে তুলিয়া দিতেন, তন্মাত্র আহার হইত। তিনি এই আশঙ্কা করিতেন, কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া মধ্যে ক্ষণমাত্র ভঙ্গ দিলে, সম্যক্ সমাধানের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। মুকুরনির্ম্মাণবিষয়ে প্রচলিত নিয়মের নিতান্ত অনুবর্ত্তী না হইয়া, তিনি স্বীয় বুদ্ধিকৌশলেই অধিকাংশ সম্পাদন করিতেন।

হর্শেল, ১৭৮১ খৃঃ অব্দের ১৩ই মার্চ, যে নূতন গ্রহের আবিষ্ক্রিয়া করেন, বোধ হয়, সর্বপেক্ষা তদ্দ্বারা লোকসমাজে সমধিক বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি ক্রমাগত প্রায় দেড় বৎসর রীতিমত নভোমণ্ডলের পর্যবেক্ষণে ব্যাপৃত ছিলেন। দৈবযোগে, উল্লিখিত দিবসের সায়ংসময়ে, সেই স্বহস্তনির্মিত অত্যুৎকৃষ্ট সাপ্তপাদিক প্রাতিফলিক দূরবীক্ষণ নভোমণ্ডলৈকদেশে প্রয়োগ করিয়া এক নক্ষত্র দেখিতে পাইলেন। বোধ হইল, তৎসন্নিহিত সমুদায় নক্ষত্র অপেক্ষা তাহার প্রভা স্থিরতর। উক্ত হেতু প্রযুক্ত ও তদীয় আকারগত অন্যান্য বৈলক্ষণ্য দর্শনে সংশয়ান হইয়া, তিনি সবিশেষ অভিনিবেশ পূর্বক পর্যবেক্ষণ আরম্ভ করিলেন। কতিপয় হোরার পর পুনর্বার পর্যবেক্ষণ করাতে উহা স্থান পরিত্যাগ করিয়াছে উহা স্পষ্ট অনুভব করিয়া, তিনি সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। পর দিন, এই বিষয়ে অনেক সন্দেহ দূর হইল। প্রথমতঃ, তাঁহার অন্তঃকরণে এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল যে পূর্ব পূর্ব বারে যাহা দেখিয়াছি, ইহা সেই নক্ষত্র কি না। কিন্তু ক্রমাগত আর কয়েক দিবস পর্ববেক্ষণ করাতে, তদ্বিষয়ক সমুদায় দ্বৈধ অন্তর্হিত হইল।

অনন্তর, তিনি এই সমুদায় ব্যাপার রাজকীয় জ্যোতির্বিদ ডাক্তার মাস্কিলিনের গোচর করিলেন। তিনি আদ্যোপান্ত বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন, ইহা নূতন ধূমকেতু না হইয়া যায় না। কিন্তু আর কয়েক মাস ক্রমিক পর্ববেক্ষণ করাতে, এই ভ্রান্তি নিরাকৃত হইল; তখন স্পষ্ট বোধ হইল, উহা এক অনাবিষ্কৃতপূর্ব নূতন গ্রহ, ধূমকেতু নহে। আমাদের অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবী যে সৌর জগতের অন্তর্গত, এই নূতন গ্রহও তদন্তর্বর্তী (১)। তৎকালে তৃতীয় জর্জ ইংলণ্ডের অধীশ্বর ছিলেন। হর্শেল তাঁহার মর্যাদা নিমিত্ত তদীয়নামানুসারে স্বাবিষ্কৃত নক্ষত্রের নাম জর্জিয়ম্ সাইডস অর্থাৎ জর্জনক্ষত্র রাখিলেন। কিন্তু ইয়ুরোপের প্রদেশান্তরীয় জ্যোতির্বিদেরা ইহার য়ুরেনস এই নাম নির্দেশ করিয়াছেন; আর আবিষ্কর্তার নামানুসারে এই গ্রহকে হর্শেলও বলিয়া থাকেন। অনন্তর হর্শেল ক্রমে ক্রমে স্বাবিষ্কৃত নূতন গ্রহের ছয় পারিপার্শ্বিক অর্থাৎ চন্দ্র প্রকাশ করিলেন।

(১) সূর্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতির মতে পৃথিবী স্থিরা; আর সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ প্রভৃতি গ্রহগণ তাহার চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে। কিন্তু অধুনাতম ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা যে অখণ্ডনীয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা পূর্বোক্ত মতের নিতান্ত বিপরীত। তাঁহাদের মতে সূর্য সকলের কেন্দ্র, গ্রহগণ তাহার চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে, সূর্য গ্রহমধ্যে পরিগণিত নহে; যাহারা সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে তাহারাই গ্রহ। পৃথিবীও বুধ, শুক্র প্রভৃতি গ্রহের ন্যায় যথানিয়মে সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে, এই নিমিত্ত উহাও গ্রহমধ্যে পরিগণিত। আর যাহারা কোনও গ্রহের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে তাহাদিগকে উপগ্রহ ও সেই সেই গ্রহের পারিপার্শ্বিক বলে। চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে, এই নিমিত্ত চন্দ্র স্বতন্ত্র গ্রহ নহে, উহা এক উপগ্রহ, পৃথিবীগ্রহের পারিপার্শ্বিকমাত্র।

জর্জিয়ম্ সাইডসের আবিষ্ক্রিয়াবার্তা প্রচার হইলে, হর্শেলের নাম একবারে জগদ্বিখ্যাত হইল। কয়েক মাসের মধ্যেই, ইংলণ্ডেশ্বর এই অভিপ্রায়ে তাঁহার বার্ষিক ত্রিসহস্র মুদ্রা বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দিলেন যে, তিনি বাথনগরীর কর্ম পরিত্যাগ করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে, বিদ্যানুশীলনে রত থাকিতে পারিবেন। হর্শেল, তদনুসারে ঐ কর্ম পরিত্যাগ করিয়া, উইণ্ডসরসন্নিহিত স্লো নামক স্থানে অবস্থিতি নিরূপণ করিলেন। অতঃপর তিনি অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া কেবল পদার্থবিদ্যার অনুশীলনে রত হইলেন। বাস্তবিকও, ক্রমাগত দূরবীক্ষণ নির্মাণ ও নভোমণ্ডলীপর্যবেক্ষণ দ্বারাই, তিনি জীবনের শেষ ভাগ যাপন করিয়াছিলেন।

যে নূতন গ্রহের আবিষ্ক্রিয়া নির্দিষ্ট হইল, তিনি তদ্ব্যতিরিক্ত নানাবিধ মহোপকারক অভিনব আবিষ্ক্রিয়া ও অতর্কিতচর বহুতর নিপুণ প্রগাঢ় কল্পনা দ্বারা জ্যোতির্বিদ্যার বিশিষ্টরূপ শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি পূর্ব পূর্ব অপেক্ষায় অধিকায়ত ও অধিকশক্তিক প্রাতিফলিক দূরবীক্ষণ নির্মাণবিষয়ে কতিপয় মহোপকারিণী সুবিধা প্রদর্শন করেন। তিনি স্লো নামক স্থানে, ইংলণ্ডেশ্বরের নিমিত্ত চত্বারিংশৎপাদদীর্ঘ যে দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করেন, তাহাই সর্বাপেক্ষায় বৃহৎ। ১৭৮৫ খৃঃ অব্দের শেষে, তিনি এই অতিবৃহৎ নল নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরে, ১৭৮৯ খৃঃ অব্দের ২৭শে আগষ্ট, উহা এক যন্ত্রোপরি সন্নিবেশিত হইয়া ব্যবহারযোগ্য হইল। ঐ যন্ত্র অতিশয় জটিল বটে, কিন্তু প্রগাঢতর বুদ্ধিকৌশলে সম্পাদিত। উহা দ্বারা ঐ নলের সঞ্চালনাদি ক্রিয়া নিয়মিত হইত। শনৈশ্চরের ষষ্ঠ পারিপার্শ্বিক বলিয়া যাহাকে সকলে অনুমান করিত, সন্নিবেশদিবসেই সেই দূরবীক্ষণ দ্বারা উহা উদ্ভাবিত হইল। কিয়দ্দিনানন্তর ঐ নল দ্বারা শনৈশ্চরের সপ্তম পারিপার্শ্বিকও আবিষ্কৃত হইল। এক্ষণে ঐ নল স্বস্থান হইতে অপসারিত হইয়াছে এবং তৎপরিবর্তে হর্শেলের সুবিখ্যাত পুত্রের হস্তবিনির্মিত অত্যুৎকৃষ্ট অন্য এক দূরবীক্ষণ তথায় স্থাপিত হইয়াছে। উহা দৈর্ঘ্যে পূর্ব যন্ত্রের অর্ধেকের অধিক নহে।

এক সূর্য ও তাহার চতুর্দিকে পরিভ্রমণকারী যাবতীয় গ্রহ উপগ্রহ ও ধূমকেতুগণ লইয়া এক সৌরজগৎ হয়। সূর্য সকলের কেন্দ্র, আর বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বেষ্টা, পল্লস, জেনো, অসট্রিয়া হীবি, আইরিস, ফ্লোরা, ডায়েনা বৃহস্পতি, শনৈশ্চর য়ুরেনস ও নেপচুন প্রভৃতি গ্রহ সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে। পৃথিবীর একমাত্র পারিপার্শ্বিক, বৃহস্পতির চারি, শনৈশ্চরের আট, য়ুরেনসের ছয়, নেপচুনের এ পর্যন্ত একটিমাত্র বিজ্ঞাত হইয়াছে। অনুমান হয়, এই সৌরজগতে বহুসহস্র ধূমকেতু আছে। গ্রহ উপগ্রহগণ নিজে তেজোময় নহে, তেজোময় সূর্যের আলোকপাত দ্বারা ঐরূপ প্রতীয়মান। জ্যোতির্বিদেরা ইহা প্রায় একপ্রকার স্থির করিয়াছেন, যে সকল নক্ষত্রের প্রভা চঞ্চল তাহারা এক এক সূর্য, নিজে তেজোময় এবং এক এক জগতের কেন্দ্রভূত। এই অপরিচ্ছিন্ন বিশ্বমধ্যে আমাদের এই সৌরজগতের ন্যায় কত জগৎ আছে, তাহার ইয়ত্তা করা কাহারও সাধ্য নহে।

ইহা নির্দিষ্ট আছে, এই প্রধান জ্যোতির্বিদ স্বাভিলষিত বিদ্যার আলোচনাবিষয়ে এমন অনুরক্ত ছিলেন যে, অনেক বৎসর পর্যন্ত নক্ষত্রদর্শনযোগ্য কালে তখনও শয্যারূঢ় থাকিতেন না ; কি শীত, কি গ্রীষ্ম, সকল ঋতুতে নিজ উদ্যানে অনাবৃত প্রদেশে প্রায় একাকী অবস্থিত হইয়া সমুদয় পর্যবেক্ষণ সমাধান করেন। তিনি এই সমস্ত গবেষণা দ্বারা দূরতরবর্তী নক্ষত্রসমূহের ভাব অবগত হইয়া, তদ্বিষয়ের সবিশেষ বিবরণ স্বাভিপ্রায়-সহিত পত্রারূঢ় করিয়া প্রচার করেন।

হর্শেল তৎকালজীবী প্রধান প্রধান জ্যোতির্জ্ঞবর্গের মধ্যে গণনীয় হইয়াছিলেন এবং পণ্ডিতসমাজে ও রাজসন্নিধানে যথেষ্ট মর্যাদা পাইয়াছিলেন। ১৮১৬ খৃঃ অব্দে, যুবরাজ চতুর্থ জর্জ তাঁহাকে নাইট উপাধি প্রদান করেন। হর্শেল, প্রথমে সেনাসম্পর্কীয় তূর্যসম্প্রদায়নিযুক্ত এক দরিদ্র বালকমাত্র ছিলেন ; কিন্তু বহুমঙ্গলহেতুভূত জ্যোতির্বিদ্যার শ্রীবৃদ্ধিবিষয়ে দীর্ঘ কাল পর্যন্ত গরীয়সী আয়াসপরম্পরা স্বীকার করাতে, পরিশেষে এই রূপে পুরস্কৃত হইলেন। হর্শেল, মৃত্যুর কতিপয় বৎসর পূর্ব পর্যন্ত জৌতিষিক পর্যবেক্ষণে ক্ষান্ত হয়েন নাই ; অনন্তর, ১৮২২ খৃঃ অব্দে আগষ্ট মাসের ত্রয়োবিংশ দিবসে, ত্রশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে, লোকযাত্রা সংবরণ করিলেন। তিনি যথেষ্ট বয়স ও যথেষ্ট মান প্রাপ্ত হইয়া, এবং পরিবারের নিমিত্ত অপ্রমিত সম্পত্তি রাখিয়া, তনুত্যাগ করিয়াছেন। ঐ পরিবার, তদীয় অপ্রমিত ধনসম্পত্তির ন্যায়, তদীয় অদ্ভুত ধীসম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।

গ্রোশ্যস (১)

গ্রোশ্যস, ১৫৮৩ খৃঃ অব্দে, হলণ্ডের অন্তঃপাতী ডেল্‌ফট নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈশবকালেই অসাধারণবিদ্যোপার্জন দ্বারা অত্যন্ত খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; অষ্টবর্ষ বয়ঃক্রমকালে লাটিন ভাষায় কাব্যরচনা করেন। চতুর্দশ বৎসরের সময়, পণ্ডিতসমাজে গণিত, ব্যবহারসংহিতা ও দর্শনশাস্ত্রের বিচার করিতে পারিতেন ; ১৫৯৮ খৃঃ অব্দে, হলণ্ডের রাজদূত বর্নিবেণ্টের সমভিব্যাহারে পারিস রাজধানী গমন করেন, তথায় বুদ্ধিনৈপুণ্য ও সুশীলতাদ্বারা ফ্রান্সের অধিপতি সুপ্রসিদ্ধ চতুর্থ হেনরির নিকট ভূয়সী প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, এবং সর্বত্র অদ্ভুত পদার্থ বলিয়া পরিগণিত ও প্রশংসিত হয়েন। হলণ্ড প্রত্যাগমনের পর, তিনি ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন, এবং সতর বৎসর

(১) ইঁহার প্রকৃত নাম হুগো গ্রূট্। গ্রূট্ শব্দ লাটিন ভাষায় সাধিত হইলে গ্রোশ্যস হয়। ইনি গ্রূট্ অপেক্ষা গ্রোশ্যস নামেই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

বয়সে, ধর্মাধিকরণে প্রথম বারেই এমন অসাধারণ রূপে আত্মপক্ষ সমর্থন করিলেন যে, তদ্দ্বারা অতি প্রভূত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিলেন, এবং অল্পকালমধ্যে প্রধান ব্যবহারাজীবের পদে অধিরূঢ় হইলেন।

বীরনগরের অধ্যক্ষের মেরি রিজর্স্‌বর্গনাম্নী এক তনয়া ছিল। গ্রোশ্যস, ১৬০৮ খৃঃ অব্দে, ঐ কামিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন। এই রমণী রমণীয় গুণগ্রাম দ্বারা গ্রোশ্যসের যোগ্যা ছিলেন, এবং গ্রোশ্যসের সহধর্মিণী হওয়াতেই, তাঁহার গুণের সমুচিত সমাদর হইয়াছিল। কি সম্পত্তি, কি বিপত্তি, সকল সময়েই তাঁহারা পরস্পর অবিচলিত সদ্ভাবে ও যৎপরোনাস্তিপ্রণয়ে কালযাপন করিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ পরেই দৃষ্ট হইবেক, নিগৃহীত স্বামীর ক্লেশশান্তিবিষয়ে, ঐ পতিপ্রাণা কামিনীর ঐকান্তিক প্রণয়ের কিং পর্যন্ত উপযোগিতা হইয়াছিল।

গ্রোশ্যস অত্যন্ত কুৎসিত সময়ে ভূমণ্ডলে আসিয়াছিলেন। ঐ কালে জনসমাজ ধর্ম ও দণ্ডনীতি বিষয়ক বিষম বিসংবাদ দ্বারা সাতিশয় বিসঙ্কুল ছিল। মনুষ্যমাত্রেই ধর্মসংক্রান্ত বিবাদে উন্মত্ত, এবং ভিন্ন ভিন্ন পক্ষের ঔদ্ধত্য ও কলহপ্রিয়তা দ্বারা সৌজন্য ও দয়া দাক্ষিণ্য একান্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল। গ্রোশ্যস, আর্মিনিয় সাম্প্রদায়িক (১) ও সর্বতন্ত্রপক্ষীয় (২) ছিলেন। তিনি স্বীয়ব্যবসায়িককার্যোপলক্ষে ত্বরায় এমন বিবাদবাগুরাতে পতিত হইলেন যে, তাহা হইতে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত দুরূহ হইয়া উঠিল। তাঁহার তুল্যমতাবলম্বী পূর্বসহায় বর্নিবেল্ট অভিদ্রোহাভিযোগে ধর্মাধিকরণে নীত হইলে, তিনি স্বীয় লেখনী ও আধিপত্য দ্বারা তাঁহাব যথোচিত সহায়তা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সমুদায় প্রয়াস বিফল হইল। ১৬১৯ খৃঃ অব্দে, বর্নিবেল্টের প্রাণদণ্ড হইল, এবং গ্রোশ্যস দক্ষিণ হলণ্ডের অন্তঃপাতী লোবিষ্টিনের দুর্গমধ্যে যাবজ্জীবন কারানিরুদ্ধ হইলেন। এইরূপ দারুণ অবিচারের পর তাঁহার সর্বস্ব হৃত হইল।

বিচারারম্ভের পূর্বে, গ্রোশ্যস কোনও সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার সহধর্মিণী, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার নিমিত্ত সাতিশয় উৎসুকা হইয়াও, কোনও ক্রমে তাঁহার নিকটে যাইতে পান নাই; কিন্তু তাঁহার দণ্ডবিধানের পর, কারাবাসসহচরী হইবার প্রার্থনায় ব্যগ্রতাপ্রদর্শন পূর্বক আবেদন করিয়া, তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। গ্রোশ্যস, তাঁহার এইরূপ অনির্বচনীয় অনুরাগ দর্শনে মুগ্ধ ও

(১) খৃষ্টধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে আর্মিনিয়স্‌ নামে এক ব্যক্তি এক নূতন সম্প্রদায় প্রবর্তিত করেন। প্রবর্তকের নামানুসারে ইহার নাম আর্মিনিয় সম্প্রদায় হইয়াছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদিগের সহিত এই নূতন সম্প্রদায়ের অনুযায়ী লোকদিগের অত্যন্ত বিরোধ ছিল।

(২) যেখানে রাজা নাই সর্বসাধারণ লোকের মতানুসারে যাবতীয় রাজকার্য নির্বাহ হয় তাহাকে সর্বতন্ত্র বলে। সর্ব—সর্বসাধারণ, তন্ত্র—রাজ্যচিন্তা।

প্রীত হইয়া, এক স্বরচিত লাটিন কাব্যে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা লিখিয়াছেন, এবং তাঁহার সন্নিধানাবস্থানকে কারাবাসক্লেশরূপে অন্ধতমসে সূর্যকরোদয়স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।
হলণ্ডের লোকেরা গ্রোশ্যসের গ্রাসাচ্ছাদননির্বাহার্থে আনুকূল্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পত্নী সমুচিতগর্বপ্রদর্শন পূর্বক উত্তর দিলেন, আমার যাহা সংস্থান আছে তদ্দারাই তাঁহার আবশ্যক ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিব, অন্যের আনুকূল্য আবশ্যক নাই। তিনি, স্ত্রীজাতিসুলভবৃথাশোকপরবশ না হইয়া, সাধ্যানুসারে পতিকে সুখী ও সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গ্রোশ্যসের অধ্যয়নানুরাগও এক বিলক্ষণ বিনোদনোপায় হইয়াছিল। বস্তুতঃ, গুণবতীভার্যাসহায় ও প্রশস্তপুস্তকমণ্ডলীপরিবৃত ব্যক্তির সাংসারিক সংকটে বিষণ্ণ হইবার বিষয় কি। তথাপি, গ্রোশ্যস, যাবজ্জীবন কারাবাসদণ্ডে নিগৃহীত হইয়াও, নিজ পত্নীর সন্নিধান ও অভিমত অধ্যয়ন দ্বারা প্রফুল্ল চিত্তে কালযাপন করিয়াছিলেন।
কিন্তু, তাঁহার পত্নী তদীয় উদ্ধারসাধনে একান্ত অধ্যবসায়িনী ছিলেন। যাঁহারা অসন্দিগ্ধ চিত্তে তাঁহাকে পতিসমভিব্যাহারে কারাগারে বাস করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, বোধ হয়, পতিপ্রাণা কামিনীর বুদ্ধিকৌশলে ও উদ্যোগে কি পর্যন্ত কার্যসাধন হইতে পারে, তাঁহারা তদ্বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। তিনি, এক মুহূর্তের নিমিত্তেও, এই অভিলষিত-সমাধানের উপায়চিন্তনে বিরতা হয়েন নাই; এবং যদ্দারা এতদ্বিষয়ের আনুকূল্য হইবার সম্ভাবনা, তাদৃশ ব্যাপার উপস্থিত হইলে, তদ্বিষয়ে কোনও ক্রমেই উপেক্ষা করিতেন না।
গ্রোশ্যস সন্নিহিতনগরবর্তী বন্ধুবর্গের নিকট হইতে পাঠার্থ পুস্তকানয়নের অনুমতি পাইয়াছিলেন। পাঠসমাপ্তির পর, সেই সকল পুস্তক করণ্ডকমধ্যগত করিয়া প্রতিপ্রেরিত হইত। ঐ সমভিব্যাহারে তাঁহার মলিন বস্ত্রও ক্ষালনার্থে রজকালয়ে যাইত। প্রথমতঃ রক্ষকেরা তন্ন তন্ন করিয়া ঐ করণ্ডকের বিষয়ে অনুসন্ধান করিত; কিন্তু কোনও বারেই সন্দেহোদ্বোধক বস্তু দৃষ্টিগোচর না হওয়াতে, ক্রমে শিথিলপ্রযত্ন হয়। গ্রোশ্যসের পত্নী, রক্ষিগণের উত্তরোত্তর অযত্নপ্রাদুর্ভাব দেখিয়া, পতিকে সেই করণ্ডকমধ্যগত করিয়া স্থানান্তরিত করিবার উপায় কল্পনা করিলেন। বায়ুপ্রবেশার্থে তিনি তাহাতে কতিপয় ছিদ্র প্রস্তুত করিলেন; এবং গ্রোশ্যস এইরূপ সংক্ষিপ্ত স্থানে রুদ্ধ হইয়া কত ক্ষণ পর্যন্ত থাকিতে পারেন, ইহাও পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তিনি এক দিবস, দুর্গাধ্যক্ষের অসন্নিধানরূপ সুযোগ দেখিয়া, তাঁহার সহধর্মিণীর নিকটে গিয়া, নিবেদন করিলেন, আমার স্বামী অত্যধিক অধ্যয়ন দ্বারা শরীরপাত করিতেছেন; এজন্য, আমি সমুদায় পুস্তক এক কালে ফিরিয়া দিতে বাসনা করি।
এইরূপ প্রার্থনা দ্বারা তাঁহার সম্মতিলাভ হইলে, নিরূপিত সময়ে গ্রোশ্যস করণ্ডকমধ্যে

প্রবেশ করিলেন। দুই জন সৈনিক পুরুষ অধিরোহণী দ্বারা অতি কষ্টে করণ্ডক অবতীর্ণ করিল। ঐ করণ্ডক সমধিকভারাক্রান্ত দেখিয়া, তাহাদের অন্যতর পরিহাস পূর্বক কহিল, ভাই! ইহাব ভিতরে অবশ্যই এক আর্মিনিয় আছে। গ্রোশ্যসের পত্নী অব্যাকুল চিত্তে উত্তর করিলেন, হাঁ ইহার মধ্যে অনেক আর্মিনিয় পুস্তক আছে বটে। যাহা হউক, সৈনিক পুরুষ, করণ্ডকের অসম্ভবভারদর্শনে সন্দিহান হইয়া, উচিতবোধে অধ্যক্ষপত্নীর গোচর করিল। কিন্তু তিনি কহিলেন, ইহার মধ্যে বহুসংখ্যক পুস্তক আছে, তাহাতেই এত ভারী হইয়াছে; গ্রোশ্যসের শারীরিকস্বাস্থ্যরক্ষার্থে, তাঁহার পত্নী ঐ সমুদায় পুস্তক এক কালে ফিরিয়া দিবার নিমিত্ত অনুমতি লইয়াছেন। এক দাসী এই গোপনীয় পরামর্শের মধ্যে ছিল, সে ঐ করণ্ডকের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিল। করণ্ডক এক বন্ধুর আলয়ে নীত হইলে, গ্রোশ্যস অব্যাহত শরীরে তন্মধ্য হইতে নির্গত হইলেন, রাজমিস্ত্রির বেশপরিগ্রহ ও করে কর্ণিকধারণ পূর্বক, আপণের মধ্য দিয়া গমন করিয়া, নৌকারোহণ করিলেন এবং ব্রাবণ্টে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে শকটযানে এণ্টওয়েপ প্রস্থান করিলেন। ১৬২১ খৃঃ অব্দের মার্চ মাসে, এই ব্যাপার সম্পন্ন হয়। গ্রোশ্যসের সহধর্মিণীর যত দিন এরূপ দৃঢ় প্রত্যয় না জন্মিল, গ্রোশ্যস সম্পূর্ণ রূপে বিপক্ষবর্গের ক্ষমতার বহির্ভূত হইয়াছেন, তাবৎ তিনি সকলের এই বিশ্বাস জন্মাইয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বামী অত্যন্ত রোগাভিভূত হইয়া শয্যাগত আছেন।

কিয়ৎ দিন পরে এই বিষয় প্রকাশ হইলে, তিনি পূর্বাপর সমুদায় স্বীকার করিলেন। তখন দুর্গাধ্যক্ষ ক্রোধে অন্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে দৃঢ় রূপে রুদ্ধ করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিতে লাগিলেন। পরিশেষে, তিনি রাজপুরুষদিগের নিকট আবেদন করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন। কতকগুলা পামর প্রস্তাব করিয়াছিল, তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করা কর্তব্য। কিন্তু অনেকেরই অন্তঃকরণে করুণাসঞ্চার হওয়াতে, তাহা অগ্রাহ্য হইল। ফলতঃ, সকলেই তাঁহার বুদ্ধিকৌশল, সহিষ্ণুতা ও পতিপরায়ণতা দর্শনে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

গ্রোশ্যস ফ্রান্সে গিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ দিবস পরে, তাঁহার পরিবারও তাঁহার সহিত সমাগত হইলেন। পারিস রাজধানীতে বাস করা বহুব্যয়সাধ্য; এজন্য গ্রোশ্যস প্রথমতঃ কিছু কাল অর্থের অসঙ্গতিনিবন্ধনে অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়াছিলেন। অবশেষে, ফ্রান্সের অধিপতি তাঁহার বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দিলেন। তিনি অবিশ্রান্ত গ্রন্থরচনা করিতে লাগিলেন; তাঁহার যশঃশশধর, সমুদায় ইয়ুরোপমধ্যে বিদ্যোতমান হইতে লাগিল।

ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী কার্ডিনল রিশিলিয়ু গ্রোশ্যসকে অনন্যমনাঃ ও অনন্যকর্মা হইয়া ফ্রান্সের হিতচিন্তাবিষয়ে ব্যাসক্ত হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। কিন্তু গ্রোশ্যস,

প্রাকৃত জনের ন্যায়, তাঁহার সমুদায় প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে, তিনি তাঁহাকে অধীনতা-নিবন্ধন বিস্তর ক্লেশ দিয়াছিলেন। গ্রোশ্যস, এই রূপে নিতান্ত হতাদর হইয়া, স্বদেশ-প্রত্যাগমনার্থে অতিশয় উৎসুক হইলেন। তদনুসারে, ১৬২৭ খৃঃ অব্দে, তাঁহার সহধর্ম্মিণী, বন্ধুবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যস্থিরীকরণার্থ, হলণ্ড প্রস্থান করিলেন।

গ্রোশ্যস প্রত্যাগমনবিষয়ে প্রাড্‌বিবাকদিগের অনুমতি লাভ করিতে পারিলেন না; কিন্তু তৎকালে দণ্ডনীতিবিষয়ে যে নিয়মপরিবর্ত্ত হইয়াছিল, তাহার উপর নির্ভর করিয়া, স্বীয় সহধর্ম্মিণীর উপদেশানুসারে, সাহস পূর্ব্বক রটর্ডাম নগরে উপস্থিত হইলেন। যৎকালে তাঁহার নামে বিচারালয়ে অভিযোগ হইয়াছিল, তখন তিনি কোনও প্রকারেই অপরাধ-স্বীকার ও ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে চাহেন নাই; বিশেষতঃ এমন দৃঢ় রূপে আত্মপক্ষ রক্ষা কবিয়াছিলেন যে, তাঁহার বিপক্ষেরা অত্যন্ত অপদস্থ ও অবমানিত হয়; এজন্য তাহারা তৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার পক্ষে খড়্গহস্ত হইয়াছিল। কতকগুলি লোকে তাঁহাব প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু প্রাড্‌বিবাকেরা এই ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে ব্যক্তি গ্রোশ্যসকে রুদ্ধ করিয়া দিতে পারিবেক সে উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেক। গ্রোশ্যসের জন্মভূমি বলিয়া যে দেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, তত্রত্য লোকেরা তাঁহাব প্রতি এইরূপ নৃশংস ব্যবহার করিল।

তিনি হলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া, হম্বর্গ নগরে গিয়া, দুই বৎসর অবস্থিতি করিলেন। তথায় অবস্থানকালে, স্থইডেনের রাজ্ঞী ক্রিষ্টিনার অধিকারে বিষয়কর্ম্ম স্বীকারে সম্মত হওয়াতে রাজ্ঞী তাঁহাকে ফ্রান্সের রাজসভায় দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তিনি দশ বৎসব অবস্থিতি ও কতিপয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিলেন। উক্ত কাল পরেই, নানাকারণ-বশতঃ দৌত্যপদ দুরূহ ও কষ্টপ্রদ বোধ হওয়াতে, তিনি বিরক্ত হইয়া কর্ম্মপরিত্যাগ-প্রার্থনায় আবেদন করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল। তিনি স্থইডেনে প্রত্যাগমন-কালে হলণ্ডে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাব দেশীয় লোকেরা পূর্ব্বে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল, এক্ষণে বিশিষ্টরূপ সমাদর করিল।

তিনি স্থইডেনে উপস্থিত হইয়া, ক্রিষ্টিনাকে সমস্ত কাগজপত্র বুঝাইয়া দিয়া, লুবেক-প্রত্যাগমনে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু পথিমধ্যে অত্যন্ত দুর্য্যোগ হওয়াতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল। পরিশেষে, নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া, ঝড় বৃষ্টি না মানিয়া, তিনি এক অনাবৃত শকটে আরোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। কিন্তু এই অবিমৃষ্যকারিতাদোষেই তাঁহার আয়ুঃশেষ হইল। রষ্টক পর্য্যন্ত গমন করিয়া তাঁহাকে বিরত হইতে হইল। তিনি ঐ স্থানেই, ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে, আগষ্টের অষ্টাবিংশ দিবসে, ত্রিষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রম কালে, প্রিয়তমা পত্নী এবং ছয় পুত্রের মধ্যে চারিটি রাখিয়া, কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

গ্রোশ্যস নানা বিষয়ে নানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সকলে স্বীকার করেন, তদীয় গ্রন্থপরম্পরা দ্বারা বিজ্ঞানশাস্ত্রের সুচারুরূপ অনুশীলনের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার সন্দর্ভসমূহের মধ্যে অধিকাংশই নিরবচ্ছিন্ন শব্দবিদ্যাসংক্রান্ত, সুতরাং গ্রীক ও লাটিন ভাষার জ্ঞানসাপেক্ষ। এক্ষণে ঐ দুই ভাষার পূর্ববৎ অনুশীলন নাই, এজন্য তৎসমুদায় অধুনা একপ্রকার অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠিয়াছে। আর, ঐ কারণবশতই, তাঁহার আলঙ্কারিক গ্রন্থ সকলও একান্ত উপেক্ষিত হইয়াছে। তিনি লাটিন ভাষায় নৈসর্গিক ও জাতীয় বিধান বিষয়ে সন্ধিবিগ্রহবিধিনামক যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, অধুনাতন কালে তাহাতেই তাঁহার কীর্তি পৃথ্বীমণ্ডলে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ঐ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ দ্বারা ইয়ুরোপীয় অধুনাতন বিধানশাস্ত্রের বিশিষ্টরূপ শ্রীবৃদ্ধিলাভ হইয়াছে।

লিনিয়স (১)

সুইডেন রাজ্যের অন্তর্গত স্মিলণ্ড প্রদেশে রাসল্ট নামে এক গ্রাম আছে। চার্লস লিনিয়স, ১৭০৭ খৃঃ অব্দে, তথায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অতি দীন গ্রামপুরোহিত ছিলেন। লিনিয়স, অত্যন্ত দরিদ্র ও অগণ্য হইয়াও, অলোকসামান্য বুদ্ধিশক্তি, মহোৎসাহশীলতা ও অবিচলিত অধ্যবসায় প্রভাবে বিজ্ঞানশাস্ত্র ও অন্যান্য বিদ্যা বিষয়ে মনুষ্যসমাজে অগ্রগণ্য হইয়াছেন। অতি শৈশবকালেই প্রকৃতির অনুশীলনে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে; তন্মধ্যে উদ্ভিদবিদ্যার আলোচনায় তিনি সমধিক অনুরক্ত ছিলেন। বোধ হয়, তিনি বাল্যকালে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে পরিভ্রমণে ও প্রকৃতিরূপ প্রকাণ্ড পুস্তকের অধ্যয়নে অধিক রত ছিলেন, পাঠশালার নিরূপিত পুস্তকে তাদৃশ মনোনিবেশ করিতেন না। সুতরাং, তাঁহার প্রথম শিক্ষকেরা তদীয় অনাবেশ দর্শনে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা, তাঁহাদের মুখে পাঠের গতিশ্রবণে বিরক্ত হইয়া, তাঁহাকে উপানৎকারের ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিলেন; কিন্তু, পরিশেষে বন্ধুবর্গের সবিশেষ অনুরোধ ও লিনিয়সের নিরতিশয় বিনয়ের বশবর্তী হইয়া, চিকিৎসাবিদ্যাশিক্ষার্থে অনুমতি দিলেন; বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তাঁহার, না পুস্তক, না বস্ত্র, না আহারসামগ্রী, কিছুরই সঙ্গতি ছিল না; এমন কি, অভীষ্ট উদ্ভিদবিদ্যার অনুশীলনসমাধানার্থে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে পারিবার নিমিত্ত, জীর্ণ চর্মপাদুকাতে বল্কলের তালী দিয়া লইতে হইত। এরূপ দুরবস্থাতেও তিনি প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিলেন।

(১) ইঁহার প্রকৃত নাম লিনি, লিনি শব্দ লাটিনভাষায় সাধিত হইলে, লিনিয়স হয়। ইনি লিনিয়স নামেই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

লিনিয়স কেবল যৌবনদশায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এমন সময়ে অপ্সালের বৈজ্ঞানিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে এই অভিপ্রায়ে লাপ্লাণ্ডের অতি ভীষণ ভূভাগে পাঠাইবার নিমিত্ত স্থির করিলেন যে, তিনি তত্রত্য নিসর্গোৎপন্ন বস্তুসমুদায়ের তত্ত্বনির্ধারণ করিয়া আনিবেন। তিনিও, অনুরাগ ও ব্যগ্রতা প্রদর্শন পূর্বক, পাথেয়মাত্রপর্যাপ্ত বেতনে, উক্তবহুপরিশ্রমসাধ্যব্যাপারসমাধানার্থ ঐ প্রান্তরদেশে প্রস্থান করিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগমনের পর, অপ্সালের বিশ্ববিদ্যালয়েব উদ্ভিদ ও ধাতুবিদ্যা বিষয়ে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। উপদেষ্টব্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকার এবং উপদেশপ্রণালীর চমৎকারিত্ব ও অভিনবত্ব প্রযুক্ত ভূরি ভূরি শ্রোতৃসমাগম হইল।

কিন্তু, উদয়োন্মুখী প্রতিভার নিত্যবিদ্বেষিণী ঈর্ষা ত্বরায় তাঁহার অভ্যুদয়াশা উচ্ছিন্ন করিল। ইহা উদ্ভাবিত হইল, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম আছে, কোনও ব্যক্তি অগ্রে উপাধিপত্র প্রাপ্ত না হইলে, তথায় উপদেশ দিতে অধিকারী হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে, লিনিয়সের বিদ্যালয়-সম্পর্কীয় কোনও প্রশংসাপত্রাদি ছিল না। এই বিষয় উপলক্ষে, চিকিৎসাশাস্ত্রেব অধ্যাপক ডাক্তার রোজিনের সহিত তাঁহার ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। বন্ধুবর্গ মধ্যবর্তী হইযা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। অনন্তর, তিনি কতিপয় শিষ্য সহিত অবিলম্বে অপ্সাল হইতে প্রস্থান করিলেন; এবং ধাতু ও উদ্ভিদ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানার্থে ডালিকা-র্লিযাপ্রদেশে পর্যটন কবিতে লাগিলেন।

লিনিয়স, ডালিকার্লিয়ার রাজধানী ফহ্লন নগবে উপস্থিত হইযা, তথাকার প্রধান চিকিৎসক ডাক্তার মোরিযসের নিকট বিশিষ্ট রূপে প্রতিপন্ন হইলেন। উক্ত ডাক্তার দয়াবান ও বিদ্যাবান ছিলেন। তাঁহার বৃক্ষবাটিকাতে কতকগুলি তরু, লতা ও পুষ্প ছিল, তদ্দর্শনে লিনিযস অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সমধিকসৌন্দর্যধার আর একটি রমণীয় পুষ্প ছিল, লিনিয়স কখনও কোনও উদ্যানে বা ক্ষেত্রে তাদৃশ মনোহর পুষ্প অবলোকন করেন নাই। ফলতঃ নবীন উদ্ভিদবেত্তা ডাক্তার মোরিয়সের জ্যেষ্ঠা কন্যার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত হইলেন; এবং সেই নবীনা কামিনীরও অন্তঃকরণে গাঢতর অনুরাগ সঞ্চার হইল। লিনিযস, অন্তঃকরণের অনুরাগ ও ব্যগ্রতার বশবর্তী হইয়া, নব-প্রণয়িনীর জনকসন্নিধানে পাণিগ্রহণের কথা উত্থাপন করিলেন। সুশীল ডাক্তার, এই নবাগত বিদ্বান বাগ্মী যুবা ব্যক্তির ব্যবসায় ও সরল স্বভাব দর্শনে, তাঁহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন; কিন্তু আপন কন্যাকেও অত্যন্ত ভালবাসিতেন, এবং নবানুরাগপরবশ যুবকজনের মত উদ্ধত ও অবিমৃষ্যকারী ছিলেন না; অতএব বিবেচনা করিলেন, অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া, এরূপ সহায়সম্পত্তিহীন ও কোনও প্রকার নিয়মিত ব্যবসায় ও বিষয়কর্ম শূন্য অনাথ ব্যক্তিকে জামাতা করিলে কন্যাকে চিরদুঃখিনী করা হয়। অনন্তর, তিনি তাঁহাকে বিবাহবিষয়ে আর তিন বৎসর অপেক্ষা করিবার নিমিত্ত সম্মত করিয়া,

চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নার্থ দৃঢ় রূপে পরামর্শ দিলেন, এবং কহিলেন, ইতিমধ্যে আমি কন্যার বিবাহ দিব না ; যদি তুমি এই সময় মধ্যে কিঞ্চিৎ সংস্থান করিতে পার, তাহা হইলে আমি, ক্ষণ কাল বিলম্ব না করিয়া, প্রসন্ন চিত্তে তোমাকে কন্যাদান করিব।

ইহা অপেক্ষা আর কি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব হইতে পারে। লিনিয়স, স্বীয় নির্মল জ্ঞানের সহায়তা দ্বারা প্রীতিপ্রসারচঞ্চল চিত্তকে স্থিরীভূত করিয়া, প্রশংসাপত্র লইবার নিমিত্ত, অবিলম্বে লীডন নগর প্রস্থান করিলেন। তাঁহার প্রস্থানের পূর্বে, কুমারী মোরিয়স, বহু দিনের সংগৃহীত ব্যায়াবশিষ্ট এক শত মুদ্রা আনয়ন করিয়া, প্রণয়ব্রতের বরণ ও অকৃত্রিম অনুরাগের দৃঢ়তর প্রমাণস্বরূপ তাঁহার চরণে সমর্পণ করিলেন। তিনি, তাঁহার কোমল-করপল্লবমর্দন ও ব্যগ্র চিত্তে বারংবার মুখচুম্বন করিলেন এবং অপরিমেয় প্রণয়রসাস্বাদে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া, অন্তঃকরণমধ্যে তাঁহার অকৃত্রিম ঔদার্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে বিদায় হইলেন।

অনেকানেক রসজ্ঞ নায়কেরা, এমন অবস্থায়, মনে মনে কতপ্রকার কল্পনা করিতে করিতে, প্রস্থান করেন ; এবং মধ্যে মধ্যে নায়িকার উদ্দেশে বিচ্ছেদবেদনানিবেদন-দূতীস্বরূপ রসবতী গাথা রচনা করিয়া থাকেন ; এবং দুর্বিষহবিরহাতিকাতর হইয়া, অনবরত বিলাপ ও পরিতাপ করেন। কিন্তু লিনিয়স সেরূপ নায়ক ছিলেন না। তিনি ইহাই ভাবিয়া প্রফুল্ল হৃদয়ে প্রস্থান করিলেন, ভাল, এক ব্যক্তি আমাকে যথার্থরূপ ভাল-বাসে ও আমার ব্যবসায়ের প্রশংসা করে ; আমিও, তাহার প্রণয়ের যোগ্য পাত্র হইবার নিমিত্ত, বিদ্যা ও খ্যাতি লাভ বিষয়ে প্রাণপণ যত্ন ও পরিশ্রম করিতে ক্রটি করিব না।

অনন্তর, তিনি লীডন নগরে উপস্থিত হইয়া, সাতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে, অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, বোরহেব ও অন্যান্য বিজ্ঞানশাস্ত্রজ্ঞ বিখ্যাত পণ্ডিতদিগের নিকট প্রতিপন্ন হইলেন, এবং আমষ্টর্ডাম নগরের অধ্যক্ষের বাটীর চিকিৎসক হইলেন। যে দুই বৎসর এই কর্মে নিযুক্ত থাকেন, ঐ কালে তিনি বহুতর পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে কতিপয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। অনন্তর, তিনি সমধিকবিদ্যালাভপ্রত্যাশায়, ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশে ভ্রমণ করিলেন। ফলতঃ তিনি এই সময়ে বিদ্যোপার্জনবিষয়ে যেরূপ অসাধারণ পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছিলেন, শুনিলে অসম্ভব বোধ হয়। বাস্তবিক, পদার্থবিদ্যাসংক্রান্ত এমন কোনও বিষয় ছিল না যে, তিনি তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, আর তাহা শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন নাই ; কিন্তু উদ্ভিদবিদ্যার অনুশীলনেই সর্বাপেক্ষা অধিক রত ছিলেন, এবং ঐ বিদ্যায় এমন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন, যে, উহার লোপ না হইলে, তাঁহার সেই প্রতিষ্ঠার অপক্ষয় সম্ভাবনা নাই।

লিনিয়স, ১৭৩৮ খৃঃ অব্দে, কিছু দিনের জন্যে পারিস যাত্রা করিলেন। ঐ বৎসরের শেষে, তিনি স্বদেশ প্রত্যাগমন পূর্বক ষ্টকহলম নগরে চিকিৎসাব্যবসায় আরম্ভ করিলেন।

প্রথমে সকলেই তাঁহার প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। পরিশেষে, সৌভাগ্যোদয়-বশতঃ, রাজ্ঞী ইলিয়োনোরার কাসের চিকিৎসায় কৃতকার্য হওয়াতে, তদবধি তিনি তন্নগরের অতি আদরণীয় চিকিৎসক হইয়া উঠিলেন, এবং সামুদ্রিকসৈন্যসম্পর্কীয় চিকিৎসকের ও রাজকীয় উদ্ভিদবিদের পদে নিযুক্ত হইলেন। এই রূপে নিয়মিত আয় ব্যবস্থাপিত হইলে, তিনি পরস্পরানুরাগসঞ্চারের পাঁচ বৎসর পরে, সেই প্রিয়তমা কামিনীর পাণিপীড়ন করিলেন।

কিয়ৎ দিবস পরেই, লিনিয়স অপ্সালের বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ুর্বেদের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। ঐ সময়ে, তাঁহার পূর্বশত্রু রোজিন উক্ত বিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হওয়াতে, উভয়ে সদ্ভাব পূর্বক পরস্পরের পদ বিনিময় করিয়া লইলেন। এই রূপে লিনিয়স, চিরপ্রার্থিত উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপকপদে অধিরূঢ় হইয়া, অতি সম্মানপূর্বক ক্রমাগত সপ্তত্রিংশৎ বৎসর উক্ত কার্য নির্বাহ করিলেন।

লিনিয়সের উদ্যোগে, কয়েক জন নব্য পণ্ডিত নিসর্গোৎপন্নপদার্থগবেষণার্থ দেশে দেশে প্রেরিত হইলেন। কালম, অসবেক, হসক্কিস্ট ও লোফ্লিং এই কয়েক ব্যক্তি প্রাকৃত ইতিবৃত্ত বিষয়ে যে নানা আবিষ্ক্রিয়া করিয়া গিয়াছেন, পদার্থবিদ্যার শ্রীবৃদ্ধিবিষয়ে লিনিয়সের যে প্রগাঢ় অনুরাগ ও আগ্রহাতিশয় ছিল, তাহার মূল কারণ। ডট্টনিংহলম নগরে সুইডেনের রাজমহিষীর যে চিত্রশালিকা ছিল, তিনি তাহার সবিশেষ বিবরণ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, লিনিয়সের উপর ভারার্পণ করেন। তিনিও, তদনুসারে, তত্রত্য সমুদায় শঙ্খশম্বুকাদির বিজ্ঞানশাস্ত্রানুযায়ী নূতন শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। বোধ হয়, ১৭৫১ খৃঃ অব্দে, তিনি ফিলসফিয়া বোটানিকা অর্থাৎ উদ্ভিদমীমাংসা নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পরে, ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে স্পিশিস প্লাণ্টেরম অর্থাৎ উদ্ভিদসংবিভাগ নামে গ্রন্থ রচিত, ও প্রচারিত হয়। এই গ্রন্থে তৎকালবিদিত নিখিল তরুগুল্মাদির সবিশেষ বিবরণ লিখিত হইযাছে। এই গ্রন্থ লিনিয়সের অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও অবিনশ্বর।

১৭৫৩ খৃঃ অব্দে, এই মহীয়ান পণ্ডিত, নাইট অব্ দি পোলার স্টার, এই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। এই মহতী মর্যাদা ইহার পূর্বে কখনও কোনও পণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রদত্ত হয় নাই। ১৭৬১ খৃঃ অব্দে, তিনি সম্ভ্রান্তলোকশ্রেণীমধ্যে পরিগণিত হইলেন। অন্যান্যদেশীয় বৈজ্ঞানিক সমাজ হইতেও তিনি বিদ্যাসম্বন্ধ নানা মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। তিনি, ক্রমে ক্রমে ঐশ্বর্যশালী হইয়া, অপ্সালসন্নিহিত হামার্বি নগরে এক অট্টালিকা ও ভূম্যধিকার ক্রয় করিয়া, জীবনের শেষ পঞ্চদশ বৎসর প্রায় তথায় অবস্থিতি করেন। ঐ স্থানে তাঁহার প্রাকৃত ইতিবৃত্ত সংক্রান্ত এক চিত্রশালিকা ছিল, তথায় তিনি উক্তবিদ্যাবিষয়ে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। পৃথিবীর নানাভাগস্থিত বিজ্ঞানশাস্ত্রজ্ঞ লোক ও অধ্বনীন বর্গের সাহায্যে, তাঁহার ঐ চিত্রশালিকার সর্বদাই শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

লিনিয়স, জীবনের অধিকাংশ, শারীরিক সুস্থ ও পটু থাকাতে, অতিশয় উৎসাহ ও পরিশ্রম স্বীকার পূর্বক, পদার্থবিদ্যাবিষয়িণী গবেষণা সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু ১৭৭৪ খৃঃ অব্দের মে মাসে, অপস্মাররোগে আক্রান্ত হইলেন। এজন্য, অধ্যাপনা-সংক্রান্ত যে সকল কর্মে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইত, তাঁহাকে তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিতে ও বিদ্যানুশীলনে ক্ষান্ত হইতে হইল। অনন্তর, তিনি ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে, দ্বিতীয় বার, কিয়ৎ দিন পরে আর এক বার, ঐ রোগে আক্রান্ত হইলেন। পরিশেষে, ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে, জানুয়ারির একাদশাহে, তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল।

লিনিয়স পূর্বোক্ত গ্রন্থসমূহ ব্যতিরিক্ত ভেষজনির্ণয় এবং রোগনির্ণয় বিষয়ে এক এক প্রণালীবদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি যেরূপ অসাধারণ সাহস, উৎসাহ, পরিশ্রম ও দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন, বিজ্ঞানশাস্ত্রের সমুদায় ইতিবৃত্তমধ্যে অতি অল্প লোকের সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি পদার্থবিদ্যাবিষযে যে নানা প্রণালী ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন, কালক্রমে তৎসমুদাযের অন্যথাভাব হইলেও হইতে পারে; কিন্তু, তাঁহা হইতে উক্ত বিদ্যার যে মহীয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। সুইডেনের অধিপতি চতুর্দশ চার্লস, ১৮১৯ খৃঃ অব্দে, লিনিয়সের জন্মভূমিতে তাঁহাব এক কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণের আদেশ করিয়াছেন।

বলণ্টিন জামিরে ডুবাল

ফ্রান্স রাজ্যে সাম্পেন নামে এক প্রদেশ আছে, ১৬৯৫ খৃঃ অব্দে, ডুবাল ঐ প্রদেশেব অন্তর্বর্তী আর্টনি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, সামান্যরূপ কৃষিকর্ম মাত্র অবলম্বন করিয়া, যথাকথঞ্চিৎ পরিবারের ভরণপোষণ নির্বাহ করিতেন। ডুবালের দশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে, তাঁহার পিতা মাতা, আর কতকগুলি পুত্র ও কন্যা রাখিয়া, পরলোকযাত্রা করেন। তাঁহাদের প্রতিপালনের কোনও উপায় ছিল না। সুতরাং ডুবাল অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িলেন। কিন্তু, এইরূপ দুরবস্থায পড়িয়াও, মহীয়সী উৎসাহশীলতা ও অবিচলিত অধ্যবসায় প্রভাবে, সমস্ত প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া, তিনি অসাধারণ বিদ্যোপার্জনাদি দ্বারা মনুষ্যমণ্ডলীতে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। দুই বৎসর পরে, তিনি এক কৃষকের আলয়ে পেরুশাবক সকলের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু, বালস্বভাবসুলভ কতিপয় গর্হিতাচারদোষে দূষিত হওয়াতে, অল্প দিনের মধ্যেই, তথা হইতে দূরীকৃত হইলেন। পরিশেষে, ঐ কারণ বশতঃ, তাঁহাকে জন্মভূমিও পরিত্যাগ করিতে হইল।

ডুবাল ১৭০৯ খৃঃ অব্দের দুঃসহ হেমন্তের উপক্রমে, লোরেন প্রস্থান করিলেন। তিনি

পথিমধ্যে বিষম বসন্তরোগে আক্রান্ত হইলেন। ঐ সময়ে যদি এক কৃষকের আশ্রয় না পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবার কোনও অসম্ভাবনা ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে, ঐ ব্যক্তি, তাঁহার তাদৃশদশাদর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া, তাঁহাকে আপন মেষশালায় লইয়া গেল। যাবৎ তাঁহার পীড়োপশম না হইল, কৃষক তাঁহাকে মেষপুরীষরাশিতে আকণ্ঠ মগ্ন করিয়া রাখিল এবং অতি কদর্য পোড়া রুটি ও জল এই মাত্র পথ্য দিতে লাগিল। এইরূপ চিকিৎসা ও এইরূপ শুশ্রূষাতেও, তিনি সৌভাগ্যক্রমে এই ভয়ানক রোগের আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইলেন, এবং পরিশেষে কোনও সন্নিবেশ-বাসী যাজকের আশ্রয় পাইয়া, সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

ডুবাল, নান্সির নিকটে এক মেষপালকের গৃহে নিযুক্ত হইয়া তথায় দুই বৎসর অবস্থিতি করিলেন। ঐ সময়েই তিনি ভূয়সী জ্ঞানবৃদ্ধি সম্পাদন করেন। ডুবাল শৈশবাবধি অতিশয় অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। তিনি, শৈশবকালেই, সর্প, ভেক, প্রভৃতি অনেকবিধ জন্তু সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং প্রতিবেশী ব্যক্তিবর্গকে, এই সকল জন্তুর কিরূপ অবস্থা ইহারা এরূপে নির্মিত হইল কেন, ইহাদের সৃষ্টির তাৎপর্যই বা কি, এইরূপ বহুবিধ প্রশ্ন দ্বারা সর্বদাই বিরক্ত করিতেন। কিন্তু এই সকল প্রশ্নের যে উত্তর পাইতেন, তাহা যে সন্তোষজনক হইত না, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। সামান্যবুদ্ধি লোকেরা সামান্য বস্তুকে সামান্য জ্ঞানই করিয়া থাকে। কিন্তু অসামান্যবুদ্ধিসম্পন্নেরা কোনও বস্তুকেই সামান্য জ্ঞান করেন না। এই নিমিত্ত, সর্বদা এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, প্রাকৃত লোকেরা, মহানুভাবদিগের বুদ্ধির প্রথম ধার্য সকল দেখিয়া, উন্মাদ জ্ঞান করে। এক দিবস, ডুবাল কোনও পল্লীগ্রামস্থ বালকের হস্তে ঈসপরচিত গল্পের পুস্তক অবলোকন করিলেন। ঐ পুস্তক পশুপক্ষী, সর্প প্রভৃতি নানাবিধ জন্তুর প্রতিমূর্তিতে অলঙ্কৃত ছিল। এ পর্যন্ত, ডুবালের বর্ণপরিচয় হয় নাই, সুতরাং পুস্তকে কি লিখিত ছিল তাহার বিন্দুবিসর্গও অনুধাবন করিতে পারিলেন না। যে সকল জন্তু দেখিলেন, উহাদের নাম জানিতে, ও তত্তদ্বিষয়ে ঈসপ কি লিখিয়াছেন তাহা শুনিতে অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত ও ব্যগ্রচিত্ত হইয়া, আপন সমক্ষে সেই পুস্তক পাঠ করিবার নিমিত্ত, স্বীয় সহচরকে অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই বালক কোনও ক্রমেই তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিল না। ফলতঃ তাঁহাকে সর্বদাই এই রূপে কৌতূ-হলাক্রান্ত ও পরিশেষে একান্ত বিষাদ প্রাপ্ত হইতে হইত।

এই রূপে যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া, তিনি এতাদৃশ ক্ষুণ্ণ অবস্থায় থাকিয়াও, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যত কষ্টসাধ্য হউক না কেন, যে রূপে পারি, লেখা পড়া শিখিব। এইরূপ অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া, তিনি, যে কিছু অর্থ তাঁহার হস্তে আসিতে লাগিল, প্রাণপণে তাহা সঞ্চয় করিতে লাগিলেন, এবং তাহা দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া, বয়োধিক বালকদিগের নিকট বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিলেন।

ডুবাল, কিছু দিনের মধ্যেই, অদ্ভুত পরিশ্রম দ্বারা আপন অভিপ্রেত একপ্রকার সিদ্ধ করিয়া, ঘটনাক্রমে এক দিবস একখানি পঞ্জিকা অবলোকন করিলেন। ঐ পঞ্জিকাতে জ্যোতিশ্চক্রের দ্বাদশ রাশি চিত্রিত ছিল। তিনি তদ্দর্শনে অনায়াসেই স্থির করিলেন যে, এই সমুদায় আকাশমণ্ডলস্থিত পদার্থবিশেষের প্রতিমূর্তি হইবেক, সন্দেহ নাই। অনন্তর, তিনি, তৎসমুদায় প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত, এক দৃষ্টিতে নভোমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং সেই সমুদায় দেখিলাম বলিয়া যাবৎ তাঁহার অন্তঃকরণে দৃঢ় প্রত্যয় না জন্মিল, তাবৎ কোনও মতেই নিবৃত্ত হইলেন না।

কিয়ৎ দিন পরে, তিনি, একদা কোনও মুদ্রাযন্ত্রালয়ের গবাক্ষের নিকট দিয়া গমন করিতে করিতে, তন্মধ্যে এক ভূগোলচিত্র দেখিতে পাইলেন। উহা পূর্বদৃষ্ট যাবতীয় বস্তু অপেক্ষায় উপাদেয় বোধ হওয়াতে, তিনি তৎক্ষণাৎ ক্রয় করিয়া লইলেন ; এবং কিয়ৎ দিবস পর্যন্ত, অবসর পাইলেই, অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া, কেবল তাহাই পাঠ করিতে লাগিলেন। নাড়ীমণ্ডলস্থিত অংশ সকল অবলোকন করিয়া, তিনি প্রথমতঃ ঐ সমস্তকে ফ্রান্সপ্রচলিত লীগ অর্থাৎ সার্ধ ক্রোশের চিত্র অনুমান করিয়াছিলেন। পরন্তু, সাম্পেন হইতে লোরেনে আসিতে ঐরূপ অনেক লীগ অতিক্রম করিতে হইয়াছে, অথচ ভূচিত্রে উভয়ের অন্তর অত্যল্পস্থানব্যাপী লক্ষিত হইতেছে ; এই বিবেচনা করিয়া তিনি সেই অনুমান ভ্রান্তিমূলক বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। যাহা হউক, এই ভূচিত্র ও অন্য অন্য ভূচিত্র সকল অভিনিবেশপূর্বক পাঠ করিয়া, তিনি ক্রমে ক্রমে কেবল ঐ সকল চিহ্নেরই স্বরূপ ও তাৎপর্য সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে নির্ধারিত করিলেন এমন নহে, ভূগোল-বিদ্যাসংক্রান্ত প্রায় সমুদয় সংজ্ঞা ও সঙ্কেতের মর্মগ্রহ করিতে পারিলেন।

ডুবাল এই রূপে গাঢ়তর অনুরাগ ও অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অন্যান্য কৃষীবল বালকেরা অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মাইতে আরম্ভ করিল। অতএব, তিনি বিজনস্থানলাভের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইলেন। এক দিবস ঘটনাক্রমে ডিনিযুবরের নিকটে এক আশ্রম দর্শন করিয়া, তিনি এমন প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন যে, তৎক্ষণাৎ মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, অত্রত্য তপস্বী পালিমানের অনুবর্তী হইয়া, ধর্মচিন্তাবিষয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিব। অনন্তর, তিনি তপস্বী মহাশয়কে আপন প্রার্থনা জানাইলেন। পালিমান অনুগ্রহপ্রদর্শন পূর্বক তাঁহার প্রার্থিত বিষয়ে সম্মত হইলেন, এবং আপন অধিকারে যে এক পদ শূন্য ছিল, তাহাতে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু অনতি-বিলম্বেই পালিমানের কর্তৃপক্ষ ঐ পদে অন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

লুনিবিলের প্রায় পাদোন ক্রোশ অন্তরে, সেণ্ট এন নামে এক আশ্রম ছিল, তথায় কতকগুলি তপস্বী বাস করিতেন। পালিমান, সাধ্যানুসারে ডুবালের ক্ষোভ শান্তি করিবার নিমিত্ত, তাঁহাকে এক অনুরোধপত্রসমেত তাঁহাদের আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন।

সেই সতীর্থ তপস্বীদিগের আজীবনস্বরূপ যে ছয়টি ধেনু ছিল, ডুবালের প্রতি তাঁহারা তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিলেন। বোধ হয়, তপস্বী মহাশয়েরা ডুবাল অপেক্ষা অজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কতকগুলি পুস্তক ছিল, তাঁহারা ডুবালকে তাহা পাঠ করিবার অনুমতি দিলেন। ডুবাল যে যে কঠিন বিষয় স্বয়ং বুঝিতে না পারিতেন, তাহা আশ্রমদর্শনাগত ব্যক্তিগণের নিকট বুঝিয়া লইতেন। তিনি এখানেও, পূর্বের মত কষ্ট স্বীকার করিয়া, যে কিছু অর্থ বাঁচাইতেন, অন্য কোনও বিষয়ে ব্যয় না করিয়া, তদ্দ্বারা কেবল পুস্তক ও ভূচিত্র ক্রয় করিতেন। এই স্থলে, বিস্তরব্যাঘাতসত্ত্বেও, তিনি লিখিতে ও অঙ্ক কষিতে শিখিলেন।

কোনও কোনও ভূচিত্রের নিম্ন ভাগে সম্ভ্রান্ত লোকবিশেষের পরিচ্ছদ চিত্রিত ছিল, তাহাতে গ্রিফিন, উৎক্রোশপক্ষী, লাঙ্গুলদ্বয়োপলক্ষিত কেশরী ও অন্যান্য বিকটাকার অদ্ভুত জন্তু নিরীক্ষণ করিয়া, ডুবাল আশ্রমাগত কোনও ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পৃথিবীতে এবংবিধ জীব আছে কি না। তিনি কহিলেন, কুলাদর্শ নামে এক শাস্ত্র আছে, এই সমস্ত তাহার সঙ্কেত। শ্রবণমাত্র তিনি ঐ শব্দটি লিখিয়া লইলেন, এবং অতি সত্বর নিকটবর্তী নগর হইতে উক্ত বিদ্যার এক পুস্তক ক্রয় করিয়া আনিলেন, এবং অবিলম্বে তদ্বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠিলেন।

জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোলবৃত্তান্তের অনুশীলনে ডুবাল অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি সর্বদাই সন্নিহিতবিপিন মধ্যে নির্জন প্রদেশ অন্বেষণ করিয়া লইতেন এবং একাকী তথায় অবস্থিত হইয়া, নির্মল নিদাঘরজনীর অধিকাংশ জ্যোতির্মণ্ডলপর্যবেক্ষায় যাপন করিতেন, এবং মস্তকোপরি পরিশোভমান মৌক্তিময় নভোমণ্ডলের বিষয় সমধিক রূপে জানিতে মনোরথ করিতেন—সেরূপ অবস্থা, মনোরথের অধিক আর কি ঘটিতে পারে। জ্যোতির্গণের বিষয় বিশিষ্ট রূপে জানিতে পারিবেন, এই বাসনায় তিনি অত্যুন্নত ওকবৃক্ষশিখরোপরি বন্য দ্রাক্ষা ও উইলোশাখার পরস্পর সংযোজনা করিয়া সারসকুলায়সন্নিভ একপ্রকার বসিবার স্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন।

ক্রমে ক্রমে ডুবালের যত জ্ঞানবৃদ্ধি হইতে লাগিল, পুস্তকবিষয়েও তত আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্তু পুস্তকক্রয়ের যে নির্ধারিত উপায় ছিল, তাহার সেরূপ বৃদ্ধি হইল না। তিনি আয়বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত ফাঁদ পাতিয়া বনের জন্তু ধরিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কিয়ৎকাল এই ব্যবসায় দ্বারা কিছু কিছু লাভও করিতে লাগিলেন। আয়বৃদ্ধি-সম্পাদন নিমিত্ত, তিনি কখনও কখনও অত্যন্ত দুঃসাহসিক ব্যাপারেও প্রবৃত্ত হইতে পরাঙ্‌মুখ হইতেন না।

একদা তিনি, কাননমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, বৃক্ষোপরি এক অতি চিক্কণলোমা আরণ্য মার্জার অবলোকন করিলেন। ইহা অনেক উপকারে আসিবে, এই বিবেচনা করিয়া,

তিনি তৎক্ষণাৎ বৃক্ষোপরি আরোহণ পূর্বক এক দীর্ঘ যষ্টি দ্বারা মার্জারকে অধিষ্ঠানশাখা হইতে অবতীর্ণ করাইলেন। বিড়াল দৌড়িতে আরম্ভ করিল। তিনিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। উহা এক তরুকোটরে প্রবেশ করিল, এবং তথা হইতে নিষ্কাশিত করিবামাত্র, তাঁহার হস্তোপরি ঝাঁপিয়া পড়িল। অনন্তর, উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, কুপিত বিড়াল তাঁহার মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে নখরপ্রহার করিল; ডুবাল তথাপি উহাকে টানিতে লাগিলেন। বিড়াল আরও শক্ত করিয়া ধরিল এবং খর নখর দ্বারা চর্মের যত দূর আক্রমণ করিয়াছিল, প্রায় সমুদায় অংশ উঠাইয়া লইল। অনন্তর, ডুবাল নিকটবর্তী বৃক্ষোপরি বারংবার আঘাত কবিয়া, মার্জারের প্রাণসংহার করিলেন এবং হর্ষোৎফুল্ল লোচনে তাহাকে গৃহে আনিলেন; ইহা দ্বারা প্রয়োজনোপযোগী পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারিব, এই আহ্লাদে বিড়ালকৃত ক্ষতক্লেশ এক বার মনেও করিলেন না।

ডুবাল বন্য জন্তুর উদ্দেশে সর্বদাই এইরূপ সঙ্কটে প্রবৃত্ত হইতেন, এবং লুনিবিলে গিয়া সেই সেই পশুর চর্মবিক্রয় দ্বারা অর্থসংগ্রহ করিয়া, পুস্তক ও ভূচিত্র কিনিয়া আনিতেন।

অবশেষে, এক শুভ ঘটনা হওয়াতে, তিনি অনেক পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারিলেন। শরৎকালে এক দিবস অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, সম্মুখবর্তী শুষ্ক পর্ণরাশিতে আঘাত করিবামাত্র, তিনি ভূতলে এক উজ্জ্বল বস্তু অবলোকন করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ হস্তে লইয়া দেখিলেন, উহা স্বর্ণময় মুদ্রা, উহাতে উত্তমরূপে তিনটি মুখ উৎকীর্ণ আছে। ডুবাল ইচ্ছা করিলেই ঐ স্বর্ণময় মুদ্রা আত্মসাৎ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি পবের দ্রব্য অপহরণ করা গর্হিত ও অধর্মহেতু বলিয়া জানিতেন; অতএব পব রবিবারে লুনি-বিলে গিয়া তত্রত্য ধর্মাধ্যক্ষের নিকট নিবেদন করিলেন, মহাশয়! অরণ্য মধ্যে আমি এক স্বর্ণমুদ্রা পাইযাছি, আপনি এই ধর্মালয়ে ঘোষণা করিয়া দেন; যে ব্যক্তিব হারাই-য়াছে, তিনি সেণ্ট এনের আশ্রমে গিয়া, আমার নিকটে আবেদন করিলেই, আপন বস্তু প্রাপ্ত হইবেন।

কয়েক সপ্তাহের পর, ইংলণ্ডদেশীয় ফরস্টর নামে এক ব্যক্তি অশ্বারোহণে, সেণ্ট এনের আশ্রমদ্বারে উপস্থিত হইয়া, ডুবালের অন্বেষণ করিলেন, এবং ডুবাল উপস্থিত হইলে জিজ্ঞাসিলেন; তুমি কি এক মুদ্রা পাইয়াছ? ডুবাল কহিলেন, হ্যাঁ মহাশয়! তিনি কহিলেন, আমি তোমার নিকট বড় বাধিত হইলাম, সে আমার মুদ্রা। ডুবাল কহিলেন, অগ্রে আপনি অনুগ্রহ করিয়া, কুলাদর্শানুযায়ী ভাষায় নিজ আভিজাতিক চিহ্ন বর্ণন করুন, তবে আমি আপনাকে মুদ্রা দিব। তখন সেই আগন্তুক কহিলেন, অহে বালক! তুমি পবিহাস করিতেছ কেন, কুলাদর্শের বিষয় তুমি কি বুঝিবে। ডুবাল কহিলেন, সে যাহা হউক, অ মি নিশ্চিত বলিতেছি, আপনি নিজ আভিজাতিক চিহ্নেব বর্ণন না করিলে মুদ্রা পাইবেন না।

ডুবালের নির্বন্ধাতিশয়দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, ফরস্টর, তাঁহার জ্ঞানপরীক্ষার্থে তাঁহাকে নানা বিষয়ে ভূরি ভূরি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; পরিশেষে তৎকৃত উত্তর শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া, নিজ আভিজাতিক চিহ্ন বর্ণন দ্বারা তাঁহার প্রার্থনা সিদ্ধ করিয়া, মুদ্রাগ্রহণ পূর্বক দুই স্বর্ণ পুরস্কার দিলেন; এবং প্রস্থানকালে ডুবালকে, মধ্যে মধ্যে লুনিবিলে গিয়া, সাক্ষাৎ করিতে কহিয়া দিলেন। তদনুসারে ডুবাল যখন যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, প্রতিবারেই তিনি তাঁহাকে এক এক রজতমুদ্রা দিতেন। এই রূপে ফরেস্টরের নিকট মধ্যে মধ্যে মুদ্রা ও পুস্তক দান পাইয়া, সেণ্ট এনের রাখালের পুস্তকালয়ে চারি শত খণ্ড পুস্তক সংগৃহীত হইল; তন্মধ্যে বিজ্ঞানশাস্ত্র ও পুরাবৃত্ত বিষয়ক অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ছিল।

ডুবাল ক্রমে দ্বাবিংশতিবর্ষীয় হইলেন; কিন্তু এ পর্যন্ত আপনার হীন অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা এক দিবসের নিমিত্তেও মনে আনেন নাই। ফলতঃ, এখনও তিনি জ্ঞানব্যতীত সর্ব বিষয়েই রাখাল ছিলেন, এবং জ্ঞানোপার্জন ব্যতীত আর কোনও বিষয়েরই অভিলাষ রাখিতেন না। তিনি প্রতিদিন গোচারণকালে, তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া, আপনার চারি দিকে ভূচিত্র ও পুস্তক সকল বিস্তৃত করিতেন, এবং ধেনুগণের রক্ষণাবেক্ষণবিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ না রাখিয়া, কেবল অধ্যয়নে নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন; ধেনু সকল সচ্ছন্দে ইতস্ততঃ চরিয়া বেড়াইত।

একদা তিনি এই ভাবে অবস্থিত আছেন, এমন সময়ে সহসা এক সৌম্যমূর্তি পুরুষ আসিয়া তাঁহার সম্মুখবর্তী হইলেন। ডুবালকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে যুগপৎ কারুণ্য ও বিস্ময় রসের উদয় হইল। এই মহানুভাব ব্যক্তি লোরেনের রাজকুমারদিগের অধ্যাপক, নাম কৌণ্ট বি ডাম্পিয়র। ইনি ও রাজকুমারগণ এবং অন্য এক অধ্যাপক মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। সকলেই ঐ অরণ্যে পথহারা হন। কৌণ্ট মহাশয়, অসংস্কৃতবিরলকেশ অতিহীনবেশ রাখালের চতুর্দিকে পুস্তক ও ভূচিত্ররাশি প্রসারিত দেখিয়া, এমন চমৎকৃত হইলেন যে, ঐ অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত স্বীয় সহচরদিগকে তথায় আনয়ন করিলেন।

এই রূপে মৃগয়াবেশধারী দেশাধিপতনয় ও তদীয় সহচরেরা, ডুবালকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এ স্থলে উহা উল্লেখ করা আবশ্যক, ঐ রাজকুমারদিগের মধ্যে এক জন পরে মেরিয়া থেরিসার পাণিগ্রহণ করেন এবং জর্মনিরাজ্যের সম্রাট হয়েন।

এই ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া, সকলেই এক কালে মুগ্ধ হইলেন; পরিশেষে যখন কতিপয় প্রশ্ন দ্বারা তাহার বিদ্যা ও বিদ্যাগমের উপায় সবিশেষ অবগত হইলেন, তখন তাঁহারা বাকপথাতীত বিস্ময় ও সন্তোষ সাগরে মগ্ন হইলেন। সর্বজ্যেষ্ঠ রাজকুমার, তৎক্ষণাৎ কহিলেন, তুমি রাজসংসারে চল, আমি তোমাকে এক উত্তম কর্মে নিযুক্ত

করিব। ডুবাল কোনও কোনও পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলেন, সংসারের সংস্রবে মনুষ্যের ধর্মভ্রংশ হয়; এবং নান্সিতেও দেখিয়াছিলেন, বড় মানুষের অনুচরেরা প্রায় লম্পট ও কলহপ্রিয়; অতএব অকপট বাক্যে কহিলেন, আমার রাজসেবায় অভিলাষ নাই; চির কাল অরণ্যে থাকিয়া গোচারণ করিয়া নিরুদ্বেগে জীবনক্ষেপণ করিব; আমি এ অবস্থায় সম্পূর্ণ সুখে আছি; কিন্তু ইহাও কহিলেন, যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার উত্তম উত্তম পাঠ ও সমধিক বিদ্যা ও জ্ঞান লাভের সুযোগ করিয়া দেন, তাহা হইলে আমি আপনকাব সমভিব্যাহারে যাইতে প্রস্তুত আছি।

বাজকুমার এই উত্তব শ্রবণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন; এবং রাজধানীতে প্রত্যাগমন পূর্বক, ডুবালেব যথানিয়মে সংপণ্ডিত ও সদুপদেশকের নিকট বিদ্যাধ্যয়নসমাধানের নিমিত্ত, নিজ পিতা ডিউককে সম্মত কবিয়া, তাঁহাকে পোণ্টে মৌসলের জেস্থটদিগের সংস্থাপিত বিদ্যালয়ে পাঠাইযা দিলেন।

ডুবাল তথায দুই বৎসর অবস্থিতি করিয়া জ্যোতিষ, ভূগোল, পুরাবৃত্ত ও পৌরাণিক বিষয় সকল সমধিক রূপে অধ্যয়ন করিলেন। তদনন্তর, ১৭১৮ খৃঃ অব্দের শেষভাগে, ডিউকের পারিসযাত্রাকালে, তদীয়সম্মতিক্রমে তৎসমভিব্যাহারে গমন করিলেন, এই অভিপ্রায়ে যে তত্রত্য অধ্যাপকদিগের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। পর বৎসর, তিনি তথা হইতে লুনিবিলে প্রত্যাগমন করিলে, ডিউক মহাশয় তাঁহাকে সহস্র মুদ্রা বেতনে আপনার পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ ও সাত শত মুদ্রা বেতনে বিদ্যালয়ে পুরাবৃত্তের অধ্যাপক নিযুক্ত কবিলেন, এবং কোনও বিষয়ে কোনও নিয়মে বদ্ধ না করিয়া, সচ্ছন্দে রাজবাটীতে অবস্থিতি করিতে অনুমতি দিলেন।

তিনি পুবাবৃত্তে যে উপদেশ দিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার এমন সুখ্যাতি হইল যে, অনেকানেক বৈদেশিকেরাও লুনিবিলে আসিয়া তদীয়শিষ্যশ্রেণীতে নিবিষ্ট হইতে লাগিলেন।

ডুবাল স্বভাবতঃ অত্যন্ত বিনীত ও লোকরঞ্জন ছিলেন। আপনার পূর্বতন হীন অবস্থার কথা উত্থাপন হইলে, তিনি তদুপলক্ষে কিঞ্চিন্মাত্র লজ্জিত বা ক্ষুব্ধ না হইয়া, বরং সেই অবস্থায় যে মনের সচ্ছন্দে কালযাপন করিতেন ও ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের উপচয়সহকারে অন্তঃকরণমধ্যে যে নব নব ভাবোদয় হইত, সেই সমস্ত বর্ণনা করিতে করিতে অপর্যাপ্ত প্রীতি প্রাপ্ত হইতেন।

তিনি প্রথমসংগৃহীত বহুসংখ্যক অর্থ দ্বারা সেণ্ট এনের আশ্রম পুনর্নির্মাণ করিয়া দিলেন এবং তথায় আপনার নিমিত্তে একটি গৃহ নির্মাণ করাইলেন। অনন্তর, তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া, রাজকুমারগণ ও তাঁহাদের অধ্যাপকদিগের সহিত যে রূপে কথোপকথন করিয়াছিলেন,* কোনও নিপুণতর চিত্রকর দ্বারা, সেই অবস্থার ব্যঞ্জক এক আলেখ্য প্রস্তুত

করাইলেন, এবং ডিউকের সম্মতি লইয়া, স্বপ্রত্যবেক্ষিত পুস্তকালয় স্থাপন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে, তিনি জন্মভূমিদর্শনবাসনাপরবশ হইয়া তথায় গমন করিলেন, এবং যে ভবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তত্রত্য শিক্ষকের ব্যবহারার্থে প্রশস্ত রূপে নির্মাণ করাইলেন, আর গ্রামস্থ লোকের জলকষ্টনিবারণার্থে নিজ ব্যয়ে অনেক কূপ খনন করাইয়া দিলেন।

১৭৩৮ খৃঃ অব্দে, ডিউকের মৃত্যুর পর, তদীয় উত্তরাধিকারী লোরেনের বিনিময়ে টস্কানির আধিপত্য গ্রহণ করিলে, রাজকীয় পুস্তকালয় ফ্লোরেন্স নগরে নীত হইল। ডুবাল তথায় পূর্ববৎ পুস্তকাধ্যক্ষের কার্যনির্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অভিনব প্রভু, হঙ্গরির রাজ্ঞীর পাণিগ্রহণ দ্বারা অত্যুন্নত সম্রাটপদ প্রাপ্ত হইয়া, বিয়েনার পুরাতন ও নূতন টঙ্ক এবং পৃথিবীর অন্যান্যভাগপ্রচলিত সমুদায় টঙ্ক সংগ্রহ করিবার বাসনা করিলেন। ডুবালের টঙ্কবিজ্ঞানবিদ্যাবিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগ ছিল, সম্রাট তাঁহাকে উক্ত টঙ্কালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন ; এবং রাজপল্লীমধ্যে রাজকীয় প্রাসাদের অদূরে তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ডুবাল প্রায় সপ্তাহে এক দিন মহারাজ ও রাজমহিষীর সহিত আহার করিতেন।

এই রূপে অবস্থার পরিবর্ত হইলেও, তাঁহার স্বভাব ও চরিত্রের কিঞ্চিন্মাত্র পরিবর্ত হইল না। ইয়ুরোপের এক অত্যন্ত বিষয়রসপরায়ণ নগরে থাকিয়াও, তিনি লোরেনের অরণ্যে যেরূপ ঋজুস্বভাব ও বিদ্যোপার্জনে একাগ্রচিত্ত ছিলেন, সেইরূপই রহিলেন। রাজা ও রাজ্ঞী তাঁহার রমণীয় গুণগ্রামের নিমিত্ত অত্যন্ত প্রীতি ও প্রসন্ন ছিলেন, এবং তাহার প্রমাণস্বরূপ তাঁহাকে, ১৭৫১ খৃঃ অব্দে, আপন পুত্রের উপাচার্যের পদ প্রদান করেন। কিন্তু তিনি কোনও কারণ বশতঃ এই সম্মানের পদ অস্বীকার করিলেন। রাজসংসারে তাঁহার গতিবিধি এত অল্প ছিল যে, কোনও কোনও রাজকুমারীকে কখনও নয়নগোচর করেন নাই, সুতরাং তিনি তাঁহাদিগকে চিনিতেন না। একদা, এই কথা উত্থাপিত হইলে, কোনও রাজকুমার কহিয়াছিলেন, ডুবাল যে আমার ভগিনীদিগকে জানেন না, ইহাতে আমি আশ্চর্য জ্ঞান করি না, কারণ আমার ভগিনীরা পৌরাণিক পদার্থ নহেন।

এক দিবস, তিনি না বলিয়া সত্বর চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া, সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় যাইতেছেন। ডুবাল কহিলেন, গ্রাব্রিলির গান শুনিতে। নরপতি কহিলেন, সে তো ভাল গাইতে পারে না। কিন্তু বাস্তবিক সে ভাল গাইত, এজন্য ডুবাল উত্তর দিলেন, আমি মহারাজের নিকট বিনয়বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, এ কথা উচ্চ স্বরে কহিবেন না। রাজা কহিলেন, কেন। ডুবাল কহিলেন, কারণ এই যে, মহারাজের পক্ষে ইহা অত্যন্ত আবশ্যক যে, সকলে আপনকার কথায় বিশ্বাস করে, কিন্তু এই কথায়

কোনও ব্যক্তি বিশ্বাস করিবেক না। ফলতঃ ডুবাল কোনও কালেই প্রসাদাকাঙ্ক্ষী চাটুকার ছিলেন না।

এই মহানুভাব ধর্মাত্মা, জীবনের শেষ দশা সচ্ছন্দে ও সম্মান পূর্বক যাপন করিয়া, ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে, একাশীতি বৎসর বয়ঃক্রমে, কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। যাঁহারা ডুবালকে বিশেষ রূপে জানিতেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার দেহাত্যয়বার্তাশ্রবণে শোকাভিভূত হইলেন। এম ডি রোশ নামক তাঁহার এক বন্ধু, তাঁহার মৃত্যুর পর তল্লিখিত সমুদায় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া, দুই খণ্ড পুস্তকে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। সরকেশিয়াদেশীয়া এক সুশিক্ষিতা রমণী দ্বিতীয় কাথিরিনের শয়নাগারপরিচারিকা ছিলেন, তাঁহার সহিত ডুবালের জীবনের শেষ ত্রয়োদশ বৎসর যে লেখালেখি চলিয়াছিল সে সমুদায়ও মুদ্রিত হইল। সকলে স্বীকার করেন, তাহাতে উভয় পক্ষেরই অসাধারণ বুদ্ধিনৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। বৃদ্ধবয়সে রূপবতী যুবতীদিগকে প্রিয় বিবি বলিয়া সম্ভাষণ করা দূষণাবহ নহে, এই নিমিত্ত তিনি, পূর্বোক্ত রমণী ও অন্যান্য যে যে গুণবতী কামিনীদিগকে ভালবাসিতেন, সকলকেই উক্ত বাক্যে সম্ভাষণ করিতেন।

এই সকল দেখিয়া যদিও নিশ্চিত বোধ হইতে পারে, ডুবাল কামিনীগণসহবাসে বীতরাগ ছিলেন না, কিন্তু তাহাদের অধিকতর মনোরঞ্জন হইবে বলিয়া, কখনও পরিচ্ছদপরিপাটীর চেষ্টা করেন নাই। ফলতঃ, অন্তিম কাল পর্যন্ত তাঁহার বেশ ও চলন পূর্বের ন্যায় গ্রাম্যই ছিল। তিনি কৃষকদিগের ন্যায় চলিতেন, এবং সর্বদা কৃষ্ণপিঙ্গল বর্ণের অঙ্গাবরণ, সামান্য পরিধান, ঘন উপকেশ, কৃষ্ণবর্ণ রোমজ চরণাবরণ পরিতেন, এবং লৌহকণ্টকাবৃত স্থূল উপানহ ধারণ করিতেন। তিনি যে পরিচ্ছদপরিপাটীবিষয়ে এরূপ অনাদর করিতেন, তাহা কোনও ক্রমেই কৃত্রিম নহে। তাঁহার জীবনের পূর্বাপর অবেক্ষণ করিলে, স্প বোধ হয় যে, কেবল নির্মলজ্ঞানালোকসহকৃত ঋজুস্বভাবতাবশতই এরূপ হইত। এই বিষয়ে এক উদাহরণ প্রদর্শিত হইলেই পর্যাপ্ত হইতে পারিবেক—তাঁহার একজন কর্মকর ছিল, তিনি তাহাকে ভৃত্য না ভাবিয়া বন্ধুমধ্যে গণন করিতেন, সে ব্যক্তি বিবাহিত পুরুষ, এজন্য তিনি প্রতিদিন সকাল রাত্রেই, তাহাকে গৃহগমনের অনুমতি দিতেন, এবং তৎপরে যথাকথঞ্চিৎ স্বহস্তেই সামান্যরূপ কিঞ্চিৎ আহার প্রস্তুত করিয়া লইতেন।

ডুবাল, স্বীয় অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যাবসায় মাত্র সহায় করিয়া, ক্রমে ক্রমে অনেকবিধ জ্ঞানোপার্জন দ্বারা তৎকালীন প্রায়সমস্ত ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক বিদ্যাবান হইয়াছিলেন। রাজসংসারে ব্যাপক কাল অবস্থিতি করিলে, মনুষ্যমাত্রেরই প্রায় আত্মশ্লাঘা ও দুষ্ক্রিয়াশক্তির পরতন্ত্র হয়, কিন্তু তিনি তথায় অর্ধ শতাব্দীর অধিক যাপন করিয়াছিলেন, তথাপি অতি দীর্ঘ জীবনের অন্তিম ক্ষণ পর্যন্ত এক মুহূর্তের নিমিত্তেও, চরিত্রের নির্মলতাবিষয়ে লোরেনাবস্থানকালের রাখালভাব পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার পূর্বতন হীন অবস্থার

দুঃসহক্লেশপ্রপঞ্চমাত্র অতিক্রান্ত হইয়াছিল, সরলহৃদয়তা, যদৃচ্ছালাভসন্তোষ ও প্রশান্ত-চিত্ততা, অন্তিম ক্ষণ পর্যন্ত অবিকৃতই ছিল।

তামস জেঙ্কিন্স

এক্ষণে এমন এক অদ্ভুত ব্যাপার লিখিত হইতেছে যে, তাহা দূর দেশে বা অতীতকালে ঘটিলে, তাহাতে বিশ্বাস জন্মাইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু বর্ণনীয় বিষয় অত্যন্ত সন্নিহিত দেশে ও সন্নিহিত কালে ঘটিয়াছে। সুতরাং কোনও অংশ অপ্রামাণিক বোধ হইলে, অনায়াসে তাহার প্রামাণ্যসংস্থাপন করা যাইতে পারিবে, এই নিমিত্ত অসঙ্কুচিত চিত্তে প্রচারিত হইল।

তামস জেঙ্কিন্স আফ্রিকাদেশীয় কোনও রাজার পুত্র। তদীয় আকার কাফরির সমুদায়-লক্ষণোপেত ছিল। তাঁহার পিতা বহ্বায়ত গিনি উপকূলের অন্তর্গত লিটিল কেপ মৌণ্ট সংজ্ঞিত স্থান ও তৎপূর্ববর্তী জনপদের অনেকাংশেব অধিপতি ছিলেন। এই উপকূলে ব্রিটেনীয় সাংযাত্রিকেরা দাসক্রয়ার্থ সর্বদা যাতায়াত করিত। কাফরিরাজ, শরীরগত কোনও বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত, ব্রিটেনিয়া নাবিকদিগের নিকট কুক্কুটাক্ষ নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইয়ুরোপীয়েরা, সভ্যতা ও বিদ্যার প্রভাবে, বাণিজ্যবিষয়ে কাফরিজাতি অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া রাজা কুক্কুটাক্ষ আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিদ্যানুশীলনার্থে ব্রিটেনে পাঠাইবার নিশ্চয় করিলেন। স্কটলণ্ডের অন্তর্গত হাউয়িক প্রদেশীয় কাপ্তেন স্বানস্টন এই উপকূলে আসিয়া, হস্তিদন্ত, স্বর্ণবেণু প্রভৃতি ক্রয় করিতেন। কাফরিরাজ তাঁহার সহিত এই নিয়ম স্থির করিলেন যে, আপনি আমার পুত্রকে স্বদেশে লইয়া গিয়া কতিপয় বৎসরে সুশিক্ষিত করিয়া আনিয়া দিবেন; আমি এতদ্দেশোৎপন্নপণ্যবিষয়ে আপনকার পক্ষে বিশেষ বিবেচনা করিব।

এই বালক যে অভিপ্রায়ে ও যে প্রকারে স্বানস্টনের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অন্তঃকরণে কিছু কিছু জাগরূক ছিল। প্রস্থানদিবসে, তাঁহার পিতামাতা, কতিপয় কৃষ্ণকায় মহামাত্র সমভিব্যাহারে উপকূলসন্নিহিত এক উন্নত হরিত প্রদেশের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন। বালক যথাবিধানে পোতবণিকের হস্তে সমর্পিত হইলেন। তাঁহার জননী রোদন করিতে লাগিলেন। স্বানস্টন ধর্মপ্রমাণ অঙ্গীকার করিলেন, আপনাদের পুত্র যত দূর পারেন বিদ্যা শিখাইয়া কতিপয় বৎসরের পর আনিয়া দিব। অনন্তর, বালক পোতোপরি নীত হইলেন; পোতপতি যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহার নাম তামস জেঙ্কিন্স রাখিলেন।

স্বানস্টন, জেঙ্কিন্সকে হাউয়িকে আনয়ন করিয়া, আপন প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালনের যথোচিত উপায় দেখিতেছেন, এমন সময়ে দুর্দৈববশতঃ অকস্মাৎ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এরূপ

দুর্দৈব ঘটিলে কি হইবে, তাহার কোনও প্রতিবিধান করা না থাকাতে জেঙ্কিন্সের কেবল বিদ্যাশিক্ষারই প্রতিবন্ধ উপস্থিত হইল এমন নহে, গ্রাসাচ্ছাদনাদি অত্যন্ত আবশ্যক বিষয়েও যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইতে লাগিল। হাউয়িকে টৌন ইননামক পান্থনিবাসের অন্তর্গত এক গৃহে স্বানস্টনের প্রাণত্যাগ হয়। তথায় জেঙ্কিন্স, স্কটদেশীয় দুরন্ত হেমন্তের শীতে ম্রিয়মাণ হইয়াও, সাধ্যানুসারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে ত্রুটি করেন নাই। স্বানস্টনের মৃত্যুর পর, তিনি শীতে যে পর্যন্ত ক্লেশ পাইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। পরিশেষে, সেই স্থানের অধিকারিণী বিবি ব্রৌন তাঁহাকে রন্ধনাগারে বাশীকৃতপ্রজ্বলিতজ্বলনসন্নিধানে আনয়ন্ করিলেন। সমুদায় বাটীর মধ্যে, কেবল ঐ স্থান তাঁহার সচ্ছন্দাবাসের যোগ্য ছিল। তিনি বিবি ব্রৌনের এই দয়ার কার্য চিরকাল স্মরণ করিতেন।

জেঙ্কিন্স সেই পান্থনিবাসে কিয়ৎকাল অবস্থিতি কবিলেন। পরে মৃত স্বানস্টনের অতি নিকট কুটুম্ব টিবিয়টহেডবাসী এক কৃষক, তদীয়সমস্তভাবগ্রহণ পূর্বক, তাঁহাকে স্বীয় আবাসে আনয়ন করিলেন। তথায় তিনি শূকবশাবক ও হংসকুক্কুটাদি গ্রাম্য বিহঙ্গমগণেব রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি নিকৃষ্ট কর্ম করিতে লাগিলেন। পান্থনিবাস হইতে প্রস্থানকালে, তিনি ইংরেজীব এক বর্ণও বুঝিতে পারিতেন না। কিন্তু, এখানে আসিয়া, তিনি অতি ত্ববায় সেই প্রদেশের প্রচলিত ভাষা, উচ্চাবণের সমুদায় নিয়ম সহিত, শিক্ষা করিলেন। তিনি স্বানস্টনের কুটুম্বের বাটীতে যে কযেক বৎসর অবস্থিতি কবিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কিছু কাল রাখালের কর্ম করেন; তৎপবে, একপ্রকার তৃণ শকটে করিয়া হাউয়িকে বিক্রয় কবিতে লইয়া যাইতেন। তিনি এই কর্ম এমন উত্তম রূপে নির্বাহ করিতেন যে গৃহস্বামী তাঁহাব প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন।

জেঙ্কিন্স দৃঢকায় হইলে পর, ফলনাসনিবাসী লেডলানামক এক ব্যক্তি, কোনও অনির্ণীত হেতুবশতঃ, তাঁহার প্রতি সদয় হইযা, সেই গৃহস্বামীব নিকট প্রার্থনা পূর্বক, তাঁহাকে আপন বাটীতে আনিযা রাখিলেন। কৃষ্ণকায় জেঙ্কিন্স ফলনাসে আসিয়া সকল কর্মই করিতে লাগিলেন, কখনও রাখাল হইতেন, কখনও বা মন্দুরার কর্ম করিতেন ফলতঃ তিনি কর্মমাত্রেই হস্তার্পণ করিতে পারিতেন। তাঁহার বিশেষ কর্ম এই নির্দিষ্ট ছিল, সর্বপ্রকার সংবাদ লইয়া হাউয়িকে যাইতে হইত। অত্যন্ত মেধা থাকাতে, তিনি এই কর্মেব বিশেষ উপযুক্ত ছিলেন। অনন্তর, তিনি লেডলার একজন প্রকৃত কৃষাণ হইযা উঠিলেন।

এই সময়েই বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে তাঁহার অনুরাগ জন্মে। তিনি প্রথম কি রূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা পরিজ্ঞাত নহে। বোধ হয়, বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে তাঁহাব অবশ্যকর্তব্যতা বোধ ছিল, এবং এরূপ অবস্থায় যত দূর হইতে পারে, পিতার মানস পূর্ণ করিবার নিমিত্ত তিনি নিতান্ত উৎসুক ছিলেন। ইহা সম্ভব বোধ হইতেছে, তিনি লেডলার সন্তানদের অথবা তাঁহার গৃহদাসীদের নিকট প্রথম শিক্ষা আরম্ভ করেন।

লেডলা অতি অল্প দিন মধ্যেই, জেঙ্কিন্সকে বর্তিকার শেষগ্রহণে বিশেষ ব্যগ্র দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। জেঙ্কিন্স, দশা ও বসার অবশেষ সম্মুখে দেখিলেই, তৎক্ষণাৎ তাহা লইয়া মন্দুরার উপরি মঞ্চে লুকাইয়া রাখিতেন। এই সকল লইয়া তিনি কি করেন, এ বিষয়ে সকলের অন্তঃকরণে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল। ত্বরায়, তত্রত্য লোক সকল কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া, .জেঙ্কিস বাসায় গিয়া কি করেন, এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ কবিল। কিন্তু সকলেই দেখিয়া চমৎকৃত হইল যে, ঐ দীন বালক এক পুস্তক ও প্রস্তরফলক লইয়া অক্ষর লিখিতে অভ্যাস করিতেছেন। দৃষ্ট হইল, একটি পুরাতন বীণাযন্ত্রও তাঁহার নিকটে আছে। ঐ যন্ত্রের জন্যে অধঃস্থিত অশ্বদিগকে বহুসংখ্যক রাত্রি নিদ্রাপ্রতিরোধনিবন্ধন অসুখে যাপন করিতে হইত।

এইরূপে বিদ্যানুশীলনে তাঁহার অনুরাগ, প্রকাশ হওয়াতে, লেডলা তাঁহাকে কোনও প্রতিবেশিসংস্থাপিত বৈকালিক পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতে অনুমতি দিলেন। তিনি তথায় অল্পদিন মধ্যে এমন বিদ্যোপার্জন করিলেন যে, সেই প্রদেশের সমুদায় লোক শুনিয়া চমৎকৃত হইল। কখনও কাহারও বোধ ছিল না যে, কাফরিজাতি কোনও কালে বিদ্যার্থী হইতে পাবে। যাহা হউক, যদিও তাঁহাকে লেডলার ক্ষেত্রসংক্রান্ত নীচ কর্মেই অধিকাংশ সময় ব্যাপৃত থাকিতে হইত, তথাপি তিনি অবকাশমতে ক্রমে ক্রমে বিনা সাহায্যে লাটিন ও গ্রীক অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এক বালকের সহিত তাঁহার বন্ধুতা ছিল। সেই বালক, উক্ত ভাষাদ্বয়ের অধ্যয়নার্থে যে যে পুস্তক আবশ্যক, তাহা তাঁহাকে পাঠ করিতে দিতেন। লেডলারা স্ত্রী পুরুষে তাঁহার ইষ্টসিদ্ধিবিষয়ে যথাশক্তি আনুকূল্য করিতেন, কিন্তু নিকটে লাটিন ও গ্রীক শিক্ষার বিদ্যালয় না থাকাতে, তাঁহারা প্রকৃত রূপে তাঁহার শিক্ষার সদুপায় ও সুযোগ করিয়া দিতে পারেন নাই।

অনেকেই অনেক বার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, লেডলারা স্ত্রী পুরুষে তাঁহার প্রতি যে সৌজন্য দর্শাইয়াছিলেন, স্বমুখে তাহা বর্ণন করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়কন্দর কৃতজ্ঞতা প্রবাহে উচ্ছলিত ও নয়নদ্বয় বিগলিত বাষ্পসলিলে প্লাবিত হইত। কিয়ৎ দিন পরে, লাটিন ও গ্রীক ভাষাতে একপ্রকার বোধাধিকার জন্মিলে, তিনি গণিতবিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন।

জেঙ্কিন্স যে গ্রীক অভিধান ক্রয় করেন, তাহা তাঁহার জীবনচরিতের মধ্যে এক প্রধান ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। হাউয়িকে কতকগুলি পুস্তক বিক্রয় হইবে শুনিয়া, তিনি পূর্বনির্দিষ্ট বয়স্যের সহিত তথায় গমন করিলেন। তিনি যে বেতন পাইতেন, তাহার মধ্যে ছয় টাকা বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। আর, তাঁহার সহচরও স্বীকার করিলেন, যদি পুস্তকবিশেষ ক্রয় করিবার নিমিত্ত .আরও কিছু আবশ্যক হয়, আমারও যার

আনা সংস্থান আছে, দিতে পারিব। এক্ষণে অধ্যয়ন বিষয়ে গ্রীকভাষার অভিধান অত্যন্ত উপযোগী জ্ঞান করিয়া, বিক্রয় সময়ে জেঙ্কিন্স, উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায়, ঐ পুস্তক ক্রয় করিতে উদ্যত হইলেন। যে পুস্তক কেবল বহুজ্ঞ বিদ্যার্থীর প্রয়োজনোপযোগী, অতি হীনবেশ কাফরিকে তৎক্রয়ার্থ প্রতিযোগিতা করিতে দেখিয়া, ব্যক্তিমাত্রেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

জেঙ্কিন্সের সহচরের সহিত মনক্রিফনামক এক ব্যক্তির আলাপ ছিল। তিনি, ইঙ্গিতদ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করিয়া কৌতুকাকুলিত চিত্তে এই অদ্ভুত ব্যাপারের রহস্য জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বালক সবিশেষ সমুদায় নিবেদন করিলেন। তখন মনক্রিফ, তাঁহাদের ছয় টাকা বার আনা মাত্র সংস্থান অবগত হইয়া, কহিলেন, তোমার যত দূর পর্যন্ত ইচ্ছা হয় মূল্য ডাকিবে, যাহা অকুলান পড়িবে, আমি তাহার দায়ী রহিলাম। জেঙ্কিস, মনক্রিফ মহাশয়ের এই সানুগ্রহ প্রস্তাবের বিষয় অবগত ছিলেন না, সুতরাং তিনি আপনাদের সঙ্গতি পর্যন্ত ডাকিয়া নিরাশ হইয়া বিষণ্ণ বদনে ক্ষান্ত হইবামাত্র তাঁহার সহচর মূল্য ডাকিতে লাগিলেন। দীন কাফরিবালক তদ্দর্শনে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, বয়স্য! কি কর, তুমি তো জান, আমাদেব এত মূল্য ও শুল্ক উভয় দিবার সংস্থান নাই। কিন্তু ঐ বালক তাঁহার সেই নিষেধ না মানিযা পুস্তক ক্রয করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ হৃষ্ট চিত্তে তদীয় হস্তে সমর্পণ কবিয়া তাঁহাব ক্ষোভ নিবারণ করিলেন। মনক্রিফ মহাশয়কে এ বিষয়ে কেবল আট আনা মাত্র সাহায্য কবিতে হইয়াছিল। জেঙ্কিন্স আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইযা পুস্তক লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর তিনি যে উহা সার্থক করিয়াছিলেন, তদুল্লেখ বাহুল্যমাত্র।

এক্ষণে ইহা জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, কাফরিজাতির বুদ্ধির অদ্ভুত আদর্শস্বরূপ সেই সুবোধ বালকের স্বভাব ও চরিত্র কিরূপ ছিল। ইহাতে এক বারেই এই উত্তর দিতে পারা যায়, যত উৎকৃষ্ট হইতে পারে। জেঙ্কিন্স, স্বভাবতঃ বিনীত, নিরহঙ্কার ও দুষ্ক্রিয়াসক্তিশূন্য ছিলেন। তাঁহার আচরণ এমন অসামান্য-সৌজন্যব্যঞ্জক ছিল যে, পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহাব প্রতি স্নেহ ও অনুগ্রহ করিতেন। বস্তুতঃ, সমুদায় উচ্চ টিবিয়টহেড প্রদেশে তিনি অতিমাত্র লোকরঞ্জন বলিয়া সবিশেষ বিখ্যাত ছিলেন।

তিনি আপন কার্য নির্বাহ বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র আলস্য বা ঔদাস্য করিতেন না, এজন্য তাঁহার নিযোগ্যেরা তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদর করিতেন ; আর, জ্ঞানোপার্জন-বিষয়ে তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব উৎসাহ দর্শনে ব্যক্তিমাত্রেই মুগ্ধ ছিলেন। তাঁহার, স্বদেশভাষার বিন্দুবিসর্গও মনে না থাকাতে, স্কটলণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলের সামান্য কৃষকদিগের সহিত শরীরের বর্ণ ব্যতিরিক্ত কোনও বিষয়ে বিভিন্নতা ছিল না ; এই মাত্র বিশেষ যে, তিনি তাহাদের প্রায় সকল অপেক্ষা সমধিকবিদ্যাসম্পন্ন ছিলেন এবং বিদ্যানুশীলনবিষয়ে সাতিশয় আসক্ত হইয়া সময়

যাপন করিতেন। খৃষ্টোপদিষ্ট ধর্মে তাঁহার ভ্রূয়সী শ্রদ্ধা ছিল এবং ধর্মসংক্রান্ত প্রত্যেক-বিধিপ্রতিপালনে তিনি অত্যন্ত অবহিত ছিলেন। সমুদায় পর্যালোচনা করিলে, বোধহয়, জেঙ্কিন্স অত্যুৎকৃষ্ট উপাদানে নির্মিত। ফলতঃ, তিনি বিদ্যালাভের নিমিত্ত যে অশেষ-প্রকার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা গণনা না করিলেও, সর্বত্র আদৃত ও প্রিয় হইতেন, সন্দেহ নাই।

জেঙ্কিন্সের বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে, টিবিয়টহেডের পাঠশালায় শিক্ষকের পদ শূন্য হইল, উক্ত কৃষকবহুল জনপদের নিবাসীদিগের শিক্ষার্থে যে পাঠশালা ছিল, ইহা তাহার শাখা-স্বরূপ। এ বিষয়ে জেটবর্গের যাজকগণের উপর এই ভারার্পণ হইল যে, তাঁহারা কোনও এক দিন, হাউয়িকে সমাগত হইয়া, কর্মাকাঙ্ক্ষীদিগের পরীক্ষা করিয়া, অধ্যক্ষবর্গের নিকট বিজ্ঞাপনী প্রদান করিবেন। পরীক্ষাদিবসে ফলনাসের কৃষ্ণকায় কৃষকও, পুস্তকরাশি কক্ষে করিয়া, অতি হীন বেশে তথায় উপস্থিত হইয়া, পরীক্ষাদানের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। পরীক্ষকেরা কাফরিকে পরীক্ষাদানার্থ উদ্যত দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ চরিত্র বিদ্যাদি বিষয়ক প্রশংসাপত্র দর্শনে, অন্যান্য তিন চারিজন কর্মাকাঙ্ক্ষীদিগের ন্যায়, তাঁহারও যথানিয়মে পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হইল, অস্বীকার করিতে পারিলেন না। জেঙ্কিন্স পরীক্ষাতে অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষায় এত উৎকৃষ্ট হইলেন যে, পরীক্ষকদিগকে উপস্থিত ব্যাপারে তাঁহাকেই সর্বাপেক্ষায় উপযুক্ত বলিয়া অধ্যক্ষবর্গের নিকট বিজ্ঞাপনী দিতে হইল। জেঙ্কিন্স জয়লাভ করিয়া, হর্ষোৎফুল্ল লোচনে এই আলোচনা করিতে করিতে, প্রত্যাগমন করিলেন যে, ওক্ষণে আমি যে পদে নিযুক্ত হইব, তাহা পূর্বতন সমুদয় কর্ম অপেক্ষা উত্তম এবং তাহাতে বিদ্যোপার্জনের বিশিষ্টরূপ সুযোগ ও সদুপায় হইবেক।

কিন্তু, কিয়ৎ কালের নিমিত্ত, জেঙ্কিন্সের এই অভ্যুদয়াশা প্রতিহত হইয়া রহিল। পরীক্ষক-দিগের বিজ্ঞাপনী যাজকমণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি, কাফরিকে উপস্থিত কর্মে নিযুক্ত করা অযুক্ত বিবেচনা করিয়া অন্য এক ব্যক্তিকে ঐ পদে নিযুক্ত করিলেন। তদনুসারে, তিনি পরীক্ষাদানের সমুদয় ফলে বঞ্চিত হইয়া, জাতি ও অবস্থার অপকর্ষনিমিত্ত এই সমস্ত দুরবস্থা ঘটিতেছে, এই মনস্তাপে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন। কিন্তু, যাজকমণ্ডলীর অবিচারে তিনি যেরূপ বিষাদ ও ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে, বর্তমান ব্যাপারের প্রধান উদ্যোগী ব্যক্তিবর্গ তদনুরূপ অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইলেন।

অনন্তর, ডিউক অব বক্লিযু প্রভৃতি ভূম্যধিকারীরা, উপস্থিত বিষয়ে বিশিষ্টরূপে উদ্যুক্ত হইয়া, বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন যে পরীক্ষোত্তীর্ণ জেঙ্কিন্সকে নিযুক্ত করিতে হইবেক এবং এ পর্যন্ত যাজকমণ্ডলীর নিযুক্ত শিক্ষক যত বেতন পাইয়াছেন, ইহাকে তাহা ধরিয়া দিতে হইবেক। তদনন্তর, অতি ত্বরায় এক কর্মকারের পুরাণ বিপণিতে স্থান নিরূপণ করিয়া,

তাঁহারা জেঙ্কিন্সকে শিক্ষকের পদে অভিষিক্ত করিলেন। তদ্দর্শনে, সমুদয় বালক ও তাহাদের পিতা মাতার পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই, সমুদয় ছাত্র পূর্ব পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়া জেঙ্কিন্সের নিকট অধ্যয়ন করিতে লাগিল। জেঙ্কিন্স কিয়ৎ দিন পূর্বে, শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু অল্প কালেই শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এক্ষণে তিনি এমন বেতন পাইতে লাগিলেন যে, তাহাতে আবশ্যক ব্যয় নির্বাহ হইয়া, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদ্বৃত্ত হইতে লাগিল।

তিনি অতি ত্বরায় একজন উৎকৃষ্ট শিক্ষক হইয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে, তাঁহার বন্ধুবর্গ আনন্দপ্রবাহে মগ্ন হইলেন ; তাঁহার প্রতিপক্ষ যাজকমণ্ডলীর মুখ মলিন হইল। তিনি শিক্ষা দিবার অত্যুৎকৃষ্ট ও ফলোপধায়ক প্রণালী জানিতেন ; কোনও প্রকার কার্কশ্য প্রকাশ না করিয়া, কেবল কৌশলবলে কার্যনির্বাহ করাতে, স্বীয় ছাত্রবর্গের সাতিশয় প্রিয় ও নিয়োগ্যগণের অত্যন্ত সমাদরণীয় ছিলেন। সপ্তাহে পাঁচ দিন পাঠশালার কার্য করিতেন, এবং এই কয়েক দিবস স্বয়ং যাহা শিক্ষা করিতেন, প্রতিশনিবার অবাধে হাউয়িকে গমন করিয়া, তত্রত্য বিদ্যালয়ের অধ্যাপকের নিকট পরিচয় দিয়া আসিতেন। ইহাতে দৃষ্ট হইতেছে যে তিনি শিক্ষক হইয়াও স্বয়ং শিক্ষা করিতে বিরত ও নিরুৎসাহ হয়েন নাই।

এই রূপে, দুই এক বৎসর পাঠশালার কার্যসম্পাদন করিলে, জেঙ্কিন্সের দুইশত মুদ্রার সংস্থান হইল। তখন তিনি প্রতিনিধি দিয়া, শীত কয়েক মাস কোনও প্রধান বিদ্যালযে থাকিয়া, লাটিন, গ্রীক ও গণিত বিদ্যা বিশিষ্ট রূপে অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত, অভিলাষী হইলেন। তিনি পাঠশালায় অধ্যক্ষবর্গের অত্যন্ত আদরণীয় ছিলেন ; অতএব তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তখন তিনি, উপস্থিত ব্যাপারে সংপরামর্শ লইবার নিমিত্ত, তাঁহার দয়ালু বন্ধু মনক্রিফ মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। এ দয়াবান ব্যক্তি তাঁহার গ্রীক অভিধান ক্রয়কালে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তৎপরেও আর আর অনেক উপকার করেন।

মনক্রিফ পরিচয়দিবসাবধি জেঙ্কিন্সকে অদ্ভুতপদার্থমধ্যে গণনা করিতেন ; এক্ষণে, তাঁহার এই অভিনব প্রস্তাব শ্রবণে আরও চমৎকৃত হইলেন ; এবং সর্বাগ্রে তাঁহার সংস্থানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া, সবিশেষ অবগত হইয়া কহিলেন, শুন জেঙ্কিন্স ! ইহাতে কোনও রূপেই তোমার অভিপ্রেত সিদ্ধ হইতে পারে না। যাহা সঞ্চয় করিয়াছ, তদ্দ্বারা শুল্কদাননির্বাহ হওয়াই কঠিন। তিনি শুনিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ ও ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু, ঐ বদান্য বন্ধু, তাঁহার ক্ষোভশান্তি করিবার নিমিত্ত, তাঁহার হস্তে এক অনুমতিপত্র প্রদান করিয়া কহিলেন, এডিনবরা নগরে অমুক বণিককে লিখিলাম, অতিরিক্ত যখন যাহা আবশ্যক হইবেক, তাঁহার নিকট চাহিয়া লইবে।

জেঙ্কিন্স অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া, এডিনবরা প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া, প্রথমতঃ তিনি লাটিনের অধ্যাপকের নিকট গিয়া, তাঁহার শ্রেণীতে নিদিষ্ট হইবার নিমিত্ত প্রবেশিকা প্রার্থনা করাতে, তিনি তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, আপাততঃ কয়েক মুহূর্ত্ত অবাক হইয়া রহিলেন; অনন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি লাটিনের কিছু শিখিয়াছ কি না। জেঙ্কিন্স বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন, আমি বহু কাল লাটিন অধ্যয়ন করিয়াছি; এক্ষণে উক্ত ভাষায় সম্পূর্ণরূপ জ্ঞানলাভের আশয়ে এই স্থানে আসিয়াছি। উক্ত অধ্যাপক, জেঙ্কিন্স যাহা কহিলেন তাহা যথার্থ নিশ্চয় করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে এক প্রবেশিকা প্রদান কবিলেন, কিন্তু বদান্যতাপ্রদর্শন পূর্ব্বক নিয়মিত শুল্ক গ্রহণ করিলেন না।

অনন্তর, জেঙ্কিস অন্য দুই অধ্যাপকের নিকট প্রার্থনা করাতে, তাঁহারাও উভয়ে প্রথমতঃ চমৎকৃত হইলেন; পরিশেষে তাঁহাকে শিষ্যমণ্ডলীমধ্য নিবেশিত করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেবল এক ব্যক্তি শুল্ক গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এই রূপে তিন শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইয়া, শীত কয়েক মাস তথায় অবস্থিতি পূর্ব্বক, অভিলাষানুরূপ অধ্যয়ন সমাধান করিলেন, অথচ পরম দয়ালু মনক্রিফ মহাশয়ের অনুমতিপত্রের উপর অধিক নির্ভর করিতে হইল না। বসন্তকাল উপস্থিত হইল, টিবিয়টহেডে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, তিনি পুনর্বার যথানিয়মে পাঠশালার কার্য করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই অদ্ভুত আখ্যানের শেষ ভাগ, যে রূপে উপসংহৃত হইলে, সকলের মনোরঞ্জন হইত, সেরূপ হয় নাই। বোধ হয়, কোনও লোকহিতৈষী সমাজের সাহায্যে জেঙ্কিন্সের স্বদেশে প্রতিপ্রেরিত হওয়াই উচিত ছিল। তাহা হইলে তিনি তথায় পৈতৃক প্রজাগণের সভ্যতাসম্পাদন ও তাহাদিগকে শিক্ষাপ্রদান করিতে পারিতেন।

কিয়ৎ কাল অতীত হইল, প্রতিবেশবাসী কোনও সদাশয় ব্যক্তি সদভিপ্রায়-প্রণোদিত হইয়া, ঔপনিবেশিক দাসমণ্ডলীব উপযুক্ত ধর্মোপদেষ্টা বলিয়া, জেঙ্কিন্সকে খৃষ্টধর্ম সঞ্চারিণী সভার নিকট বলিয়া দেন। উক্ত সভার অধ্যক্ষেরা জেঙ্কিন্সকে সম্মত করিয়া উপদেশকতার ভার দিয়া, মরিশস দ্বীপে প্রেরণ কবিয়াছেন। কিন্তু এই নিয়োগ তাঁহার পক্ষে কোনও রূপেই উপযুক্ত হয় নাই।

সর উইলিয়ম জোন্স

উইলিয়ম জোন্স, ১৭৪৬ খৃঃ অব্দে ২০শে সেপ্টেম্বর, লণ্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার তৃতীয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতৃবিয়োগ হয়; সুতরাং তাঁহার শিক্ষার ভার তাঁহার জননীর উপর বর্ত্তে। এই নারী অসামান্যগুণসম্পন্ন ছিলেন। জোন্স অতি শৈশবকালেই অদ্ভুত পরিশ্রম ও প্রগাঢ় বিদ্যানুরাগের দৃঢ় প্রমাণ দর্শাইয়াছিলেন। ইহা প্রসিদ্ধ আছে,

তিন চারি বৎসর বয়ঃক্রম কালে, যদি তিনি কোনও বিষয় জানিবার অভিলাষে আপন জননীকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেন, ঐ বুদ্ধিমতী নারী সর্বদাই এই উত্তর দিতেন, পড়িলেই জানিতে পারিবে। জ্ঞানলাভবিষয়ে আগ্রহাতিশয় ও জননীর তাদৃশ উপদেশ এই উভয় কারণে, পুস্তকপাঠবিষয়ে তাঁহার গাঢ় অনুরাগ জন্মে, এবং তাহা বয়োবৃদ্ধিসহকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

সপ্তম বৎসরের শেষে, তিনি হারো নগরের পাঠশালায় প্রেরিত হয়েন, এবং ১৭৬৪খৃঃ অব্দে, অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। তিনি, বিশ্ববিদ্যালয়স্থিত অন্যান্য ছাত্রবর্গের ন্যায়, বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া, অধ্যয়নবিষয়েই অনুক্ষণ নিমগ্নচিত্ত থাকিতেন, এবং যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত পরিশ্রম দ্বারা বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠ অপেক্ষা অনেক অধিক শিক্ষা করিতেন। বাস্তবিক, তিনি পাঠশালায় এরূপ পরিশ্রমী ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন যে, তদ্দৃষ্টে তাঁহার এক অধ্যাপক কহিয়াছিলেন, এই বালক, সালিসবরি প্রান্তরে নগ্ন ও নিঃসহায় পরিত্যক্ত হইলেও, খ্যাতি ও সম্পত্তির পথ প্রাপ্ত হইবেক, সন্দেহ নাই।

এই সময় তিনি, প্রায় সর্বদাই, নিদ্রাপ্রতিরোধের নিমিত্ত, কফি কিংবা চা খাইয়া সমস্ত রাত্রি অধ্যয়ন করিতেন। কিন্তু এইপ্রকার অনুষ্ঠান প্রশংসনীয় নহে ; ইহাতে অনায়াসেই রোগ জন্মিত পারে। জোন্স অবকাশকালে ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। ইহা নির্দিষ্ট আছে, তিনি, কোকলিখিত ব্যবহারশাস্ত্রের সারসংগ্রহ পাঠ করিয়া, তাহাতে এমন ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন যে, স্বীয় জননীর পরিচিত গৃহাগত ব্যবহারদর্শীদিগকে, উক্ত গ্রন্থ হইতে সমুদ্ধৃত ব্যবহারবিষয়ক প্রশ্ন দ্বারা, সর্বদাই প্রীত ও চমৎকৃত করিতেন।

জোন্স ভাষাশিক্ষাবিষয়ে অতিশয় নিপুণ ও অনুরাগী ছিলেন। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল ব্যক্তির ভাষাশিক্ষায় বিশেষ অনুরাগ ও নৈপুণ্য থাকে, তাহাদের প্রায় অন্য অন্য বিষয়ে বুদ্ধিপ্রবেশ হয় না। কিন্তু জোন্সের বিষয়ে সেরূপ লক্ষিত হইতেছে না। তিনি প্রয়োজনোপযোগী বহুবিধ জ্ঞানশাস্ত্রে ও সুকুমার বিদ্যাতে বিশিষ্টরূপ পারদর্শী ছিলেন। অক্‌সফোর্ডে অধ্যয়নকালে তিনি, এসিয়াখণ্ডের ভাষাসমূহ শিক্ষাবিষয়ে অত্যন্ত অভিলাষী হইয়াছিলেন, এবং আরবির উচ্চারণ শিখাইবার নিমিত্ত, স্বয়ং বেতন দিয়া এলিপোদেশীয় এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। গ্রীক ও লাটিন ভাষাতে তৎপূর্বেই বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের অনধ্যায়কাল উপস্থিত হইল, তিনি অশ্বারোহণ ও স্বাত্মরক্ষা শিক্ষা করিতেন, ইটালীয়, স্পানিশ, পোর্তুগীস ও ফ্রেঞ্চ ভাষার অত্যুত্তম গ্রন্থ সকল পাঠ করিতেন ; ইহার মধ্যেই অবকাশক্রমে নৃত্য, বাদ্য, খড়্গপ্রয়োগ এবং বীণাবাদন শিখিতেন।

ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইলে, জননীকে বিদ্যালয়ের বেতনদানস্বরূপ ভার হইতে মুক্ত করিতে পারিবেক, এই আশয়ে তিনি, পূর্বনির্দিষ্ট বহুবিধ অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকিয়াও, উক্ত অভি-

লষিত বৃত্তি প্রাপ্তি বিষয়ে বিশিষ্ট রূপ মনোযোগী হইয়াছিলেন। এই আকাঙ্ক্ষিত বিষয় সাধনে কৃতকার্য হইতে পারিয়া, ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে, তিনি লার্ড আলথর্পের শিক্ষকতাকার্য স্বীকার করিলেন এবং কিয়ৎ দিবস পরে অভিপ্রেত ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে, তাঁহাকে আপন ছাত্রের সহিত জর্মনির অন্তর্বর্তী স্পানামক নগরে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল; এই সুযোগে তিনি জর্মন ভাষা শিক্ষা করেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, তিনি নাদিরশাহের জীবনবৃত্ত ফ্রেঞ্চ ভাষায় অনুবাদিত করিলেন। এই জীবনবৃত্ত পারসী ভাষায় লিখিত।

কিয়দ্দিনান্তর তাঁহাকে আপন ছাত্র ও তদীয় পরিবারের সহিত মহাদ্বীপে গমন করিয়া, ১৭৭০ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত, অবস্থিতি করিতে হয়। উক্ত অব্দে তাঁহার শিক্ষকতাকর্ম রহিত হওয়াতে, তিনি ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়নার্থে টেম্পলনামক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইলেন। এই রূপে বিষয়কর্মের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াও, তিনি বিদ্যানুশীলন এক বারেই পরিত্যাগ করেন নাই। মধ্যে মধ্যে তিনি নানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; তৎসমুদায় অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ঐ সমস্ত গ্রন্থে তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও মনের উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে।

১৭৭৪ খৃঃ অব্দে, জোন্স বিচারালয়ে ব্যবহারাজীবের কার্যে নিযুক্ত হইলেন, এবং অবলম্বিত ব্যবসায়ে ত্বরায় বিলক্ষণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিলেন।

কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টে বিচারকর্তার পদ বহুকালাবধি তাঁহার প্রার্থনীয় ছিল। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দের মার্চ মাসে, তিনি ঐ চিরপ্রার্থিত পদে নিযুক্ত ও তদুপলক্ষে নাইট উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। সুপ্রীম কোর্টের বহুপরিশ্রমসাধ্য কর্মে অত্যন্ত ব্যাপৃত থাকিয়াও, তিনি পূর্বাপেক্ষায় অধিকতর প্রযত্ন ও পরিশ্রম সহকারে সাহিত্যবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন করিতে লাগিলেন। তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াই লণ্ডন নগরের রয়েল সোসাইটী নামক সভাকে আদর্শ করিয়া, স্বীয় অসাধারণ উৎসাহ ও উদ্যোগ দ্বারা এসিয়াটিক সোসাইটী নামক সমাজ স্থাপন করিলেন। যত দিন জীবিত ছিলেন, তাবৎ কাল পর্যন্ত, তিনি তাহার সভাপতির কার্যনির্বাহ করেন, এবং প্রতিবৎসর সাতিশয় পরিশ্রমস্বীকার পূর্বক, এতদ্দেশীয় শব্দবিদ্যা ও পূর্বকালীন বিষয়ে সকলের তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা উক্ত সমাজের কার্য উজ্জ্বল ও বিভূষিত করিয়াছিলেন।

অতঃপর, বিচারালয়বন্ধব্যতিরেকে আর তাঁহার অধ্যয়নের অবকাশ ছিল না। ১৭৮৫ খৃঃ অব্দের দীর্ঘ বন্ধের সময়, তিনি যে রূপে দিবসযাপন করিতেন, তাঁহার কাগজপত্রের মধ্যে তাহার বিবরণ দৃষ্ট হইয়াছে; প্রাতঃকালে প্রথমতঃ একখানি পত্র লিখিয়া, কয়েক অধ্যায় বাইবল অধ্যয়ন করিতেন; তৎপরে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ধর্মশাস্ত্র; মধ্যাহ্নকালে ভারতবর্ষের ভূগোলবিবরণ; অপরাহ্নে রোমরাজ্যের পুরাবৃত্ত; পরিশেষে, দুই চারি বাজী শতরঞ্চ খেলিয়া, ও আরিয়ষ্টোর কিয়দংশ পাঠ করিয়া, দিবাবসান করিতেন।

তিনি এতদ্দেশীয় জল ও বায়ুর দোষে শারীরিক অসুস্থ হইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার চক্ষু এমন নিস্তেজ হইয়া গেল যে মধুখবর্তিকার আলোকে লেখা রহিত করিতে হইল। কিন্তু যাবৎ তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র সামর্থ্য থাকিত, কিছুতেই তাঁহার অভিলষিত অধ্যয়নের ব্যাঘাত ঘটাইতে পারিত না। পীড়াভিভূত শয্যাগত থাকিয়াও, তিনি বিনা সাহায্যে উদ্ভিদবিদ্যা অধ্যয়ন করিলেন। এবং চিকিৎসকের উপদেশানুসারে, স্বাস্থ্যপ্রতিলাভার্থে যে কিয়ৎ কাল্ল পর্যটন করিতে হইয়াছিল, ঐ সময়ে তিনি গ্রীস, ইটালি ও ভারতবর্ষীয় দেবতাগণের বিষয়ে এক প্রশস্ত গ্রন্থ রচনা করিলেন ইহাতে বোধ হইতেছে যে, তিনি আপন মনকে এমন দৃঢীভূত করিয়াছিলেন যে, এইরূপ পরিশ্রম বিশ্রামভূমিতে গণনীয় হইত।

কিয়ৎ দিবস পরে, তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া উঠিলেন, এবং পুনর্বার পূর্বাপেক্ষায় অধিকতর প্রযত্ন ও উৎসাহ সহকারে, বিচারালয়ের কার্যে ও অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। কিছু কাল, তিনি কলিকাতায় আড়াই ক্রোশ দূরে ভাগীরথীতীরসন্নিহিত এক ভবনে অবস্থিতি করেন। তথা হইতে তাঁহাকে প্রতিদিন বিচারালয়ে আসিতে হইত। তাঁহার জীবনবৃত্তলেখক সুশীল প্রজ্ঞাবান লার্ড টিনমৌথ কহেন যে, তিনি প্রতিদিন সূর্যাস্তের পর এই স্থানে প্রতিগমন করিতেন; এবং এত প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিতেন যে, পদব্রজে আসিয়া অরুণোদয়কালে কলিকাতার আবাসে উপস্থিত হইতেন। তথায় উপস্থিতির পর ও বিচারালয়ের কার্যারম্ভ হইবার পূর্বে যে সময় থাকিত, তাহা রীতিমত পৃথক পৃথক অধ্যয়নে নিয়োজিত ছিল। এই সময়ে তিনি, রাত্রি চারি পাঁচ দণ্ড থাকিতে শয্যা পরিত্যাগ করিতেন।

বিচারালয়ের কর্মবন্ধ হইলেও, তিনি কর্মে ব্যাসক্ত থাকিতেন। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দের কর্মবন্ধ সময়ে, তিনি কৃষ্ণনগরে অবস্থিতি করেন; তথা হইতে লিখিয়াছিলেন, "আমি এই কুটীরে বাস করিয়া অত্যন্ত প্রীতি প্রাপ্ত হইতেছি; এই তিন মাস কর্মবন্ধ উপলক্ষে অবকাশ পাইয়াছি বটে, কিন্তু আমি এক দণ্ডের নিমিত্তেও কর্মশূন্য নহি। অভিমত বিদ্যানুশীলনের সহিত বিষয়কার্যের ভূয়িষ্ঠ সম্বন্ধ প্রায় ঘটিয়া উঠে না; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমার পক্ষে তাহা ঘটিয়াছে। এই কুটীরে থাকিয়াও, আমি আরবি ও সংস্কৃত অধ্যয়ন দ্বারা বিচারালয়েরই কার্য করিতেছি। এক্ষণে সাহস করিয়া বলিতে পারি, মুসলমান ও হিন্দু ব্যবস্থাদায়কেরা অমূলক ব্যবস্থা দিয়া আর আমাদিগকে ঠকাইতে পারিবেক না।" বাস্তবিক, এইরূপ সার্বক্ষণিক পরিশ্রমে ব্যাসক্ত থাকাতেই, তাঁহার আনন্দে কালযাপন হইয়াছিল।

যে সকল মোকদ্দমা শাস্ত্রের ব্যবস্থা অনুসারে নিষ্পত্তি করা আবশ্যক; সে সমুদায় পণ্ডিত ও মৌলবীদিগের অপেক্ষা না রাখিয়া, অনায়াসে নিষ্পত্তি করিতে পারা যাইবেক, এই

অভিপ্রায়ে তিনি হিন্দু মুসলমানদিগের ধর্মশাস্ত্রের সারসংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ তিনি সমাপন করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু, পরিশেষে অন্যান্য ব্যক্তি দ্বারা তাহার যে সমাধান হইয়াছে, তাহা এই মহানুভাবের পরামর্শ ও প্রাথমিক উদ্যোগ দ্বারাই হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

১৭৮৯ খৃঃ অব্দে, তিনি শকুন্তলানামক সংস্কৃত নাটকের ইংরেজী ভাষাতে অনুবাদ প্রকাশ করেন। অনন্তর, ১৭৯৪ খৃঃ অব্দের প্রথম ভাগে, মনুপ্রণীত ধর্মশাস্ত্রের ইংরেজী অনুবাদ প্রচারিত হয়। যে সকল ব্যক্তি ভারতবর্ষের পূর্বকালীন আচার ব্যবহার জানিবার বাসনা রাখেন, এই গ্রন্থ তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। পরিশেষে এই সুবিখ্যাত প্রশংসিত ব্যক্তি, বিচারালয়ের কার্যনিষ্পাদন ও বিদ্যানুশীল বিষয়ে অবিশ্রান্ত অসঙ্গত পরিশ্রম করাতে, অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। ১৭৯৪ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে, কলিকাতাতে তাঁহার যকৃৎ স্ফীত হইল, এবং ঐ রোগেই, উক্ত মাসে সপ্তবিংশ দিবসে, অষ্টচত্বারিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

সর উইলিয়াম জোন্সের কতিপয় অতি সামান্য নিয়ম নির্ধারিত ছিল; তদ্বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ থাকাতেই, তিনি এই সমস্ত গুরুতর কার্য নির্বাহে সমর্থ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, বিদ্যানুশীলনের সুযোগ পাইলে কখনও উপেক্ষা করিবেক না। অন্য এক এই যে, অন্যেরা যে বিষয়ে কৃতকার্য হইয়াছে, আমি ও অবশ্য তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারিব; এবং সেই নিমিত্তে বাস্তবিক প্রতিবন্ধক দেখিয়া, অথবা প্রতিবন্ধকের সম্ভাবনা করিয়া অভিপ্রেত বিষয় হইতে বিরত হওয়া বিচারসিদ্ধ নহে, বরং তাহার সিদ্ধিবিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইতে হইবেক।

তাঁহার জীবনচরিতলেখক লার্ড টিনমৌথ কহেন, "ইহাও তাঁহার এক নির্ধারিত নিয়ম ছিল, যে সকল ব্যাঘাত অতিক্রম করিতে পারা যায় তদ্দৃষ্টে, বিবেচনা পূর্বক হস্তার্পিত ব্যাপারের সমাধানবিষয়ে কোনও ক্রমেই ভগ্নোৎসাহ হওয়া উচিত নহে। এই নিয়ম তিনি কখনও ইচ্ছা পূর্বক লঙ্ঘন করেন নাই। কিন্তু, তিনি যে এক এক কর্মের নিমিত্ত পৃথক পৃথক সময় নিরূপণ করিতেন এবং অতি সাবধান হইয়া সেই সেই নির্ধারিত সময়ে তত্তৎ কর্মের সমাধান করিতেন, আমার বোধে এই মহাফলদায়ক নিয়ম দ্বারাই অব্যাঘাতে ও অনাকুলিত চিত্তে এই সমস্ত বিদ্যায় কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

সর উইলিয়ম জোন্সের অকাল মৃত্যুতে সর্বসাধারণের যেরূপ অসাধারণ মনস্তাপ ও ক্ষতিবোধ হইয়াছে, অতি অল্প লোকের বিষয়ে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষাজ্ঞানবিষয়ে, বোধ হয়, প্রায় কোনও ব্যক্তিই তাঁহা অপেক্ষা অধিক প্রবীণ ছিলেন না। পুরাবৃত্ত, দর্শনশাস্ত্র, স্মৃতি, ধর্মসংক্রান্ত গ্রন্থ, পদার্থবিদ্যা ও সর্বজাতীয় আচার ব্যবহার বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল; আর, যদি তিনি ভিন্নদেশীয় কাব্যের ভাব লইয়া স্বভাষায়

সঙ্কলনে অধিক অনুরক্ত না হইতেন এবং বহুবিস্তৃত বিষয়কর্ম নির্বাহ করিয়া, আপন শক্ত্যনুদায়িনী রচনা বিষয়ে প্রযত্নবান হইবার নিমিত্ত উপযুক্তরূপ অবকাশ পাইতেন, তাহা হইলে, তাঁহার কবিত্ববিষয়েও অসাধারণখ্যাতিলাভের ভূয়সী সম্ভাবনা ছিল। তিনি পরিবার ও পোষ্যবর্গের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতেন তাহা অতি প্রশংসনীয়। তিনি স্বভাবতঃ বদান্য ও তেজস্বী ছিলেন।

সর উইলিয়ম জোন্সের নাম চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত, ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে নানা উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষেরা সেণ্ট পালের কাথিড্রলে তাঁহার এক কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন, এবং বাঙ্গালাতে এক প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্তি প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহার সহধর্মিণী, ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে, তদীয় সমুদায় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ছয় খণ্ড পুস্তকে যে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার সর্বাপেক্ষা সমধিক প্রশংসনীয় ও অবিনশ্বর কীর্তিস্তম্ভ। তদ্ব্যতিরিক্ত, ঐ বিধবা নারী আপন ব্যয়ে তাঁহার এক প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্তি নির্মাণ করাইয়া, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত করিয়াছেন।

দুরূহ ও সঙ্কলিত নূতন শব্দের অর্থ

অংশ, (Degree) অক্ষাংশ। ভূগোলবেত্তারা বিষুবরেখার উত্তর দক্ষিণ অথবা পূর্ব পশ্চিম ভূভাগ ৩৬০ ভাগে বিভক্ত করেন, ইহার এক এক ভাগ এক এক অক্ষাংশ।

অযথাভূত, (Perverted) যেরূপ হওয়া উচিত সেরূপ নহে। অযথাভূত দর্শনশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্রের যাহা উদ্দেশ্য তাহা প্রতিপন্ন না করিয়া তদ্বিপরীতার্থপ্রতিপাদক।

অস্থিত পাটীগণিত, (Arithmetic of Infinites) একপ্রকার অঙ্কশাস্ত্র।

আধিশ্রয়ণিক ব্যবধি, (Focal Distance) অধিশ্রয়ণ অগ্নিস্থান, চুল্লী। আলোকের কিরণ সকল দূরবীক্ষণের মুকুরের মধ্য দিয়া গমন করিয়া যে স্থানে মিলিত হয়, তাহাকে অধিশ্রয়ণ কহা যায়। মুকুরে সর্বাপেক্ষায় উচ্চ ভাগ ও অধিশ্রয়ণ এই উভয়ের অন্তরকে আধিশ্রয়ণিক ব্যবধি কহে।

আভিজাতিক চিহ্ন, (অভিজাত কুল, বংশ) কুলপরিচায়ক চিহ্ন।

আবিষ্ক্রিয়া, (Discovery) অপ্রকাশিত অথবা অপরিজ্ঞাত বিষয়ের উদ্ভাবন।

উদ্ভিদবিদ্যা, (Botany) উদ্ভিদ, তরুগুল্মাদি। তরুগুল্মাদির অবয়বসংস্থান, প্রত্যেক অবয়বের কার্য, উৎপত্তিস্থান, জাতিবিভাগ ইত্যাদি যে শাস্ত্রে নির্ণীত আছে।

উপকূল, (Coast) বেলাভূমি, সমুদ্রসন্নিহিত ভূভাগ।

ঔপনিবেশিক, (Colonial) উপনিবেশ, কোনও দূরদেশে কৃষিকর্ম ও বাস করিবার নিমিত্ত জন্মভূমি হইতে যে সকল লোক লইয়া যাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধীয় ঔপনিবেশিক।

কক্ষ, (Orbit) গ্রহগণের পরিভ্রমণপথ।

কীর্তিস্তম্ভ, (Monument) ঘটনাবিশেষের স্মরণার্থে অথবা ব্যক্তিবিশেষের নাম ও কীর্তি রক্ষার্থে নির্মিত স্তম্ভাদি।

কুলাদর্শ (Heraldry) বংশাবলী ও বংশপরিচায়ক চিহ্ন বিষয়ক শাস্ত্র।

কুসংস্কারক, (Prejudice) সমুচিত বিবেচনা না করিয়া যে সিদ্ধান্ত করা হয়।

কেন্দ্র, (Centre) ঠিক মধ্যস্থান।

গণিত, (Mathematics) পরিমাণ ও অঙ্কবিষয়ক শাস্ত্র।

গবেষণা, (Research) কোনও বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান।

গ্রহনীহারিকা, (Planetary Nebulæ) যে সকল নীহারিকা গ্রহের লক্ষণাক্রান্ত-বোধ হয়।

চরণাবরণ, (Stoking) মোজা।

চরিতাখ্যায়ক, (Biographer) যে ব্যক্তি কোনও লোকেব জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করে।

চিত্রশালিকা, (Museum) চিত্র অদ্ভুত বস্তু, শালিকা আলয়। যে স্থানে প্রাকৃত ইতি-বৃত্ত, পদার্থমীমাংসা ও সাহিত্যবিদ্যা সংক্রান্ত এবং শিল্পসাধিত কৌতূহলোদ্বোধক বস্তু সকল স্থাপিত থাকে।

ছায়াপথ, (Milky Way) নভোমণ্ডলে দৃশ্যমান জ্যোতির্ময় তিরশ্চীন পথ।

জলোচ্ছ্বাস, (Tide) [জল-উচ্ছ্বাস] জলের স্ফীততা, জলের জোয়ার।

জাতীয় বিধান, (National Law) বিভিন্নজাতীয় লোকদিগের পরস্পরব্যবহার-ব্যবস্থাপক শাস্ত্র।

জ্যোতির্বিদ্যা, (Astronomy) গ্রহ নক্ষত্র, ধূমকেতু প্রভৃতি দিব্য পদার্থের স্বরূপ, সঞ্চার, পরিভ্রমণকাল, গ্রহণ, শৃঙ্খলা, অন্তর ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত ঘটনা নিরূপক শাস্ত্র।

জ্যোতিষ্ক, (Heavenly Bodies) গ্রহনক্ষত্রাদি।

টঙ্কবিজ্ঞান, (Numismatics) টঙ্ক মুদ্রা, টাকা। নানাদেশীয় ও নানাকালীন টঙ্ক পরিজ্ঞানার্থক বিদ্যা।

তুলামান, (Libration) তুলাদণ্ডে পরিমাণকর। চন্দ্রের তুলামানশব্দে চন্দ্রমণ্ডলবৃত্তি-পরীবর্ত। এই পরীবর্ত দ্বারা চন্দ্রমণ্ডলের প্রান্তসন্নিহিত কোনও কোনও অংশের পর্যায়-ক্রমে আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়।

তূর্যাচার্য, তূর্য, (Music) বাদ্য, আচার্য উপদেশক। যে ব্যক্তি বাদ্যবিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন।

তূর্যাজীব, (Musician) তূর্য বাদ্য, আজীব জীবিকা। বাদ্যব্যবসায়ী।

দূরবীক্ষণ, (Telescope) দূর-বীক্ষণ। দূরস্থিতবস্তুদর্শনার্থ নলাকার যন্ত্র, দূরবীণ।

দৃষ্টিবিজ্ঞান, (Optics) আলোক ও দর্শন বিষয়ক বিদ্যা।

দ্বিপাদপ্রমিত, যাহার পরিমাণ দুই (Foot) পা।

দেবালয়, (Church) দেব ঈশ্বর, আলয় স্থান। ঈশ্বরের উপাসনার স্থান, গির্জা।

ধাতুবিদ্যা, (Mineralogy) ধাতু ভূগর্ভে স্বয়মুৎপন্ন নির্জীব পদার্থ, যেমন স্বর্ণ, প্রস্তর, পারদ, লবণ, অঙ্গার প্রভৃতি, এতদ্বিষয়ক বিদ্যা।

নক্ষত্রবিদ্যা, (Astrology) গ্রহ নক্ষত্রাদির স্থিতি ও সঞ্চার অনুসারে শুভাশুভনির্বাচন ও ভবিষ্যসংসূচন বিদ্যা।

নাড়ীমণ্ডল, (Equator) বিষুবরেখা। সূর্য এই রেখায় উপস্থিত হইলে, দিন ও রাত্রি সমান হয়।

নীহারিকা, (Nebulæ) নীহার কুজ্ঝটিকা। যে সকল নক্ষত্র চক্ষুর গোচর নয়, দূরবীক্ষণ দ্বারা অবলোকন করিলে, কুজ্ঝটিকাবৎ প্রতীয়মান হয়, তৎসমুদায়ের নাম নীহারিকা।

নৈসর্গিক বিধান, (Natural Law) নৈসর্গিক স্বাভাবিক, বিধান নিয়ম, ব্যবস্থা। মানবজাতির ঐশিকনিয়মানুযায়ী পরস্পর ব্যবস্থাপক শাস্ত্র। যথা, কেহ কাহারও হিংসা করিবেক না ইত্যাদি।

নৈহারিক নক্ষত্র, (Nebulous Stars) যে সকল নীহারিকা নক্ষত্রের লক্ষণাক্রান্ত বোধ হয়।

পদার্থবিদ্যা, (Natural Philosophy) বিশ্বান্তর্গত সমস্ত পদার্থের তত্ত্বানির্ণায়ক শাস্ত্র।

পরিপ্রেক্ষিত, (Perspective) পরি সর্বতোভাবে, প্রেক্ষিত দর্শন। বস্তু সকল বাস্তিক সত্তাকালে যেরূপ প্রতীয়মান হয়, আলেখ্যে তাহাদের তদনুরূপবিন্যাসনিয়ামক বিদ্যা।

পর্যবেক্ষণ, (Observation) [পরি-অবেক্ষণ] অভিনিবেশ পূর্বক অবলোকন।

পাঞ্চপাদিক, যাহার পরিমাণ পাঁচ (Foot) পা।

পাটীগণিত, (Arithmetic) অঙ্কবিদ্যা।

পান্থনিবাস, (Inn) পথিকদিগের অবস্থিতি করিবার স্থান, সে স্থানে নবাগত ব্যক্তিরা ভাটকপ্রদান পূর্বক আপাততঃ অবস্থিতি করে।

পারিপার্শ্বিক, (Satellite) পার্শ্ববর্তী, পার্শ্বচর, উপগ্রহ, কোনও বৃহৎ গ্রহের চতুর্দিকে ভ্রমণকারী ক্ষুদ্র গ্রহ। যথা, পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক চন্দ্র।

পুরাগত
পৌরাণিক } পূর্বতনকালীন।

প্রকৃতি, (Nature) ঈশ্বরসৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের সাধারণ সংজ্ঞা।

প্রতিপোষক, (Patron) সহায়, আনুকূল্যকারী।

প্রতিভা, (Genius) অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি।

প্রবেশিকা, (Ticket) যাহা দেখাইলে প্রবেশ করিতে পাওয়া যায় ; টিকিট।

প্রস্তরফলক, (Slate) শেলেট।

প্রাতিফলিক দূরবীক্ষণ, (Reflecting Telescope) আলোকের কিরণ সকল যে দূরবীক্ষণের মুকুরে প্রতিফলিত হইয়া সরলরেখায় গমন পূর্বক প্রতিবিম্ব স্বরূপে পরিণত হয়।

প্রাকৃত ইতিবৃত্ত, (Natural History) প্রকৃতিবিষয়ক বৃত্তান্ত, অর্থাৎ পৃথিবী ও তদুৎপন্ন বস্তুসমুদায়ের বিবরণ। জন্তুবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূবিদ্যা প্রভৃতি বিদ্যা-সকল প্রাকৃত ইতিবৃত্তের অন্তর্গত।

বন্ধুর, (Rough) উঁচ নীচ, আবুড়া খাবুড়া।

মনোবিজ্ঞান, (Metaphysics) মন বুদ্ধি প্রভৃতি নির্ণায়ক শাস্ত্র।

মণ্ডল, (State) প্রদেশ, রাজ্য।

মধুত্থবর্তিকা, মোমবাতি।

মেরুদণ্ড, (Axis) ভূগোলের অন্তর্গত উভয়কেন্দ্রভেদী কাল্পনিক সরল রেখা। এই রেখা অবলম্বন করিয়া পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্বাভিমুখে দৈনন্দিন পরিভ্রমণ করে।

রঙ্গভূমি, (Theatre) যেখানে নাটকের অভিনয় হয়।

রাজবিপ্লব, (Revolution) রাজ্যশাসনের প্রচলিত প্রণালীর পরিবর্তন।

রোমীয় সম্প্রদায়, (Romish Church) রোমনগরীয় ধর্মালয়ের মতানুযায়ী খৃষ্টধর্মাবলম্বী লোক।

বিজ্ঞান, (Science) পদার্থের তত্ত্বনির্ণায়ক শাস্ত্র, যথা জ্যোতির্বিদ্যা।

বিজ্ঞাপনী, (Report) বাক্য অথবা লিপি দ্বারা কোনও বিষয় বিদিত করা।

বিধানশাস্ত্র, (Law) ব্যবস্থাশাস্ত্র।

বিমিশ্র গণিত, (Mixed Mathematics) যাহাতে পদার্থসম্বন্ধ রাশি নিরূপণ করা হয়।

বিশপ, (Bishop) ধর্ম বিষয়ক অধ্যক্ষ।

বিশুদ্ধ গণিত, (Pure Mathematics) যাহাতে পদার্থের সহিত কোনও সম্বন্ধ না রাখিয়া কেবল রাশির নিরূপণ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়, (University) [বিশ্ব-বিদ্যা-আলয়] সর্বপ্রকার বিদ্যার আলোচনাস্থান।

ব্যবহারদর্শী, ধর্মাধিকরণের বিধিজ্ঞ। ধর্মাধিকরণ আদালত।

ব্যবহারসংহিতা (Law) ব্যবস্থাশাস্ত্র, আইন।

ব্যবহারাজীব, (Lawyer) ব্যবহার মোকদ্দমা, আজীব জীবিকা, যাহারা বাদী প্রতিবাদীর প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া মোকদ্দমাসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য নির্বাহ করে; উকীল ইত্যাদি।

শঙ্কু, (Index) ঘড়ির কাঁটা।

শঙ্কুপট্ট, Dial-Plate) দণ্ডপলাদিচিহ্নিত শঙ্কুদণ্ডের আধার।

শতাব্দী, (Century) শতবৎসরাত্মক কাল; সংবৎ ১৯০১ অবধি ২০০০ পর্যন্ত কাল এক-শতাব্দী; তদনুসারে ইহা কহা যাইতে পারে, এক্ষণে বিক্রমাদিত্যের বিংশ শতাব্দী চলিতেছে।

শিলিং, (Shilling) আধ টাকা।

সুকুমার বিদ্যা, (Polite Learning) সাহিত্য প্রভৃতি বিদ্যা।

স্থিতিস্থাপক, (Elasticity) আকুঞ্চন, প্রসারণ, অভিঘাতাদি করিলেও বস্তু সকল যে নৈসর্গিকগুণপ্রভাবে পুনর্বার পূর্ব ভাব প্রাপ্ত হয়।

স্বাত্মরক্ষা, (Fencing) আক্রমণ অথবা আত্মরক্ষার্থে তরবারিপ্রয়োগবিষয়ক নৈপুণ্য-সাধনবিদ্যা।

বাল্যবিবাহের দোষ

বাল্যবিবাহের দোষ

অষ্টমবর্ষীয় কন্যা দান করিলে পিতা মাতার গৌরীদানজন্য পুণ্যোদয় হয়, নবমবর্ষীয়াকে দান করিলে পৃথ্বী দানের ফল লাভ হয়; দশমবর্ষীয়াকে পাত্রসাৎ করিলে পরত্র পবিত্রলোকপ্রাপ্তি হয়, ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রপ্রতিপাদিত কল্পিত ফলমৃগতৃষ্ণায় মুগ্ধ হইয়া পরিণাম বিবেচনা পরিশূন্য চিত্তে অস্মদ্দেশীয় মনুষ্য মাত্রেই বাল্যকালে পাণিপীড়নের প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন।

ইহাতে এ পর্যন্ত যে কত দারুণ অনর্থ সজ্ঘটন হইতেছে, তাহা কাহার না অনুভবগোচর আছে? শাস্ত্রকারকেরা এই বাল্যবিবাহ সংস্থাপনা নিমিত্ত এবং তারুণ্যাবস্থায় বিবাহ নিষেধার্থ স্ব স্ব বুদ্ধি কৌশলে এমত কঠিনতর অধর্মভাগিতার বিভীষিকা দর্শাইয়াছেন, যদ্যপি কোন কন্যা কন্যাদশাতেই পিতৃগৃহে স্ত্রীধর্মিনী হয়, তবে সেই কন্যা পিতৃ মাতৃ উভয় কুলের কলঙ্কস্বরূপা হইয়া সপ্ত পুরুষ পর্যন্তকে নিরয়কগামী করে, এবং তাহার পিতামাতা যাবজ্জীবন অশৌচগ্রস্ত হইয়া সমস্ত লোকসমাজে অশ্রদ্ধেয় ও অপাঙ্‌ক্তেয় হয়।

ইহাতে যদিও কোন সুবোধ ব্যক্তির অন্তঃকরণে উক্ত বিধির প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি জন্মে, তথাপি তিনি চিরাচরিত লৌকিক ব্যবহারের পরতন্ত্র হইয়া স্বাভীষ্ট সিদ্ধি করিতে সমর্থ হন না। তাঁহার আন্তরিক চিন্তা অন্তরে উদয় হইয়া ক্ষণপ্রভার ন্যায় ক্ষণমাত্রেই অন্তরে বিলীন হইয়া যায়।

এইরূপে লোকাচার ও শাস্ত্রব্যবহারপাশে বদ্ধ হইয়া দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা চিরকাল বাল্য বিবাহনিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ও দুরপনেয় দুর্দশা ভোগ করিতেছি। বাল্যকালে বিবাহ হওয়াতে বিবাহের সুমধুর ফল যে পরস্পর প্রণয়, তাহা দম্পতিরা কখন আস্বাদ করিতে পায় না, সুতরাং পরস্পরের সপ্রণয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ করণ বিষয়েও পদে পদে বিড়ম্বনা ঘটে, আর পরস্পরের অত্যন্ত অপ্রীতিকর সম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহাও তদনুরূপ অপ্রশস্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আর নব-বিবাহিত বালক বালিকারা পরস্পরের চিত্তরঞ্জনার্থে রসালাপ, বিদগ্ধতা, বাক্‌চাতুরী, কামকলাকৌশল প্রভৃতির অভ্যাসকরণে ও প্রকাশকরণে সর্বদা সযত্ন থাকে, এবং তত্তদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপায়পরিপাটী পরিচিন্তনেও তৎপর থাকে, সুতরাং তাহাদিগের বিদ্যালোচনার বিষম ব্যাঘাত জন্মিবাতে সংসারের সারভূত বিদ্যাধনে বঞ্চিত হইয়া কেবল মনুষ্যের আকারমাত্রধারী, বস্তুতঃ প্রকৃতরূপে মনুষ্য গণনায় পরিগণিত হয় না।

সকল সুখের মূল যে শারীরিক স্বাস্থ্য, তাহাও বাল্যপরিণয়প্রযুক্ত ক্ষয় পায়। ফলতঃ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অস্মদ্দেশীয় লোকেরা যে শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যে নিতান্ত দরিদ্র হইয়াছে, কারণ অন্বেষণ করিলে পরিশেষে বাল্যবিবাহই ইহার মুখ্য কারণ নির্ধারিত হইবেক সন্দেহ নাই।

হায়! জগদীশ্বর আমাদিগকে এ দুরবস্থা হইতে কত দিনে উদ্ধার করিবেন। এবং সেই শুভদিনই বা কতকালের পর উপস্থিত হইবে। যাহা হউক, অধুনা এতদ্বিষয় লইয়া যে আন্দোলন হইতেছে, ইহাও মঙ্গল। বোধ হয় কখন না কখন এতদ্দেশীয় লোকেরা সেই ভাবি শুভদিনের শুভাগমনে সুখের অবস্থা ভোগ করিতে সমর্থ হইবেক।

এইরূপে অস্মদ্দেশীয় অন্যান্য অসদ্ব্যবহার বিষয়ে যদ্যপি সর্বদাই লিখন পঠন ও পর্যালোচনা হয়, অবশ্যই তন্নিরাকরণের কোন সদুপায় স্থির হইবেক সন্দেহ নাই। অনবরত মৃত্তিকা খনন করিলে কতদিন বারি বিনির্গত না হইয়া রহিতে পারে? কাষ্ঠে কাষ্ঠে অনবরত সঙ্ঘর্ষণ করিলে কতক্ষণ হুতাশন বিনিঃসৃত না হইয়া থাকিতে পারে? এবং অনবরত সত্যের অনুসন্ধান করিলে কতদিনই বা তাহা প্রকাশিত না হইয়া মিথ্যাজালে প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে?

আমরা অন্তঃকরণমধ্যে এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া বাল্যবিবাহের বিষয়ে যথা-সাধ্য কিঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সৃষ্টিকর্তার এই বিশ্বরচনামধ্যে সর্বজীবেই স্ত্রী পুরুষ সৃষ্টি ও তদুভয়ের সংসৃষ্টি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইহাতে স্পষ্টরূপে বিশ্বরূপের এই অভিপ্রায় প্রকাশ পায় যে, স্ত্রীপুংজাতি কোনরূপ অপ্রতিবন্ধ সম্বন্ধে পরস্পর আবদ্ধ থাকিয়া ইতরেতর রক্ষণাবেক্ষণপূর্বক স্বজাতীয় জীবোৎপত্তিনিমিত্ত নিত্য যত্নশীল হয়। বিশেষতঃ মনুষ্যজাতীয়েরা এক স্ত্রী, এক পুরুষ, উভয়ে মিলিত হইয়া, পরস্পরের উপরোধানুরোধ রক্ষা করত সপ্রণয়ে উত্তম নিয়মানুসারে সংসারের নিয়ম রক্ষা করে।

জগৎসৃষ্টির কত কাল পরে মনুষ্য জাতির এই বিবাহ সম্বন্ধের নিয়ম চলিত হইয়াছে, যদ্যপি তদ্বিশেষ নির্দেশ করা অতি দুরূহ, তথাপি এইমাত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে, যখন মনুষ্যমণ্ডলীতে বৈষয়িক জ্ঞানের কিঞ্চিৎ নির্মলতা ও রাজনীতির কিঞ্চিৎ প্রবলতা হইতে আরম্ভ হইল এবং যখন আত্মপরবিবেক, স্নেহ, দয়া, বাৎসল্য, মমতাভিমান ব্যতিরেকে সংসারযাত্রার সুনির্বাহ হয় না, বিবাহ সম্বন্ধই ঐ সকলের প্রধান কারণ, ইত্যাকার বোধ সকলের অন্তঃকরণে উদয় হইতে লাগিল, তখনি দাম্পত্য সম্বন্ধ অর্থাৎ বিবাহের নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

অনন্তর সর্বদেশে এই বিবাহের প্রথা পূর্বপূর্বাপেক্ষা উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হইয়া আসি-

তেছে। কিন্তু অস্মদ্দেশে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং এমত নিকৃষ্ট হইয়াছে যে, যথার্থ বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে, বর্তমান বিবাহনিয়মই অস্মদ্দেশের সর্বনাশের মূল কারণ।

এতদ্দেশে পিতা মাতারা পুত্রী সম্প্রদানের নিমিত্ত বা স্বয়ং বা অন্য দ্বারা পাত্র অন্বেষণ করিয়া, কেবল অসার কৌলীন্যমর্যাদার অনুরোধে পাত্র মূর্খ ও অপ্রাপ্তবিবাহকাল এবং অযোগ্য হইলেও তাহাকে কন্যা দান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ ও ধন্য বোধ করেন, উত্তরকালে কন্যার ভাবি সুখদুঃখের প্রতি একবারও নেত্রপাত করেননা। এইসংসারে দাম্পত্যনিবন্ধন সুখই সর্বাপেক্ষা প্রধান সুখ। এতাদৃশ অকৃত্রিম সুখে বিড়ম্বনা ঘটিলে দম্পতির চিরকাল বিষাদে কালহরণ করিতে হয়। হায়, কি দুঃখের বিষয়! যে পতির প্রণয়ের উপর প্রণয়িনীর সমুদায় সুখ নির্ভর করে, এবং যাহার সচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন সুখী ও অসচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন দুঃখী হইতে হইবেক, পরিণয়কালে তাদৃশ পরিণেতার আচার ব্যবহার ও চরিত্র বিষয়ে যদ্যপি কন্যাব কোন সম্মতির প্রয়োজন না হইল, তবে সেই দম্পতির সুখের আর কি সম্ভাবনা রহিল।

মনের ঐক্যই প্রণয়েব মূল। সেই ঐক্য বয়স, অবস্থা, রূপ, গুণ, চরিত্র, বাহ্য ভাব ও আন্তরিক ভাব ইত্যাদি নানা কারণেব উপর নিভব করে। অস্মদ্দেশীয় বালদম্পতিরা পরস্পরের আশয় জানিতে পারিল না, অভিপ্রায়ে অবগাহন করিতে অবকাশ পাইল না, অবস্থার তত্ত্বানুসন্ধান পাইল না, আলাপ পরিচয় দ্বারা ইতরেতরের চরিত্রপরিচয়ের কথা দূরে থাকুক, এক বার অন্যোন্য নয়নসঙ্ঘটনও হইল না, কেবল একজন উদাসীন বাচাল ঘটকের প্রবৃত্তিজনক বৃথা বচনে প্রত্যয় করিয়া পিতামাতার যেরূপ অভিরুচি হয়, কন্যাপুত্রের সেইবিধিই বিধিনিয়োগবৎ সুখদুঃখের অনুল্লঙ্ঘনীয় সীমা হইয়া রহিল। এই জন্যই অস্মদ্দেশে দাম্পত্যনিবন্ধন অকপট প্রণয় প্রায় দৃষ্ট হয় না, কেবল প্রণয়ী ভর্তাস্বরূপ এবং প্রণয়িনী গৃহপবিচারিকাস্বরূপ হইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করে।

অপ্রমত্ত শরীরতত্ত্বাভিজ্ঞ বিজ্ঞ ভিষগ্বর্গেরা কহিয়াছেন, অনতীত শৈশবজায়াপতিসম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহার গর্ভবাসেই প্রায় বিপত্তি ঘটে, যদি প্রাণবিশিষ্ট হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাকে আর ধাত্রীর অঙ্কনশয্যাশায়ী হইতে না হইয়া অনতিবিলম্বেই ভূতধাত্রীর গর্ভশায়ী হইতে হয়। কথঞ্চিৎ যদি জনক জননীর ভাগ্যবলে সেই বালক লোকসংখ্যার অঙ্ক বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু স্বভাবতঃ শরীরের দৌর্বল্য ও সর্বদা পীড়ার প্রাবল্যপ্রযুক্ত সংসারযাত্রার অকিঞ্চিৎকর পাত্র হইয়া অল্পকালমধ্যেই পরত্রপ্রস্থিত হয়। সুতরাং যে সন্তানোৎপত্তিফলনিমিত্ত দাম্পত্য সম্বন্ধের নির্বন্ধ হইয়াছে, বাল্যপরিণয় দ্বারা সেই ফলের এই প্রকার বিড়ম্বনা সঙ্ঘটন হইয়া থাকে।

অস্মদ্দেশীয়েরা ভূমণ্ডলস্থিত প্রায় সর্বজাতি অপেক্ষা ভীরু, ক্ষীণ, দুর্বলস্বভাব এবং অল্প বয়সেই স্থবিরদেশাপন্ন হইয়া অবসন্ন হয়, যদ্যপি এতদ্বিষয়ে অন্যান্য সামান্য কারণ অন্বেষণ করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতীতি হইবে যে, বাল্যবিবাহই এ সমুদায়ের মুখ্য কারণ হইয়াছে। পিতামাতা সবল ও দৃঢ়শরীর না হইলে সন্তানেরা কখন সবল হইতে পারে না যেহেতু ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, দুর্বল কারণ হইতে সবল কার্যের উৎপত্তি কদাপি সম্ভবে না। যেমন অনুর্বরা ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বীজ বপন এবং উর্বরা ক্ষেত্রে হীনবীর্য বীজ রোপণ করিলে উৎকৃষ্ট ফলোদয় হয় না, সেইরূপ অকালবপনেও ইষ্টসিদ্ধির অসঙ্গতি হয়।

ভারতবর্ষে নিতান্তই যে বীর্যবন্ত বীরপুরুষের অসম্ভাব ছিল, এমত নহে, যেহেতু পূর্বতন ক্ষত্রিয়সন্তানেরা এবং কোন কোন বিপ্রসন্তানেরা যুদ্ধবিগ্রহাদি কার্যে প্রবল পরাক্রম ও অসীম সাহস প্রকাশ করিয়া এই ভূমণ্ডলে অবিনশ্বর কীর্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের তত্তচ্চরিত্র পৌরাণিক ইতিবৃত্তে প্রথিত আছে, সেই সকল বীরপুরুষ প্রসব করাতে এই ভারতভূমিও বীরপ্রসবিনী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এবং এক্ষণেও পশ্চিমপ্রদেশে ভূরি ভূরি পরাক্রান্ত পুরুষেরা অনেকানেক বিষয়ে সাহস ও শৌর্যগুণের কার্য দর্শাইয়া পূর্বপুরুষীয় পরাক্রমের দৃষ্টান্ত বহন করিতেছে। এতদ্দেশীয় হিন্দুগণ সেই জাতি ও সেই বংশে উৎপন্ন হইয়া যে এতাদৃশ দুর্বলদশাগ্রস্ত হইয়াছে বাল্যপরিণয় কি ইহার মুখ্য কারণ নয়? কেন না, পূর্বকালে প্রায় সর্বজাতিমধ্যেই অধিক বয়সে দারক্রিয়া নিষ্পন্ন হইত। যদ্যপি তৎকালে অষ্টবিধ বিবাহক্রিয়ার শাস্ত্র পাওয়া যায়, তথাপি অধিকবয়োনিষ্পন্ন গান্ধর্ব, আসুর, রাক্ষস, পৈশাচ, এই বিবাহচতুষ্টয় অধিক প্রচলিত ছিল, ইহা ভিন্ন স্বয়ম্বর প্রথারও প্রচলন ছিল, এবং এই সমুদায়প্রকার বিবাহক্রিয়া বরকন্যার অধিক বয়স ব্যতীত সম্ভবে না। আরো আমরা অনুসন্ধান দ্বারা পশ্চিমদেশীয় লোকমুখে জ্ঞাত আছি, তদ্দেশে অদ্যাপি প্রায় সর্বজাতিমধ্যে বরকন্যার অধিক বয়সে বিবাহকর্ম নির্বাহ হইয়া থাকে, সুতরাং তদ্দেশে জনকজননীসদৃশ অপত্যোৎপত্তির কোন অসঙ্গতি না থাকাতে তাহারা প্রায় সকলেই পরাক্রমী ও সাহসী হইয়া আসিতেছে। ইহার প্রমাণ, পশ্চিমদেশীয়েরা যখন অন্যবিধ জীবিকার উপায় না পায়, তখনি রাজকীয় সৈন্য শ্রেণীতে ও অন্যান্য ধনাঢ্য লোকের দৌবারিকতাদি কর্মে নিযুক্ত হইয়া অক্লেশে আজীবন নির্বাহ করে। এতদ্দেশীয়েরা অন্নাভাবে জঘন্য বৃত্তিও স্বীকার করে, তথাপি কোন সাহসের ও পরাক্রমের কার্যে প্রবৃত্ত হয় না। এই জন্যই রাজকীয় সৈন্যমধ্যে কখন বঙ্গদেশোৎপন্ন ব্যক্তিকে দেখা যায় নাই। উৎকলদেশীয়েরা আমাদিগের অপেক্ষাও ভীরু এবং দুর্বলস্বভাব, এ নিমিত্ত আমরাও তাহাদিগকে ভীত ও কাপুরুষ বলিয়া

উপহাস করিয়া থাকি। জানা গিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যেও এতদ্দেশের ন্যায় বাল্য-বিবাহ প্রচলিত আছে। অতএব পাশ্চাত্ত্য লোকের সহিত আমাদিগের ও উৎ-কলদিগের সাহস ও পরাক্রম বিষয়ে এতাদৃশ গুরুতর ইতরবিশেষ দেখিয়া কাহার না স্পষ্ট বোধ হইবে যে, বাল্যপরিণয়ই এতাদৃশ বৈলক্ষণ্যের কারণ হইয়াছে, নতুবা কি হেতুক যে উভয় দেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত, তদ্দেশীয়েরাই দুর্বল ও সাহসবিহীন হয়, এবং যে প্রদেশে অধিক বয়সে বিবাহ হইতেছে, তদ্দেশীয়েরাই বা কেন সাহসী ও পরাক্রান্ত হইতেছে।

এতদ্দেশে যদ্যপি স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার প্রথা প্রচলিত থাকিত, তবে অস্মদ্দেশীয় বালক বালিকারা মাতৃসন্নিধান হইতেও সদুপদেশ পাইয়া অল্প বয়সেই কৃতবিদ্য হইতে পারিত। সন্তানেরা শৈশব কালে যেরূপ স্ব স্ব প্রসূতির অনুগত থাকে, পিতা বা অন্য গুরুজনের নিকটে তাদৃশ অনুগত হয় না। শিশুগণের নিকটে সস্নেহ মধুর বচন যাদৃশ অনুকূল-রূপে অনুভূয়মান হয়, উপদেশকের হিতবচন তাদৃশ প্রীতিজনক নহে। এই নিমিত্তে বালকেরা স্ত্রীসমাজে অবস্থিতি করিয়া যাদৃশ সুখী হয়, পুরুষসমাজে থাকিয়া তাদৃশ সুখী ও সন্তুষ্ট হয় না। অতএব স্তনপান পরিত্যাগ করিয়াই যদি বালকেরা মাতৃ-মুখ-চন্দ্রমণ্ডল হইতে সরস উপদেশ সুধা স্বাদ করিতে পায়, তবে বাল্যকালেই বিদ্যার প্রতি দৃঢ়তর অনুরাগী হইয়া অনায়াসে কৃতবিদ্য হইতে পারে। কারণ, সন্তানের হৃদয়ে জন-নীর উপদেশ যেমন দৃঢ়রূপে সংসক্ত হয় ও তদ্দ্বারা যতশীঘ্র উপকার দর্শে, অন্য শিক্ষ-কের দ্বারা তাহার শতাংশেরও সম্ভাবনা নাই, জননীর উপদেশকতাশক্তি থাকাতেই ইউরোপীয়েরা অল্প বয়সেই বিচক্ষণ ও সভ্যলক্ষণসম্পন্ন হয়। অতএব যাবৎ অস্মদ্দেশ হইতে বাল্যবিবাহের নিয়ম দূরীকৃত না হইবে, তাবৎ উক্তরূপ উপকার কদাচ ঘটিবে না। আমরা অবগত আছি, কোন কোন ভদ্র সন্তানেরা স্ব স্ব কন্যাসন্তানদিগকেও পুত্র-বৎ শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই কন্যাদিগের বর্ণপরিচয় হইতে না হইতেই উদ্বাহের দিন উপস্থিত হয়। সুতরাং তাহার পাঠের প্রস্তাব সেই দিনেই অস্তগত হইয়া যায়। পরে পরগৃহবাসিনী হইয়া তাহাকে পরের অধীনে শ্বশ্রূ শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের ইচ্ছানুসারে গৃহসম্মার্জন, শয্যাসজ্জন, রন্ধন, পরিবেষণ ও অন্যান্য পরিচর্যার পরিপাটী শিক্ষা করিতে হয়। পিতৃগৃহে যে কয়েকটি বর্ণের সহিত পরিচয় হইয়াছিল, তৎসমুদায়ই স্থালী, কটাহ, দর্বী প্রভৃতির সহিত নিয়ত সদালাপ হওয়াতে একেবারেই লোপ পাইয়া যায়। ফলতঃ, সেই কন্যাদিগের পিতা মাতা যদ্যপি এতদ্দেশীয় বিবাহনিয়মের বাধ্য হইয়া শিক্ষার উপক্রমেই কন্যাদিগে পাত্রসাৎ না করেন, তবে আর কিছুকাল শিক্ষা করিলেই তাঁহাদিগের সেই দুহিতৃগণ ভাবী সন্তানগণের উপদেশক্ষম হইয়া পিতা মাতার অশেষ অভিলাষ সফল করিতে পারেন। অতএব অধুনাতন সভ্য সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে

আমরা অনুরোধ করি, তাঁহারা স্ত্রীজাতির শিক্ষা দান বিষয়ে যেরূপ উদ্যোগ করিবেন, তদ্রূপ বাল্যবিবাহপ্রথার উচ্ছেদ করণেও যত্নশালী হউন, নচেৎ কদাচ অভীষ্টসিদ্ধি করিতে পারিবেন না।

বাল্যকালে বিবাহ করিয়া আমরা সর্বতোভাবে বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হই। কারণ, প্রথমতঃ বিবাহঘটিত আমোদপ্রমোদ ও কেলিকৌতুকে বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য কাল যে বাল্যকাল, তাহা বৃথা বায় হইয়া যায়। অনন্তর উপার্জনক্ষমতার জন্ম না হইতেই সন্তানের জন্মদাতা হই। সুতরাং তখন নিত্যপ্রযোজনীয় অর্থের নিমিত্তে অত্যন্ত ব্যাকুল হইতে হয়। কারণ, গৃহস্থ ব্যক্তির হস্তে ক্ষণেক অর্থ না থাকিলে চতুর্দশ ভুবন শূন্যময় প্রতীত হইতে থাকে। তৎকালে যদি অসৎ কর্ম করিয়াও অর্থলাভ সম্পন্ন হয়, তাহাতেও নিতান্ত পরাঙ্মুখতা না হইয়া, বরং বার বার প্রবৃত্তি জন্মিতে থাকে। অনেক স্থলে এমতও দৃষ্ট হইয়াছে যে, বাস্তবিক সৎস্বভাবাপন্ন ব্যক্তিরাও কতকগুলি অপোগণ্ড পরিবারে পরিবৃত হইয়া অগত্যা দুষ্ক্রিয়াকরণে সম্মত হইয়াছেন। আব ঐরূপ দুবাবস্থাকালে পরম প্রীতির পাত্র পুত্রকলত্রাদি পরিবারবর্গ উপসর্গবৎ বোধ হয। তখন কাজে কাজেই পিতৃসত্ত্বে তাঁহার অধীন, কখন বা সহোদবদিগের অনুগ্রহোপজীবী, কখন বা আত্মীযবর্গের ভারস্বরূপ হইয়া স্বকীয় স্বাধীনতাসুখে বঞ্চিত ও জনপদে পদে পদে অপমানিত হইযা অতি কষ্টে মনোদুঃখে জীবন ক্ষয় কবিতে হয়। অতএব যে বাল্যবিবাহ দ্বারা আমাদিগের এতাদৃশী দুর্দশা ঘটিযা থাকে, সমূলে তাহাব উচ্ছেদ করা কি সর্বতোভাবে শ্রেয়স্কর নহে?

যদ্যপি কোন ব্যক্তি এমত আপত্তি উপস্থিত করেন যে, অস্মদ্দেশে বাল্যপরিণয়প্রথা না থাকিলে বালক বালিকাদের দুষ্কর্মাসক্ত হইবাব সম্ভাবনা। এ কথায আমরা একান্ত ঔদাস্য করিতে পারি না; কিন্তু ইহা অবশ্যই বলিতে পারি, যদি বাল্যকালাবধি বিদ্যার অনুশীলনে সর্বদা মন নিবিষ্ট থাকে, তাহা হইলে কদাপি দুষ্ক্রিয়াপ্রবৃত্তির উপস্থিতিই হয় না। কাবণ, বিদ্যা দ্বারা ধর্মাধর্মে ও সদসৎ কর্মে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বিচার জন্মে এরং বিবেকশক্তির প্রাখর্য বৃদ্ধি হয়। তাহা হইলে অসদিচ্ছাব উদয় হইবার অবসর কোথায়? অতএব অপক্ষপাতী হইয়া বিবেচনা করিলে এতাদৃশ পূর্বপক্ষই উপস্থিত হইতে পারে না।

কত বয়সে মনুষ্যদিগের মৃত্যু ঘটনার অধিক সম্ভাবনা, যদি আমরা এই বিষয়ের আলোচনা করি, তবে অবশ্যই প্রতীতি হইবে, মনুষ্যের জন্মকাল অবধি বিংশতি বর্ষ বয়স পর্যন্ত মৃত্যুর অধিক সম্ভাবনা। অতএব বিংশতি বর্ষ অতীত হইলে যদ্যপি উদ্বাহকর্ম নির্বাহ হয়, তবে বিধবার সংখ্যাও অধিক হইতে পারে না। এবং পিতামাতাদিগের তন্নিমিত্ত

আশঙ্কার লাঘবও হইতে পারে। যেহেতু অস্মদ্দেশে বিধবাবেদনের বিধি দৃঢ়তররূপ প্রতিষিদ্ধ হওয়াতে শাস্ত্রানুসারে বিধবাগণের যেরূপ কঠোর ব্রতানুষ্ঠান ও তজ্জন্য যে প্রকার দুঃসহ দুঃখ সহন করিতে হয়, তাহা কাহার না অনুভবগোচর আছে? বিধবার জীবন কেবল দুঃখের ভার। এবং এই বিচিত্র সংসার তাহার পক্ষে জনশূন্য অরণ্যাকার। পতির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত সুখ সাঙ্গ হইয়া যায়। এবং পতিবিয়োগদুঃখের সহ সকল দুঃসহ দুঃখের সমাগম হয়। উপবাস দিবসে পিপাসা নিবন্ধে কিংবা সাংঘাতিক রোগানুবন্ধে যদি তাহার প্রাণাপচয় হইয়া যায়, তথাপি নির্দয় বিধি তাহার নিঃশেষ নীরস রসনাগ্রে গণ্ডূষমাত্র বারি বা ঔষধ দানেরও অনুমতি দেন না। অতএব যদি কোন বালিকা অনাথা হইয়া এইরূপ দারুন দুরবস্থায় পতিতা হয়, যাহা বাল্যবিবাহে নিয়তই ঘটিতে পারে, তবে বিবেচনা কর, তাহার সমান দুঃখিনী ও যাতনাভাগিনী আর কে আছে? যে কঠোর ব্রহ্মচর্য ব্রতাচরণ পরিণত শরীর দ্বারাও নির্বাহকরণ দুষ্কর হয়, সেই দুশ্চর ব্রতে কোমলাঙ্গী বালিকাকে বাল্যাবধি ব্রতী হইতে হইলে তাহার সেই দুঃখদগ্ধ জীবন যে কত দুঃখেতে যাপিত হয়, বর্ণনা দ্বারা তাহার কি জানাইব। আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি, এইরূপ কত শত হতভাগা কুমারী উপবাসশর্বরীতে ক্ষুৎপিপাসায় ক্ষামোদরী শুষ্কতালু ম্লানমুখ হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া যায়, তথাপি কোন কারুণিক ব্যক্তি তাহার তাদৃশ শোচনীয়াবস্থাতে করুণা দর্শাইয়া নিষ্ঠুর শাস্ত্রবিধি ও লোকাচার উল্লঙ্ঘনে সাহস করিতে চাহেন না। আর ঐ অভাগিনীগণেরও এমত সংস্কারের দৃঢতা জন্মে যে, যদি প্রাণবায়ুর প্রয়াণ হইয়া যায়, তাহাও স্বীকার, তথাপি জলবিন্দুমাত্র গলাধঃকরণ কবিতে চায় না। অতএব যে সময়ে লালন পালন শরীর সংস্কারাদি দ্বারা পিতা মাতার সন্তানদিগকে পরিরক্ষণ করা উচিত, তৎকালে পরিণয় দ্বারা পরগৃহে বিসর্জন দিয়া এতাদৃশ অসীম দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করা নিতান্ত অন্যায্য কর্ম। আর ভদ্রকুলে বিধবা স্ত্রী থাকিলে যে কত প্রকার পাপের আশঙ্কা আছে, বিবেচনা করিলে তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। বিধবা নারী অজ্ঞানবশতঃ কখন কখন সতীত্ব ধর্মকেও বিস্মৃত হইয়া বিপথগামিনী হইতে পাবে, এবং লোকাপবাদভয়ে ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি অতি বিগর্হিত পাপ কার্য সম্পাদনেও প্রবৃত্ত হইতে পারে। অতএব অল্প বয়সে যে বৈধব্য দশা উপস্থিত হয়, বাল্যবিবাহই তাহার মুখ্য কারণ। সুতরাং বাল্যকালে বিবাহ দেওয়া অতিশয় নির্দয় ও নৃশংসের কর্ম। অতএব আমরা বিনয়বচনে স্বদেশীয় ভদ্র মহাশয়দিগের সন্নিধানে নিবেদন করিতেছি, যাহাতে এই বাল্যপরিণয়রূপ দুর্নয় অস্মদ্দেশ হইতে অপনীত হয়, সকলে একমত হইয়া সতত এমত যত্নবান্ হউন।

বাল্যবিবাহ বিষয়ে আমরা অদ্যকার পত্রিকায় যাহা লিখিলাম, ইহা কেবল উপক্রমমাত্র।

এতদ্বিষয়ক হেতু, যুক্তি ও দৃষ্টান্ত আমাদিগের মনে মনে অনেক পরিশিষ্ট রহিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে তাহা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না।*

* ১৮৫০ খৃঃ অব্দে, মতিলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশযের সম্পাদনায় 'সর্বশুভকরী' মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয। এই পত্রিকায় প্রকাশিত কোন রচনায় লেখকের নাম নাই। 'সর্বশুভকরী'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাল্যবিবাহের দোষ' রচনাটি যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখা ইহার উল্লেখ রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' ও শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিত 'বিদ্যাসাগর জীবন চরিত' গ্রন্থে আছে।

বোধোদয়

বিজ্ঞাপন

বোধোদয় নানা ইংরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইল, পুস্তকবিশেষের অনুবাদ নহে। যে কয়টি বিষয় লিখিত হইল, বোধ করি, তৎপাঠে অমূলক কল্পিত গল্পের পাঠ অপেক্ষা, অধিকতর উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি বালক বালিকারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে, এই আশায় অতি সরল ভাষায় লিখিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিয়াছি; কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না। মধ্যে মধ্যে অগত্যা, যে যে অপ্রচলিত দুরূহ শব্দের প্রয়োগ করিতে হইয়াছে, পাঠকবর্গের বোধ-সৌকর্য্যার্থে, পুস্তকের শেষে সেই সকল শব্দের অর্থ লিখিত হইল। এক্ষণে বোধোদয় সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইলে, শ্রম সফল বোধ করিব।

কলিকাতা।
২০শে চৈত্র। সংবৎ ১৯০৭।

একোনাশীতিতম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

ত্রিপুরা জিলার অন্তঃপাতী রূপসা গ্রামে যে রীডিং ক্লব অর্থাৎ পাঠগোষ্ঠী আছে, উহার কার্য্যদর্শী শ্রীযুক্ত মহম্মদ রেয়াজ উদ্দীন্ আহম্মদ মহাশয়, বোধোদয়ের কতিপয় স্থল অসংলগ্ন দেখিয়া, পত্রদ্বারা আমায় জানাইয়াছিলেন। তৎপরে, কলিকাতাবাসী শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন ঘোষ ডাক্তার মহাশয়ও দুই তিনটি অসংলগ্ন স্থল দেখাইয়া দেন; ইহাতে আমি সাতিশয় উপকৃত ও সবিশেষ অনুগৃহীত হইয়াছি। তাঁহাদের প্রদর্শিত স্থল সকল সংশোধিত হইয়াছে। তাঁহারা এরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন না করিলে ঐ সকল স্থল পূর্ব্ববৎ অসংলগ্নই থাকিত। এতদ্ব্যতিরিক্ত, আবশ্যক বোধে কোনও কোনও স্থল কিয়ৎ অংশে পরিবর্তিত, কোনও কোনও স্থল কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

কলিকাতা।
২২শে পৌষ। সংবৎ ১৯৩৯।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

ষণ্ণবতিতম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এই পুস্তকের তাম্রপ্রকরণে নির্দ্দিষ্ট ছিল, "তিন ভাগ দস্তা ও এক ভাগ তামা মিশ্রিত করিলে পিতল হয়।" শ্রীকস্তসওদাগর পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়েরা, বর্ত্তমান সালের ২৫শে জ্যৈষ্ঠের পত্রিকাতে প্রদর্শিত করিয়াছেন, উপরি নির্দ্দিষ্ট স্থলে, 'এক ভাগ তামা' এই নির্দ্দেশটী ভুল। 'এক ভাগ.তামা' ইহার পরিবর্ত্তে 'চারি ভাগ তামা' এরূপ নির্দ্দেশ হওয়া উচিত। তদনুসারে ঐ স্থল সংশোধিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, রঙ্গপ্রকরণে, "তামা মিশ্রিত করিলে, উত্তম কাঁসা প্রস্তুত হয়", এতন্মাত্র নির্দ্দিষ্ট ছিল না। উক্ত সম্পাদক মহাশয়েরা এই ন্যূনতারও উল্লেখ করিয়াছিলেন। তদনুসারে এই ন্যূনতারও পরিহার করা গিয়াছে। সম্পাদক মহাশয়েরা, এই ভুল ও এই ন্যূনতার প্রদর্শন করাতে, আমি অতিশয় উপকৃত ও অনুগৃহীত হইয়াছি, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

কলিকাতা।
২৫শে ভাদ্র। ১২৯৩ সাল

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

বোধোদয়

পদার্থ

আমরা ইতস্ততঃ যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, সে সমুদয়কে পদার্থ বলে। পদার্থ দ্বিবিধ; সজীব ও নির্জীব। যে সকল বস্তুর জীবন আছে, অর্থাৎ যাহাদের জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু আছে, উহারা সজীব পদার্থ; যেমন মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি। যে সকল বস্তুর জীবন নাই, যেখানে রাখ, সেইখানে থাকে, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না, উহাদিগকে নির্জীব বা জড় পদার্থ কহে; যেমন ধাতু, প্রস্তর, মৃত্তিকা ইত্যাদি। সজীব পদার্থের মধ্যে যাহারা ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারে, তাহাদিগকে প্রাণী বলে; যেমন মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি। আর যে সকল বস্তু ভূমিতে জন্মে, ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারে না, উহারা উদ্ভিদ পদার্থ; যেমন তরু, লতা, তৃণ ইত্যাদি।

ঈশ্বর

ঈশ্বর, কি প্রাণী, কি উদ্ভিদ, কি জড়, সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ নিমিত্ত ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বলে। ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে পায় না; কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। আমরা যাহা করি, তিনি তাহা দেখিতে পান; আমরা যাহা মনে ভাবি, তিনি তাহা জানিতে পারেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু, তিনি সমস্ত জীবের আহার-দাতা ও রক্ষাকর্তা।

চেতন পদার্থ

সমুদয় চেতন পদার্থের সাধারণ নাম জন্তু। জন্তুগণ মুখ দ্বারা আহারের গ্রহণ, এবং মুখ ও নাসিকা দ্বারা বায়ুর আকর্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করে। আহার দ্বারা শরীরের পুষ্টি হয়, তাহাতেই উহারা বাঁচিয়া থাকে। আহার না পাইলে, শরীর শুষ্ক হইতে থাকে, এবং অল্প দিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ ঘটে।

প্রায় সকল জন্তুর পাঁচ ইন্দ্রিয় আছে। সেই পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা, তাহারা দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শ করিতে পারে।

পুত্তলিকার চক্ষু আছে, দেখিতে পায় না; মুখ আছে, খাইতে পারে না; নাসিকা আছে, গন্ধ পায় না; হস্ত আছে, কোনও কর্ম করিতে পারে না; কর্ণ আছে, কিছুই শুনিতে পায় না; চরণ আছে, চলিতে পারে না। ইহার কারণ এই, পুত্তলিকা জড় পদার্থ, উহার চেতনা নাই। ঈশ্বর কেবল প্রাণীদিগকে চেতনা দিয়াছেন। তিনি ভিন্ন আর কাহারও চেতনা দিবার ক্ষমতা নাই। দেখ, মনুষ্যেরা পুত্তলিকার মুখ, চোখ, নাক, কান, হাত, পা সমুদয় গড়িতে পারে, এবং উহাকে ইচ্ছামত বেশ-ভূষাও পরাইতে পারে, কিন্তু চেতনা দিতে পারে না; উহা অচেতন পদার্থই থাকে, দেখিতেও পায় না, শুনিতেও পায় না, চলিতেও পারে না, বলিতেও পারে না।

পৃথিবীর সকল স্থানেই নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জন্তু আছে; তাহাদের মধ্যে কতকগুলি স্থলচর, অর্থাৎ কেবল স্থলে থাকে; আর কতকগুলি জলচর, অর্থাৎ কেবল জলেথাকে, আর কতকগুলি, স্থল ও জল উভয় স্থানেই থাকে, উহাদিগকে উভচর বলা যাইতে পারে।

যাবতীয় প্রাণীর মধ্যে মনুষ্য সর্বপ্রধান। আর সমুদয় জীব মনুষ্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট। তাহারা কোনও ক্রমে, বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে মনুষ্যের তুল্য নহে।

যে সকল জন্তুর শরীরের চর্ম রোমশ, অর্থাৎ রোমে আবৃত, এবং যাহারা চারি পায়ে চলে, তাহাদিগকে পশু বলে; যেমন গো, মহিষ, অশ্ব, গর্দভ, ছাগল, মেষ, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি। পশুর চারি পা; এজন্য পশুদিগকে চতুষ্পদ জন্তু বলে। কতকগুলি জন্তুর পায়ে খুর আছে; যেমন গো, মহিষ, অশ্ব, গর্দভ, ছাগল, মেষ প্রভৃতির। কোনও কোনও পশুর খুব অখণ্ডিত অর্থাৎ জোড়া; যেমন ঘোড়ার। কতকগুলির খুর দুই খণ্ডে বিভক্ত, যেমন গো, মেষ, ছাগল প্রভৃতির। কোনও কোনও পশুর পায়ে খুর নাই, নখর আছে; যেমন সিংহ, ব্যাঘ্র, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতির। বানরগণের দেহ লোমে আচ্ছাদিত বটে, কিন্তু উহারা চতুষ্পদ নহে। উহারা হস্ত ও পদ উভয়েরই অঙ্গুলি দ্বারা বৃক্ষের শাখা ধরিতে পারে; এজন্য পণ্ডিতেরা উহাদিগকে চতুষ্পদ না বলিয়া চতুর্হস্ত বলিয়া থাকেন। বানর, বুদ্ধিতে মনুষ্য অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট হইলেও, অন্য জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

জন্তুর মধ্যে পক্ষিজাতি, দেখিতে অতি সুন্দর। তাহাদের সর্বাঙ্গ পালকে ঢাকা। পক্ষীর দুই পাশে দুই পক্ষ অর্থাৎ ডানা আছে; উহা দ্বারা উড়িতে পারে, অনেক দূর গেলেও ক্লেশবোধ করে না। পক্ষীর দুটি পা আছে; তাহা দ্বারা চলিতে পারে, এবং বৃক্ষের শাখায় বসিতে পারে; প্রায় সকল পক্ষী, খড়, কুটা, তৃণ প্রভৃতি আহরণ করিয়া অতি পরিষ্কৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসা প্রস্তুত করে। কোন কোন পক্ষী অতিশয় ক্ষুদ্র; যেমন চড়ুই, বাবুই ইত্যাদি। আমেরিকায় একপ্রকার পক্ষী আছে, উহা ভ্রমর অপেক্ষা বৃহৎ নহে।

কাক, কোকিল, পারাবত প্রভৃতি অনেকগুলি পক্ষীর আকার কিছু বৃহৎ। আফ্রিকা-দেশে উটপক্ষী নামে একপ্রকার পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়; উহা উচ্চে ছয় সাত হাত পর্যন্ত হইয়া থাকে। হংস, সারস প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষী জলে খেলা করে ও সাঁতার দিতে ভালবাসে, উহারা জলচর পক্ষী। সন্তরণের সুবিধার জন্য, পরমেশ্বর জলচর পক্ষীর পায়ের অঙ্গুলি, একখানি পাতলা চর্ম দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। পক্ষী সকল আপন আপন বাসায় ডিম পাড়ে। কিছুদিন ডানায় ঢাকিয়া গরমে রাখিলে, ডিমের ভিতর হইতে ছানা বাহির হয়। ইহাকেই ডিমে তা দেওয়া ও ডিম ফুটান বলে।

মৎস্য একপ্রকার জন্তু। ইহারা জলে থাকে। মৎস্যের শরীর ছালে আচ্ছাদিত। ঐ ছালের উপর মসৃণ চিক্কণ শল্ক অর্থাৎ আঁইস আছে। বোয়াল, মাগুর প্রভৃতি কতকগুলি মৎস্যের ছালে আঁইস নাই। মৎস্যের দুই পাশে যে পাখনা আছে, তাহার বলে জলে ভাসিয়া বেড়ায়। মৎস্যেরা অতি বেগে সাঁতার দিতে পারে, এবং জলের ভিতর দিয়া গিয়া, কীট ও অন্য অন্য ভক্ষ্য বস্তু ধরে।

আর একপ্রকার জন্তু আছে, তাহাদিগকে সরীসৃপ বলে; যেমন সাপ, গোসাপ, টিক্-টিকি, গিরগিটি, বেঙ ইত্যাদি।

সর্প প্রভৃতি কতকগুলি সরীসৃপের পা নাই, বুকে ভর দিয়া চলে; সর্পের শরীরের চর্ম অতি মসৃণ ও চিক্কণ। ভেক, কচ্ছপ, গোসাপ, টিক্‌টিকি প্রভৃতি কতকগুলি সরীসৃপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা আছে; উহারা তাহা দ্বারা চলে। ভেকজাতি নিরীহ; কৌতুক ও আমোদের নিমিত্ত, উহাদিগকে ক্লেশ দেওয়া উচিত নহে। কেহ কেহ এমন নিষ্ঠুর যে, ভেক দেখিলেই ডেলা মারে ও যষ্টি প্রহার করে।

পতঙ্গও একপ্রকার জন্তু। পতঙ্গ নানাবিধ। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফড়িং, মশা, মাছি প্রজা-পতি প্রভৃতি বহুবিধ পতঙ্গ উড়িয়া বেড়ায়। পতঙ্গগণ পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতি জন্তুর আহার। কীট অতি ক্ষুদ্র জন্তু। কীট নানাবিধ। উকুন, ছারপোকা, পিপীলিকা, উই প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু কীট জাতি। পতঙ্গের ন্যায় কীটেরা উড়িয়া বেড়াইতে পারে না।

এ সমস্ত ভিন্ন আরও অনেকবিধ জন্তু আছে। তাহারা এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণনামক যন্ত্র ব্যতিরেকে, কেবল চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা স্ব স্ব প্রকৃতি অনু-সারে জলে ও স্থলে অবস্থিতি করে।

সমস্ত জগৎ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জীবসমূহে পরিবৃত। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার কি অপার মহিমা! তিনি সমস্ত জীবের প্রতিদিনের পর্যাপ্ত আহারের যোজনা করিয়া রাখিয়াছেন।

অধিকাংশ জন্তু লতা, পাতা, ফল, মূল, ঘাস খাইয়া প্রাণধারণ করে। কতকগুলি জন্তু

আপন অপেক্ষা দুর্বল জন্তুর প্রাণবধ করিয়া, তাহাদের মাংস খায়। উহাদিগকে শ্বাপদ অথবা শিকারী জন্তু বলে।

গো, অশ্ব, গর্দভ, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি কতকগুলি জন্তু লোকালয়ে থাকে, এবং মানুষে যাহা দেয়, তাহাই খাইয়া প্রাণধারণ করে। এই সকল জন্তুকে গ্রাম্যপশু বলে। গ্রাম্যপশুরা অতি শান্তস্বভাব, মনুষ্যের অনেক উপকারে আইসে।

কোনও কোনও প্রাণী, মনুষ্যের ন্যায় সন্তান প্রসব করে এবং স্তন্যপান করাইয়া থাকে; ইহাদিগকে স্তন্যপায়ী কহে। কোনও কোনও প্রাণী, পক্ষীর ন্যায় অণ্ড প্রসব করে; উহাদিগকে অণ্ডজ বলে। মৎস্য, সরীসৃপ, কীট, পতঙ্গ মাত্রেই অণ্ডজ।

কোন্ জন্তু কোন্ শ্রেণীতে নিবিষ্ট, কাহার কি নাম, বিশেষরূপে জানা অতি আবশ্যক। কোনও জন্তুকেই অযথা নামে ডাকা উচিত নহে; যাহার যে নাম, তাহাকে সেই নামে ডাকা কর্তব্য। কোনও কোনও ব্যক্তি বাদুড়কে পক্ষী বলে; কিন্তু বাদুড় পক্ষী নহে, স্তন্যপায়ী। পশুদিগের ন্যায় উহাদিগেরও চারি পা আছে। সম্মুখের দুই পায়ের অঙ্গুলি শরীরের অপেক্ষা অনেক বৃহৎ, এবং একখানি পাতলা চর্ম দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত উহাকেই আমরা বাদুড়ের ডানা বলি। সমুদ্রে একপ্রকার সুবৃহৎ মৎস্যাকৃতি জন্তু বাস করে তাহার নাম তিমি। তিমি স্তন্যপায়ী, অতএব উহাকে মৎস্য বলা উচিত নহে। চিংড়িও একপ্রকার জলজ কীট, মৎস্য নহে।

লোকে সচরাচর গুটিপোকাকে কীট বলিয়া থাকে; কিন্তু বাস্তবিক গুটিপোকা কীট নহে, পতঙ্গ। অণ্ড হইতে নির্গত হইয়া, উহারা কিছুকাল কীটের অবস্থায় থাকে, পরে সহসা উহাদের আকৃতির পরিবর্তন হইতে আরম্ভ হয়। ক্রমে উহাদের পাখা উঠে এবং উহারা উড়িয়া বেড়াইতে শিখে। গুটিপোকার ন্যায় প্রজাপতিকেও ঐরূপ তিন অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।

ঈশ্বর, কি অভিপ্রায়ে কোন্ বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা তাহা অবগত নহি, এজন্য কতকগুলিকে পূজ্য ও পবিত্র জ্ঞান করি আর কতকগুলিকে ঘৃণা করি। কিন্তু ইহা অন্যায় ও ভ্রান্তিমূলক। বিশ্বকর্তা ঈশ্বরের সন্নিধানে, সকল জন্তুই সমান। অতএব আমাদেরও ঐরূপ জ্ঞান করা উচিত।

পশুদের মধ্যে পদমর্যাদা নাই। লোকে সিংহকে মৃগেন্দ্র অর্থাৎ পশুর রাজা বলে। সকল পশু অপেক্ষা সিংহের সাহস ও বিক্রম অধিক; এই নিমিত্ত মনুষ্যেরা উহাকে, ঐ উপাধি দিয়াছে; নচেৎ, সিংহ অন্য অন্য পশু অপেক্ষা কোন মতেই উৎকৃষ্ট নহে।

মানবজাতি

মানবজাতি, বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে সকল জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহাদের বুদ্ধি ও বিবেচনা-শক্তি আছে; এজন্য সর্ববিধ জন্তুর উপর আধিপত্য করে। মানুষ, পশুর ন্যায় চারি পায়ে চলে না, দুই পায়ের উপর ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ায়। মানুষের দুই হাত, দুই পা। দুই পা দিয়া ইচ্ছামত সর্বত্র যাতায়াত করিতে পারে। মানুষ দুই হস্ত দ্বারা আহার-সামগ্রীর আহরণ করে, গৃহসামগ্রী ও পরিধান-বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া লয়, এবং গৃহনির্মাণ করিয়া, তাহাতে বাস করে। গৃহের মধ্যে বাস করে, এজন্য মানুষকে রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড় প্রভৃতিতে ক্লেশ পাইতে হয় না।

মনুষ্যজাতি একাকী থাকিতে ভালবাসে না। তাহারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গের মধ্যগত ও প্রতিবেশিমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া বাস করে। এরূপও দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও কোনও ব্যক্তি লোকালয় ছাড়িয়া অরণ্যে বাস করে; কিন্তু তাদৃশ লোক অতি বিরল। অধিকাংশ লোকই, গ্রামে ও নগরে পরস্পরের নিকটে বাটী নির্মাণ করিয়া অবস্থিতি করে। যেখানে অল্প লোক বাস করে, তাহার নাম গ্রাম। যেখানে বহুসংখ্যক লোকের বাস, তাহাকে নগর বলে। যে নগরে রাজার বাস, অথবা রাজকীয় প্রধান স্থান থাকে, তাহাকে রাজধানী বলে, যেমন কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী।

মনুষ্যেরা গ্রামে ও নগরে, একত্র হইয়া বাস করে। ইহার তাৎপর্য এই, তাহাদের পরস্পর সাহায্য হইতে পারিবে ও পরস্পর দেখাশুনা ও কথাবার্তায় সুখে কালযাপন হইবে। যাহারা এইরূপে একত্র বাস করে, তাহাদিগকে অন্যান্যের প্রতিবেশী বলা যায়; প্রতিবেশীদিগের মধ্যে সর্বদা সদ্ভাব থাকা উচিত, পরস্পর কলহ ও বিবাদ করিলে অসুখের বৃদ্ধি হয়। যে লোক যে দেশে বাস করে, তাহাকে সে দেশের নিবাসী বলে। দেশের সমস্ত নিবাসী লোক লইয়া এক জাতি হয়। পৃথিবীতে নানা দেশ ও জাতি আছে।

লোক মাত্রেরই জন্মভূমিঘটিত এক এক উপাধি থাকে; ঐ উপাধি দ্বারা তাহাদিগকে অন্য দেশীয় লোক হইতে পৃথক বলিয়া জানা যায়। বাঙ্গালা দেশে আমাদের নিবাস, এই নিমিত্ত আমাদিগকে বাঙ্গালী বলে। এইরূপ উড়িষ্যা দেশের নিবাসী লোকদিগকে উড়িয়া বলে; মিথিলার নিবাসীদিগকে মৈথিল, ইংলণ্ডের নিবাসীদিগকে ইংরেজ।

প্রাণী সকল, দিনের বেলায় আপন আপন কর্ম করে, রাত্রিকালে নিদ্রা যায়। নিদ্রা যাইবার সময়, তাহারা শয়ন করে ও নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাকে। অশ্ব প্রভৃতি কতক-

গুলি জন্তু দাঁড়াইয়া নিদ্রা যায়। শশক প্রভৃতি কতকগুলি জন্তু, চক্ষু না মুদিয়া নিদ্রা যাইতে পারে। সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি শিকারী জন্তু দিবাভাগে নিদ্রা যায়, এবং রাত্রি কালে আহার অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়।

আমরা নিদ্রা যাইবার সময়, কখনও কখনও স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন সকল অমূলক চিন্তা মাত্র, কার্যকারক নহে। প্রাণী সকল যখন নিদ্রা যায়, তখন উহাদিগকে নিদ্রিত বলে, যখন নিদ্রা না যাইয়া জাগিয়া থাকে, তখন উহাদিগকে জাগরিত বলে।

মনুষ্য ভিন্ন সকল প্রাণীই কাঁচা বস্তু খাইয়া থাকে। গো, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি জন্তু সকল মাঠে কাঁচা ঘাস খায়। সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদেরা কোনও জন্তু মারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার কাঁচা মাংস খাইয়া ফেলে। পক্ষিগণ জীয়ন্ত কীট পতঙ্গ ধরিয়া তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করে। মনুষ্যেরা প্রায় সকল বস্তুই, অগ্নিতে পাক করিয়া খায়। ভাল পাক করা হইলে, এই সমুদয় বস্তু সুস্বাদু ও পুষ্টিকর হয়; কাঁচা খাইলে পরিপাক হয় না, পীড়াদায়ক হয়।

প্রাণিগণ যখন স্বচ্ছন্দ-শরীরে আহার বিহার করিয়া বেড়ায়, তখন তাহাদিগকে সুস্থ বলা যায়; আর যখন তাহাদের পীড়া হয়, স্বচ্ছন্দে আহার বিহার করিতে পারে না, সর্বদা শুইয়া থাকে, ঐ সময়ে তাহাদিগকে অসুস্থ বলে। সময়ে সময়ে অসাবধানতা প্রযুক্ত মনুষ্যের পীড়া হইয়া থাকে। পীড়া হইলে, চিকিৎসকেরা ঔষধ পথ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন; সকলেরই ঐ ব্যবস্থা অনুসারে চলা উচিত ও আবশ্যক। যাহারা ঐ ব্যবস্থা অনুসারে চলে, তাহারা অধিক ক্লেশ পায় না, ত্বরায় রোগমুক্ত ও সুস্থ হইয়া উঠে। যাহারা চিকিৎসকের ব্যবস্থায় অবহেলা করে, তাহারা বিস্তর ক্লেশ পায়, এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে মরিয়া যায়।

কোনও কোনও জন্তু অধিক কাল বাঁচে, কোনও কোনও জন্তু অল্প কাল বাঁচে। হস্তী প্রায় একশত বৎসর বাঁচে। কুকুর প্রায় চৌদ্দ পনর বৎসর বাঁচে। অধিকাংশ কীট পতঙ্গ প্রায় এক বৎসরের অধিক বাঁচে না। কোনও কোনও কীট এক ঘণ্টা মাত্র বাঁচে। অতি ক্ষুদ্র জাতীয় মশা, সূর্যের আলোকে অল্পকাল মাত্র খেলা করিয়া, ভূতলে পড়ে ও প্রাণত্যাগ করে। মনুষ্যজাতি, প্রায় সমুদয় জন্তু অপেক্ষা অধিক কাল বাঁচে। মরণের অবধারিত কাল নাই। অনেকে প্রায় ষাটি বৎসরের মধ্যে মরিয়া যায়। যাহারা সত্তর, আশী, নব্বই, অথবা একশত বৎসর বাঁচে, তাহাদিগকে লোকে দীর্ঘজীবী বলে। কিন্তু অনেকেই শৈশবকালে মরিয়া যায়। এক্ষণে যাহারা নিতান্ত শিশু আছে, তাহারাও তাহাদের পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহীর ন্যায়, বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বাঁচিতে পারে, কিন্তু চিরজীবী হইবে না। কেহই অমর নহে, সকলকেই মরিতে হইবে।

জন্তু সকল মরিলে তাহাদের শরীরে প্রাণ ও চেতনা থাকে না। তখন উহারা আর

পূর্বের মত দেখিতে, শুনিতে, চলিতে, বলিতে কিছুই পারে না; কেবল অচেতন স্পন্দহীন জড় পদার্থ মাত্র পড়িয়া থাকে। মৃত শরীর বিশ্রী ও বিবর্ণ হইয়া যায়, এবং অল্পকালের মধ্যেই গলিত ও দুর্গন্ধ হইয়া পড়ে, এজন্য কেহ মরিলে, লোকে অবিলম্বে তাহার দেহ দগ্ধ করে। কোনও কোনও জাতি দাহ করে না, মাটিতে পুতিয়া ফেলে।
মনুষ্য শৈশবকালে অতি অজ্ঞ থাকে। ক্রমে ক্রমে যত বড় হয়, উপদেশ পাইয়া, নানা বিষয় শিখিতে আরম্ভ করে। আমরা এই যে পৃথিবীতে বাস করিতেছি, ইহা কত বড়, ইহার আকার কেমন, শিশুরা তাহার কিছুই জানে না। অধিক কি, তাহাদের কিঁ নাম, কোন্ হাত ডান্, কোন্ হাত বাঁ, শিখাইয়া না দিলে, ইহাও জানিতে পারে না।
বালকেরা সকল বিষয়ে অজ্ঞ বলিয়া, তাহাদিগকে শিক্ষার্থে পাঠশালায় পাঠান হয়। যাহারা বাল্যকালে যত্নপূর্বক বিদ্যাভ্যাস করে, তাহারা মনের সুখে কালযাপন করে। আর যাহারা বিদ্যাভ্যাসে আলস্য ও অবহেলা করিয়া, কেবল খেলিয়া বেড়ায়, তাহারা মূর্খ হয় ও যাবজ্জীবন দুঃখ পায়।

ইন্দ্রিয়

ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্ববিধ জ্ঞান জন্মে। ইন্দ্রিয় না থাকিলে আমরা কোনও বিষয়ে কিছু মাত্র জানিতে পারিতাম না। মনুষ্যের পাঁচ ইন্দ্রিয়। সেই পাঁচ ইন্দ্রিয় এই; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্। চক্ষু দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে দর্শন বলে; কর্ণ দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে শ্রবণ; নাসিকা দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে আঘ্রাণ; জিহ্বা দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে আস্বাদন; ত্বক্ দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে স্পর্শ বলে।

চক্ষু

চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়। চক্ষু দ্বারা সকল বস্তুর দর্শন নিষ্পন্ন হয়। চক্ষু না থাকিলে, কোন্ বস্তুর কেমন আকার, কোন্ বস্তু শাদা, কোন্ বস্তু কালো, কিছুই জানিতে পারিতাম না।
যেখানে আলোক থাকে, সেখানে চক্ষুতে দেখা যায়; যেখানে গাঢ় অন্ধকার, কিছুই আলোক নাই, সেখানে কিছুই দেখা যায় না। দিনের বেলায় সূর্যের আলোক থাকে, এজন্য অতি সুন্দর দেখিতে পাওয়া যায়। রাত্রিকালে চন্দ্র ও নক্ষত্র দ্বারাও অতি অল্প আলোক হয়; এ নিমিত্ত, বড় স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না, প্রদীপ জ্বালিলে বিলক্ষণ আলোক হয়; তখন উত্তম দেখিতে পাওয়া যায়।
চক্ষু অতি কোমল পদার্থ, অল্পেই নষ্ট হইতে পারে; এজন্য চক্ষুর উপর দুইখানি আবরণ

আছে। ঐ আবরণকে চক্ষুর পাতা বলে। চক্ষুতে আঘাত লাগিবার অথবা কিছু পড়িবার আশঙ্কা হইলে, পাতা দিয়া চক্ষু ঢাকিয়া ফেলি। চক্ষুর পাতার ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোম আছে, তাহাতে চক্ষুর অনেক রক্ষা হয়। ঐ রোমের নাম পক্ষ্ম। পক্ষ্ম আছে বলিয়া, চক্ষুতে ধূলা, কুটা, কীট প্রভৃতি পড়িতে পায় না, এবং সূর্যের উত্তাপ অধিক লাগে না।

যাহার দুই চক্ষু নাই, সে অন্ধ। অন্ধ কিছুই দেখিতে পায় না। সে কোথাও যাইতে পারে না। যাইতে হইলে, একজন তাহার হাত ধরিয়া লইয়া যায়, নতুবা সে পড়িয়া মরে। অন্ধ হওয়া বড় ক্লেশ। যাহার এক চক্ষু নাই, তাহাকে কাণা বলে। কাণা এক চক্ষু দ্বারা দেখিতে পায়। কাণাকে, অন্ধের মত ক্লেশ পাইতে হয় না। অক্ষিগোলকের সম্মুখভাগে যে গোলাকৃতি অংশ কৃষ্ণবর্ণ দেখায়, ঐ অংশকে চক্ষুর তারা বলে। উহা কাচের ন্যায় স্বচ্ছ। তাহার পশ্চাদ্ভাগে একটি কোমল পাতলা পর্দা থাকে। আমরা যে বস্তু দেখি, সে বস্তু হইতে আলোক আসিয়া, ঐ তারা ভেদ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তখন ঐ কোমল পাতলা পর্দার উপর সেই বস্তুর ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি আবির্ভূত হয়, তাহাতেই আমাদের দর্শনজ্ঞান জন্মে।

কর্ণ দ্বারা সকল শব্দের শ্রবণ হয়; এ নিমিত্ত কর্ণকে শ্রবণেন্দ্রিয় বলে। কর্ণ না থাকিলে, আমরা কিছুই শুনিতে পাইতাম না। শব্দ সকল প্রথমতঃ কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। কর্ণকুহরে, পটহের মত যে অতি পাতলা একখণ্ড চর্ম আছে, তাহাতে ঐ সকল শব্দের প্রতিঘাত হয়, এবং তাহাতেই শ্রবণজ্ঞান নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কোনও কোনও লোক এমন দুর্ভাগ্য যে, তাহাদের শ্রবণশক্তি নাই; তাহাদিগকে বধির অর্থাৎ কালা বলে। কেহ কিছু বলিলে অথবা কোনও শব্দ করিলে, কালারা শুনিতে পায় না।

নাসিকা

নাসিকাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় বলে। নাসিকার দ্বারা গন্ধের আঘ্রাণ পাওয়া যায়। নাসিকা না থাকিলে, কি ভাল, কি মন্দ, কোনও গন্ধের আঘ্রাণ পাওয়া যাইত না। নাসিকারন্ধ্রের অভ্যন্তরে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু সঞ্চারিত আছে। ঐ সকল স্নায়ু দ্বারা গন্ধের আঘ্রাণ পাওয়া যায়। যে গন্ধের আঘ্রাণে মনে প্রীতি জন্মে, তাহাকে সুগন্ধ বা সৌরভ বলে। যে গন্ধের আঘ্রাণে অসুখ ও ঘৃণাবোধ হয়, তাহাকে দুর্গন্ধ বলে। চন্দন ও গোলাপের গন্ধ সুগন্ধ। কোনও বস্তু পচিলে যে গন্ধ হয়, তাহাকে দুর্গন্ধ বলে।

জিহ্বা

জিহ্বা দ্বারা সকল বস্তুর আস্বাদ পাওয়া যায় ; এজন্য জিহ্বাকে রসনেন্দ্রিয় বলে। রসন শব্দের অর্থ আস্বাদন। জিহ্বার অন্য এক নাম রসনা। জিহ্বা না থাকিলে, আমরা কোনও বস্তুর আস্বাদন বুঝিতে পারিতাম না। জিহ্বাতে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু আছে। মুখের ভিতর কোনও বস্তু দিলে, ঐ সকল স্নায়ুর দ্বারা তাহার স্বাদ হয়।

বস্তুর আস্বাদন নানাবিধ। গুড়ের আস্বাদ মিষ্ট। তেঁতুল অম্ল বোধ হয়। নিম ও চিরতা তিক্ত, এবং মরিচ কটু লাগে। যাহা খাইতে ভাল লাগে, তাহাকে সুস্বাদ বলে ; যাহা মন্দ লাগে, তাহাকে বিস্বাদ বলে। কোনও কোনও বস্তুর কিছুই আস্বাদ নাই। মুখে দিলে, না অম্ল, না মিষ্ট, না তিক্ত, না কটু, কিছুই বোধ হয় না ; যেমন, গঁদ, চুয়ান জল ইত্যাদি।

ত্বক্

ত্বক্ স্পর্শেন্দ্রিয়। ত্বক দ্বারা স্পর্শজ্ঞান জন্মে। ত্বক্ সকল শরীর ব্যাপিয়া আছে, এবং সমস্ত ত্বকেই স্নায়ু সঞ্চারিত আছে ; এজন্য শরীরের সকল অংশেই স্পর্শজ্ঞান হইয়া থাকে। কিন্তু সকল অঙ্গ অপেক্ষা, হস্তই স্পর্শজ্ঞানের প্রধান সাধন। অন্ধকারে যখন দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন হস্ত ও অন্যান্য অবয়ব দ্বারা স্পর্শ করিয়া, প্রায় সকল বস্তু জানিতে পারা যায়। বায়ু দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা উহার অনুভব হয়।

এই পাঁচ ইন্দ্রিয় জ্ঞানের পথস্বরূপ ইন্দ্রিয়পথ দ্বারা আমাদের মনে জ্ঞানের সঞ্চার হয়। ইন্দ্রিয়বিহীন হইলে, আমরা সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞান থাকিতাম। এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিনিয়োগ দ্বারা অভিজ্ঞতা জন্মে। অভিজ্ঞতা জন্মিলে, ভাল, মন্দ, হিত, অহিত এই সমস্ত বিবেচনা করিবার ক্ষমতা হয়। অতএব ইন্দ্রিয় মনুষ্যের পক্ষে অশেষ প্রকারে উপকারক।

মনুষ্যের ন্যায়, পশু, পক্ষী ও অন্যান্য জন্তুরও এই সকল ইন্দ্রিয় আছে। কিন্তু তাহাদের কোনও কোনও ইন্দ্রিয়, মনুষ্যের অপেক্ষা অধিক প্রবল। বিড়ালের শ্রবণশক্তি অনেক অধিক। এরূপ হইবার তাৎপর্য এই যে, বিড়ালের শ্রবণশক্তি অধিক না হইলে, অন্ধকারময় স্থানে মূষিক প্রভৃতির সঞ্চার বুঝিতে পারিত না। কোনও কোনও কুকুর-জাতির ঘ্রাণশক্তি অতিশয় প্রবল ; পলায়িত পশুর কেবল গাত্রগন্ধের আঘ্রাণ অনুসারে, তাহার অন্বেষণ করিয়া লয়। ঘ্রাণশক্তি এত অধিক না হলে, তাহারা সহজে শিকার

করিতে পারিত না। যে সকল জন্তু আঘ্রাণ দ্বারা শিকার না করিয়া দৃষ্টি দ্বারা শিকার করে, তাহাদের দর্শনশক্তি অতিশয় প্রবল। যে পশুর অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়, উহা অধিক দূরবর্তী হইলেও ইহারা দেখিতে পায়। যেখানে অল্প অন্ধকার সেখানে বিড়াল, মনুষ্য অপেক্ষা ভাল দেখিতে পায়। কিন্তু যেখানে ঘোর অন্ধকার, কিছুমাত্র আলোক নাই, সেখানে বিড়াল, মনুষ্য অপেক্ষা অধিক দেখিতে পায় না।

এইরূপ যে জন্তুর যে ইন্দ্রিয়ের যেরূপ আবশ্যক, ঈশ্বর তাহাকে তাহাই দিয়াছেন। তিনি কাহারও কোনও বিষয়ে ন্যূনতা রাখেন নাই।

বাক্যকথন—ভাষা

মনুষ্যেরা, মুখ দ্বারা নানাবিধ শব্দের উচ্চারণ করিয়া, মনের ভাব ব্যক্ত করে। শব্দের উচ্চারণ বিষয়ে জিহ্বাই প্রধান সাধন। এইরূপ শব্দের উচ্চারণকে কথা কহা বলে, এবং ঐ উচ্চারিত শব্দের নাম ভাষা। যে শক্তির দ্বারা শব্দের উচ্চারণ নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে বাক্‌শক্তি বলে।

পশু, পক্ষী ও অন্যান্য জন্তুদিগের বাক্‌শক্তি নাই। তাহাদের মনে, কখনও কখনও কোনও ভাবের উদয় হয় বটে, কিন্তু উহারা মনুষ্যের মত কথা কহিয়া, তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না; কেবল এক প্রকার অব্যক্ত শব্দ ও চীৎকার করে। গো, মহিষ, মেষ, ছাগল, গর্দভ, কুকুর, বিড়াল, পক্ষী, ভেক প্রভৃতি জন্তু সকল এক এক প্রকার শব্দ করে। ঐ সকল শব্দ দ্বারা তাহারা হর্ষ, বিষাদ, রোষ, অভিলাষ প্রভৃতি মনের ভাব ব্যক্ত করে। কিন্তু সে সকল অব্যক্ত শব্দ বুঝিতে পারা যায় না, এজন্য ঐ সকল শব্দকে ভাষা বলে না। শুক প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষীকে শিখাইলে, উহারা মনুষ্যের মত স্পষ্ট শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে, কিন্তু অর্থ বুঝাইতে পারে না। যাহা শিখে, বারংবার তাহাই উচ্চারণ করিতে থাকে।

চিন্তা ও বাক্‌শক্তির অভাবে, পশু পক্ষী ও আর আর জন্তুদিগকে মনুষ্য অপেক্ষা, অনেক হীন অবস্থায় থাকিতে হইয়াছে। তাহাদের কোথায় জন্ম, কত বয়স, কি নাম, কাহার কি অবস্থা, ইত্যাদি কোনও বিষয় পরস্পর জানাইতে পারে না; সুতরাং তাহারা পরস্পর শিক্ষা দিতে অক্ষম, এবং আপনাদিগকে সুখী ও স্বচ্ছন্দ করিবার নিমিত্ত, কোনও উপায় করিতেও সমর্থ নয়। ফলতঃ, মনুষ্য ভিন্ন আর সকল জন্তুকেই, চিরকাল এই হীন অবস্থায় থাকিতে হইবে; এবং মনুষ্যেরা অনায়াসে তাহাদিগকে পরাভূত ও বশীভূত করিতে পারিবে।

আমাদের বাক্‌শক্তি ও চিন্তাশক্তি উভয়ই আছে। মনে যে বিষয়ের চিন্তা করি, জিহ্বা দ্বারা তাহা উচ্চারণ করিতে পারি। জিহ্বা ও কণ্ঠনালী এ উভয়কে বাগিন্দ্রিয় বলে।

জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ সম্পন্ন হয়, কণ্ঠনালী দ্বারা শব্দ নির্গত হয়। কোনও কোনও লোক এমন হতভাগ্য যে, কথা কহিতে পারে না। উহাদিগকে মূক অর্থাৎ বোবা বলে। সকল ব্যক্তিই অতি শৈশবকালে কথা কহিতে শিখে। প্রথম কথা কহিতে শিখা, স্বজাতীয় লোকের নিকটে হয়; এ নিমিত্ত প্রথম শিক্ষিত ভাষাকে জাতিভাষা বলে। সকলেরই স্পষ্ট কথা কহিতে চেষ্টা করা উচিত; তাহা হইলে সকলে অনায়াসে বুঝিতে পারে। আর যখন বলিবে, সত্য বই মিথ্যা বলিবে না। মিথ্যা বলা বড় দোষ; মিথ্যা বলিলে কেহ বিশ্বাস করে না; সকলেই ঘৃণা করে। কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি ধনবান্, কি দরিদ্র, কাহারও অশ্লীল ও অসাধু ভাষা মুখে আনা উচিত নহে। কি ছোট, কি বড়, সকলকেই প্রিয় ও মিষ্ট বাক্যে বলা উচিত। রূঢ় ও কর্কশ বাক্য বলিয়া, কাহারও মনে বেদনা দেওয়া উচিত নহে।

সকল দেশেরই ভাষা পৃথক্ পৃথক্। না শিখিলে, এক দেশের লোক অন্যদেশীয় লোকের ভাষা বুঝিতে পারে না। আমরা যে ভাষা বলি, তাহাকে বাঙ্গালা বলে। কাশী অঞ্চলের লোক যে ভাষা বলে, তাহাকে হিন্দী বলে। পারস্য দেশের লোকের ভাষা, পারসী। আরব দেশের ভাষা, আরবী। হিন্দী ভাষাতে আরবী ও পারসী কথা মিশ্রিত হইয়া, এক ভাষা প্রস্তুত হইয়াছে, উহাকে উর্দু বলে। উর্দুকে স্বতন্ত্র ভাষা বলা যাইতে পারে না। কতকগুলি আরবী ও পারসী কথা ভিন্ন উহা সর্ব প্রকারেই হিন্দী। ইংলণ্ডীয় লোকের অর্থাৎ ইংরেজদিগের ভাষা, ইংরেজী।

ইংরেজেরা আমাদের দেশের রাজা ছিল, সুতরাং ইংরেজী আমাদের রাজভাষা ছিল; এ নিমিত্ত সকলে আগ্রহপূর্বক ইংরেজী শিক্ষিত; কিন্তু অগ্রে মাতৃভাষা না শিখিয়া, পরের ভাষা শিক্ষা কোনও মতে উচিত নহে।

পূর্বকালে ভারতবর্ষে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহার নাম সংস্কৃত। সংস্কৃত অতি প্রাচীন ও অতি উৎকৃষ্ট ভাষা। এ ভাষা এখন আর চলিত ভাষা নহে। কিন্তু ইহাতে অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ আছে। সংস্কৃত ভাল না জানিলে, হিন্দী বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষাতে উত্তম ব্যুৎপত্তি জন্মে না।

কাল

প্রভাত ও সন্ধ্যা কাহাকে বলে, তাহা সকলেই জানে। যখন সূর্যের উদয় হয়, আমরা শয্যা হইতে উঠি, ঐ সময়কে প্রভাত বলে। যখন সূর্য অস্ত যায়, অন্ধকার হইতে আরম্ভ হয়, ঐ সকলকে সন্ধ্যা বলে। প্রভাত অবধি সন্ধ্যা পর্যন্ত যে সময়, তাহাকে দিবাভাগ বলে। আর সন্ধ্যা অবধি প্রভাত পর্যন্ত যে সময়, তাহাকে রাত্রি বলে। দিবাভাগে প্রায় সকল জীব জাগরিত থাকে ও আপন আপন কর্ম করে। রাত্রিকালে আরাম

করে ও নিদ্রা যায়। দিবাভাগের প্রথম ভাগকে পূর্বাহ্ণ, মধ্য ভাগকে মধ্যাহ্ন, শেষ ভাগকে অপরাহ্ণ ও সায়াহ্ন বলে।

দিবা ও রাত্রি এ দুয়ে এক দিবস হয়, অর্থাৎ এক প্রভাত হইতে আর এক প্রভাত পর্যন্ত যে সময়, তাহাকে দিবস বলে। দিবসকে ষাটি ভাগ করিলে, ঐ এক এক ভাগকে এক এক দণ্ড বলে। আড়াই দণ্ডে এক হোরা বা ঘণ্টা; তিন ঘণ্টাতে অর্থাৎ সাড়ে সাত দণ্ডে এক প্রহর; আট প্রহরে এক দিবস; পনর দিবসে এক পক্ষ হয়। দুই পক্ষ; শুক্ল ও কৃষ্ণ। যে পক্ষে চন্দ্রের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহাকে শুক্লপক্ষ বলে। আর যে পক্ষে চন্দ্রের হ্রাস হইতে থাকে, তাহাকে কৃষ্ণপক্ষ বলে। দুই পক্ষে অর্থাৎ ত্রিশ দিনে এক মাস হয়। দুই মাসে এক ঋতু; সমুদয়ে ছয় ঋতু, সেই ছয় ঋতু এই; গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস গ্রীষ্ম ঋতু; আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুই মাস বর্ষা ঋতু; ভাদ্র ও আশ্বিন এই দুই মাস শরৎ ঋতু; কার্তিক ও অগ্রহায়ণ এই দুই মাস হেমন্ত ঋতু; পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস শীত ঋতু; ফাল্গুন ও চৈত্র এই দুই মাস বসন্ত ঋতু। ছয় ঋতুতে অর্থাৎ বার মাসে এক বৎসর হয়।

সচরাচর সকলে বলে ত্রিশ দিনে এক মাস হয়। কিন্তু সকল মাস সমান হয় না। কোনও মাস ঊনত্রিশ দিনে, কোনও মাস ত্রিশ দিনে, কোনওমাসএকত্রিশ দিনে, কোনও মাস বত্রিশ দিনে হয়। এই ন্যূনাধিক্য বশতঃ বৎসরে তিনশত পঁয়ষট্টি দিন হইয়া থাকে। সকল মাস ত্রিশ দিনে হইলে, তিন শত ষাটিদিনে বৎসর হইত। পূর্ব কালের লোকেরা তিন শত ষাটি দিনে বৎসরের গণনা করিতেন। সে অনুসারে, অদ্যাপি সামান্য লোকে তিন শত ষাটি দিনে বৎসর বলে। মাসের শেষ দিবসকে সংক্রান্তি বলে। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে বৎসর সমাপ্ত হয়। বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসেনূতন বৎসরের আরম্ভ হয়, চিরকালই বৎসরের পর বৎসর আসিতেছে ও যাইতেছে। এইরূপএক শত বৎসরে এক শতাব্দী হয়।

কোনও সুপ্রসিদ্ধ রাজার অধিকার, অথবা কোনও সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বন করিয়া বৎসরের গণনা আরব্ধ হইয়া থাকে। এইরূপে যে বৎসরের গণনা করা যায়, তাহাকে শাক বলে। আমাদের দেশে তিন শাক প্রচলিত; সংবৎ, শকাব্দাঃ ও সাল। বিক্রমাদিত্য নামে এক অতিপ্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন; তিনি যে শাক প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম সংবৎ। আর শালিবহন রাজা যে শাক প্রচলিত করেন, তাহার নাম শকাব্দাঃ। বিক্রমাদিত্যের ঊনবিংশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে, এক্ষণে বিংশ শতাব্দী চলিতেছে। শালিবাহনের অষ্টাদশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে, এক্ষণে ঊনবিংশ শতাব্দী চলিতেছে। মুসলমানেরা মহম্মদের মক্কা হইতে পলায়নের দিবস অবধি এক শাকের গণনা করেন, উহার নাম হিজিরা। ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ মোগল সম্রাট আকবর, হিজিরা

নামের পরিবর্তে ঐ শাককে ইলাহী নামে প্রতিষ্ঠিত করেন। উহাই বাঙ্গালাদেশে সাল নামে প্রচলিত হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের দেশে বিষয়কর্মে, সকল শাক অপেক্ষা সাল অধিক প্রচলিত। এই শাকের ত্রয়োদশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে, এক্ষণে চতুর্দশ শতাব্দী চলিতেছে। এইরূপ ইংরেজ, ফরাসি, জর্মন প্রভৃতি য়ুরোপীয় জাতিরা, যিশুখ্রীষ্টের জন্ম অবধি এক শাকের গণনা করেন; উহাকে খ্রীষ্টীয় শাক বলে। খ্রীষ্টীয় শাকের উনবিংশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে, এক্ষণে বিংশ শতাব্দী চলিতেছে।

গণনা—অঙ্ক

বস্তুর সংখ্যা করিবার ও মূল্য বলিবার নিমিত্ত, গণনা জানা অতিশয় আবশ্যক। সচরাচর সকলে কয়েকটি কথা দ্বারা গণনা করিয়া থাকে। যথা—এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ ইত্যাদি। কিন্তু যখন পুস্তকে অথবা অন্য কোনও স্থানে, কেহ কোনও বস্তুর সংখ্যাপাত করে, তখন সে ব্যক্তি এক, দুই ইত্যাদি শব্দ না লিখিয়া উহাদের স্থলে ১, ২ প্রভৃতি অঙ্কপাত করে। ঐ ঐ অঙ্ক দ্বারা সেই সেই শব্দের কার্য নিষ্পন্ন হয়।

অঙ্ক সমুদয়ে দশটি মাত্র। উহাদের আকার ও নাম এই—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	০
এক	দুই	তিন	চার	পাঁচ	ছয়	সাত	আট	নয়	শূন্য

যেমন, বর্ণমালার কয়েকটি অক্ষরের পরস্পর যোজনা দ্বারা, সকল বিষয় লিখিতে পারা যায়; সেইরূপ, কেবল এই কয়টি অক্ষরের পরস্পর যোগে, কি ছোট কি বড়, সকল সংখ্যাই লিখা যায়।

অন্তিম ০ অঙ্ককে শূন্য বলে, অর্থাৎ উহা কিছুই নয়। অন্য নয়টি অঙ্কের আশ্রয় ব্যতিরেকে, কেবল উহা দ্বারা কোনও সংখ্যার বোধ হয় না। কিন্তু, ১ এই অঙ্কের পর বসাইলে, অর্থাৎ এইরূপ ১০ লিখিলে দশ হয়; ২ এই অঙ্কের পর বসাইলে, ২০ কুড়ি হয়; ৩ এই অঙ্কের পর, ৩০ ত্রিশ; ৪ এই অঙ্কের পর, ৪০ চল্লিশ; ৫ এই অঙ্কের পর, ৫০ পঞ্চাশ ইত্যাদি। যদি ১ এই অঙ্কের পর দুই শূন্য বসান যায়, অর্থাৎ এইরূপ ১০০ লিখা যায়, তবে তাহাতে এক শত বুঝায়। ১ লিখিয়া তিন শূন্য বসাইলে, অর্থাৎ এইরূপ ১০০০ লিখিলে, সহস্র বুঝায়।

১, ৩, ৫, ৭, ৯ ইত্যাদি অঙ্ককে বিষম অঙ্ক বলে। আর, ২, ৪, ৬, ৮, ১০ ইত্যাদি অঙ্ককে সম অঙ্ক বলে।

অঙ্ক দ্বারা যখন কেবল সংখ্যার বোধ হয়, তখন উহাদিগকে সংখ্যাবাচক বলে। সংখ্যাবাচক শব্দের নাম ও আকার নিম্নে দর্শিত হইতেছে।

১ এক
২ দুই
৩ তিন
৪ চার
৫ পাঁচ
৬ ছয
৭ সাত
৮ আট
৯ নয
১০ দশ
১১ এগাব
১২ বার
১৩ তেব
১৪ চৌদ্দ
১৫ পনর
১৬ ষোল
১৭ সতর
১৮ আঠাব
১৯ উনিশ
২০ কুড়ি, বিশ
২১ একুশ
২২ বাইশ
২৩ তেইশ
২৪ চব্বিশ
২৫ পঁচিশ
২৬ ছাব্বিশ
২৭ সাতাশ
২৮ আটাশ
২৯ উনত্রিশ
৩০ ত্রিশ
৩১ একত্রিশ

৩২ বত্রিশ
৩৩ তেত্রিশ
৩৪ চৌত্রিশ
৩৫ পঁয়ত্রিশ
৩৬ ছত্রিশ
৩৭ সাঁইত্রিশ
৩৭ আটত্রিশ
৩৯ উনচল্লিশ
৪০ চল্লিশ
৪১ একচল্লিশ
৪২ বিযাল্লিশ
৪৩ তিতাল্লিশ
৪৪ চুযাল্লিশ
৪৫ পঁযতাল্লিশ
৪৬ ছচল্লিশ
৪৭ সাতচল্লিশ
৪৮ আটচল্লিশ
৪৯ উনপঞ্চাশ
৫০ পঞ্চাশ
৫১ একান্ন
৫২ বায়ান্ন
৫৩ তিপ্পান্ন
৫৪ চুযান্ন
৫৫ পঞ্চান্ন
৫৬ ছাপ্পান্ন
৫৭ সাতান্ন
৫৮ আটান্ন
৫৯ উনষাটি
৬০ ষাটি
৬১ একষট্টি
৬২ বাষট্টি

৬৩ তেষট্টি
৬৪ চৌষট্টি
৬৫ পঁযষট্টি
৬৬ ছষট্টি
৬৭ সাতষট্টি
৬৮ আটষট্টি
৬৯ উনসত্তর
৭০ সত্তর
৭১ একাত্তর
৭২ বাযাত্তব
৭৩ তিযাত্তর
৭৪ চুযাত্তর
৭৫ পঁচাত্তব
৭৬ ছিযাত্তব
৭৭ সাতাত্তর
৭৮ আটাত্তর
৭৯ উনআশি
৮০ আশি
৮১ একাশি
৮২ বিবাশি
৮৩ তিবাশি
৮৪ চুরাশি
৮৫ পঁচাশি
৮৬ ছিযাশি
৮৭ সাতাশি
৮৮ অষ্টাশি
৮৯ উননব্বই
৯০ নব্বই
৯১ একনব্বই
৯২ বিবনব্বই
৯৩ তিরনব্বই

৯৪ চুরনব্বই	৯৮ আটনব্বই	১০০০০ অযুত
৯৫ পঁচনব্বই	৯৯ নিরনব্বই	১০০০০০ লক্ষ
৯৬ ছিয়নব্বই	১০০ শত	১০০০০০০ নিযুত
৯৭ সাতনব্বই	১০০০ সহস্র	১০০০০০০০ কোটি

দশ শতে এক সহস্র, দশ সহস্রে এক অযুত, দশ অযুতে এক লক্ষ, দশ লক্ষে এক নিযুত, দশ নিযুতে এক কোটী হয়। ইহা ভিন্ন অর্বুদ, বৃন্দ, খর্ব প্রভৃতি আরও কতকগুলি সংখ্যা আছে সে সকলের সচরাচর ব্যবহার নাই।

১, ২, ৩, ৪, ৫, ইত্যাদি অঙ্ক যেমন এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ ইত্যাদি যেমন সংখ্যার বাচক হয়, সেইরূপ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ইত্যাদি পূরণের বাচক হইয়া থাকে। যাহা দ্বারা কোনও সংখ্যা পূর্ণ হয়, তাহাকে ঐ সংখ্যার পূরণ বলে। যে অঙ্ক দ্বারা সেই পূরণের বোধ হয়, তাহাকে পূরণবাচক বলে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ইত্যাদি পূরণবাচক শব্দ। যদি দুই রেখা।। লিখা যায়, তবে শেষেরটিকে দ্বিতীয়, অর্থাৎ দুই সংখ্যার পূরণ বলিতে হইবে, আর আগেরটিকে প্রথম; কারণ, শেষের রেখাটি না লিখিলে দুই সংখ্যা পূর্ণ হয় না; আর আগের রেখাটি না থাকিলে, এক সংখ্যা সম্পন্ন হয় না। এইরূপ তিন রেখা।।। লিখিলে শেষেরটিকে তৃতীয়, অর্থাৎ তিন সংখ্যার পূরণ বলিতে হইবে; কারণ, শেষের রেখাটি না থাকিলে, তিন সংখ্যা পূর্ণ হয় না। চারি রেখা।।।। লিখিলে, শেষেরটিকে চতুর্থ রেখা, পাঁচ রেখা।।।।। লিখিলে, শেষেরটিকে পঞ্চম রেখা বলা যায়; কারণ, শেষের দুই রেখা না থাকিলে, চারি ও পাঁচ সংখ্যা পূর্ণ হয় না।

১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি অঙ্ক যখন পূরণ অর্থে লিখিত হয়, তখন ঐ ঐ অঙ্কের শেষে প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি পূরণবাচক শব্দের শেষ অক্ষর যোগ করিয়া দেওয়া উচিত; তাহা হইলে অর্থবোধের কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না; যেমন, ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ইত্যাদি। এইরূপ অঙ্কের শেষে ম প্রভৃতি অক্ষর যোজিত থাকিলে, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বুঝাইবে। ঐ ঐ অক্ষরের যোগ না থাকিলে, এক, দুই, তিন, চারি; কি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ; ইহার স্পষ্ট বোধ হওয়া দুর্ঘট। যদি কেহ এরূপ লিখে, "আমি চৈত্র মাসের ৩ দিবসে এই কর্ম করিয়াছিলাম," তাহা হইলে তিন দিবসে ইহা নিশ্চিত বুঝা যাইবে না; কেহ এরূপ বুঝিবে, ঐ কর্ম করিতে তিন দিবস লাগিয়াছিল; কেহ বোধ করিবে, মাসের তৃতীয় দিবসে ঐ কর্ম করা হইয়াছিল। ফলতঃ, যে লিখিয়াছিল, তাহার অভিপ্রায় কি, ইহার নির্ণয় হওয়া কঠিন। কিন্তু ৩ এই অঙ্কের পর যদি য় এই অক্ষরের যোগ থাকে, তবে আর কোনও সংশয় থাকে না, কেবল তৃতীয় বুঝাইবে।

পূরণবাচক অঙ্ক লিখিবার ধারা

প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ
১ম	২য়	৩য়	৪র্থ
পঞ্চম	ষষ্ঠ	সপ্তম	অষ্টম
৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম
নবম	দশম	একাদশ	দ্বাদশ
৯ম	১০ম	১১শ	১২শ
ত্রয়োদশ	চতুর্দশ	পঞ্চদশ	ষোড়শ
১৩শ	১৪শ	১৫শ	১৬শ
সপ্তদশ	অষ্টাদশ	ঊনবিংশ	বিংশ
১৭শ	১৮শ	১৯শ	২০শ
একবিংশ	দ্বাবিংশ	ত্রয়োবিংশ	চতুর্বিংশ
২১শ	২২শ	২৩শ	২৪শ
পঞ্চবিংশ	ষড়্‌বিংশ	সপ্তবিংশ	অষ্টাবিংশ
২৫শ	২৬শ	২৭শ	২৮শ
ঊনত্রিংশ	ত্রিংশ	একত্রিংশ	দ্বাত্রিংশ
২৯শ	৩০শ	৩১শ	৩২শ

মাসের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি দিবস বুঝাইতে হইলে ১, ২, ইত্যাদি অঙ্কের পর, পহিলা, দোসরা, তেসরা ইত্যাদি শব্দের শেষ অক্ষর যোগ করা আবশ্যক। যথা,

পহিলা	দোসরা	তেসরা	চৌঠা
১লা	২রা	৩রা	৪ঠা
পাঁচই	ছয়ই	সাতই	আটই
৫ই	৬ই	৭ই	৮ই
নয়ই	দশই	এগারই	বারই
৯ই	১০ই	১১ই	১২ই
তেরই	চৌদ্দই	পনরই	ষোলই
১৩ই	১৪ই	১৫ই	১৬ই
সতরই	আঠারই	উনিশে	বিশে
১৭ই	১৮ই	১৯শে	২০শে
একুশে *	বাইশে	তেইশে	চব্বিশে
২১শে	২২শে	২৩শে	২৪শে

পঁচিশে	ছাব্বিশে	সাতাশে	আটাশে
২৫শে	২৬শে	২৭শে	২৮শে
উনত্রিশে	ত্রিশে	একত্রিশে	বত্রিশে
২৯শে	৩০শে	৩১শে	৩২শে

বর্ণ

নানা বর্ণের বস্তু দেখিলে নয়নের যেরূপ প্রীতি জন্মে, সর্বদা এক বর্ণের বস্তু দেখিলে সেরূপ হয় না, বরং বিরক্তি জন্মে। এজন্য জগতের যাবতীয় পদার্থ এক বর্ণের না হইয়া, নানা বর্ণের হইয়াছে। সকল বর্ণ অপেক্ষা, হরিত বর্ণ অধিক মনোরম ও অধিকক্ষণ দেখিতে পারা যায়; এজন্য জগতে অন্য বর্ণের বস্তু অপেক্ষা, হরিত বর্ণের বস্তুই অধিক।

কি স্বাভাবিক, কি কৃত্রিম, সকল পদার্থের নানাবিধ বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যেখানে যত বর্ণ আছে, সকলই তিনটি মাত্র মূল বর্ণ হইতে উৎপন্ন। সেই তিন মূল বর্ণ এই; নীল, পীত, লোহিত। এই তিন মূল বর্ণকে যত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে মিশ্রিত করা যায়, তত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ উৎপন্ন হয়। ঐ সকল উৎপন্ন বর্ণকে মিশ্র বর্ণ বলে। মিশ্র বর্ণের মধ্যে হরিত, পাটল, ধূমল এই তিনটি প্রধান। তদ্ভিন্ন কপিশ, ধূসর, পিঙ্গল ইত্যাদি নানা মিশ্র বর্ণ আছে; সে সকল ঐ তিন মূল বর্ণের মিশ্রণে উৎপন্ন হয়।

কৃষ্ণ, সচরাচর বর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু কৃষ্ণ, বর্ণ নহে। অমুক বস্তু কৃষ্ণ, ইহা বলিলে সেই বস্তুতে সর্ব বর্ণের অসদ্ভাব, অর্থাৎ কোনও বর্ণ নাই, ইহাই প্রতীয়মান হইবে। শুক্ল বর্ণে সকল প্রকার মূল বর্ণই বিদ্যমান থাকে। মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের রশ্মি শ্বেতবর্ণ। এই রশ্মি, ঝাড়ের কলম অথবা তদনুরূপ অন্য কোন কাচখণ্ডের ভিতর দিয়া যাইলে, বাহির হওয়ার পর আর শুক্লবর্ণ থাকে না। তখন এই রশ্মিকে শুভ্র বস্ত্রের উপর ধরিলে, লোহিত, পাটল, পীত, হরিত, নীল, ধূমল ও ভায়লেট এই সাতটি বর্ণ পরে পরে দেখিতে পাওয়া যায়।

কখনও কখনও গগনমণ্ডলে, ধনুকের মত নানাবর্ণের অতি সুন্দর যে বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, লোকে তাহাকে রামধনু বলে। ঝাড়ের কলমের মত বৃষ্টি কালীন জলবিন্দু-সমূহে সূর্যের কিরণ পড়িয়া, এরূপ লোহিত, পাটল, পীত প্রভৃতি সাত বর্ণের পরম সুন্দর ধনুকের আকার উৎপন্ন হয়। সূর্যের বিপরীত দিকে রামধনুর উদয় হইয়া থাকে।

বস্তুর আকার পরিমাণ

সকল বস্তুরই আকার ভিন্ন ভিন্ন। কোনও কোনও বস্তু বড়, কোনও কোনও বস্তু ছোট। ঘটী অপেক্ষা কলসী বড়; বিড়াল অপেক্ষা গরু বড়; শিশু অপেক্ষা যুবা বড়। সকল বস্তুরই আকারে দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বেধ, এই তিন গুণ আছে। বস্তুর লম্বা দিকের পরিমাণকে দৈর্ঘ্য, দুই পার্শ্বের পরিমাণকে বিস্তার, দুই পৃষ্ঠের পরিমাণকে বেধ বলে। পুস্তকের উপরিভাগ হইতে নিম্নভাগ পর্যন্ত যে পরিমাণ, তাহার নাম দৈর্ঘ্য; এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্যন্ত যে পরিমাণ, তাহার নাম বিস্তার; এক পৃষ্ঠ হইতে অপর পৃষ্ঠ পর্যন্ত যে পরিমাণ, তাহার নাম বেধ।

বস্তুর দৈর্ঘ্য মাপা যাইতে পারে। আমরা কাপড়ের দৈর্ঘ্য মাপিতে পারি। এক স্থান হইতে আর এক স্থান কত দূর, তাহাও মাপা যায়। আমরা হস্ত দ্বারা সকল বস্তু মাপিয়া থাকি। কনুই অবধি মধ্যম অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত এক হাত। সকলের হাত সমান নহে। এ নিমিত্ত হাতের নিরূপিত পরিমাণ আছে। ৮ যবোদরে এক এক অঙ্গুল ২৪ অঙ্গুলে ১ হাত। যবোদর শব্দে যবের মধ্য ভাগ। আটটি যব সারি সারি রাখিলে, উহাদের মধ্যভাগের যে পরিমাণ, তাহাকে অঙ্গুল বলে। এরূপ ২৪ অঙ্গুলে, অর্থাৎ ১৯২ যবোদরে এক হাত হয়। ৪ হাতে ১ ধনু; ২০০০ ধনুতে অর্থাৎ ৮০০০ হাতে ১ ক্রোশ হয়; ৪ ক্রোশে ১ যোজন।

লোকে বস্তুর দৈর্ঘ্য যেরূপে মাপে, বস্তুর উচ্চতাও সেইরূপে মাপা যায়। আমরা দেওয়াল, খুঁটি, কপাট, গাছ ইত্যাদির উচ্চতা মাপিতে পারি। বস্তুর উপরের দিকের যে দৈর্ঘ্য, তাহাকে উচ্চতা বলে। বস্তুর নীচের দিকের যে দৈর্ঘ্য, তাহার নাম গভীরতা। দৈর্ঘ্য যেরূপে মাপা যায়, গভীরতাও সেইরূপে মাপা যাইতে পারে। কোনও কোনও কূপের গভীরতা ১০, ১২ হাত; কোনও পুষ্করিণীর গভীরতা ২০, ২৫ হাত। কোনও কোনও বস্তু, কোনও কোনও বস্তু অপেক্ষা অধিক ভারী। ক্ষুদ্র পুস্তক অপেক্ষা বৃহৎ পুস্তক অধিক ভারী। সমান আকারের এক খণ্ড কাষ্ঠ অপেক্ষা এক খণ্ড লৌহ অধিক ভারী। অনেক বস্তু ওজনে বিক্রীত হয়। বস্তুর ভারের পরিমাণকে ওজন কহে। সেই পরিমাণ এই—

১ টাকার যত ভার, তাহা ১ তোলা;

৫ তোলায়	১ ছটাক,
৪ ছটাকে	১ পোয়া;
৪ পোয়ায়	১ সের;
৪০ সেরে	১ মণ।

ধাতু

আমরা সর্বদা যে সকল বস্তু ব্যবহার করি, উহাদের অধিকাংশই ধাতু। থালা, ঘটী, বাটী, গাড়ু, পিলসুজ, ছুরি, কাঁচি, ছুঁচ ইত্যাদি বস্তু ও নানাবিধ অলঙ্কার, এ সমুদয় ধাতুনির্মিত।

অন্য অন্য বস্তু অপেক্ষা, ধাতুর ভার অধিক। অধিকাংশ ধাতু কঠিন, ঘা মারিলে সহসা ভাঙ্গে না। ধাতু আগুনে গলান যায়। প্রায় সকল ধাতুকে পিটিয়া, অতি পাতলা সরু তার প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কোনও কোনও ধাতু এমন ভারসহ যে, সরু তারে ভারী বস্তু ঝুলাইলেও ছিঁড়িয়া পড়ে না।

ধাতু আকরে পাওয়া যায়। আকরে বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র দুই প্রকার ধাতু থাকে। ধাতু যখন স্বভাবতঃ নির্দোষ হয়, তখন উহাকে বিশুদ্ধ বলা যায়, আর যখন অন্য অন্য বস্তুর সহিত মিশ্রিত থাকে, তখন উহাকে বিমিশ্র বলে। স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ, সীস, তাম্র, লৌহ, রঙ্গ, দস্তা, এই আটটি প্রধান ধাতু।

স্বর্ণ

গলাইলে স্বর্ণের ভার কমিয়া যায় না ও ব্যত্যয় হয় না; এজন্য স্বর্ণকে উৎকৃষ্ট ধাতু বলে। স্বর্ণ জল অপেক্ষা উনিশগুণ ভারী। সর্ষপ প্রমাণ স্বর্ণকে পিটিয়া দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে নয় অঙ্গুল পাত প্রস্তুত করা যাইতে পারে; এবং ঐ পরিমাণের স্বর্ণে ২৩৫ হাত তার প্রস্তুত হইতে পারে। স্বর্ণ এমন ভারসহ যে, এক যবোদরের মত স্থূল তারে ৫ মণ ৩৪ সের ভার ঝুলাইলেও ছিঁড়িয়া পড়ে না।

স্বর্ণ স্বভাবতঃ অতিশয় উজ্জ্বল, দেখিতে অতি সুন্দর, মলিন হয় না, এজন্য লোকে উহাতে অলঙ্কার গড়ায়। স্বর্ণের মূল্য প্রায় সকল ধাতু অপেক্ষা অধিক। এ দেশে স্বর্ণে যে মুদ্রা প্রস্তুত হয়, তাহাকে মোহর বলে। ইংলণ্ডে সচরাচর যে স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার নাম সভরিন্; ইহাকেই এদেশের লোকে গিনি বলিয়া থাকে।

বিশুদ্ধ স্বর্ণের বর্ণ কাঁচা হরিদ্রার মত। বিশুদ্ধ স্বর্ণ অপেক্ষাকৃত নরম; এজন্য সচরাচর উহাতে ব্যবহারোপযোগী কোনও দ্রব্য প্রস্তুত হয় না। ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে, উহার সহিত অল্প তামা ও রূপা মিশ্রিত করিয়া দৃঢ় করিয়া লইতে হয়। এইরূপ তামা ও রূপা মিশ্রিত করাকে খাদ দেওয়া বলে।

পৃথিবীর প্রায় সকল প্রদেশেই স্বর্ণের আকর আছে; কিন্তু কালিফর্ণিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ও য়ুরাল পর্বতেই অধিক।

রৌপ্য

রৌপ্য, জল অপেক্ষা প্রায় এগার গুণ ভারী। রৌপ্য শুক্ল ও উজ্জ্বল। স্বর্ণে যেরূপ পাতলা পাতলা পাত ও সরু তার হয়, ইহাতেও প্রায় সেইরূপ হইতে পারে। রৌপ্য এমন ভারসহ যে, এক যবোদরের মত স্থূল তারে ৪ মণ ১১ সের ভার ঝুলাইলেও ছিঁড়িয়া পড়ে না।

পৃথিবীর প্রায় সকল প্রদেশেই রৌপ্যের আকর আছে; কিন্তু আমেরিকা দেশে সর্বাপেক্ষা অধিক।

রূপাতে টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি নির্মিত হয়। রূপাতে নানাবিধ অলঙ্কার গড়ায়, এবং ঘটী, বাটী প্রভৃতিও নির্মিত হইয়া থাকে।

পারদ

পারদ, রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র ও উজ্জ্বল। এই ধাতু জল অপেক্ষা প্রায় চৌদ্দগুণ ভারী। ইহা আর আব ধাতুর মতন কঠিন নহে, জলের ন্যায় তরল; যাবতীয় তবল দ্রব্য অপেক্ষা অধিক ভারী; সর্বদা দ্রব অবস্থায় থাকে; কিন্তু মেরুসন্নিহিত দেশে লইয়া গেলে জমিয়া যায়। তখন অন্য অন্য ধাতুব ন্যায় ইহাতেও সরু তার ও পাতলা পাত প্রস্তুত হইতে পারে; এবং ঘা মারিলে ইহা সহসা ভাঙ্গিয়া যায় না।

স্পর্শ করিলে, পারদ স্বভাবতঃ সমস্ত তরল দ্রব্য অপেক্ষা শীতল বোধ হয়; কিন্তু অগ্নির উত্তাপ দিলে, সহজেই উষ্ণ হইয়া উঠে। পারদকে অনায়াসেই অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ঐ সকল খণ্ড গোলাকার হয়।

ভারতবর্ষ, চীন, তিব্বত, সিংহল, জাপান, স্পেন, অষ্ট্রিয়া, বাভেবিয়া, পেরু, মেক্সিকো এই সকল দেশে পারদের আকর আছে।

সীস

সীস, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু অপেক্ষা নরম; জল অপেক্ষা এগারগুণ ভারী। সীসের ভার, রৌপ্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। ইহা অল্প উত্তাপে গলে; কিন্তু অধিক উত্তাপ দিলে উড়িয়া যায়। জল বা অনাবৃত স্থলে ফেলিয়া রাখিলে, সীসের অধিক ভাব পরিবর্তন হয় না, উপরের উজ্জ্বলতা মাত্র নষ্ট হইয়া যায়।

ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড, জর্মনি, ফ্রান্স ও আমেরিকা এই সকল দেশে অপর্যাপ্ত সীস পাওয়া যায়। হিমালয় পর্বত ও তিব্বত দেশেও সীসের আকর আছে।

সীসেগোলা-গুলি নির্মিত হয়। কিছু শক্ত ও উত্তমরূপে গোলাকার করিবার নিমিত্ত,

ইহাতে হরিতাল মিশ্রিত করে। রসাঞ্জন ও রঙ্গ মিশ্রিত করিলে, সীসে ছাপিবার অক্ষর নির্মিত হয়।
সীস কাগজের উপর টানিলে, ধূসরবর্ণ রেখা পড়ে। লোকের সংস্কার আছে, সীসে পেন্সিল প্রস্তুত হয়, বাস্তবিক তাহা নহে; উহা গ্রাফাইট বা কৃষ্ণসীস নামে একরূপ অঙ্গারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই কৃষ্ণসীস আমেরিকা, জর্মনি প্রভৃতি দেশে আকরে পাওয়া যায়।

তাম্র

এই ধাতু জল অপেক্ষা আটগুণ ভারী। ইহা লালবর্ণ, উজ্জ্বল, দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাকে পিটিয়া যেমন পাত করা যায়, তার তেমন হয় না। তাম্র, সকল ধাতু অপেক্ষা অধিক গভীর শব্দজনক; লৌহ অপেক্ষা অনেক সহজে গলান যায়। এক যবোদরের মত স্থূল তারে ৩ মণ ১৫ সের ভার ঝুলাইলেও ছিঁড়িয়া যায় না।
তাম্রে পয়সা প্রস্তুত হয়। অনেকে তামাতে পাকস্থালী, জলপাত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করে।
সুইডেন, সাক্সনি, গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, পেরু, মেক্সিকো, চীন, জাপান, নেপাল, আগ্রা, আজমীর প্রভৃতি দেশে তাম্রের আকর আছে।

লৌহ

লৌহ, সকল ধাতু অপেক্ষা অধিক কার্যোপযোগী; এই ধাতুতে লাঙ্গলের ফাল, কোদাল, কাস্তিয়া প্রভৃতি কৃষিকার্যের যন্ত্র সকল নির্মিত হয়। কুড়াল, খন্তা, কাটারি, চাবি, কুলুপ, শিকল, পেরেক, হাতা. বেড়ি, কড়া, হাতুড়ি ইত্যাদি সকল বস্তু সর্বদা প্রয়োজনে লাগে, সে সমুদয় লৌহে নির্মিত হইয়া থাকে।
লৌহ, জল অপেক্ষা সাত আট গুণ ভারী; লোহাতে মানুষের চুলের সমান সরু তার হইতে পারে। ইহা সকল প্রধান ধাতু অপেক্ষা অধিক ভারসহ; এক যবোদরের মত স্থূল তারে ৬ মণ ১৭ সের ভারী বস্তু ঝুলাইলেও ছিঁড়িয়া যায় না।
এক সের লৌহের সহিত ন্যূনাধিক এক তোলা অঙ্গার মিশ্রিত করিলে, ইস্পাত প্রস্তুত হয়। ইস্পাতকে উত্তাপ দ্বারা লোহিতবর্ণ করিয়া শীতল জলে ডুবাইলে উহা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। ছুরি, কাঁচি, তরবারি প্রভৃতি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র ইস্পাতে নির্মিত হইয়া থাকে।
লৌহ, সকল ধাতু অপেক্ষা অধিক পাওয়া যায়, এবং সকল দেশেই ইহার আকর আছে। কিন্তু ইংলণ্ড, ফ্রান্স, সুইডেন, রুষিয়া এই কয় দেশে কিছু অধিক।

রঙ্গ

রঙ্গ, অর্থাৎ রাঙ শুক্লবর্ণ ও উজ্জ্বল; জল অপেক্ষা সাতগুণ ভারী; রূপা অপেক্ষা নরম; সীস অপেক্ষা কঠিন।

ইংলণ্ড, জর্মনি, চিলি, মেক্সিকো, বঙ্গদ্বীপ এই কয় স্থানে সর্বাপেক্ষা অধিক রঙ্গ জন্মে। রঙ্গের ইংরেজী নাম টিন। লৌহের পাতে রঙ্গের কলাই করিলে, উহা দেখিতে সুন্দর হয়; এবং শীঘ্র মরিচা ধরিয়া নষ্ট হয় না। এই পাতে বাক্স, পেটারা, কৌটা প্রভৃতি অনেক দ্রব্য নির্মিত হয়। উহাদিগকেই আমরা সচরাচর টিনের বাক্স, টিনের পেটারা ইত্যাদি বলিয়া থাকি।

দুই ভাগ রাঙ ও সাত ভাগ তামা মিশ্রিত করিলে, উত্তম কাঁসা প্রস্তুত হয়। কাঁসায় ঘটী, বাটী, গেলাস ইত্যাদি নানা বস্তু প্রস্তুত করে।

পারা ও রাঙ মিশ্রিত হইয়া কাচের পশ্চাদ্ভাগে লাগিয়া থাকিলে, ঐ কাচে উত্তম প্রতিবিম্ব পড়ে। ঐরূপ কাচকে দর্পণ বলে। লোকে দর্পণে মুখ দেখে। কখনও কখনও, পারদ ও রঙ্গের পরিবর্তে রৌপ্যও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দস্তা

দস্তা, রাঙ অপেক্ষা কোমল এবং সীস অপেক্ষা কঠিন। এই ধাতু জল অপেক্ষা সাত গুণ ভারী; পূর্বোক্ত সকল ধাতু অপেক্ষা লঘু; দেখিতে উজ্জ্বল ও নীলের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। দস্তা, সীসের ন্যায় জলে নষ্ট নয় না, অথচ সীস অপেক্ষা লঘু। এজন্য ছাদের নল প্রভৃতি দস্তাতে গঠিত হয়। লৌহের পাতে দস্তার কলাই করিয়া, লোকে বালতি, গৃহের ছাদ ইত্যাদি নির্মিত করিয়া থাকে।

তিন ভাগ দস্তা ও চারি ভাগ তামা মিশ্রিত করিলে পিতল হয়। তামায় যত শীঘ্র মরিচা ধরে, পিতলে তত শীঘ্র ধরে না। কলসী, গাড়ু, পিলসুজ প্রভৃতি বস্তু পিতলে প্রস্তুত হয়।

ক্রয়—বিক্রয়—মুদ্রা

যাহাদের যে বস্তু অধিক থাকে, তাহারা সে বস্তু আপনাদের আবশ্যক মত রাখিয়া, অতিরিক্ত অংশ বেচিয়া ফেলে। আর যাহাদের যে বস্তুর অপ্রতুল থাকে, তাহারা সেই বস্তু অন্য লোকের নিকট হইতে কিনিয়া লয়। লোকে মুদ্রা দিয়া আবশ্যক বস্তু কিনিয়া থাকে। যদি মুদ্রা চলিত না থাকিত, তাহা হইলে নিজের কোনও বস্তুর সহিত বিনিময়

করিয়া, অন্যের নিকট হইতে আবশ্যক বস্তু লইতে হইত। কিন্তু তাহাতে অনেক অসু-বিধা ঘটিত।

কোনও বস্তু কিনিতে হইলে যত মুদ্রা দিতে হয়, উহাকে ঐ বস্তুর মূল্য বলে। বস্তুর মূল্য সকল সময়ে সমান থাকে না ; কখনও অধিক হয়, কখনও অল্প হয়। যখন যে বস্তু অধিক মূল্যে কিনিতে হয়, তখন তাহাকে মহার্ঘ বা অক্রেয় বলে। আর যখন যে বস্তু অল্প মূল্যে কিনিতে পাওয়া যায়, তখন তাহাকে সুলভ বা সস্তা বলে।

মুদ্রা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাতুখণ্ড। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, এই ত্রিবিধ ধাতুতে মুদ্রা নির্মিত হয়। এই সকল ধাতু দুষ্প্রাপ্য ; এ নিমিত্ত ইহাতে মুদ্রা প্রস্তুত করে। দেশের রাজা ভিন্ন, আর কোনও ব্যক্তির মুদ্রা প্রস্তুত করিবার অধিকার নাই। রাজাও স্বহস্তে মুদ্রা প্রস্তুত করেন না। মুদ্রা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত লোক নিযুক্ত করা থাকে। রাজা, স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রের যোগাড় করিয়া দেন ; নিযুক্ত ভৃত্যেরা তাহাতে মুদ্রা প্রস্তুত করে। যে স্থানে মুদ্রা প্রস্তুত হয়, ঐ স্থানকে টাকশাল বলে। কলিকাতা ও বোম্বাই নগরে টাকশাল আছে।

টাকশালের লোকেরা হস্ত দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত করে না। মুদ্রা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, তথায় নানাবিধ কল আছে। টাকার উপর যে মুখ ও যে সকল অক্ষর মুদ্রিত থাকে, তাহা ঐ কলে প্রস্তুত হয় ; ঐ মুখ, ঐ অক্ষর, হস্ত দ্বারা নির্মিত হইলে তত পরিষ্কৃত হইত না। কোন্ রাজার অধিকারে, কোন্ বৎসরে, ঐ মুদ্রা প্রস্তুত ও প্রচলিত হইল, এবং ঐ মুদ্রার মূল্য কত, ঐ সকল অক্ষরে এই সমুদয় লিখিত থাকে। আর ঐ মুখও রাজার মুখের প্রতিকৃতি।

সকল দেশেই নানাবিধ মুদ্রা প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে যে সকল মুদ্রা প্রচলিত, তন্মধ্যে পয়সা তাম্রনির্মিত ; টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি রৌপ্যনির্মিত। আর ঐরূপ টাকা, আধুলি, সিকি স্বর্ণনির্মিতও আছে। স্বর্ণনির্মিত টাকাকে সুবর্ণ ও মোহর বলে।

৪ পয়সায়	১ আনা ,
৮ পয়সায়	১ দু আনি ;
৪ আনায়	১ সিকি ;
৮ আনায়	১ আধুলি ;
১৬ আনায়	১ টাকা।

সিকি পয়সা অপেক্ষা অনেক ছোট, কিন্তু এক সিকির মূল্য ১৬ পয়সা ; ইহার কারণ এই যে, রৌপ্য তাম্র অপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য ; এজন্য রৌপ্যের মূল্য তাম্র অপেক্ষা এত অধিক। স্বর্ণ সর্বাপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য ; এজন্য স্বর্ণের মূল্য সর্বাপেক্ষা অধিক। পূর্বে এক মোহরের মূল্য

১৬ টাকা অথবা ১০২৪ পয়সা ছিল ; কিন্তু এক্ষণে উহার মূল্য তদপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছে। যদি রৌপ্য ও স্বর্ণের মুদ্রা এত দুষ্প্রাপ্য না হইত, সকলে অনায়াসে পাইতে পারিত, তাহা হইলে মুদ্রার এত গৌরব হইত না। দুষ্প্রাপ্য হওয়াতেই উহার এত মূল্য ও এত গৌরব হইয়াছে।

হীরক

যত প্রকার উৎকৃষ্ট প্রস্তর আছে, হীরকের জ্যোতি সর্বাপেক্ষা অধিক। হীরক আকরে জন্মে। পৃথিবীর সকল প্রদেশে হীরকের আকর নাই। ভারতবর্ষে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে গোলকুণ্ডা প্রভৃতি কতিপয় স্থানে, দক্ষিণ আমেরিকার অন্তঃপাতী ব্রেজীল রাজ্যে, রুষিয়ার অন্তর্বর্তী যুরাল পর্বতে, এবং আফ্রিকার দক্ষিণ বিভাগে হীরকের আকর আছে। আকর হইতে তুলিবার সময় হীরা অতিশয় মলিন থাকে, পরে পরিষ্কৃত করিয়া লয়।

এ পর্যন্ত যত বস্তু জানা গিয়াছে, হীরা সকল অপেক্ষা কঠিন। হীরার গুঁড়া ব্যতিরেকে, আর কিছুতেই উহা পরিষ্কৃত করিতে পারা যায় না। বিশুদ্ধ হীরক অতি পরিষ্কৃত জলের ন্যায় নির্মল। ঐরূপ হীরাই অতি সুন্দর ও প্রশংসনীয়। তদ্ভিন্ন, রক্ত, পীত, নীল, হরিত প্রভৃতি নানা বর্ণের হীরা আছে। বর্ণ যত গাঢ় হয়, হীরার মূল্য তত অধিক হয়, কিন্তু বিশুদ্ধ নির্মল হীরাই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও মহামূল্য। আকার বর্ণ ও নির্মলতা অনুসারে মূল্যের তারতম্য হয়।

হীরার মূল্য এত অধিক যে, শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। পোর্টুগালের রাজার নিকট এক হীরা আছে, তাহার মূল্য ৫,৬৪, ৪৮০০০ পাঁচ কোটি চৌষট্টি লক্ষ, আটচল্লিশ সহস্র টাকা। আমাদের দেশে কোহিনুর নামে এক উৎকৃষ্ট হীরা ছিল। সচরাচর সকলে বলে, উহার মূল্য ৩,৫০,০০০০০ তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। এক্ষণে এই মহামূল্য হীরা ইংলণ্ডে আছে।

হীরকের ন্যায়, নীলকান্ত, পদ্মরাগ, মরকত প্রভৃতি আরও বহুবিধ মহামূল্য প্রস্তর আছে। শোভা ও মূল্য বিষয়ে, উহারা হীরক অপেক্ষা অনেক ন্যূন। পদ্মরাগ সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ ও সৌষ্ঠবযুক্ত হইলে, হীরকের অপেক্ষাও মূল্যবান্ হয়, তবে এইরূপ পদ্মরাগ অতি বিরল। হীরক, নীলকান্ত, পদ্মরাগ, মরকত প্রভৃতি মহামূল্য প্রস্তর সকলকে মণি ও রত্ন বলে।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে হীরা অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। ঔজ্জ্বল্য ব্যতিরিক্ত উহার আর কোনও গুণ নাই, কাচ কাটা বই, আর কোনও বিশেষ প্রয়োজনে আইসে না।

এরূপ প্রস্তরের একখণ্ড গৃহে রাখিবার নিমিত্ত অত অর্থ ব্যয় করা কেবল অহঙ্কার প্রদর্শন ও মূঢ়তা মাত্র।

ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, এই মহামূল্য প্রস্তর ও কয়লা, দুই-ই এক পদার্থ। কিছু দিন হইল, দেপ্রেয় নামক এক ফরাসীদেশীয় পণ্ডিত, অনেক যত্ন, পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের পর, কয়লাতে হীরা প্রস্তুত করিয়াছেন। পূর্বে কেহ কখনও হীরা গলাইতে পারে নাই ; কিন্তু তিনি বিদ্যার বলে ও বুদ্ধির কৌশলে, তাহাতেও কৃতকার্য হইয়াছেন।

কাচ

কাচ অতি কঠিন, নির্মল, মসৃণ পদার্থ, এবং অতিশয় ভঙ্গপ্রবণ, অর্থাৎ অনায়াসে ভাঙ্গিয়া যায়। কাচ স্বচ্ছ, অর্থাৎ উহার ভিতর দিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। ঘরের মধ্যে থাকিয়া, জানালা ও কপাট বন্ধ করিলে অন্ধকার হয়, বাহিরের কোনও বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সার্সি বন্ধ করিলে, পূর্বের মত আলোক থাকে ও বাহিরের বস্তু দেখা যায়। তাহার কারণ এই, সার্সি কাচে নির্মিত। সূর্যের আভা, কাচের ভিতর দিয়া আসিতে পারে, কিন্তু কাষ্ঠের ভিতর দিয়া আসিতে পারে না।

বালুকা ও এক প্রকার ক্ষার, এই দুই বস্তু একত্রিত করিয়া অগ্নির উৎকট উত্তাপ লাগাইলে, গলিয়া উভয়ে মিলিয়া কাচ হয়। বালুকা যেরূপ পরিষ্কৃত থাকে; কাচ সেই অনুসারে পরিষ্কৃত হয়। কাচে লাল, সবুজ, হরিদ্রা প্রভৃতি রঙ করে ; রঙ করিলে অতি সুন্দর দেখায়।

কাচ অনেক প্রয়োজনে লাগে। সার্সি, আরসি, সিসি, বোতল, গেলাস, ঝাড়, লণ্ঠন ইত্যাদি নানা বস্তু কাচে প্রস্তুত হয়।

কাচ কোনও অস্ত্রে কাটা যায় না, কেবল হীরাতে কাটে। হীরার সূক্ষ্ম অগ্রভাগ কাচের উপর দিয়া টানিয়া গেলে একটি দাগ পড়ে, তার পর জোর দিলেই দাগে দাগে ভাঙ্গিয়া যায়। যদি হীরার অগ্রভাগ স্বভাবতঃ সূক্ষ্ম থাকে, তবেই তাহাতে কাচ কাটা যায়। যদি হীরা ভাঙ্গিয়া, অথবা, আর কোনও প্রকারে উহার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম করিয়া লওয়া যায়, তাহাতে কাচের গায়ে আঁচড় মাত্র লাগে, কাটিবার মত দাগ বসে না।

কাচ প্রস্তুত করিবার প্রণালী প্রথম কি প্রকারে প্রকাশিত হয়, তাহার নির্ণয় করা অসাধ্য। এরূপ জনশ্রুতি আছে, ফিনিশিয়াদেশীয় কতকগুলি বণিক্, জলপথে বাণিজ্য করিতে যাইতেছিলেন। সিরিয়া দেশে উপস্থিত হইলে, ঝড় তুফানে তাঁহাদিগকে সমুদ্রের তীরে লইয়া ফেলে। বণিকেরা তীরে উঠিয়া, বালির উপর পাক করিতে আরম্ভ করেন। সমুদ্রের তীরে কেলি নামে একপ্রকার চারা গাছ ছিল ; উহার কাষ্ঠে তাঁহারা

আগুন জ্বালিয়াছিলেন। বালি ও কেলির ক্ষার মিশ্রিত হইয়া, অগ্নির উত্তাপে গলিয়া কাচ হইয়াছিল, উহা দেখিয়া, ঐ বণিকেরা কাচ প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিলেন।
যেরূপে যে দেশে কাচের প্রথম উৎপত্তি হউক, উহা বহুকাল অবধি প্রচলিত আছে, তাহার সন্দেহ নাই। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে কাচের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মিশর দেশেও, তিন সহস্র বৎসর পূর্বে কাচের ব্যবহার ছিল, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওযা গিয়াছে।

জল—নদী—সমুদ্র

জল অতি তরল বস্তু, স্রোত বহিয়া যায় এবং এক পাত্র হইতে আর এক পাত্রে ঢালিতে পারা যায়। পৃথিবীর অধিকাংশ জলে মগ্ন। যে জলরাশি পৃথিবীকে বেষ্টিত করিয়া আছে, তাহার নাম সমুদ্র।
সমুদ্রের জল এত লোণা ও বিস্বাদ যে, কেহ পান করিতে পারে না। সমুদ্রের জল, সকল স্থানে সমান লোণা নহে, কোনও স্থানে অল্প লোণা, কোনও স্থানে অধিক। উত্তর সমুদ্র অপেক্ষা, দক্ষিণ সমুদ্রের জল অধিক লোণা।
সমুদ্রের জলে লবণ মিশ্রিত আছে বলিয়া, উহা লোণা হয। আমরা সচরাচর যে লবণ খাই, তাহা সমুদ্র হইতে উৎপন্ন। উডিষ্যা প্রভৃতি দেশে সমুদ্রের জল জ্বাল দিয়া, এখনও লবণ প্রস্তুত করে। লোণা জল সূর্যের উত্তাপে শুকাইয়া গেলে লবণের ভাগ পডিযা থাকে। রাজপুতানা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যে সকল লবণের খনি আছে, তাহা এই-রূপেই উৎপন্ন হইয়া থাকিবে।
অল্প পরিমাণে সমুদ্রের জল লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওযা যায়,উহাতে কোনও বর্ণ নাই। কিন্তু সমুদ্রের রাশীকৃত জল নীলবর্ণ দেখায। নীলবর্ণ দেখায় কেন, তাহার কারণ এ পর্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই।
সমুদ্র কত গভীর, এ পর্যন্ত তাহার নির্ণয় হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক গভীর, সেখানেও আডাই ক্রোশের বড অধিক হইবেক না। অনেকে সমুদ্রের জল মাপিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেহ ৩,১২০ হাত, কেহ ৪,৮০০ হাত, কেহ ১৯,৪০০ হাত দীর্ঘ মানরজ্জু সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন রজ্জুই তল স্পর্শ করিতে পারে নাই, সুতরাং সমুদ্রের জলের ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। লাপ্লাস্ নামক ফরাসিদেশীয় অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, সমুদ্রে যত জল আছে, যদি আর তাহার চতুর্থ ভাগ অধিক হয়, তবে সমস্ত পৃথিবী জলপ্লাবিত হইয়া যায়, আর যদি তাহার চতুর্থ ভাগ ন্যূন হয়, তাহা হইলে সমুদয় নদী, খাল প্রভৃতি শুকাইয়া যায়।

যথানিয়মে প্রতিদিন সমুদ্রের জলের যে হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়, উহাকে জোয়ার ও ভাটা বলে। অর্থাৎ সমুদ্রের জল যে সহসা স্ফীত হইয়া উঠে, তাহাকে জোয়ার বলে ; আর ঐ জল পুনরায় যে ক্রমে ক্রমে অল্প হইতে থাকে, তাহাকে ভাটা বলে। সূর্য ও চন্দ্রের আকর্ষণে এই অদ্ভুত ঘটনা হয়।

লোকে জাহাজে চড়িয়া সমুদ্রের উপর দিয়া এক দেশ হইতে অন্য দেশে যায়। যদি জাহাজ ঝড় ও তুফানে পড়ে, অথবা পাহাড়ে কিংবা চড়ায় লাগে, তাহা হইলে বড় বিপদ ; জাহাজের সমস্ত লোকের প্রাণ নষ্ট হইতে পারে।

সমুদ্র এত বিস্তৃত যে, কতক দূর গেলে আর তীর দেখা যায় না, অথচ জাহাজের লোক পথহারা হয় না। তাহার কারণ এই, জাহাজে কম্পাস্ নামে একটি যন্ত্র থাকে ; ঐ যন্ত্রে একটি সূচী আছে ; জাহাজ যে মুখে যাউক না কেন, সেই সূচী সর্বদা উত্তরমুখে থাকে ; তাহা দেখিয়া নাবিকেরা দিঙ্‌নির্ণয় করে।

প্রাতঃকালে যেদিকে সূর্যের উদয় হয়, তাহাকে পূর্ব দিক বলে ; যেদিকে সূর্য অস্ত যায়, তাহাকে পশ্চিম দিক বলে। পূর্বদিকে ডান হাত করিয়া দাঁড়াইলে, সম্মুখে উত্তর ও পশ্চাতে দক্ষিণ দিক্ হয়। এই পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ লক্ষ্য করিয়া লোকে, কি স্থলপথে, কি জলপথে, পৃথিবীর সকল স্থানে যাতায়াত করে।

নদীর ও অন্যান্য স্রোতের জল সুস্বাদ, সমুদ্রের জলের ন্যায় বিস্বাদ ও লবণময় নহে। যাবতীয় নদীর উৎপত্তিস্থান প্রস্রবণ। গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু প্রভৃতি যত বড় বড় নদী আছে, সকলেরই এক এক প্রস্রবণ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। বর্ষাকালে সর্বদা বৃষ্টি হয় ; এজন্য ঐ সময়ে সকল নদীর প্রবাহের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

সমস্ত প্রধান প্রধান নদীর জল সমুদ্রে পড়ে। কিন্তু তাহাতে সমুদ্রের জলের বৃদ্ধি হয় না। কারণ, নদীপাত দ্বারা সমুদ্রের যত জল বাড়ে, ঐ পরিমাণে সমুদ্রের জল, সর্বদা কুজ্ঝটিকা ও বাষ্প হইয়া আকাশে উঠে। ঐ সমস্ত বাষ্পে মেঘ হয়। মেঘ সকল, যথা-কালে জল হইয়া ভূতলে পতিত হয়। সেই জল দ্বারা পুনরায় নদীর প্রবাহের বৃদ্ধি হয়। সমুদ্র ও নদীতে নানাপ্রকার মৎস্য ও জলজন্তু আছে।

উদ্ভিদ

যে সকল বস্তুর জীবন আছে, অথচ জন্তুর ন্যায় গমনাগমনের শক্তি নাই, তাহাদের নাম উদ্ভিদ ; যেমন লতা, তৃণ, বৃক্ষ ইত্যাদি। উহারা সচরাচর ভূমি ভেদ করিয়া উঠে, এজন্য উহাদিগকে উদ্ভিদ বলে। উদ্ভিদ সকল যখন বাড়িতে থাকে, তখন উহাদিগকে

জীবিত বলা যায়; আর যখন শুকাইয়া যায়, আর বাড়ে না তখন উহাদিগকে মৃত বলে। উহারা যেখানে জন্মে, সেইখানেই থাকে; এই নিমিত্ত উহাদিগকে স্থাবর বলে।

উদ্ভিদ সকল, মূল দ্বারা ভূমি হইতে রস আকর্ষণ করে। ঐ আকৃষ্ট রসই উদ্ভিদের খাদ্য। রস, মূল হইতে স্কন্ধদেশে উঠে। তৎপর ক্রমে ক্রমে সমস্ত শাখা, প্রশাখা ও পত্রে প্রবেশ করে। এইরূপে ভূমির রস উদ্ভিদের সর্ব অবয়বে সঞ্চারিত হয়। তাহাতে উহারা জীবিত থাকে ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কোনও কোনও উদ্ভিদ ভূমিতে না জন্মিয়া, বৃক্ষের উপরে জন্মে; এবং বৃক্ষ হইতে রস গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করে। এরূপ উদ্ভিদের নাম তরুরুহ বা পরগাছা। শীতকালে রসের সঞ্চার রুদ্ধ হয়, এজন্য পত্র সকল শুষ্ক ও পতিত হয়। বসন্তকাল উপস্থিত হইলে, পুনর্বার রসের সঞ্চার হইতে আরম্ভ হয়; তখন নূতন পত্র নির্গত হইতে থাকে।

বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি উদ্ভিদগণের অবয়ব সকল ছালে আচ্ছাদিত। অবয়ব সকল ছালে আচ্ছাদিত বলিয়া, উদ্ভিদে সহজে আঘাত লাগে না, এবং পুষ্টি বিষয়েও আনুকূল্য হয়। যদি ছাল অত্যন্ত আঘাত পায়, তাহা হইলে উদ্ভিদ নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এবং ক্রমে শুকাইয়া যায়।

প্রায় সমস্ত উদ্ভিদের ফলের মধ্যে বীজ জন্মে। সেই বীজ ভূমিতে রোপিলে, তাহা হইতে নূতন উদ্ভিদের উদ্ভব হয়। কতকগুলি উদ্ভিদ এরূপ আছে যে, উহাদের শাখা, অথবা মূলের কিয়দংশ ভূমিতে রোপিয়া দিলে, নূতন উদ্ভিদ জন্মে।

উদ্ভিদ, মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপায়। আমরা কি অন্ন, কি বস্ত্র, কি বাসগৃহ, সমুদয়ই উদ্ভিদ হইতে লাভ করি। ফল, মূল, পত্র, পুষ্প প্রভৃতি আমাদের আহার; কাষ্ঠাদি দ্বারা অগ্নি জ্বালিয়া অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি রন্ধন করি; তুলা হইতে সূত্র প্রস্তুত করিয়া লই; এবং তৃণ, কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া থাকি।

জন্তুর ন্যায় উদ্ভিদের আয়তন এবং আকারের বিলক্ষণ তারতম্য আছে। আফ্রিকাদেশস্থ বাওবাব বৃক্ষের কাণ্ড এরূপ স্থূল যে, তাহার বল্কল খুলিয়া লইয়া তাঁবু প্রস্তুত করিলে তন্মধ্যে চল্লিশ পঞ্চাশ ব্যক্তি অবলীলাক্রমে শয়ন করিতে পারে। অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে দেবদারু জাতীয় একপ্রকার বৃক্ষ, তিন শত হস্তেরও অধিক উচ্চ হইযা থাকে। ভূমি হইতে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাত পর্যন্ত তাহার কোনও শাখা প্রশাখা থাকে না; অতএব তাহার গুঁড়িই ত্রিতল গৃহের অপেক্ষা উচ্চ। আমাদের দেশেও শাল, বট প্রভৃতি নানাবিধ প্রকাণ্ড বৃক্ষ আছে। বটবৃক্ষ তাদৃশ উচ্চ না হইলেও, আয়তনে অতি বৃহৎ হইয়া থাকে। গুজরাট প্রদেশে একটি বটবৃক্ষ ছিল; তিন চারি সহস্র লোক তাহার ছায়ায় বিশ্রাম করিতে পারিত।

এক দিকে যেরূপ বৃহদাকার বৃক্ষ আছে, অপর দিকে সেইরূপ ক্ষুদ্রাকৃতি উদ্ভিদও দেখিতে পাওয়া যায়। ছত্রক বা কোঁড়ক জাতীয় কোনও কোনও উদ্ভিদ এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে দৃষ্টিগোচর হয় না। বর্ষাকালে পুস্তকে যে ছাতা পড়ে, তাহা এই জাতীয় উদ্ভিদ। কোনও কোনও কোঁড়ক অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হয়; উহাদিগকে বেঙের ছাতা বলে।

আম, কাঁঠাল, জাম, আতা, পিয়ারা, বাদাম, দাড়িম ইত্যাদি নানাবিধ মিষ্ট ও সুস্বাদ ফল বৃক্ষে জন্মে। যেখানে এই সকল ফলের বৃক্ষ অনেক থাকে, তাহাকে উদ্যান বলে। যেখানে বহু পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করা যায়, তাহাকে পুষ্পোদ্যান কহে।

কতকগুলি বৃক্ষের ছালে আমাদের অনেক উপকার হয়। স্পেন দেশে কর্ক নামে এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে। উহার বল্কল এরূপ স্থূল, কোমল ও রন্ধ্রশূন্য যে তদ্দ্বারা শিশি, বোতল প্রভৃতির ছিপি নির্মিত হয়। আমেরিকার পেরু প্রদেশস্থ সিঙ্কোনা নামক বৃক্ষের ত্বক সিদ্ধ করিলে যে কাথ হয়, তাহা হইতে কুইনাইন উৎপন্ন হয়। ইদানীং দার্জিলিঙ অঞ্চলে সিঙ্কোনার চাষ হইতেছে। পাট ও শণ গাছের ছালের তন্তু হইতে চট, রজ্জু প্রভৃতি প্রস্তুত হয়; তিসির ছাল হইতে যে সূক্ষ্ম তন্তু বাহির হয়, তাহাতে লিনেন কেম্ব্রিক ইত্যাদি উৎকৃষ্ট বস্ত্রের বয়ন হইয়া থাকে।

অসুখের সময়, রোগীকে যে এরোরুট পথ্য দেওয়া হয়, তাহা হরিদ্রাজাতীয় একপ্রকার বৃক্ষের মূল হইতে উৎপন্ন। কোনও কোনও বৃক্ষের মূলদেশে কচুর ন্যায় একপ্রকার পদার্থ জন্মে, ঐ পদার্থকে কন্দ বলে; যেমন আলু, পলাণ্ডু, ওল, মানকচু, শালগম ইত্যাদি।

অনেকে প্রাতঃকালে ও সায়াহ্নে, চা খাইয়া থাকেন। ঐ চা, একপ্রকার গুল্মের শুষ্ক পত্র কিয়ৎক্ষণ উষ্ণ জলে রাখিয়া দিলে, প্রস্তুত হয়। চীন, জাপান, আসাম, দার্জিলিঙ প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে, ঐ গুল্মের চাষ হইয়া থাকে। পূর্বে বঙ্গদেশের অনেক স্থানে নীলের চাষ হইত। উহার গাছ জলে পচাইলে, একপ্রকার নীলবর্ণ পদার্থ বাহির হয়; ঐ পদার্থ পৃথক্ করিয়া লইয়া শুষ্ক করিলেই, নীলবড়ি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কোনও কোনও বৃক্ষের নির্যাস বা আঠা অনেক প্রয়োজনে লাগে। কাগজ হইতে পেন্সিল বা কালির দাগ উঠাইবার জন্য যে রবর ব্যবহৃত হয়, তাহা বটগাছের ন্যায় একপ্রকার বৃহৎ গাছের আঠা মাত্র। ধূনা, টার্পিন তৈল, খদির, হিঙ্গ, কর্পূর, গঁদ ইত্যাদি সমুদয়ই বৃক্ষনির্যাস হইতে উৎপন্ন। পোস্ত গাছের ফল চিরিয়া দিলে যে রস নির্গত হয়, তাহা হইতে অহিফেন বা আফিম প্রস্তুত হয়।

সুমাত্রা, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপে তালজাতীয় একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে, উহার মজ্জা হইতে সাগুদানা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পরিশ্রম—অধিকার

আমরা চারিদিকে যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাই, ঐ সকল বস্তু কোনও না কোনও লোকের হইবে। যে বস্তু যাহার, সে ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া উহা প্রাপ্ত হইয়াছে। বিনা পরিশ্রমে কেহ কোন বস্তু পাইতে পারে না, ভিক্ষা করিলে, পরিশ্রম ব্যতিরেকে, কোনও কোনও বস্তু পাওযা যাইতে পারে , কিন্তু ভিক্ষা করা ভদ্র লোকের কর্ম নয়। যে ভিক্ষা করে, সে নিতান্ত নিস্তেজ ও নীচাশয়, এবং সকল লোকের ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার ভাজন হয়।

যদি কোনও ব্যক্তি কখনও পরিশ্রম না করিত, তাহা হইলে গৃহনির্মাণ ও কৃষিকর্ম সম্পন্ন হইত না, খাদ্যসামগ্রী, পবিধেয বস্ত্র ও পাঠ্য-পুস্তক, কিছুই পাওয়া যাইত না, সকল লোক দুঃখে কালযাপন করিত , পৃথিবী এক্ষণে, অপেক্ষাকৃত যেরূপ সুখের স্থান হইয়াছে, সেরূপ কদাচ হইত না।

পবিশ্রম না করিলে কেহ কখনও ধনবান্ হইতে পারে না। কেহ কেহ পৈতৃক বিষয পাইয়া ধনবান হয, যথার্থ বটে , কিন্তু তাহারা পবিশ্রম না করুক, তাহাদের পূর্ব-পুরুষেরা অর্থাৎ পিতা, পিতামহ প্রভৃতি পবিশ্রম দ্বারা ঐ ধন উপার্জন করিযা গিযাছেন। বিনা পরিশ্রমে এরূপ ধনলাভ অল্প লোকেব ঘটে , সুতবাং সেই কযজন ভিন্ন, সকল লোককেই পবিশ্রম করিতে হয।

লোকে পরিশ্রম করিযা অর্থ উপার্জন করে। অর্থ না হইলে সংসাবযাত্রা সম্পন্ন হয না। অন্ন, বস্ত্র, গৃহ প্রভৃতি সমস্ত বস্তু অর্থসাধ্য। যদি অতঃপর আর কেহ পরিশ্রম না কবে, তবে যে সকল আহারসামগ্রী প্রস্তুত আছে, অল্প কালের মধ্যে তাহা ফুরাইয়া যাইবে , সমস্ত বস্ত্র, ক্রমে ক্রমে ছিন্ন হইবে এবং আর আর যে সকল বস্তু আছে, সমস্তই কালক্রমে শেব হইবে। তাহা হইলে সকল লোককে, নানা কষ্ট পাইযা প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। বালকেরা পরিশ্রম করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতে সমর্থ নহে। তাহারা যতদিন কর্মক্ষম না হয, পিতা মাতা তাহাদের প্রতিপালন করেন। অতএব, যখন পিতা মাতা বৃদ্ধ হইযা কর্ম করিতে অক্ষম হন, তখন তাঁহাদের প্রতিপালন করা পুত্রদিগের অবশ্যকর্তব্য কর্ম , না করিলে ঘোবতর অধর্ম হয়।

বালকগণেব উচিত, বাল্যকাল অবধি পবিশ্রম করিতে অভ্যাস করা , তাহা হইলে বড হইযা অনাযাসে সকল কর্ম করিতে পারিবে, স্বযং অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ পাইবে না, এবং বৃদ্ধ পিতা মাতার প্রতিপালন করিতেও পারগ হইবে। কোনও কোনও বালক এমন হতভাগ্য যে, সর্বদা অলস হইযা সময় নষ্ট কবিতে ভালবাসে , পবিশ্রম করিতে হইলে সর্বনাশ উপস্থিত হয়। তাহারা বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস, এবং বড হইয়া ধনোপার্জন,

কিছুই করিতে পারে না, সুতরাং যাবজ্জীবন ক্লেশ পায়, এবং চিরকাল পরের গলগ্রহ হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া যে বস্তু উপার্জন করে, অথবা অন্যের দত্ত যে বস্তু প্রাপ্ত হয়, সে বস্তু তাহার। সে ভিন্ন অন্যের তাহা লইবার অধিকার নাই। যে বস্তু যাহার, তাহা তাহারই থাকা উচিত। লোকে জানে, আমি পরিশ্রম করিয়া যে বস্তু উপার্জন করিব, তাহা আমারই থাকিবে, অন্যে লইতে পারিবে না, এজন্যই তাহার পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু সে যদি জানিত, আমার পরিশ্রমের ধন অন্যে লইবে, তাহা হইলে তাহার কখনও পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হইত না।

যদি কেহ অন্যের বস্তু লইতে বাঞ্ছা করে, ঐ বস্তু তাহার নিকট চাহিয়া অথবা কিনিয়া লওয়া উচিত; অজ্ঞাতসারে অথবা বলপূর্বক, কিংবা প্রতারণা করিয়া লওয়া উচিত নহে। এরূপ করিয়া লইলে, অপহরণ করা হয়।

যদি কাহারও কোন দ্রব্য হারায়, তাহা পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে দেওয়া উচিত, আপনার হইল মনে করিয়া লুকাইয়া রাখিলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ। দেখ, ধরা পড়িলে চোরকে কত নিগ্রহভোগ করিতে হয়; তাহার কত অপমান; সে সকলের ঘৃণাস্পদ হয়; চোর বলিয়া কেহ বিশ্বাস করে না; কেহ তাহার সহিত আলাপ করিতে চাহে না। অতএব, প্রাণান্তেও পরের দ্রব্যে হস্তার্পণ করা উচিত নহে।

কতকগুলি সাধারণ বস্তু আছে, তাহাতে সকল লোকের সমান অধিকার; সকলেই বিনা পরিশ্রমে পাইতে পারে। বায়ু, সুর্যের আলোক, বৃষ্টি ও নদীর জল, এ সমস্ত, ও এরূপ আর আর বস্তুতে সকল লোকেরই সমান অধিকার। এতদ্ভিন্ন আর কোনও বস্তু পাইবার বাঞ্ছা করিলে, অবশ্য পরিশ্রম করিতে হইবে, বিনা পরিশ্রমে তাহা পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

ইতর জন্তু

মনুষ্য ভিন্ন আর সকল প্রাণীকে ইতর জন্তু কহে। ইতর জন্তুর মধ্যে কোনও কোনও জাতি তৃণাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে; উহাদিগকে তৃণজীবী বলে; যেমন গো, মহিষ, অশ্ব, হরিণ, ছাগল ইত্যাদি। আবার কোনও কোনও জাতি, অপর জীবের প্রাণবধ করিয়া তাহাদের মাংস খায়; উহারা শ্বাপদ বা হিংস্র জন্তু; যেমন সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগাল, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি। কোনও কোনও জন্তু মনুষ্যেরন্যায় উদ্ভিদ ও মাংস দুই-ই আহার করে। ভল্লুকেরা সচরাচর ফল, মূল ইত্যাদি ভক্ষণ করে; কিন্তু এ সকল খাদ্যের অভাব হইলে, মাংসাহার দ্বারাও উদরপূর্তি করিয়া থাকে।

তৃণজীবী জন্তুরা মনুষ্যের অনেক উপকারে আইসে। গরুর মত মনুষ্যের উপকারী জীব পৃথিবীতে আর নাই। দুগ্ধে শরীরের পুষ্টিসাধন হয় এবং ক্ষীর, দধি, ছানা, নবনীত প্রভৃতি নানা উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হয়; চর্মে পাদুকা নির্মিত হয়; শৃঙ্গ ও খুর গলাইয়া চিরুনি প্রস্তুত করে; অস্থিতে ছুরির বাঁট গড়ে; এবং গোময় হইতে উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভূমিকর্ষণ, শকটচালন প্রভৃতি কর্মেও গরুকে নিযুক্ত করা যায়। অতএব সকল মনুষ্যেরই গরুকে যত্ন ও আদর করা কর্তব্য। গরুর ন্যায় মহিষও আমাদের অনেক কাজে লাগে। মহিষের দুগ্ধ হইতে যে ঘৃত উৎপন্ন হয়, তাহাকে ভয়সা ঘি বলে।

মেষ ও ছাগ হইতে আমরা কতিপয় নিতান্ত আবশ্যক সামগ্রী প্রাপ্ত হই। তিব্বত দেশের ছাগলের লোমে শাল হয়। আমেরিকায় আলপাকা নামে একপ্রকার জন্তু আছে, তিব্বত দেশের ছাগলের ন্যায়, উহারও লোম সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ। এই লোমে যে বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহাকেও আলপাকা বলে।

অশ্ব যেমন বলিষ্ঠ ও বেগবান্, তেমনই সাহসী ও শান্তস্বভাব। অশ্বে আরোহণ করিয়া অনায়াসেই, সুদূর পথ অতি সত্বর যাওয়া যায়। লোকে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া বিনা ক্লেশে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করে। কোনও কোনও দেশে, অশ্ব দ্বারা কৃষি-কর্ম সম্পন্ন হয়।

হরিণজাতি দেখিতে অতি সুশ্রী। উহারা যখন শিং উঠাইয়া, একেবারে চারি পা তুলিয়া, লম্ফ দিতে দিতে বেগে গমন করে, তখন উহাদিগকে অতিশয় সুন্দর দেখায়। তিব্বত ও নেপালে কস্তুরিকা মৃগ নামে এক জাতীয় হরিণ বাস করে, উহাদের নাভি-দেশে এক প্রকার সুগন্ধি পদার্থ জন্মে, তাহাকেই আমরা সচরাচর কস্তুরী বা মৃগনাভি বলিয়া থাকি। মৃগীদের নাভিদেশে কস্তুরী থাকে না।

হিমালয় প্রদেশে চমরী-নামক একপ্রকার জন্তু আছে, উহার লাঙ্গুলের লোমে চামর প্রস্তুত হয়।

সমুদ্রের তলদেশে, স্থানে স্থানে একজাতীয় বড় শুক্তি বা ঝিনুক আছে। তাহাদের মধ্যে বালুকণার ন্যায় কোনও ক্ষুদ্র কঠিন বস্তু প্রবিষ্ট হইলে, তৎপ্রদেশ হইতে রস নির্গত হইতে থাকে; ঐ রস জমিয়া শুভ্র, মসৃণ, উজ্জ্বল ও গোলাকৃতি একপ্রকার কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। এই পদার্থের নাম মুক্তা। সিংহলদ্বীপের উপকূল ও পারস্য উপসাগরে মুক্তা পাওয়া যায়।

কীট ও পতঙ্গ হইতেও নানাবিধ ব্যবহারোপযোগী সামগ্রীর উৎপত্তি হইয়া থাকে। লাক্ষা বা গালা কীটজ পদার্থ। অশ্বত্থ, ডুমুর, পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষের বল্কলে একপ্রকার কীট দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ কীটের অঙ্গ হইতে যে লোহিতবর্ণ পদার্থ ক্ষরিত হয় তাহারই নাম লাক্ষা।

তুঁত, আসন প্রভৃতি গাছের পাতায় গুটিপোকা অণ্ড প্রসব করিয়া থাকে। পোকা হইতে পতঙ্গের অবস্থায় আসিবার কিঞ্চিৎ পূর্বে, উহাদের মুখ হইতে সূক্ষ্ম সূত্রের মত লালা নিঃসৃত হইতে থাকে, এবং বায়ুর সংযোগে অবিলম্বেই দৃঢ় হইয়া যায়। এই সূক্ষ্ম সূত্রের নাম রেশম। লালা নিঃসরণ করিবার সময় পোকা অনবরত ফিরিতে ঘুরিতে থাকে, এবং ক্রমে রেশম নির্মিত একটা ডিম্বাকার আবরণে রুদ্ধ হইয়া যায়। এই আবরণকে গুটি বা কোয়া কহে। কোয়া উষ্ণ জলে ফেলিয়া, বা অন্য কোনও উপায়ে, পোকাকে বিনষ্ট না করিলে, উহা কিছু দিনের মধ্যেই আবরণ কাটিয়া পলায়ন করে। ভারতবর্ষ, জাপান, চীন, ইটালি প্রভৃতি দেশে, নিয়মমত গুটিপোকার চাষ হইয়া থাকে। চাষীরা এই পোকাকে যত্নের সহিত রক্ষা করে, এবং অণ্ড হইতে কীট জন্মিলে তাহাদিগকে নরম তুঁতের পাতা, ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া খাইতে দেয়। তসর, গরদ, চেলী প্রভৃতি নানাবিধ বহুমূল্য বস্ত্র রেশমে প্রস্তুত হয়।

মধুমক্ষিকা দ্বারা মনুষ্যের বহু উপকার সাধিত হয়। উহারা যে বাসগৃহ নির্মাণ করে, তাহার নাম মধুচক্র। মধুচক্রের চলিত নাম মৌচাক। মৌমাছিরা মৌচাকে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোপ প্রস্তুত করে, এবং প্রত্যেক খোপে এক একটি ডিম্ব প্রসব করে। বর্ষা-কালে প্রায়ই কোনও পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় না, হইলেও বৃষ্টির জলে তাহার মধু ধুইয়া যায়। এজন্য বসন্তকালে যখন নানাবিধ ফুল ফুটে, তখন মৌমাছিরা ঐ সকল ফুল হইতে যত্নে মধু আহরণ করিয়া, মধুচক্রে আনিয়া রাখে। চাক ভাঙ্গিলেই সেই মধু সংগ্রহ করা যায়। সমুদয় চাক ভাঙ্গিলে মধুমক্ষিকারা একেবারে উপায়হীন হয়, এজন্য তাহার কিয়-দংশ রাখিয়া দেওয়া কর্তব্য। মৌচাক গলাইলে, মোম প্রস্তুত হয়। মোমের বাতি ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ। আমরা সচরাচর যে বাতি জ্বালিয়া থাকি, তাহা চর্বির, মোমের নহে।

পাথরিয়া কয়লা—কেরোসিন তৈল

উৎকৃষ্ট পাথরিয়া কয়লা দেখিতে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ও উজ্জ্বল। পাথরিয়া কয়লা ধাতুর ন্যায় আকরে জন্মে। কোনও কোনও পাথরিয়া কয়লার আকর ভূমির অনেক নিম্নে থাকে। লোকে গভীর কূপ খনন করিয়া ঐ সকল খনিতে উপস্থিত হয়, এবং সাবল প্রভৃতি দ্বারা কয়লা কাটিয়া, ভূমির উপরিভাগে লইয়া আইসে। রাণীগঞ্জ, আসানসোল, সীতা-রামপুর, ঝরিয়া, গিরিধি প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তর পাথরিয়া কয়লার খনি আছে। আমরা যে পাথরিয়া কয়লা ব্যবহার করি, তাহা ঐ সকল প্রদেশে পাওয়া যায়। আসাম প্রদেশেও কয়লার খনি আছে।

পাথরিয়া কয়লাকে রন্ধনকার্যের উপযোগী করিতে হইলে, একবার কি দুইবার পোড়াইয়া লইতে হয়; তখন উহাকে কোক কয়লা বলে।

এক প্রকার পাথরিয়া কয়লা আছে, তাহা চুয়াইলে কেরোসিন তৈল নির্গত হয়। পূর্বে এই রূপেই কেরোসিন তৈল প্রস্তুত হইত। কিন্তু এক্ষণে আমরা যে কেরোসিন তৈল ব্যবহার করি, তাহা আমেরিকা, রুষিয়া, বর্মা প্রভৃতি দেশে আকরে জন্মে। আকরস্থলে কূপ খনন করিলে, এই তৈল জলের সহিত নির্গত হইয়া উপরে ভাসিতে থাকে। তখন লোকে উহা তুলিয়া লয়; এবং শোধন করিয়া, বিক্রয়ের জন্য নানা দেশে পাঠাইয়া দেয়। কেরোসিন তৈল সহজেই জ্বলিয়া উঠে; অতএব উহা সাবধান হইয়া ব্যবহার করা উচিত।

কৃষিকর্ম

আমরা প্রতিদিন যাহা খাই, তাহার অধিকাংশ কৃষিকর্ম দ্বারা উৎপন্ন। লোকে নিয়মিত কালে, লাঙ্গলাদি দ্বারা ভূমি খনন করিয়া বীজ বপন করে। গাছ জন্মিলে তাহাকে যত্ন পূর্বক রক্ষা করে, এবং যাহাতে উহা উত্তমরূপে বাড়িতে পারে, তাহার উপায় করিয়া দেয়। ফল পাকিলে গাছ কাটিয়া আনে ও ফল পৃথক করিয়া লয়। এইরূপ ভূমি খনন, বীজ বপন প্রভৃতি ক্রিয়াকে কৃষিকর্ম বা চাষ বলে। যাহারা কৃষিকর্ম করে তাহাদের নাম কৃষক বা চাষী।

কৃষি দ্বারা ধান্য, গম, কয়লা প্রভৃতি নানাবিধ শস্য জন্মে। তন্মধ্যে ধান্য হইতে তণ্ডুল, যব হইতে ছাতু, গম হইতে ময়দা, আর ছোলা, মটর, অরহর, মুগ, মসূর, মাষ প্রভৃতি কলায় হইতে ডাইল হয়। তিল, সর্ষপ প্রভৃতি কতকগুলি শস্য আছে, তাহা হইতে তৈল পাওয়া যায়। ইক্ষু হইতে গুড়, চিনি, মিছরি হয়। শাক, পটোল আলু, মূলা, লাউ, কুমড়া, ফুটি, তরমুজ ইত্যাদি খাদ্যসামগ্রীও কৃষিকর্ম দ্বারা উৎপন্ন হয়।

কৃষিকর্ম দ্বারা কার্পাস জন্মে। কার্পাসের বীজ পৃথক করিলে তুলা হয়; তুলা হইতে সূত্র হয়; সূত্রে বস্ত্র প্রস্তুত করে, আমরা সেই বস্ত্র পরি। অতএব আমাদের পরিধানবস্ত্রও কৃষিকর্ম দ্বারা লব্ধ হয়।

ফল পাকিলে যে সকল উদ্ভিদ শুষ্ক ও জীবনহীন হয়, তাহাদিগকে ওষধি কহে, যেমন ধান্য, কলাই, লাউ, কুমড়া, কদলী ইত্যাদি। বাঁশও ফুল ফল হইলে মারিয়া যায়। এজন্য লোকে বাঁশের ফুল হওয়া, দোষ মনে করে।

ইদানীং অনেকেই কৃষিকর্মকে অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন; কিন্তু বাস্তবিক উহা অতি সম্মানের কার্য। পূর্বকালে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাও চাষ করিতে লজ্জিত হইতেন না। বহুকাল পূর্বে, রোমদেশে সিন্‌সিনেটাস্ নামে এক অসাধারণ বীরপুরুষ বাস করিতেন।

তাঁহার সময়ে রোমরাজ্য একবার প্রবল শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়। সকলেই একমত হইয়া স্থির করিল যে, সিন্‌সিনেটাসকেই সৈন্যাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিতে হইবে। দূতেরা যখন তাঁহার নিকট সংবাদ লইয়া যায়, তখন তিনি স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ করিতেছিলেন। আমাদের দেশে ভূমিকে লক্ষ্মী বলে। সুনিয়মে চাষ করিতে পারিলে, অল্প দিনের মধ্যেই লোকে ধনবান্ হইতে পারে। চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ বিভাগে এক ব্যক্তি কয়েক বিঘা ভূমিতে কেবল নারিকেল বৃক্ষ রোপণ করিয়া দ্বাদশ বৎসরের মধ্যেই বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়াছিল। যশোর জিলার একস্থান বহুকাল পতিত অবস্থায় ছিল। সেখানে কেবল দুই একটি খর্জুর বৃক্ষ ভিন্ন, অপর কোনও বৃক্ষ সতেজে জন্মিত না। ইহা দেখিয়া এক সাহেব, ঐ ভূমি খর্জুর বৃক্ষের উপযোগী বুঝিতে পারিয়া, উহাতে বহুসংখ্যক খর্জুর বৃক্ষ রোপণ করেন; এবং অল্পদিনের মধ্যেই যথেষ্ট ধন উপার্জন করিয়া, স্বদেশে গমন করেন।

কৃষিকর্মে প্রবৃত্ত হইলে, উদ্ভিদদিগের পুষ্টিসাধনের অন্য কি'কি উপায়ের প্রয়োজন হয়, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। প্রাণিগণের ন্যায় উদ্ভিদেরাও বায়ু, আলোক, উত্তাপ, জল ও উপযুক্ত খাদ্য ভিন্ন জীবনধারণ করিতে পারে না; অতএব যাহাতে এ সমুদায়ের মধ্যে কোনওটির কিছুমাত্র অভাব না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

জন্তু সকল যেরূপ প্রশ্বাস গ্রহণ ও নিশ্বাস ত্যাগ করে, উদ্ভিদগণও সেইরূপ করিয়া থাকে। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে না পারিলে যেমন আমাদের রোগ হয়, তেমনই উদ্ভিদগণেরও অপকার হয়। এজন্য বৃক্ষাদি ঘন করিয়া রোপিলে, উহারা রীতিমত বাড়িতে পারে না। ঘন করিয়া রোপণ করিবার আরও দোষ আছে। যে ভূমিখণ্ডে দুইটি মাত্র বৃক্ষের উপযুক্ত খাদ্য থাকে, তাহাতে চারিটি বৃক্ষ রোপণ করিলে, কাহারও প্রচুর আহার হয় না; অতএব তাহারা সকলেই হয় মরিয়া যায়, নয় অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

সূর্যের আলোক ও উত্তাপ মনুষ্যের যে পরিমাণে আবশ্যক, উদ্ভিদের তদপেক্ষাও অধিক প্রয়োজনীয়। লাপ্‌লণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে পাঁচ ছয় মাস ধরিয়া সূর্যের আলোক ও উত্তাপের অভাব হয়। এজন্য সে দেশে প্রায় কোন বৃক্ষই জন্মে না; যে দুই এক প্রকার গুল্মাদি দেখা যায়, তাহারা বসন্তের প্রারম্ভে জন্মিয়া গ্রীষ্মের শেষেই মরিয়া যায়। বৃক্ষের মূলদেশের ভূমি খনন করিয়া, তাহাতে জলসেচন করিলে মৃত্তিকা সরস হয়। মৃত্তিকা সরস হইলে, বৃক্ষগণ অনায়াসেই রস আকর্ষণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিতে পারে। রবিশস্য অর্থাৎ মটর, যব, গম প্রভৃতি বর্ষাকালের পরেই বপন করে। তখন ভূমি সরস থাকে; সুতরাং জলসেচনের আর প্রয়োজন হয় না।

যে ভূমিতে শস্যাদির প্রচুর পরিমাণে খাদ্য থাকে, তাহাকে উর্বরা ভূমি বলে। সকল শস্যের খাদ্য ঠিক একরূপ নহে ; কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ উদ্ভিদের খাদ্য যথেষ্ট আছে, ইহা বুঝিয়া চাষ করিতে পারিলে, অধিক ফললাভ হয়। এক ভূমিতে বারংবার একই শস্যের চাষ করিলে ক্রমে শস্যের যে খাদ্য, তাহা ফুরাইয়া যায়। তখন আর সে জমিতে ঐ শস্যের চাষ না করিয়া, অপর কোনও শস্যের চাষ করা বিধেয়। এজন্য বিচক্ষণ কৃষকেরা, এক ভূমিতে প্রতিবৎসর নূতন নূতন শস্যের চাষ করিয়া থাকে।

ভূমির উর্বরতার হ্রাস হইয়া আসিলে অথবা কোনও ভূমিকে শস্যবিশেষের উপযোগী করিতে হইলে, তাহাতে সার দিতে হয়। পচা গোবর, পচা পাতা, খইল, চুণ ইত্যাদি ভূমির উত্তম সার। বিলাতের ভূমি বঙ্গদেশের ভূমি অপেক্ষা কোনও ক্রমে উর্বরা নহে ; অথচ সার দিবার পারিপাট্যে অনেক অধিক শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে।

নিম্নভূমিতে সার দিবার তত প্রয়োজন হয় না। বর্ষাকালে মৃত্তিকাদি বহন করিয়া, নানা দিক্ হইতে ঐ সকল ক্ষেত্রে জল আসিয়া পড়ে। এই জল কিছুকাল স্থিত হইলেই, মৃত্তিকাদি নীচে পড়িয়া যায়, উহাকেই পলি বলে। নদীতে বন্যা হইলে, নিকটবর্তী নিম্নভূমিতে এইরূপ পলি পড়ে এবং ভূমির উর্বরতা বাড়াইয়া দেয়।

শিল্প—বাণিজ্য—সমাজ

লোকে কৃষিকার্য প্রভৃতি দ্বারা যে সকল বস্তু লাভ করে, তাহাদিগের অধিকাংশ নানা উপায়ে ব্যবহারের উপযোগী করিয়া লইতে হয়। কার্পাস কৃষিকর্ম দ্বারা উৎপন্ন হয়, কিন্তু তুলা হইতে সূত্র এবং সূত্র হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করিতে, বিশেষ পরিশ্রম ও কৌশল আবশ্যক হইয়া থাকে। লৌহ আকরে জন্মে ; কিন্তু লৌহ হইতে ইস্পাত এবং সেই ইস্পাত হইতে ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে, পুনর্বার পরিশ্রম ও কৌশল আবশ্যক হয়। এই সকল কার্যকে সচরাচর শিল্পকার্য বলে।

কর্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায় প্রভৃতিকে শিল্পী বলা যায়। উহারা না থাকিলে, আমাদিগের একদিনের জন্যও সুখে বাস করা সুকঠিন হইত। তন্তুবায় না থাকিলে, বস্ত্রাদি মিলিত না ; কুম্ভকার না থাকিলে, রন্ধনকার্য চলিত না, কর্মকার না থাকিলে, কি কুম্ভকার, কি তন্তুবায়, কেহই অস্ত্রাদির অভাবে স্ব স্ব শিল্পকার্য চালাইতে পারিত না। এজন্য পৃথিবীর সর্বস্থানেই, শিল্পীদিগের যথেষ্ট আদর। যে দেশে শিল্পকর্মের যত উন্নতি, সে দেশ তত সমৃদ্ধিশালী হয়। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যে এত ধন ও ঐশ্বর্য, শিল্পকর্মের উন্নতি তাহার একটি প্রধান কারণ।

পূর্বকালে আমাদের দেশে শিল্পকর্মের বিশেষ উন্নতি ছিল। ঢাকাই মস্‌লিন বা মলমল নামক একপ্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্র য়ুরোপে দরে বিক্রীত হইত। কটক প্রভৃতি স্থানের স্বর্ণ ও
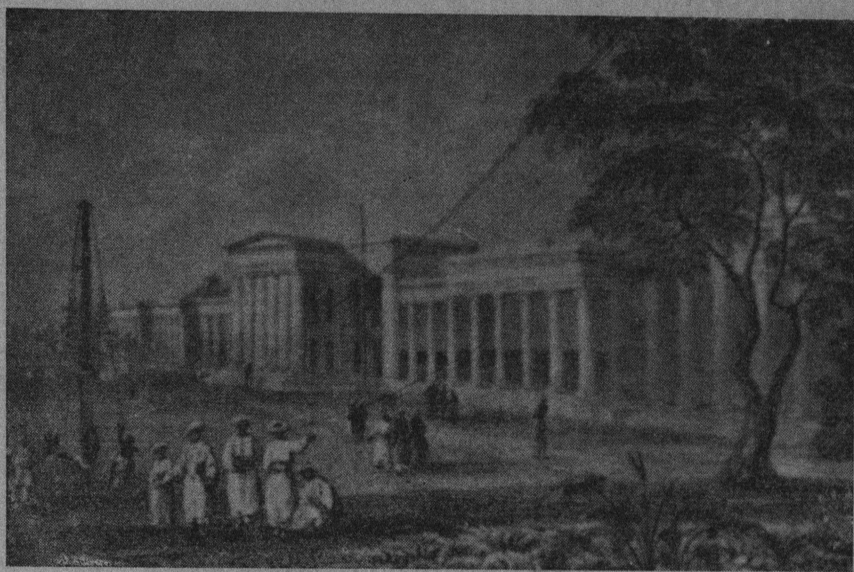
কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজ (১৮৪৭)

SIMPLE LESSONS.

PART I.

COMPILED FOR THE USE

OF

The Govt. Sanskrit College

OF CALCUTTA.

BY

ESHWAR CHANDRA VIDYASAGAR

Principal of that Institution.

—

CALCUTTA.
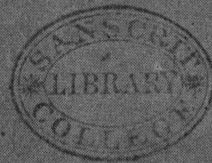
PRINTED AT THE SANSKRIT PRESS.

1851.

ঋজুপাঠ প্রথম ভাগ-এর প্রথম পাতা।

রৌপ্যের অলঙ্কার, সকল স্থানেই আদৃত হইত। জ্ঞান ও উদ্যমের অভাবে, এই সকল শিল্পের লোপ হইয়া আসিতেছে। যাহাতে পুনর্বার উহাদের উন্নতি হয়, তজ্জন্য সর্বপ্রকারে যত্নবান্ হওয়া উচিত।

কৃষকেরা যে শস্যাদি উৎপাদন করে, এবং শিল্পীরা যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত করে, তাহা সকলের হস্তগত হওয়া আবশ্যক। এজন্য কোনও কোনও লোক, কৃষক ও শিল্পীদিগের নিকট হইতে এই সকল দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া, এক একটি নির্দিষ্ট স্থানে বিক্রয় করিয়া থাকে। ঐ স্থানকে বিপণি বা বাজার কহে; এবং ঐ সকল লোককে বণিক্ বা ব্যবসায়ী বলিয়া থাকে। কৃষক ও শিল্পী না থাকিলে, যেরূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইত না, ব্যবসায়ী না থাকিলে সেইরূপ সকলে সুবিধামত দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পাইত না।

সকল দেশে সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য জন্মে না, বা প্রস্তুত করিবার সুবিধা হয় না। কোনও কোনও দেশ ধান্যের বিশেষ উপযোগী, তথায় অল্প পরিশ্রমেই অপর্যাপ্ত ধান্য উৎপন্ন হয়। কোনও কোনও দেশের ভূমিতে তত ধান্য জন্মে না; কিন্তু কার্পাস চাষ করিলে, যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। কোনও কোনও দেশে লবণের খনি আছে; কিন্তু অপর কোনও দ্রব্য ভাল জন্মে না। এই সকল দেশের লোক আপন আপন দ্রব্যাদি বিনিময় করিলে, সকলেই নিজ নিজ আবশ্যক সামগ্রী লাভ করিয়া, সুখে ও স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। এইরূপ বিনিময়ের নাম বাণিজ্য।

বাণিজ্যের গুণে লোকের সুখ ও স্বচ্ছন্দতার যে কত বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বাঙ্গালা দেশের ভূমি অতিশয় উর্বরা; এখানে খাদ্যসামগ্রী, অধিবাসী-দিগের যে পরিমাণে আবশ্যক, তদপেক্ষা অধিক জন্মিয়া থাকে। আমরা এই খাদ্যসামগ্রীর কিয়দংশের বিনিময়ে, কোনও কোনও আবশ্যক বস্তু অপরাপর দেশ হইতে প্রাপ্ত হই। আঙুর, বেদানা প্রভৃতি ফল কাবুল হইতে আইসে। লবণ, বস্ত্র, নানা-বিধ লৌহনির্মিত যন্ত্র ইত্যাদি বিলাত হইতে, এবং কুইনাইন, কেরোসিন তৈল প্রভৃতি দ্রব্য আমেরিকা হইতে আনীত হয়।

কৃষক, শিল্পী ও বণিক্ এই তিন শ্রেণীর লোকের সাহায্য আমাদিগের নিতান্ত আবশ্যক, সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাদিগের দ্বারা কখনই আমাদের অভাবের মোচন হয় না। জ্ঞান ও ধর্মের উপার্জন, রোগের চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে অন্যবিধ লোকের সাহায্য লইতে হয়। এইরূপে নানা শ্রেণীর লোক, পরস্পরের সাহায্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। এই সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সমাবেশ দ্বারা সমাজ সংগঠিত হয়।

সমাজ না থাকিলে, মনুষ্য কোন বিষয়ে, বিশেষতঃ জ্ঞান ও ধর্মের এতাদৃশ উন্নতি করিতে পারিত না। পশুপক্ষীদিগের সমাজ নাই; সুতরাং তাহাদের কোনও উন্নতি নাই। কেবল আহার অন্বেষণ করিতেই তাহাদের সমস্ত সময় কাটিয়া যায়। কিন্তু সমাজ

থাকাতে, মনুষ্যেরা আহারাদি সংগ্রহ ব্যতীত, জ্ঞান ও ধর্মের উপার্জন করিবারও যথেষ্ট সময় পায়। `

সমাজে ভাল মন্দ নানাবিধ লোক বাস করে। একদিকে, জ্ঞানী ও ধার্মিক লোকেরা সুশিক্ষা ও সৎপরামর্শ দ্বারা, সকলকেই সৎপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন এবং দরিদ্র ও বিপন্ন ব্যক্তির সাহায্য করিয়া সমাজের সুখবর্ধন করেন। অপরদিকে, চোর, ডাকাইত, প্রবঞ্চক প্রভৃতি দুশ্চরিত্র ব্যক্তিগণ, পরের দ্রব্য অপহরণ করিয়া তাহাদের সর্বনাশ করিবার চেষ্টা করে। এই সকল লোকের দমন করিতে না পারিলে অল্পকাল মধ্যেই সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। যিনি সকলের উপর কর্তা হইয়া দেশে শান্তিরক্ষা করেন, তাঁহার নাম রাজা। রাজা, রাজপুরুষগণের সাহায্যে, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া থাকেন; এবং পিতার ন্যায় সর্বদাই আমাদের দুঃখমোচন করিবার চেষ্টা করেন। অতএব, সকলেরই রাজাকে ভক্তি ও পূজা করা কর্তব্য।

দুরূহ শব্দের অর্থ

অণুবীক্ষণ—চক্ষুর অগোচর অতি ক্ষুদ্র বস্তু সকল যে যন্ত্র দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়।

অভিজ্ঞতা—অনেক দেখিয়া শুনিয়া যে জ্ঞান জন্মে।

অশ্লীল—কুৎসিৎ, ঘৃণাকর, লজ্জাজনক।

কপিশ—মেটিয়া।

কলাই—কোনও ধাতু গলাইয়া অন্য কোনও ধাতুনির্মিত পাত্র প্রভৃতিতে মাখাইয়া দেওয়া। সাধারণতঃ রঙ্গ ও দস্তা গলাইয়া কলাই করা হইয়া থাকে।

ধূমল—বেগুনিয়া।

ধূসর—পাঁশুটিয়া।

নীলকান্ত—নীলবর্ণের মণি।

পটহ—ঢাক।

পাটল—পাটকিলে।

পদ্মরাগ—লোহিতবর্ণের মণি।

পিঙ্গল—পীতের আভাযুক্ত গাঢ় নীল।

প্রস্রবণ—নির্ঝর, ঝরণা, পর্বতের উপরিভাগ হইতে যে জল নিম্নে পতিত হয়।

মরকত—হরিদ্বর্ণের মণি।

মসৃণ—যাহার উপরিভাগ এমন সমান যে স্পর্শ করিলে কোনও মতে উচ্চনীচ বোধ হয় না।

মস্তিষ্ক—মস্তকের ভিতর ঘৃতের মত যে কোমল বস্তু থাকে। ইদানীন্তন য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা মস্তিষ্ককে মন ও বুদ্ধির স্থান বলেন।

মেরু—পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তদ্বয়। এই দুই স্থান অত্যন্ত হিমপ্রধান; এজন্য তথায় দ্রব দ্রব্য জমিয়া যায়।

লোহিত—লাল।

ভায়লেট—ঈষৎ লালের আভাযুক্ত গাঢ় নীল।

বিনিময়—বদল।

বিনিয়োগ—প্রয়োগ, কোনও বিষয়ে নিয়োজিতকরণ।

সাল ও হিজিরা—হিজিরার ৯৬৩ অব্দে সম্রাট্ আকবর ঐ শাককে ইলাহী নামে প্রবর্তিত করেন। হিজিরার বৎসর চান্দ্রমাস অনুসারে পরিগণিত, ইলাহীর বৎসর সৌরমাস অনুসারে পরিগণিত। চান্দ্রমাস অনুসারে পরিগণিত বৎসর ৩৫৪ দিন, ২১ দণ্ড, ৩৫ পলে, হয়। ইলাহীর প্রবর্তনের সময় হইতে চান্দ্রমাসের অনুযায়ী গণনা অনুসারে ৩৫৫ বৎসর, আর সৌরমাসের অনুসারে ৩৪৫ বৎসর হইয়াছে। সুতরাং, এক্ষণে হিজিরার অব্দ ১৩৩১; ইলাহীর অব্দ ১৩১৯। সাল ইলাহীর নামান্তর মাত্র।

স্নায়ু—সর্বশরীরে সঞ্চারিত সূত্রবৎ পদার্থসমূহ। মস্তিষ্কের সহিত এই সকল পদার্থের যোগ আছে। এইজন্য কোনও বস্তু ইন্দ্রিয়গোচর হইলে তদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মে।

হরিত—সবুজ।

হোরা—ইংরেজী এক ঘণ্টা, আড়াই দণ্ড কাল।

সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা

বিজ্ঞাপন

কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজে, সাহিত্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, বিদ্যার্থিগণ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আদ্যন্ত এবং ধাতুপাঠ, অমরকোষ ও ভট্টিকাব্যের কিয়দংশ পাঠ করিয়া থাকে। এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিতে প্রায় পাঁচ বৎসর অতীত হয়; কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় তাদৃশী ব্যুৎপত্তি জন্মে না। এই নিমিত্ত, ছাত্রেরা, যখন সাহিত্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করে, উত্তম উত্তম কাব্যের প্রকৃত রূপে অর্থবোধ ও ভাবগ্রহ করিতে পারে না। বাস্তবিক, ব্যাকরণ শাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন ও অগ্রে সহজ সহজ গ্রন্থ পাঠ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় কিঞ্চিৎ প্রবিষ্ট না হইলে, কোনও ক্রমেই উৎকৃষ্ট কাব্য নাটকাদি গ্রন্থের অধ্যয়নে অধিকারী হইতে পারে না। কিন্তু মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, ধাতুপাঠ, অমরকোষ ও ভট্টিকাব্যের কিয়দংশমাত্র পাঠ করিয়া ব্যাকরণ শাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন ও সংস্কৃত ভাষায় অধিকারী হওয়া কোনও ক্রমেই সম্ভাবিত নহে।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও দুরূহ; অল্পবয়স্ক বালকদিগের বুদ্ধিগম্য হইবার বিষয় নহে। যাহারা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করে তাহারা গ্রন্থের অর্থ বুঝিতে ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে কোনও ক্রমেই সমর্থ হয় না; অধ্যাপকের মুখে যাহা শুনে তাহাই কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে। বিশেষতঃ, বিলক্ষণ রূপে আদ্যন্ত মুগ্ধবোধ পাঠ করিলেও সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি জন্মে না। অনেক স্থলে এ রূপে লিখিত হইয়াছে যে সহজে তাৎপর্য্যগ্রহ হওয়া দুর্ঘট। সেই সেই স্থলে টীকাকারদিগের সাহায্য আবশ্যক। কিন্তু যে সকল মহাশয়েরা মুগ্ধবোধের টীকা লিখিয়াছেন, দুর্ভাগ্যক্রমে, তাঁহারা ব্যাকরণশাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন ছিলেন না। সুতরাং ব্যাকরণের যথার্থমতগ্রহবিরহে, অনেক স্থলেই, স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা দ্বারা অসম্বদ্ধ অপ্রামাণিক অর্থ প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

মুগ্ধবোধব্যবসায়ীরা মুগ্ধবোধশব্দের দুই প্রকার ব্যুৎপত্তি করিয়া থাকেন। তদনুসারে এই দুই অর্থ নিষ্পন্ন হয়। এক অর্থ এই যে, মুগ্ধবোধপাঠে ব্যাকরণে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি জন্মে। দ্বিতীয় এই যে, এই গ্রন্থ পাঠ করিলে মূঢ় জনেরও সম্যক্ ব্যাকরণজ্ঞান জন্মে*। কিন্তু এই দুই কথাই অলীক ও অপ্রামাণিক। মুগ্ধবোধব্যবসায়ীরা, ব্যাকরণ মাত্র পাঠ করিয়া, ব্যাকরণশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইতে পারেন না এবং অত্যন্ত সুবুদ্ধি না হইলে

* মুগ্ধঃ সুন্দরো বোধো জ্ঞানং ভবত্যস্মাদিতি, মুগ্ধান্ মূঢ়ান বোধয়তীতি বা মুগ্ধবোধম্।

মুগ্ধবোধে বোধাধিকার হয় না। ফলতঃ মুগ্ধবোধের অধ্যয়নে ও অধ্যাপনে যাদৃশ পরিশ্রম ও কষ্ট, কোনও ক্রমেই তদনুযায়ী ফললাভ হয় না।

ধাতুপাঠ ও অমরকোষ সম্যক্ রূপে অর্থসঙ্কলনপূর্ব্বক, আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে পারিলে, অন্যান্য শাস্ত্রের অধ্যয়নকালে শব্দার্থপরিজ্ঞানবিষয়ে আনুকূল্য হয় যথার্থ বটে ; কিন্তু ঐ দুই গ্রন্থ আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করিতে যেরূপ আয়াস ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়, ঐ আনুকূল্যে তদনুরূপ উপকার বোধ হয় না। বরং ঐ গ্রন্থদ্বয় কণ্ঠস্থ করিতে যে সময় যায় ও যে পরিশ্রম হয়, সেই সময় ও সেই পরিশ্রম, বিবেচনাপূর্ব্বক বিষয়বিশেষে নিয়োজিত হইলে, তদপেক্ষা অনেক অংশে সমধিক-ফলোপধায়ক হইতে পারে।

এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষ মহোদয়েরা মুগ্ধবোধ, ধাতুপাঠ অমরকোষ এই গ্রন্থ ত্রিতয়ের পাঠনা রহিত করিয়া সিদ্ধান্তকৌমুদী অধ্যয়নের আদেশ-প্রদান করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় যত ব্যাকরণ আছে, সিদ্ধান্তকৌমুদী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সিদ্ধান্তকৌমুদী আদ্যন্ত পাঠ হইলে, ব্যাকরণের অবশ্যজ্ঞেয় কোনও কথাই অপরিজ্ঞাত থাকে না।

ব্যাকরণ পাঠ না হইলে সংস্কৃত ভাষায় অধিকার হয় না ; কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সুতরাং, যাহারা প্রথম ব্যাকরণ পাঠ করিতে আরম্ভ করে, তাহারা অধীয়মান গ্রন্থের অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারে না। সেই নিমিত্ত, সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ করিতে এত সময় নষ্ট ও এত কষ্ট হয়। বিশেষতঃ, সংস্কৃত কালেজে যাহারা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করে তাহারা নিতান্ত শিশু ; শিশুগণের পক্ষে সংস্কৃত ভাষা লিখিত সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ কোনও ক্রমেই সহজ ও সুসাধ্য নয়। যাঁহারা ইঙ্গরেজী অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে অত্যন্ত উৎসুক ও অত্যন্ত অভিলাষী হইয়া থাকেন। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ অত্যন্ত দুরূহ ও অত্যন্ত নীরস বলিয়া সাহস করিয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। বস্তুতঃ, সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত ভাষা উভয়ের পরস্পর সাপেক্ষতা থাকাতেই সংস্কৃতভাষা শিক্ষা এরূপ দুরূহ হইয়া রহিয়াছে।

প্রথমেই সংস্কৃত ভাষা লিখিত সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং ব্যাকরণ সমাপ্ত করিয়াই এক বারে রঘুবংশ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কাব্য পড়িতে আরম্ভ করা কোনও ক্রমেই শ্রেয়স্কর বোধ না হওয়াতে, শিক্ষাসমাজের সম্মতিক্রমে এই নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে ; ছাত্রেরা, প্রথমতঃ অতি সরল বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলিত সংস্কৃত ব্যাকরণ, ও অতি সহজ সংস্কৃত গ্রন্থ, পাঠ করিবেক ; তৎপরে সংস্কৃত ভাষায় কিঞ্চিৎ বোধাধিকার জন্মিলে, সিদ্ধান্তকৌমুদী ও রঘুবংশাদি পাঠ করিতে আরম্ভ করিবেক। তদনুসারে সরল বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ সঙ্কলন ও দুই তিনখানি সহজ সংস্কৃত পুস্তক প্রস্তুত করা অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে,

প্রথম পাঠার্থে সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা নামে এই পুস্তক প্রস্তুত ও প্রচারিত হইল।

এই গ্রন্থে অল্পবয়স্ক বালকদিগের প্রথমশিক্ষোপযোগী স্থূল স্থূল বিষয় সকল সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি জন্মিবেক না যথার্থ বটে ; কিন্তু উপদেশসাপেক্ষ হইয়া সহজ সহজ সংস্কৃত গ্রন্থ সকল সহজে অধ্যয়ন করিবার ক্ষমতা জন্মিবেক, সন্দেহ নাই ; এবং ইহাই এই পুস্তক প্রস্তুত করিবার মুখ্য তাৎপর্য্য। প্রায় সমুদয় সংস্কৃত গ্রন্থ দেবনাগর অক্ষরেই মুদ্রিত ; বাস্তবিকও যাবতীয় সংস্কৃত গ্রন্থ দেবনাগর অক্ষরেই মুদ্রিত ও অনুশীলিত হওয়া উচিত। এই নিমিত্ত বালকদিগের দেবনাগর অক্ষর পরিচয় অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে, এই পুস্তকের শেষে, সহজে উক্ত অক্ষর পরিচয়ের উপায় বিধান করা গিয়াছে। আর হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, ভট্টিকাব্য, ঋতুসংহার, বেণীসংহার এই কয়েক গ্রন্থ হইতে বালকদিগের পাঠোপযোগী অংশ সকল সঙ্কলন করিয়া ঋজুপাঠ নামে তিনখানি পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত মুগ্ধবোধ অথবা লঘুকৌমুদীতে ব্যাকরণের যত বিষয় লিখিত আছে, সেই সমুদয় বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলন করিয়া অতি ত্বরায় ব্যাকরণকৌমুদী নামে আর একখানি পুস্তক প্রস্তুত করা যাইবেক।

সংস্কৃত কালেজে প্রথম প্রবিষ্ট ছাত্রেরা প্রথম বৎসরে অগ্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা পাঠ করিয়া ঋজুপাঠের প্রথম ভাগ পাঠ করিবেক। দ্বিতীয় বৎসর, ব্যাকরণকৌমুদী ও ঋজুপাঠের দ্বিতীয় ভাগ। এই সকল পাঠ করিয়া, ব্যাকরণে এক প্রকার ব্যুৎপত্তি জন্মিলে, এবং সংস্কৃত ভাষায় কিঞ্চিৎ প্রবেশ হইলে, তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরে সিদ্ধান্তকৌমুদী, ঋজুপাঠের তৃতীয় ভাগ এবং রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব পাঠ করিবেক। এইরূপে চারি পাঁচ বৎসরে ব্যাকরণে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও সংস্কৃত ভাষাতেও বিলক্ষণ বোধাধিকার জন্মিতে পারিবেক।

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ।
সংবৎ ১৯০৮। ১লা অগ্রহায়ণ।

সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা

বর্ণমালা

১। অ ই উ, ক খ গ ইত্যাদি এক একটিকে বর্ণ ও অক্ষর বলে। বর্ণ সমুদায়ে পঞ্চাশটি। তন্মধ্যে ষোলটি স্বর, চৌত্রিশটি হল্। এই পঞ্চাশটি অক্ষরকে বর্ণমালা বলে।

স্বরবর্ণ

২। অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ। এই ষোলটি স্বর। ইহার মধ্যে অ ই উ ঋ ঌ এই পাঁচটি হ্রস্ব। আ ঈ ঊ ৠ ৡ এ ঐ ও ঔ এই নয়টি দীর্ঘ। অবশিষ্ট দুইটি মধ্যে প্রথমকার অনুস্বারটি শেষেরটি বিসর্গ। এক বিন্দু অর্থাৎ ং ইহার নাম অনুস্বার; দুই বিন্দু অর্থাৎ ঃ ইহার নাম বিসর্গ। অন্য স্বর বর্ণের সহিত যোগ না করিলে অনুস্বার ও বিসর্গ এই দুয়ের উচ্চারণ হয় না; এই নিমিত্ত অকারের সহিত যোগ করিয়া লিখিত হইয়াছে।

হল্ বর্ণ

৩। ক খ গ ঘ ঙ, চ ছ জ ঝ ঞ, ট ঠ ড ঢ ণ, ত থ দ ধ ন, প ফ ব ভ ম, য র ল ব, শ ষ স হ, ক্ষ। এই চৌত্রিশটি হল্। তন্মধ্যে ক খ গ ঘ ঙ, কবর্গ; চ ছ জ ঝ ঞ, চবর্গ ট ঠ ড ঢ ণ, টবর্গ; ত থ দ ধ ন, তবর্গ; প ফ ব ভ ম, পবর্গ। য র ল ব, শ ষ স হ, ক্ষ এই নয় বর্ণের বর্গ বিভাগ নাই। তন্মধ্যে য র ল ব ইহাদিগকে অন্তস্থ বর্ণ বলে। শ ষ স হ ইহাদের নাম উষ্মবর্ণ। ক আর মূর্দ্ধন্য ষ এই দুই বর্ণে মিলিত হইয়া ক্ষ হয়; এই নিমিত্ত অনেকে ইহাকে স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া গণনা করে না।

৪। অগ্রে কিংবা পরে এক স্বর না থাকিলে হল্ বর্ণের উচ্চারণ হয় না। যথা ইক্। পূর্বেই আছে বলিয়া ক্ উচ্চারণ করা গেল। অথবা পরে ই থাকিলেও ক্ উচ্চারণ করা যায়; যথা কি। এইরূপ ঋক্, কৃ। যখন হল্ বর্ণ স্বরের সহিত মিলিত না থাকে তখন উহার নীচে এই চিহ্ন থাকে। যদি এই চিহ্ন অথবা ই উ ইত্যাদি স্বর মিলিত না থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবেক তাহাতে অ যুক্ত আছে। যেমন ক খ ইত্যাদি।

৫। হল্ বর্ণের মধ্যে স্বর না থাকিলে দুই তিন হল্ বর্ণ একত্র মিলিত হয়। এইরূপে দুই অথবা তিন হল্ বর্ণ মিলিত হইলে তাহাকে সংযুক্ত বর্ণ কহে। যথা ক ন্ম স্ব স্ম্য

ইত্যাদি। ক্ র মিলিত হইয়া ক্র হইয়াছে; কিন্তু যদি ক্ এই বর্ণের পর অ থাকিত তাহা হইলে ক্র না হইয়া কর হইত।

বর্ণের উচ্চারণ স্থান নিয়ম

৬। অ আ ক খ গ ঘ ঙ হ, ইহাদের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ; এই নিমিত্ত ইহাদিগকে কণ্ঠ্য বর্ণ বলে।

৭। ই ঈ চ ছ জ ঝ ঞ য শ, ইহাদের উচ্চারণ স্থান তালু; এই নিমিত্ত ইহাদিগকে তালব্য বর্ণ কহে।

৮। ঋ ৠ ট ঠ ড ঢ ণ র ষ, ইহাদের উচ্চারণ স্থান মূর্দ্ধা অর্থাৎ মস্তক; এই নিমিত্ত ইহাদিগকে মূর্দ্ধন্য বর্ণ কহে।

৯। ঌ ৡ ত থ দ ধ ন ল স, ইহাদের উচ্চারণ স্থান দন্ত; এই নিমিত্ত ইহাদিগকে দন্ত্য বর্ণ বলে।

১০। উ ঊ প ফ ব ভ ব ম, ইহাদের উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ; এই নিমিত্ত ইহাদিগকে ওষ্ঠ্য বর্ণ বলে।

১১। এ ঐ, ইহাদিগের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ও তালু; এই নিমিত্ত ইহাদিগকে কণ্ঠ-তালব্য বর্ণ কহে।

১২। ও ঔ, ইহাদিগের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ্য ও ওষ্ঠ; এই নিমিত্ত ইহাদিগকে কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ বলে।

১৩। অন্তস্থ ব, ইহার উচ্চারণ স্থান দন্ত ও ওষ্ঠ; এই নিমিত্ত ইহাকে দন্তৌষ্ঠ্য বর্ণ বলে।

১৪। আমাদিগের দেশে দুই ন ণ, দুই ব ব, ও তিন শ ষ স, এক প্রকার উচ্চারণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা অশুদ্ধ; সেরূপ উচ্চারণ করা কদাপি উচিত নহে। বর্গ্য ব দুই ওষ্ঠ সংযোগ করিয়া উচ্চারণ করা যায় কিন্তু অন্তস্থ ব উপরের দন্ত ও নীচের ওষ্ঠ সংযোগ করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। এইরূপ যাহার যে উচ্চারণ স্থান, তাহা বিবেচনা করিয়া উচ্চারণ করা উচিত। য, এই বর্ণকে বর্গ্য জ ন্যায় উচ্চারণ করিয়া থাকে; তাহাও অশুদ্ধ। ই ও এই দুই বর্ণ শীঘ্র উচ্চারণ করিলে যেরূপ হয়, অন্তস্থ য কে সেই রূপ উচ্চারণ করা কর্তব্য। খ্ এই অক্ষরে য যোগ করিলে যেরূপ উচ্চারণ হয় ক্ষ এই বর্ণেরও সেইরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকে; তাহাও অশুদ্ধ। ক্ ও মূর্দ্ধন্য ষ এই দুই বর্ণ শীঘ্র উচ্চারণ করিলে যেরূপ হয়, সেই প্রকার উচ্চারণ করা কর্তব্য।

১৫। ড, এই অক্ষরের উচ্চারণ দুই প্রকার। যেমন ডমরু, ও বড়িশ। শব্দের আরম্ভে থাকিলে অথবা অন্য হল্ বর্ণের সহিত সংযুক্ত হইলে ডমরুর মত উচ্চারণ হয়। যথা ডামর, ডিম্ব, দণ্ড। আর মধ্যে কিম্বা অন্তে থাকিলে নিবিড়ের মত উচ্চারণ হয়। যেমন দাড়িম, নিবিড়, দেবরাড়্, তুরাষাড়্। ডর ন্যায় ঢরও দুই প্রকার উচ্চারণ। যথা ঢক্কা, দৃঢ়।

সন্ধি প্রকরণ

স্বরসন্ধি

১৬। যদি অকারের পর অকার থাকে, তাহা হইলে দুই আকারে মিলিয়া আকার হয়; আকার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা, শশ—অঙ্কঃ, শশাঙ্ক; উত্তম—অঙ্গম্, উত্তমাঙ্গম্; অদ্য—অবধি, অদ্যাবধি।

১৭। যদি অকারের পর আকার থাকে, তাহা হইলে অকার ও আকারে মিলিয়া আকার হয়; আকার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা, রত্ন—আকরঃ, রত্নাকরঃ; দেব—আলয়ঃ, দেবালয়ঃ; কুশ—আসনম্, কুশাসনম্।

১৮। যদি আকারের পর আকার কিংবা অকার থাকে, তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয়; আকার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা, মহা—আশয়ঃ, মহাশয়ঃ; গদা—আঘাতঃ, গদাঘাতঃ; দয়া—অর্ণবঃ, দয়ার্ণবঃ; মহা—অর্ঘঃ, মহার্ঘঃ।

১৯। যদি হ্রস্ব ইকারের পর ই কিম্বা ঈ থাকে, তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ ঈকার হয়; ঈকার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা, গিরি—ইন্দ্রঃ, গিরীন্দ্রঃ; অতি—ইব, অতীব; হরি—ঈশ্বরঃ হরীশ্বরঃ; ক্ষিতি—ঈশঃ, ক্ষিতীশঃ।

২০। যদি দীর্ঘ ঈকারের পর ই কিম্বা ঈ থাকে, তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ ঈ হয়; ঈকার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা, মহী—ইন্দ্রঃ, মহীন্দ্রঃ; লক্ষ্মী—ঈশঃ, লক্ষ্মীশঃ।

২১। যদি হ্রস্ব উকারের পর হ্রস্ব উ থাকে, তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ ঊ হয়; ঊ পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা, মধু—উৎসবঃ, মধূৎসবঃ; বিধু—উদয়ঃ, বিধূদয়ঃ।

২২। যদি অকারের পর ই কিম্বা ঈ থাকে, তাহা হইলে অকারের সহিত মিলিয়া এ হয়; একার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা, দেব—ইন্দ্রঃ, দেবেন্দ্রঃ; পূর্ণ—ইন্দুঃ, পূর্ণেন্দুঃ; গণ—ঈশঃ, গণেশঃ; অব—ইক্ষণম্, অবেক্ষণম্।

২৩। যদি আকারের পর ই কিম্বা ঈ থাকে, তাহা হইলে আকারের সহিত মিলিয়া

এ হয়, একার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা, মহা—ইন্দ্রঃ, মহেন্দ্রঃ ; মহা—ঈশ্বরঃ, মহেশ্বরঃ।

২৪। যদি অকারের পর উ কিংবা ঊ থাকে, তাহা হইলে অকারের সহিত মিলিয়া ও হয় ; ওকার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা, নীল—উৎপলম্, নীলোৎপলম্ ; সূর্য—উদয়ঃ, সূর্যোদয়ঃ ; এক—ঊনবিংশতিঃ, একোনবিংশতিঃ।

২৫। যদি আকারের পর উ কিংবা ঊ থাকে, তাহা হইলে আকারের সহিত মিলিয়া ও হয় ; ওকার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা, গঙ্গা—উদকম্ গঙ্গোদকম্ ; মহা—ঊর্মিঃ, মহোর্মিঃ।

২৬। যদি অকার কিম্বা অকারের পর ঋ থাকে, তাহা হইলে অকার ও আকারের সহিত মিলিয়া অর্ হয় ; অ পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয় ; র পর বর্ণের মস্তকে যায়। যথা, দেব—ঋষিঃ, দেবর্ষিঃ ; হিম—ঋতুঃ, হিমর্ত্তুঃ ; মহা—ঋষিঃ, মহর্ষিঃ।

২৭। যদি অকার কিম্বা আকারের পর এ কিম্বা ঐ থাকে, তাহা হইলে অকার ও আকারের সহিত মিলিয়া ঐ হয়, ঐকার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা, অদ্য—এব, অদ্যৈব ; এক—একম, একৈকম্, সদা—এব, সদৈব ; তথা—এতৎ, তথৈতৎ। মত—ঐক্যম্, মতৈক্যম্ ; মহা—ঐরাবতঃ, মহৈরাবতঃ।

২৮। যদি অকার কিম্বা আকারের পর ও অথবা ঔ থাকে, তাহা হইলে অকার ও আকারের সহিত মিলিয়া ঔ হয় ; ঔকার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা, জল—ওঘঃ, জলৌঘঃ ; মহা—ওষধিঃ, মহৌষধিঃ, চিত্ত—ঔদার্য্যম, চিত্তৌদার্য্যম্ ; মহা—ঔৎসুক্যম্, মহৌৎসুক্যম্।

২৯। যদি অ আ উ এ পরে থাকে, তাহা হইলে ই এবং ঈ য হয় ; য পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা, যদি—অপি, যদ্যপি ; ইতি—আদি, ইত্যাদি ; অভি—উদয়ঃ, অভ্যুদয়ঃ ; প্রতি—একম্, প্রত্যেকম, নদী—অম্বু, নদ্যম্বু ; সখী—আগতা, সখ্যাগতা।

৩০। যদি অ আ ই এ পরে থাকে, তাহা হইলে উকার স্থানে ব হয় ; ব পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা, অনু—অর্থঃ, অন্বর্থঃ ; সু—আগতম্, স্বাগতম্ ; অনু—ইতঃ, অন্বিতঃ ; অনু—এষণম্, অন্বেষণম্।

৩১। যদি অকার কিম্বা আকার পরে থাকে, তাহা হইলে ঋকার স্থানে র হয় ; র পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা, পিতৃ—অনুমতিঃ, পিত্রনুমতিঃ ; পিতৃ—আলয়ঃ, পিত্রালয়ঃ।

৩২। যদি অ আ ই ঈ উ এ পরে থাকে, তাহা হইলে ঔকার স্থানে আব্ হয়। যথা, রবৌ—অস্তমিতে, রবাবস্তমিতে ; গুরৌ—আগতে, গুরাবাগতে ; গতৌ—ইমৌ, গতাবিমৌ ; তৌ—ঈশ্বরৌ, তাবীশ্বরৌ ; বিধৌ—উদিতে, বিধাবুদিতে ; প্রস্থিতৌ—এতৌ, প্রস্থিতাবেতৌ।

৩৩। যদি একার কিম্বা ওকারের পর অকার থাকে তাহার লোপ হয়। যথা, প্রভো—অনুগৃহাণ, প্রভোঽনুগৃহাণ ; সখে—অবধেহি, সখেঽবধেহি।

হল্ সন্ধি

৩৪। যদি চ পরে থাকে, তাহা হইলে ত স্থানে চ হয় ; আর যদি জ পরে থাকে, তাহা হইলে ত স্থানে জ হয়। উৎ—চারণম্, উচ্চারণম্ ; সৎ—চিদানন্দঃ, সচ্চিদানন্দঃ ; সৎ—জনঃ, সজ্জনঃ ; তৎ—জন্যম্, তজ্জন্যম্।

৩৫। যদি ল পরে থাকে, তাহা হইলে ত এবং ন স্থানে ল হয়। যথা, এতৎ—লিখিতম্, এতল্লিখিতম্ ; বলবান্—লোকঃ, বলবাল্লোকঃ।

৩৬। যদি হল্ বর্ণ পরে থাকে, তাহা হইলে পদের অন্তস্থিত ম্ অনুস্বার হয়। যথা বনম্—গচ্ছ, বনংগচ্ছ ; ধনম্—গৃহাণ, ধনংগৃহাণ।

৩৭। যদি স্বরবর্ণ পরে থাকে, তাহা হইলে পদের অন্তেস্থিত নকারে দ্বিত্ব হয়। যথা, হসন্—আগতঃ, হসন্নাগতঃ ; পশ্যন্—এতি, পশ্যন্নেতি। কিন্তু যদি ঐ ন্ দীর্ঘ স্বরের পর থাকে, তাহা হইলে দ্বিত্ব হয় না। যথা, মহান্—আগ্রহঃ, মহানাগ্রহঃ ; গুরূন্—অর্চ্চয়, গুরূনর্চ্চয়।

৩৮। যদি স্বরবর্ণের পর ছ থাকে, তাহা হইলে ঐ ছ চ্ছ হয়। যথা, গৃহ—ছিদ্র, গৃহচ্ছিদ্রম্ ; বৃক্ষ—ছায়া, বৃক্ষছায়া।

৩৯। যদি তকারের পর তালব্য শ থাকে, তাহা হইলে ত স্থানে চ ও শ স্থানে ছ হয়। যথা, উৎ—শলিতম্, উচ্ছলিতম্ ; এতৎ—শয়নম্, এতচ্ছয়নম্।

৪০। যদি পদের অন্তে স্থিত দন্ত্য নকারের পর চ থাকে, তাহা হইলে দুয়ের মধ্যে শ হয়, এবং ন স্থানে অনুস্বার হয়। যথা, হসন্—চলতি, হসংশ্চলতি ; দীপ্তিমান্—চন্দ্রঃ, দীপ্তিমাংশ্চন্দ্রঃ।

৪১। যদি পদের অন্তে স্থিত দন্ত্য নকারের পর ত থাকে, তাহা হইলে দুয়ের মধ্যে দন্ত্য স হয়, এবং ন স্থানে অনুস্বার হয়। যথা, মহান্—তরুঃ, মহাংস্তরুঃ ; হসন্—তরতি, হসংস্তরতি।

৪২। যদি দন্ত্য ন কিম্বা ম পরে থাকে, তাহা হইলে ক স্থানে ঙ্ এবং ত্ স্থানে ন্ হয়। যথা, দিক্—নাগঃ দিঙ্নাগঃ ; অবাক্—মুখঃ, অবাঙ্মুখঃ ; জগৎ—নাথঃ জগন্নাথঃ ; তৎ—মনস্কঃ, তন্মনস্কঃ।

৪৩। যদি স্বরবর্ণ ও হব্ * পরে থাকে, তাহা হইলে ক্ স্থানে গ্ হয় এবং ত্ স্থানে দ্

* হ য ব র ল, ঞ ণ ন ঙ ম, ঝ ঢ় ধ ঘ ভ, জ ড় দ গ ব।

হয়। যথা, দিক্—অন্তঃ, দিগন্তঃ; বাক—দানম্, বাগ্দানম্। সৎ—আশয়ঃ, সদাশয়ঃ; মহৎ—ভয়ম্, মহদ্ভয়ম্।

বিসর্গসন্ধি

৪৪। যদি চ কিম্বা ছ পরে থাকে, তাহা হইলে বিসর্গ স্থানে তালব্য শ হয়; শ চকার ও ছকারে যুক্ত হয়। যথা, পূর্ণঃ—চন্দ্রঃ, পূর্ণশ্চন্দ্রঃ; জ্যোতিঃ—চক্রম্, জ্যোতিশ্চক্রম্; মনঃ—ছলম্, মনশ্ছলম্; রবেঃ—ছবিঃ, রবেশ্ছবিঃ।

৪৫। যদি ট পরে থাকে, তাহা হইলে বিসর্গ স্থানে মূর্দ্ধন্য ষ হয়; ষ টকারে যুক্ত হয়। যথা, ধনুঃ—টঙ্কারঃ, ধনুষ্টঙ্কারঃ।

৪৬। যদি ত পরে থাকে, তাহা হইলে বিসর্গ স্থানে দন্ত্য স হয়; স তকারে যুক্ত হয়। যথা, দীর্ঘঃ—তরুঃ, দীর্ঘস্তরুঃ; ভুবঃ—তলম্, ভুবস্তলম্।

৪৭। যদি অকার কিম্বা হব্ পরে থাকে, তাহা হইলে অকারের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে উ হয়। যথা, ঘটঃ—অয়ম্, ঘটোঽয়ম্; অশ্বঃ—ধাবতি, অশ্বোধাবতি।

৪৮। যদি অকার ভিন্ন স্বর বর্ণ পরে থাকে, তাহা হইলে অকারের পরস্থিত বিসর্গের লোপ হয়। লোপের পর আর সন্ধি হয় না। যথা, ঘটঃ—ইব, ঘটইব; গজঃ—এষঃ, গজএষঃ।

৪৯। যদি স্বর বর্ণ ও হব্ পরে থাকে, তাহা হইলে আকারের পরস্থিত বিসর্গের লোপ হয়। যথা, দ্বিজাঃ—আগতাঃ, দ্বিজা আগতাঃ, দ্বিজাঃ—গতাঃ, দ্বিজা গতাঃ।

৫০। যদি অকার ভিন্ন স্বর ও হল্ বর্ণ পরে থাকে, তাহা হইলে সঃ এষঃ এই দুয়ের বিসর্গের লোপ হয়। যথা, সঃ—আগতঃ; স আগতঃ; এষঃ—মানুষঃ, এষ মানুষঃ।

৫১। যদি স্বর বর্ণ অথবা হব্ পরে থাকে, তাহা হইলে ভোঃ এই পদের বিসর্গের লোপ হয়। যথা, ভোঃ—ঈশান, ভো ঈশান; ভোঃ—ব্রাহ্মণ, ভো ব্রাহ্মণ; ভোঃ—মিত্র, ভো মিত্র।

৫২। যদি স্বর বর্ণ অথবা হব্ পরে থাকে, তাহা হইলে ই ঈ উ ঊ এ ঐ ও ঔ এই কয়েক বর্ণের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে র হয়; র পর বর্ণে যুক্ত হয়। যথা, গতিঃ—ইয়ম্, গতিরিয়ম্; শ্রীঃ—এষা, শ্রীরেষা; পিতুঃ—বাক্যম্, পিতুর্বাক্যম্; বধূঃ—ইয়ম্, বধূরিয়ম্; কবেঃ—বাণী, কবের্ব্বাণী; পরৈঃ—বিবাদঃ, পরৈর্ব্বিবাদঃ; প্রভোঃ—আজ্ঞা, প্রভোরাজ্ঞা; গৌঃ—অয়ম্, গৌরয়ম্।

৫৩। যদি স্বর বর্ণ অথবা হব্ পরে থাকে, তাহা হইলে প্রাতঃ ভ্রাতঃ মাতঃ পিতঃ ইত্যাদি কতকগুলির বিসর্গ স্থানে র হয়। যথা, প্রাতঃ—এব, প্রাতরেব; ভ্রাতঃ—আগচ্ছ, ভ্রাতরাগচ্ছ; মাতঃ—দেহি, মাতর্দ্দেহি; পিতঃ—গৃহাণ, পিতর্গৃহাণ।

সুবন্তপ্রকরণ

৫৪। প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী এই সাত বিভক্তি শব্দের উত্তর এই সাত বিভক্তি হয়। এই বিভক্তি যুক্ত হইলে শব্দকে সুবন্ত ও পদ বলা যায়।

৫৫। এক এক বিভক্তির তিন তিন বচন, একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন। শব্দে এক-বচনের বিভক্তি যোগ করিলে একটি বস্তু বুঝায়; দ্বিবচনে বিভক্তি যোগ করিলে দুটি বস্তু বুঝায়, বহুবচনের বিভক্তি যোগ করিলে অনেক বস্তু বুঝায়। যেমন, ঘটশব্দের প্রথমার একবচনে ঘটঃ, দ্বিবচনে ঘটৌ, বহুবচনে ঘটাঃ। ঘটঃ বলিলে একটি ঘট বুঝায়; ঘটৌ বলিলে দুটি ঘট বুঝায়, ঘটাঃ বলিলে অনেক ঘট বুঝায়। বহুবচনে তিন অবধি পরার্ধপর্যন্ত সকল সংখ্যাই বুঝায়।

৫৬। কোন্ শব্দে কোন্ বিভক্তি যোগ করিলে কেমন পদ হয় তাহা ক্রমে লিখিত হইতেছে। সম্বোধনেও প্রথমা বিভক্তি; কিন্তু একবচনে কিছু বিভিন্নতা আছে। এই নিমিত্ত সম্বোধনের রূপ পৃথক লিখিত হইবেক। যেখানে পৃথক্ না লেখা যাইবেক সেখানে কোন ভেদ নাই বুঝিতে হইবেক।

স্বরান্ত শব্দ

পুংলিঙ্গ

অকারান্ত—ঘটশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ঘটঃ	ঘটৌ	ঘটাঃ
দ্বিতীয়া	ঘটম্	ঘটৌ	ঘটান্
তৃতীয়া	ঘটেন	ঘটাভ্যাম্	ঘটৈঃ
চতুর্থী	ঘটায়	ঘটাভ্যাম্	ঘটেভ্যঃ
পঞ্চমী	ঘটাৎ	ঘটাভ্যাম্	ঘটেভ্যঃ
ষষ্ঠী	ঘটস্য	ঘটয়োঃ	ঘটানাম্
সপ্তমী	ঘটে	ঘটয়োঃ	ঘটেষু
সম্বোধন	ঘট	ঘটৌ	ঘটাঃ

প্রায় সমুদায় অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ ঘট শব্দের ন্যায়।

ইকারান্ত—অগ্নিশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	অগ্নিঃ	অগ্নী	অগ্নয়ঃ
দ্বিতীয়	অগ্নিম্	অগ্নী	অগ্নীন্
তৃতীয়া	অগ্নিনা	অগ্নিভ্যাম্	অগ্নিভিঃ
চতুর্থী	অগ্নয়ে	অগ্নিভ্যাম্	অগ্নিভ্যঃ
পঞ্চমী	অগ্নেঃ	অগ্নিভ্যাম্	অগ্নিভ্যঃ
ষষ্ঠী	অগ্নেঃ	অগ্ন্যোঃ	অগ্নীনাম্
সপ্তমী	অগ্নৌ	অগ্ন্যোঃ	অগ্নিষু
সম্বোধন	অগ্নে	অগ্নী	অগ্নযঃ

সখি পতি ভিন্ন প্রায় সমুদায় ইকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ অগ্নিশব্দেব ন্যায়।

সখিশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সখা	সখাযৌ	সখাযঃ
দ্বিতীযা	সখায়ম্	সখাযৌ	সখীন্
তৃতীয়া	সখ্যা	সখিভ্যাম্	সখিভিঃ
চতুর্থী	সখ্যে	সখিভ্যাম্	স'খভ্যঃ
পঞ্চমী	সখ্যুঃ	সখিভ্যাম্	সখিভ্যঃ
ষষ্ঠী	সখ্যুঃ	সখ্যোঃ	সখীনাম্
সপ্তমী	সখ্যৌ	সখ্যোঃ	সখিষু
সম্বোধন	সখে	সখাযৌ	সখাযঃ

পতিশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	পতিঃ	পতী	পতয়ঃ
দ্বিতীয়া	পতিম্	পতী	পতীন্
তৃতীয়া	পত্যা	পতিভ্যাম্	পতিভিঃ
চতুর্থী	পত্যে	পতিভ্যাম্	পতিভ্যঃ
পঞ্চমী	পত্যুঃ	পতিভ্যাম্	পতিভ্যঃ
ষষ্ঠী	পত্যুঃ	পত্যোঃ	পতীনাম্

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
সপ্তমী	পত্যৌ	পত্যোঃ	পতিষু
সম্বোধন	পতে	পতী	পতয়ঃ

ঈকারান্ত—সুধীশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সুধীঃ	সুধিয়ৌ	সুধিয়ঃ
দ্বিতীয়া	সুধিয়ম্	সুধিয়ৌ	সুধিয়ঃ
তৃতীয়া	সুধিয়া	সুধীভ্যাম্	সুধীভিঃ
চতুর্থী	সুধিয়ে	সুধীভ্যাম	সুধীভ্যঃ
পঞ্চমী	সুধিয়ঃ	সুধীভ্যাম্	সুধীভ্যঃ
ষষ্ঠী	সুধিয়ঃ	সুধিয়োঃ	সুধিয়াম্
সপ্তমী	সুধিয়ি	সুধিয়োঃ	সুধীষু

অনেক পুংলিঙ্গ ঈকারান্ত শব্দ সুধী শব্দের ন্যায়।

উকারান্ত সাধুশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সাধুঃ	সাধূ	সাধবঃ
দ্বিতীয়া	সাধুম্	সাধূ	সাধূন্
তৃতীয়া	সাধুনা	সাধুভ্যাম্	সাধুভিঃ
চতুর্থী	সাধবে	সাধুভ্যাম্	সাধুভ্যঃ
পঞ্চমী	সাধোঃ	সাধুভ্যাম্	সাধুভ্যঃ
ষষ্ঠী	সাধোঃ	সাধ্বোঃ	সাধূনাম্
সপ্তমী	সাধৌ	সাধ্বোঃ	সাধুষু
সম্বোধন	সাধো	সাধূ	সাধবঃ

প্রায় সমুদায় পুংলিঙ্গ উকারান্ত শব্দ সাধু শব্দের ন্যায়।

ঋকারান্ত—দাতৃশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	দাতা	দাতারৌ	দাতারঃ
দ্বিতীয়া	দাতারম্	দাতারৌ	দাতৄন্

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
তৃতীয়া	দাত্রা	দাতৃভ্যাম্	দাতৃভিঃ
চতুর্থী	দাত্রে	দাতৃভ্যাম্	দাতৃভ্যঃ
পঞ্চমী	দাতুঃ	দাতৃভ্যাম্	দাতৃভ্যঃ
ষষ্ঠী	দাতুঃ	দাত্রোঃ	দাতৄণাম্
সপ্তমী	দাতরি	দাত্রোঃ	দাতৃষু
সম্বোধন	দাতঃ	দাতারৌ	দাতারঃ

পিতৃ ভ্রাতৃ জামাতৃ প্রভৃতি কযেকটি ভিন্ন সমুদায ঋকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ দাতৃ শব্দের ন্যায।

পিতৃশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	পিতা	পিতরৌ	পিতরঃ
দ্বিতীয়া	পিতরম	পিতরৌ	
সম্বোধন	পিতঃ	পিতরৌ	পিতরঃ

এতৎ ভিন্ন সকল বিভক্তিতেই দাতৃ শব্দের ন্যায়।

ভ্রাতৃ ও জামাতৃ শব্দ অবিকল পিতৃ শব্দের ন্যায়।

ওকারান্ত—গোশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	গৌঃ	গাবৌ	গাবঃ
দ্বিতীয়া	গাম্	গাবৌ	গাঃ
তৃতীয়া	গবা	গোভ্যাম্	গোভিঃ
চতুর্থী	গবে	গোভ্যাম্	গোভ্যঃ
পঞ্চমী	গোঃ	গোভ্যাম্	গোভ্যঃ
ষষ্ঠী	গোঃ	গবোঃ	গবাম্
সপ্তমী	গবি	গবোঃ	গোষু

সমুদায় পুংলিঙ্গ ওকারান্ত শব্দ এইরূপ

স্ত্রীলিঙ্গ

আকারান্ত—বিদ্যাশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	বিদ্যা	বিদ্যে	বিদ্যাঃ
দ্বিতীয়া	বিদ্যাম্	বিদ্যে	বিদ্যাঃ
তৃতীয়া	বিদ্যয়া	বিদ্যাভ্যাম্	বিদ্যাভিঃ
চতুর্থী	বিদ্যায়ৈ	বিদ্যাভ্যাম্	বিদ্যাভ্যঃ
পঞ্চমী	বিদ্যায়াঃ	বিদ্যাভ্যাম	বিদ্যাভ্যঃ
ষষ্ঠী	বিদ্যায়াঃ	বিদ্যয়োঃ	বিদ্যানাম্
সপ্তমী	বিদ্যায়াম্	বিদ্যয়োঃ	বিদ্যাসু
সম্বোধন	বিদ্যে	বিদ্যে	বিদ্যাঃ

প্রায় সমুদায় আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ এইরূপ।

ইকারান্ত—মতিশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	মতিঃ	মতী	মতয়ঃ
দ্বিতীয়া	মতিম্	মতী	মতীঃ
তৃতীয়া	মত্যা	মতিভ্যাম্	মতিভিঃ
চতুর্থী	মত্যৈ, মতয়ে	মতিভ্যাম্	মতিভ্যঃ
পঞ্চমী	মত্যাঃ, মতেঃ	মতিভ্যাম্	মতিভ্যঃ
ষষ্ঠী	মত্যাঃ, মতেঃ	মত্যোঃ	মতীনাম্
সপ্তমী	মত্যাম্, মতৌ	মত্যোঃ	মতিষু
সম্বোধন	মতে	মতী	মতয়ঃ

প্রায় সমুদায় ইকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ এইরূপ।

ঈকারান্ত—নদীশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	নদী	নদ্যৌ	নদ্যঃ
দ্বিতীয়া	নদীম্	নদ্যৌ	নদীঃ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
তৃতীয়া	নদ্যা	নদীভ্যাম্	নদীভিঃ
চতুর্থী	নদ্যৈ	নদীভ্যাম্	নদীভ্যঃ
পঞ্চমী	নদ্যাঃ	নদীভ্যাম্	নদীভ্যঃ
ষষ্ঠী	নদ্যাঃ	নদ্যোঃ	নদীনাম্
সপ্তমী	নদ্যাম্	নদ্যোঃ	নদীষু
সম্বোধন	নদি	নদ্যৌ	নদ্যঃ

শ্রীশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	শ্রীঃ	শ্রিয়ৌ	শ্রিয়ঃ
দ্বিতীয়	শ্রিয়ম্	শ্রিয়ৌ	শ্রিয়ঃ
তৃতীয়া	শ্রিয়া	শ্রীভ্যাম্	শ্রীভিঃ
চতুর্থী	শ্রিয়ৈ, শ্রিয়ে	শ্রীভ্যাম্	শ্রীভ্যঃ
পঞ্চমী	শ্রিয়াঃ, শ্রিয়ঃ	শ্রীভ্যাম্	শ্রীভ্যঃ
ষষ্ঠী	শ্রিয়াঃ, শ্রিয়ঃ	শ্রিয়োঃ	শ্রীণাম্, শ্রিয়াম্
সপ্তমী	শ্রিয়াম্, শ্রিয়ি	শ্রিযোঃ	শ্রীষু

দীর্ঘ ঈকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের মধ্যে কতকগুলি নদী শব্দের মত কতকগুলি শ্রীশব্দের মত।

উকারান্ত—ধেনুশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ধেনুঃ	ধেনূ	ধেনবঃ
দ্বিতীয়	ধেনুম্	ধেনূ	ধেনূঃ
তৃতীয়া	ধেন্বা	ধেনুভ্যাম্	ধেনুভিঃ
চতুর্থী	ধেন্বৈ, ধেনবে	ধেনুভ্যাম্	ধেনুভ্যঃ
পঞ্চমী	ধেন্বাঃ, ধেনোঃ	ধেনুভ্যাম্	ধেনুভ্যঃ
ষষ্ঠী	ধেন্বাঃ, ধেনোঃ	ধেন্বোঃ	ধেনূনাম্
সপ্তমী	ধেন্বাম, ধেনৌ	ধেন্বোঃ	ধেনুষু
সম্বোধন	ধেনো		

সমুদায় হ্রস্ব উকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের এই রূপ

উকারান্ত—বধূ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	বধূঃ	বধ্বৌ	বধ্বঃ
দ্বিতীয়া	বধূম্	বধ্বৌ	বধূঃ
তৃতীয়া	বধ্বা	বধূভ্যাম্	বধূভিঃ
চতুর্থী	বধ্বৈ	বধূভ্যাম্	বধূভ্যঃ
পঞ্চমী	বধ্বাঃ	বধূভ্যাম্	বধূভ্যঃ
ষষ্ঠী	বধ্বাঃ	বধ্বোঃ	বধূনাম্
সপ্তমী	বধ্বাম্	বধ্বোঃ	বধূষু
সম্বোধন	বধু		

ভ্রূশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ভ্রূঃ	ভ্রুবৌ	ভ্রুবঃ
দ্বিতীয়া	ভ্রুবম্	ভ্রুবৌ	ভ্রুবঃ
তৃতীয়া	ভ্রুবা	ভ্রূভ্যাম্	ভ্রূভিঃ
চতুর্থী	ভ্রুবে	ভ্রূভ্যাম্	ভ্রূভ্যঃ
পঞ্চমী	ভ্রুবঃ	ভ্রূভ্যাম্	ভ্রূভ্যঃ
ষষ্ঠী	ভ্রুবঃ	ভ্রুবোঃ	ভ্রুবাম্
সপ্তমী	ভ্রুবি	ভ্রুবোঃ	ভ্রূষু

দীর্ঘ উকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের মধ্যে কতকগুলি বধূ শব্দের মত কতকগুলি ভ্রূ শব্দের ন্যায়।

ঋকারান্ত—মাতৃশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	মাতা	মাতরৌ	মাতরঃ
দ্বিতীয়া	মাতরম্	মাতরৌ	মাতৄঃ
তৃতীয়া	মাত্রা	মাতৃভ্যাম্	মাতৃভিঃ
চতুর্থী	মাত্রে	মাতৃভ্যাম্	মাতৃভ্যঃ
পঞ্চমী	মাতুঃ	মাতৃভ্যাম্	মাতৃভ্যঃ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
ষষ্ঠী	মাতুঃ	মাত্রোঃ	মাতৃণাম্
সপ্তমী	মাতরি	মাত্রোঃ	মাতৃষু
সম্বোধন	মাতঃ		

স্বসৃশব্দ ভিন্ন সমুদায় ঋকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের এই রূপ

স্বসৃশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	স্বসা	স্বসারৌ	স্বসারঃ
দ্বিতীয়া	স্বসারম্	স্বসারে	

এ ভিন্ন আর সকল বিভক্তিতেই মাতৃশব্দের তুল্য।

ক্লীবলিঙ্গ

অকারান্ত—ফলশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ফলম্	ফলে	ফলানি
দ্বিতীযা	ফলম	ফলে	ফলানি
সম্বোধন	ফল		

আব আর বিভক্তিতে পুংলিঙ্গ অকারান্ত শব্দেব তুল্য। প্রায় সমুদায অকারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের এই রূপ।

ইকারান্ত—বারিশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	বারি	বারিণী	বারীণি
দ্বিতীযা	বারি	বারিণী	বারীণি
তৃতীয়া	বারিণা	বারিভ্যাম্	বারিভিঃ
চতুর্থী	বারিণে	বারিভ্যাম্	বারিভ্যঃ
পঞ্চমী	বারিণঃ	বারিভ্যাম্	বারিভ্যঃ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
ষষ্ঠী	বারিণঃ	বারিণোঃ	বারীণাম্
সপ্তমী	বারিণি	বারিণোঃ	বারিষু

দধি প্রভৃতি কয়েক শব্দ ভিন্ন প্রায় সমুদায় হ্রস্ব ইকারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের এই রূপ

দধিশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	দধি	দধিনী	দধীনি
দ্বিতীয়া	দধি	দধিনী	দধীনি
তৃতীয়া	দধ্না	দধিভ্যাম্	দধিভিঃ
চতুর্থী	দধ্নে	দধিভ্যাম্	দধিভ্যঃ
পঞ্চমী	দধ্নঃ	দধিভ্যাম্	দধিভ্যঃ
ষষ্ঠী	দধ্নঃ	দধ্নোঃ	দধ্নাম্
সপ্তমী	দধ্নি, দধনি	দধ্নোঃ	দধিষু

অক্ষি, অস্থি ও সক্থি শব্দ অবিকল এইরূপ

উকারান্ত—মধুশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	মধু	মধুনী	মধূনি
দ্বিতীয়া	মধু	মধুনী	মধূনি
তৃতীয়া	মধুনা	মধুভ্যাম্	মধুভিঃ
চতুর্থী		মধুভ্যাম্	মধুভ্যঃ
পঞ্চমী	মধুনঃ	মধুভ্যাম্	মধুভ্যঃ
ষষ্ঠী	মধুনঃ	মধুনোঃ	মধূনাম্
সপ্তমী	মধুনি	মধুনোঃ	মধুষু

প্রায় সমুদায় হ্রস্ব উকারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের এই রূপ

হলন্ত শব্দ

পুংলিঙ্গ

জকারান্ত—দেবরাজ্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	দেবরাট্, দেবরাড্	দেবরাজৌ	দেবরাজঃ
দ্বিতীয়া	দেবরাজম্	দেবরাজৌ	দেবরাজঃ
তৃতীয়া	দেবরাজা	দেবরাড্ভ্যাম্	দেবাড্ভিঃ
চতুর্থী	দেবরাজে	দেবরাড্ভ্যাম্	দেবরাড্ভ্যঃ
পঞ্চমী	দেবরাজঃ	দেববাড্ভ্যাম্	দেবরাড্ভ্যঃ
ষষ্ঠী	দেবরাজঃ	দেবরাজোঃ	দেবরাজাম্
সপ্তমী	দেবরাজি	দেবরাজোঃ	দেবরাট্সু

প্রায় সমুদায় জকারান্ত শব্দ দেবরাজ্ শব্দের ন্যায়।

তকারান্ত—শ্রীমৎশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	শ্রীমান	শ্রীমন্তৌ	শ্রীমন্তঃ
দ্বিতীয়া	শ্রীমন্তম্	শ্রীমন্তৌ	শ্রীমতঃ
তৃতীয়া	শ্রীমতা	শ্রীমদ্ভ্যাম্	শ্রীমদ্ভিঃ
চতুর্থী	শ্রীমতে	শ্রীমদ্ভ্যাম্	শ্রীমদ্ভ্যঃ
পঞ্চমী	শ্রীমতঃ	শ্রীমদ্ভ্যাম্	শ্রীমদ্ভ্যঃ
ষষ্ঠী	শ্রীমতঃ	শ্রীমতোঃ	শ্রীমতাম্
সপ্তমী	শ্রীমতি	শ্রীমতোঃ	শ্রীমৎসু
সম্বোধন	শ্রীমন্		

ধাবৎশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ধাবন্	ধাবন্তৌ	ধাবন্তঃ
দ্বিতীয়া	ধাবন্তম্	ধাবন্তৌ	ধাবতঃ
তৃতীয়া	ধাবতা	ধাবদ্ভ্যাম	ধাবদ্ভিঃ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
চতুর্থী	ধাবতে	ধাবদ্ভ্যাম্	ধাবদ্ভ্যঃ
পঞ্চমী	ধাবতঃ	ধাবদ্ভ্যাম্	ধাবদ্ভ্যঃ
ষষ্ঠী	ধাবতঃ	ধাবতোঃ	ধাবতাম্
সপ্তমী	ধাবতি	ধাবতোঃ	ধাবৎসু

তকারান্ত শব্দের মধ্যে কতকগুলি শ্রীমৎ শব্দের ন্যায় কতকগুলি ধাবৎ শব্দের ন্যায়। ভবৎ শব্দ ধাবৎ শব্দের তুল্য ; কিন্তু যখন তুমি অর্থে প্রয়োগ হয় তখন শ্রীমৎ শব্দের ন্যায়। মহৎ শব্দ ধাবৎ শব্দের তুল্য কেবল প্রথমা ও দ্বিতীয়াতে বিশেষ আছে।

মহৎশব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	মহান্	মহান্তৌ	মহান্তঃ
দ্বিতীয়া	মহান্তম্	মহান্তৌ	

নকারান্ত—লঘিমন্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	লঘিমা	লঘিমানৌ	লঘিমানঃ
দ্বিতীয়া	লঘিমানম্	লঘিমানৌ	লঘিম্নঃ
তৃতীয়া	লঘিম্না	লঘিমভ্যাম্	লঘিমভিঃ
চতুর্থী	লঘিম্নে	লঘিমভ্যাম্	লঘিমভ্যঃ
পঞ্চমী	লঘিম্নঃ	লঘিমভ্যাম্	লঘিমভ্যঃ
ষষ্ঠী	লঘিম্নঃ	লঘিম্নোঃ	লঘিম্নাম্
সপ্তমী	লঘিম্নি, লঘিমনি	লঘিম্নোঃ	লঘিমসু
সম্বোধন	লঘিমন্		

যজন্ যুবন্ প্রভৃতি কতকগুলি ভিন্ন প্রায় সমুদায় নকারন্ত শব্দ লঘিমন্ শব্দের ন্যায়।

যজ্বন্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	যজ্বা	যজ্বানৌ	যজ্বানঃ
দ্বিতীয়া	যজ্বানম্	যজ্বানৌ	যজ্বনঃ
তৃতীয়া	যজ্বনা	যজ্বভ্যাম্	যজ্বভিঃ
চতুর্থী	যজ্বনে	যজ্বভ্যাম	যজ্বভ্যঃ
পঞ্চমী	যজ্বনঃ	যজ্বভ্যাম্	যজ্বভ্যঃ
ষষ্ঠী	যজ্বনঃ	যজ্বনোঃ	যজ্বনাম্
সপ্তমী	যজ্বনি	যজ্বনোঃ	যজ্বসু
সম্বোধন	যজ্বন		

যত নকারান্ত শব্দে নকারের পূর্বে ম এবং ব সংযুক্ত বর্ণ থাকে প্রায় সেই সমুদায় শব্দ যজ্বন শব্দের ন্যায়।

যুবন্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	যুবা	যুবানৌ	যুবানঃ
দ্বিতীয়া	যুবানম্	যুবানৌ	যূনঃ
তৃতীয়া	যূনা	যুবভ্যাম	যুবভিঃ
চতুর্থী	যূনে	যুবভ্যাম্	যুবভ্যঃ
পঞ্চমী	যূনঃ	যুবভ্যাম্	যুবভ্যঃ
ষষ্ঠী	যূনঃ	যূনোঃ	যূনাম্
সপ্তমী	যূনি	যূনোঃ	যুবসু
সম্বোধন	যুবন্		

রাজন্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	রাজা	রাজানৌ	রাজানঃ
দ্বিতীয়া	রাজানম্	রাজানৌ	রাজ্ঞঃ
তৃতীয়া	রাজ্ঞা	রাজভ্যাম্	রাজভিঃ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
চতুর্থী	রাজ্ঞে	রাজভ্যাম	রাজভ্যঃ
পঞ্চমী	রাজ্ঞঃ	রাজভ্যাম্	রাজভ্যঃ
ষষ্ঠী	রাজ্ঞঃ	রাজ্ঞোঃ	রাজ্ঞাম্
সপ্তমী	রাজ্ঞি, রাজনি	রাজ্ঞোঃ	রাজসু
সম্বোধন	রাজন		

গুণিন্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	গুণী	গুণিনৌ	গুণিনঃ
দ্বিতীয়া	গুণিনম্	গুণিনৌ	গুণিনঃ
তৃতীয়া	গুণিনা	গুণিভ্যাম্	গুণিভিঃ
চতুর্থী	গুণিনে	গুণিভ্যাম্	গুণিভ্যঃ
পঞ্চমী		গুণিভ্যাম্	গুণিভ্যঃ
ষষ্ঠী		গুণিনোঃ	গুণিনাম্
সপ্তমী	গুণিনি	গুণিনোঃ	গুণিষু
সম্বোধন	গুণিন্		

প্রায় সমুদায় ইন্ ভাগান্ত শব্দ গুণিন্ শব্দের ন্যায়।

পথিন্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	পন্থাঃ	পন্থানৌ	পন্থানঃ
দ্বিতীয়া	পন্থানম্	পন্থানৌ	পথঃ
তৃতীয়া	পথা	পথিভ্যাম্	পথিভিঃ
চতুর্থী	পথে	পথিভ্যাম্	পথিভ্যঃ
পঞ্চমী	পথঃ	পথিভ্যাম্	পথিভ্যঃ
ষষ্ঠী	পথঃ	পথোঃ	পথাম্
সপ্তমী	পথি	পথোঃ	পথিষু

সকারান্ত—বেধস্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	বেধাঃ	বেধসৌ	বেধসঃ
দ্বিতীয়া	বেধসম্	বেধসৌ	বেধসঃ
তৃতীয়া	বেধসা	বেধোভ্যাম্	বেধোভিঃ
চতুর্থী	বেধসে	বেধোভ্যাম্	বেধোভ্যঃ
পঞ্চমী	বেধসঃ	বেধোভ্যাম্	বেধোভ্যঃ
ষষ্ঠী	বেধসঃ	বেধসোঃ	বেধসাম্
সপ্তমী	বেধসি	বেধসোঃ	বেধঃসু
সম্বোধন	বেধঃ		

বিদ্বস্, পুম্স্ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ ভিন্ন সমুদায় দন্ত্য সকারান্ত শব্দ এইরূপ

বিদ্বস্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	বিদ্বান	বিদ্বাংসৌ	বিদ্বাংসঃ
দ্বিতীয়া	বিদ্বাংসম্	বিদ্বাংসৌ	বিদুষঃ
তৃতীয়া	বিদুষা	বিদ্বদ্ভ্যাম্	বিদ্বদ্ভিঃ
চতুর্থী	বিদুষে	বিদ্বদ্ভ্যাম্	বিদ্বদ্ভ্যঃ
পঞ্চমী	বিদুষঃ	বিদ্বদ্ভ্যাম্	বিদ্বদ্ভ্যঃ
ষষ্ঠী	বিদুষঃ	বিদুষোঃ	বিদুষাম্
সপ্তমী	বিদুষি	বিদুষোঃ	বিদ্বৎসু
সম্বোধন	বিদ্বন্		

যাবতীয় বস্ ভাগান্ত শব্দ বিদ্বস্ শব্দের তুল্য।

পুম্স্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	পুমান্	পুমাংসৌ	পুমাংসঃ
দ্বিতীয়া	পুমাংসম্	পুমাংসৌ	পুংসঃ
তৃতীয়া	পুংসা	পুংভ্যাম্	পুংভিঃ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
চতুর্থী	পুংসে	পুংভ্যাম্	পুংভ্যঃ
পঞ্চমী	পুংসঃ	পুংভ্যাম্	পুংভ্যঃ
ষষ্ঠী	পুংসঃ	পুংসোঃ	পুংসাম্
সপ্তমী	পুংসি	পুংসোঃ	পুংস্থ
সম্বোধন	পুমন্		

হকারান্ত—তুরাসাহ্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	তুরাষাট্ / তুরাষাড্	তুরাসাহৌ	তুরাসাহঃ
দ্বিতীয়া	তুরাসাহম্	তুরাসাহৌ	তুরাসাহঃ
তৃতীয়া	তুরাসাহা	তুরাষাড্ভ্যাম্	তুরাষাড্ভি
চতুর্থী	তুরাসাহে	তুরাষাড্ভ্যাম্	তুরাষাড্ভ্য
পঞ্চমী	তুরাসাহঃ	তুরাষাড্ভ্যাম্	তুরাষাড্ভ্য
ষষ্ঠী	তুরাসাহঃ	তুরাসাহোঃ	তুরাসাহাম্
সপ্তমী	তুবাসাহি	তুরাসাহোঃ	তুরাষাট্স্থ / তুরাষাড্স্থ

স্ত্রীলিঙ্গ

চকারান্ত—বাচ্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	বাক্	বাচৌ	বাচঃ
দ্বিতীয়া	বাচম্	বাচৌ	বাচঃ
তৃতীয়া	বাচা	বাগ্ভ্যাম্	বাগ্ভিঃ
চতুর্থী	বাচে	বাগ্ভ্যাম্	বাগ্ভ্যঃ
পঞ্চমী	বাচঃ	বাগ্ভ্যাম্	বাগ্ভ্যঃ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
ষষ্ঠী	বাচঃ	বাচোঃ	বাচাম্
সপ্তমী	বাচি	বাচোঃ	বাক্ষু

অন্য অন্য শব্দের সহিত-যোগ করিলে বাচ্ শব্দ পুংলিঙ্গও হয়। তখনও এইরূপ।

দকারান্ত—আপদ্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	আপৎ	আপদৌ	আপদঃ
দ্বিতীয়া	আপদম্	আপদৌ	আপদঃ
তৃতীয়া	আপদা	আপদ্ভ্যাম্	আপদ্ভিঃ
চতুর্থী	আপদে	আপদ্ভ্যাম্	আপদ্ভ্যঃ
পঞ্চমী	আপদঃ	আপদ্ভ্যাম্	আপদ্ভ্যঃ
ষষ্ঠী	আপদঃ	আপদোঃ	আপদাম্
সপ্তমী	আপদি	আপদোঃ	আপৎসু

অন্য অন্য শব্দের সহিত যোগ করিলে আপদ্ শব্দ পুংলিঙ্গও হয়। তখনও এইরূপ। প্রায় সমুদায় পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ দকারান্ত শব্দ আপদ্ শব্দের ন্যায়।

পকারান্ত—অপ্ শব্দ

অপ্ শব্দ কেবল বহুবচনে হয়।

	বহুবচন
প্রথমা	আপঃ
দ্বিতীয়া	অপঃ
তৃতীয়া	অদ্ভিঃ
চতুর্থী	অদ্ভ্যঃ
পঞ্চমী	অদ্ভ্যঃ
ষষ্ঠী	অপাম্
সপ্তমী	অপ্সু

ক্লীবলিঙ্গ

তকারান্ত—শ্রীমৎ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	শ্রীমৎ	শ্রীমতী	শ্রীমন্তি
দ্বিতীয়া	শ্রীমৎ	শ্রীমতী	শ্রীমন্তি

আর আর বিভক্তিতে পুংলিঙ্গের মত। প্রায় সমুদায় তকারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শ্রীমৎ শব্দের ন্যায়।

মহৎ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	মহৎ	মহতী	মহান্তি
দ্বিতীয়া	মহৎ	মহতী	মহান্তি

আর আর বিভক্তিতে পুংলিঙ্গের ন্যায়।

নকারান্ত ধামন্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ধাম	ধাম্নী, ধামানী	ধামানি
দ্বিতীয়া	ধাম	ধাম্নী, ধামনী	ধামানি[১]

আর আর বিভক্তিতে পুংলিঙ্গ লঘিমন্ শব্দের তুল্য। প্রায় সমুদায় নকারান্ত শব্দ এইরূপ।

কর্ম্মন্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	কর্ম্ম	কর্ম্মণী	কর্ম্মাণি
দ্বিতীয়া	কর্ম্ম	কর্ম্মণী	কর্ম্মণি

আর আর বিভক্তিতে পুংলিঙ্গ যজন্ শব্দের ন্যায়।

অহন্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	অহঃ	অহ্নী, অহনী	অহানি
দ্বিতীয়া	অহঃ	অহ্নী, অহনী	অহানি
তৃতীয়া	অহ্না	অহোভ্যাম্	অহোভিঃ
চতুর্থী	অহ্নে	অহোভ্যাম্	অহোভ্যঃ
পঞ্চমী	অহ্নঃ	অহোভ্যাম্	অহোভ্যঃ
ষষ্ঠী	অহ্নঃ	অহ্নোঃ	অহ্নাম্
সপ্তমী	অহ্নি, অহনি	অহ্নোঃ	অহঃসু

সকারান্ত—পয়স্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	পয়ঃ	পয়সী	পয়াংসি
দ্বিতীয়া	পয়ঃ	পয়সী	পয়াংসি

আর আর বিভক্তিতে বেধস্ শব্দের ন্যায়। প্রায় সমুদায় সকারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ এইরূপ।

ধনুস্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ধনুঃ	ধনুষী	ধনূংষি
দ্বিতীয়া	ধনুঃ	ধনুষী	ধনূংষি
তৃতীয়া	ধনুষা	ধনুর্ভ্যাম্	ধনুর্ভিঃ
চতুর্থী	ধনুষে	ধনুর্ভ্যাম	ধনুর্ভ্যঃ
পঞ্চমী	ধনুষঃ	ধনুর্ভ্যাম্	ধনুর্ভ্যঃ
ষষ্ঠী	ধনুষঃ	ধনুষোঃ	ধনুষাম্
সপ্তমী	ধনুষি	ধনুষোঃ	ধনুঃষু

সর্ব্বনাম

পুংলিঙ্গ

সর্ব্ব শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সর্ব্বঃ	সর্ব্বৌ	সর্ব্বে
দ্বিতীয়া	সর্ব্বম্	সর্ব্বৌ	সর্ব্বান্
তৃতীয়া	সর্ব্বেণ	সর্ব্বাভ্যাম্	সর্ব্বৈঃ
চতুর্থী	সর্ব্বস্মৈ	সর্ব্বাভ্যাম্	সর্ব্বেভ্যঃ
পঞ্চমী	সর্ব্বস্মাৎ	সর্ব্বাভ্যাম্	সর্ব্বেভ্যঃ
ষষ্ঠী	সর্ব্বস্য	সর্ব্বয়োঃ	সর্ব্বেষাম্
সপ্তমী	সর্ব্বস্মিন্	সর্ব্বয়োঃ	সর্ব্বেষু

ক্লীবলিঙ্গ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সর্ব্বম্	সর্ব্বে	সর্ব্বাণি
দ্বিতীয়া	সর্ব্বম্	সর্ব্বে	সর্ব্বাণি

আর আর বিভক্তিতে পুংলিঙ্গের মত।

স্ত্রীলিঙ্গ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সর্ব্বা	সর্ব্বে	সর্ব্বাঃ
দ্বিতীয়া	সর্ব্বাম্	সর্ব্বে	সর্ব্বাঃ
তৃতীয়া	সর্ব্বয়া	সর্ব্বাভ্যাম্	সর্ব্বাভিঃ
চতুর্থী	সর্ব্বস্যৈ	সর্ব্বাভ্যাম্	সর্ব্বাভ্যঃ
পঞ্চমী	সর্ব্বস্যাঃ	সর্ব্বাভ্যাম্	সর্ব্বাভ্যঃ
ষষ্ঠী	সর্ব্বস্যাঃ	সর্ব্বয়োঃ	সর্ব্বাসাম্
সপ্তমী	সর্ব্বস্যাম্	সর্ব্বয়োঃ	সর্ব্বাসু

অন্য শব্দ ঠিক সর্ব্ব শব্দের মত কেবল ক্লীবলিঙ্গে প্রথমা ও দ্বিতীয়ার একবচনে অন্যৎ এই পদ হয়।

পুংলিঙ্গ

পূর্ব্ব শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	পূর্ব্বঃ	পূর্ব্বৌ	পূর্ব্বে, পূর্ব্বাঃ
দ্বিতীয়া	পূর্ব্বম্	পূর্ব্বৌ	পূর্ব্বান্
তৃতীয়া	পূর্ব্বেণ	পূর্ব্বাভ্যাম্	পূর্ব্বৈঃ
চতুর্থী	পূর্ব্বস্মৈ	পূর্ব্বাভ্যাম্	পূর্ব্বেভ্য
পঞ্চমী	পূর্ব্বস্মাৎ, পূর্ব্বাৎ	পূর্ব্বাভ্যাম্	পূর্ব্বেভ্যঃ
ষষ্ঠী	পূর্ব্বস্য	পূর্ব্বয়োঃ	পূর্ব্বেষাম্
সপ্তমী	পূর্ব্বস্মিন্, পূর্ব্বে	পূর্ব্বয়োঃ	পূর্ব্বেষু

ক্লীবলিঙ্গ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	পূর্ব্বম্	পূর্ব্বে	পূর্ব্বাণি
দ্বিতীয়া	পূর্ব্বম্	পূর্ব্বে	পূর্ব্বাণি

আর আর বিভক্তিতে পুংলিঙ্গের মত। স্ত্রীলিঙ্গে ঠিক সর্ব শব্দের ন্যায় কোন ভেদ নাই। পর, অপর, দক্ষিণ, উত্তর প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ পূর্ব শব্দের তুল্য।

অস্মদ্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	অহম্	আবাম্	বয়ম্
দ্বিতীয়া	মাম্, মা	আবাম্, নৌ	অস্মান্, নঃ
তৃতীয়া	ময়া	আবাভ্যাম্	অস্মাভিঃ
চতুর্থী	মহ্যম্, মে	আবাভ্যাম্, নৌ	অস্মভ্যম্, নঃ
পঞ্চমী	মৎ	আবাভ্যাম্	অস্মৎ
ষষ্ঠী	মম, মে	আবয়োঃ, নৌ	অস্মাকম্, নঃ
সপ্তমী	ময়ি	আবয়োঃ	অস্মাসু

তিন লিঙ্গেই সমান কোন ভেদ নাই।

যুষ্মদ্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ত্বম্	যুবাম্	যূয়ম্
দ্বিতীয়া	ত্বাম্, ত্বা	যুবাম্, বাম্	যুষ্মান্, বঃ
তৃতীয়া	ত্বয়া	যুবাভ্যাম্	যুষ্মাভিঃ
চতুর্থী	তুভ্যম্, তে	যুবাভ্যাম্	যুষ্মভ্যম্, বঃ
পঞ্চমী	ত্বৎ	যুবাভ্যাম্	যুষ্মৎ
ষষ্ঠী	তব, তে	যুবয়োঃ, বাম্	যুষ্মাকম্, বঃ
সপ্তমী	ত্বয়ি	যুবয়োঃ	যুষ্মাসু

তিন লিঙ্গেই সমান কোন ভেদ নাই।

পুংলিঙ্গ

ইদম্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	অয়ম্	ইমৌ	ইমে
দ্বিতীয়া	ইমম্	ইমৌ	ইমান্
তৃতীয়া	অনেন	আভ্যাম্	এভিঃ
চতুর্থী	অস্মৈ	আভ্যাম্	এভ্যঃ
পঞ্চমী	অস্মাৎ	আভ্যাম্	এভ্যঃ
ষষ্ঠী	অস্য	অনয়োঃ	এষাম্
সপ্তমী	অস্মিন্	অনয়োঃ	এষু

ক্লীবলিঙ্গ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ইদম্	ইমে	ইমানি
দ্বিতীয়া	ইদম্	ইমে	ইমানি

আর আর বিভক্তিতে ঠিক পুংলিঙ্গের মত।

স্ত্রীলিঙ্গ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ইয়ম্	ইমে	ইমাঃ
দ্বিতীয়া	ইমাম্	ইমে	ইমাঃ
তৃতীয়া	অনয়া	আভ্যাম্	আভিঃ
চতুর্থী	অস্যৈ	আভ্যাম্	আভ্যঃ
পঞ্চমী	অস্যাঃ	আভ্যাম্	আভ্যঃ
ষষ্ঠী	অস্যাঃ	অনয়োঃ	আসাম্
সপ্তমী	অস্যাম্	অনয়োঃ	আসু

পুংলিঙ্গ

কিম্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	কঃ	কৌ	কে
দ্বিতীয়া	কম্	কৌ	কান্
তৃতীয়া	কেন	কাভ্যাম্	কৈঃ
চতুর্থী	কস্মৈ	কাভ্যাম্	কেভ্যঃ
পঞ্চমী	কস্মাৎ	কাভ্যাম্	কেভ্যঃ
ষষ্ঠী	কস্য	কয়োঃ	কেষাম্
সপ্তমী	কস্মিন্	কয়োঃ	কেষু

ক্লীবলিঙ্গ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	কিম্	কে	কানি
দ্বিতীয়া	কিম্	কে	কানি

আর আর বিভক্তিতে পুংলিঙ্গের মত।

স্ত্রীলিঙ্গ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	কা	কে	কাঃ
দ্বিতীয়া	কাম্	কে	কাঃ
তৃতীয়া	কয়া	কাভ্যাম্	কাভিঃ
চতুর্থী	কস্যৈ	কাভ্যাম্	কাভ্যঃ
পঞ্চমী	কস্যাঃ	কাভ্যাম্	কাভ্যঃ
ষষ্ঠী	কস্যাঃ	কয়োঃ	কাসাম্
সপ্তমী	কস্যাম্	কয়োঃ	কাসু

পুংলিঙ্গ

যদ্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	যঃ	যৌ	যে
দ্বিতীয়া	যম	যৌ	যান
তৃতীয়া	যেন	যাভ্যাম্	যৈঃ
চতুর্থী	যস্মৈ	যাভ্যাম্	যেভ্যঃ
পঞ্চমী	যস্মাৎ	যাভ্যাম্	যেভ্যঃ
ষষ্ঠী	যস্য	যয়োঃ	যেষাম্
সপ্তমী	যস্মিন্	যয়োঃ	যেষু

ক্লীবলিঙ্গ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	যৎ	যে	যানি
দ্বিতীয়া	যৎ	যে	যানি

আর আর বিভক্তিতে পুংলিঙ্গের মত।

স্ত্রীলিঙ্গ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	যা	যে	যাঃ
দ্বিতীয়া	যাম্	যে	যাঃ
তৃতীয়া	যয়া	যাভ্যাম্	যাভিঃ
চতুর্থী	যস্যৈ	যাভ্যাম্	যাভিঃ
পঞ্চমী	যস্যাঃ	যাভ্যাম্	যাভ্যঃ
ষষ্ঠী	যস্যাঃ	যয়োঃ	যাসাম্
সপ্তমী	যস্যাম্	যয়োঃ	যাসু

পুংলিঙ্গ

তদ্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সঃ	তৌ	তে
দ্বিতীয়া	তম্	তৌ	তান
তৃতীয়া	তেন	তাভ্যাম্	তৈঃ
চতুর্থী	তস্মৈ	তাভ্যাম্	তেভ্যঃ
পঞ্চমী	তস্মাৎ	তাভ্যাম্	তেভ্যঃ
ষষ্ঠি	তস্য	তয়োঃ	তেষাম্
সপ্তমী	তস্মিন্	তয়োঃ	তেষু

ক্লীবলিঙ্গ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	তৎ	তে	তানি
দ্বিতীয়া	তৎ	তে	তানি

আর আর বিভক্তিতে পুংলিঙ্গের মত।

স্ত্রীলিঙ্গ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সা	তে	তাঃ
দ্বিতীয়া	তাম্	তে	তাঃ
তৃতীয়া	তয়া	তাভ্যাম্	তাভিঃ
চতুর্থী	তস্যৈ	তাভ্যাম্	তাভ্যঃ
পঞ্চমী	তস্যাঃ	তাভ্যাম্	তাভ্যঃ
ষষ্ঠী	তস্যাঃ	তয়োঃ	তাসাম্
সপ্তমী	তস্যাম্	তয়োঃ	তাসু

এতদ্ শব্দ অবিকল তদ্ শব্দের ন্যায় কেবল একার মাত্র অধিক আর পুংলিঙ্গে ও স্ত্রীলিঙ্গে প্রথমার একবচনে মূর্দ্ধন্য ষ হইবেক। যথা, এষঃ এষা।

পুংলিঙ্গ

অদস্ শব্দ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	অসৌ	অমূ	অমী
দ্বিতীয়া	অমুম্	অমূ	অমূন্
তৃতীয়া	অমুনা	অমূভ্যাম্	অমীভিঃ
চতুর্থী	অমুষ্মৈ	অমূভ্যাম্	অমীভ্যঃ
পঞ্চমী	অমুষ্মাৎ	অমূভ্যাম্	অমীভ্যঃ
ষষ্ঠী	অমুষ্য	অমুয়োঃ	
সপ্তমী	অমুষ্মিন্	অমুয়োঃ	

ক্লীবলিঙ্গ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	অদঃ	অমূ	
দ্বিতীয়া	অদঃ	অমূ	অমূনি

আর আর বিভক্তিতে পুংলিঙ্গের মত।

স্ত্রীলিঙ্গ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	অসৌ	অমূ	অমূঃ
দ্বিতীয়া	অমূম্	অমূ	অমূঃ
তৃতীয়া	অমূয়া	অমূভ্যাম্	অমূভিঃ
চতুর্থী	অমূষ্যৈ	অমূভ্যাম্	অমূভ্যঃ
পঞ্চমী	অমূষ্যাঃ	অমূভ্যাম্	অমূভ্যঃ
ষষ্ঠী	অমূষ্যাঃ	অমূয়োঃ	অমূষাম্
সপ্তমী	অমূষ্যাম্	অমূয়োঃ	অমূষু

সংখ্যাবাচক

এক শব্দ

এক শব্দ তিন লিঙ্গেই সর্ব শব্দের তুল্য কোন ভেদ নাই।

দ্বিশব্দ—দ্বিবচনান্ত

	পুংলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ
	দ্বিবচন	দ্বিবচন
প্রথমা	দ্বৌ	দ্বে
দ্বিতীয়া	দ্বৌ	দ্বে
তৃতীয়া	দ্বাভ্যাম্	দ্বাভ্যাম্
চতুর্থী	দ্বাভ্যাম্	দ্বাভ্যাম্
পঞ্চমী	দ্বাভ্যাম্	দ্বাভ্যাম্
ষষ্ঠী	দ্বয়োঃ	দ্বয়োঃ
সপ্তমী	দ্বয়োঃ	দ্বয়োঃ

স্ত্রীলিঙ্গে ঠিক ক্লীবলিঙ্গের ন্যায়।

ত্রি শব্দ—বহুবচনান্ত

	পুংলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
	বহুবচন	বহুবচন	বহুবচন
প্রথমা	ত্রয়ঃ	ত্রীণি	তিস্রঃ
দ্বিতীয়া	ত্রীন্	ত্রীণি	তিস্রঃ
তৃতীয়া	ত্রিভিঃ	ত্রিভিঃ	তিসৃভিঃ
চতুর্থী	ত্রিভ্যঃ	ত্রিভ্যঃ	তিসৃভ্যঃ
পঞ্চমী	ত্রিভ্যঃ	ত্রিভ্যঃ	তিসৃভ্যঃ
ষষ্ঠী	ত্রয়াণাম্	ত্রয়াণাম্	তিসৃণাম্
সপ্তমী	ত্রিষু	ত্রিষু	তিসৃষু

চতুর্ শব্দ—বহুবচনান্ত

	পুংলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
	বহুবচন	বহুবচন	বহুবচন
প্রথমা	চত্বারঃ	চত্বারি	চতস্রঃ
দ্বিতীয়া	চতুরঃ	চত্বারি	চতস্রঃ
তৃতীয়া	চতুর্ভিঃ	চতুর্ভিঃ	চতসৃভিঃ
চতুর্থী	চতুর্ভ্যঃ	চতুর্ভ্যঃ	চতসৃভ্যঃ
পঞ্চমী	চতুর্ভ্যঃ	চতুর্ভ্যঃ	চতসৃভ্যঃ
ষষ্ঠী	চতুর্ণাম্	চতুর্ণাম্	চতসৃণাম্
সপ্তমী	চতুর্ষু	চতুর্ষু	চতসৃষু

ষষ্ শব্দ—বহুবচনান্ত

প্র	দ্বি	তৃ	চ	প	ষ	স
ষট্	ষট্	ষড্ভিঃ	ষড্ভ্যঃ	ষড্ভ্যঃ	ষণ্ণাম্	ষট্সু

তিন লিঙ্গেই এইরূপ।

অষ্টন্ শব্দ—বহুবচনান্ত

	বহুবচন
প্রথমা	অষ্টৌ, অষ্ট
দ্বিতীয়া	অষ্টৌ, অষ্ট
তৃতীয়া	অষ্টাভিঃ, অষ্টভিঃ
চতুর্থী	অষ্টাভ্যঃ, অষ্টভ্যঃ
পঞ্চমী	অষ্টাভ্যঃ, অষ্টভ্যঃ
ষষ্ঠী	অষ্টানাম্
সপ্তমী	অষ্টাসু, অষ্টসু

তিন লিঙ্গেই সমান।

পঞ্চন্ শব্দ—বহুবচনান্ত

	বহুবচন
প্রথমা	পঞ্চ
দ্বিতীয়া	পঞ্চ
তৃতীয়া	পঞ্চভিঃ
চতুর্থী	পঞ্চভ্যঃ
পঞ্চমী	পঞ্চভ্যঃ
ষষ্ঠী	পঞ্চানাম্
সপ্তমী	পঞ্চসু

সপ্তন্, নবন্, দশন্ প্রভৃতি সমুদায় নকারান্ত সংখ্যাবাচক শব্দ পঞ্চন্ শব্দের তুল্য।

অব্যয় শব্দ

কতকগুলি শব্দ এরূপ আছে যে তাহাদের উত্তর বিভক্তি থাকে না। সুতরাং যেমন শব্দ তেমনই থাকে কোন পরিবর্ত হয় না। এই সকল শব্দকে অব্যয় বলে। যথা, প্রাতঃ, উচ্চৈঃ, ধিক্। প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব, অনু, নির্, দুর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ। যদি ক্রিয়ার সহিত যোগ হয় তাহা হইলে প্র অবধি আ পর্যন্ত কুড়িটি অব্যয়কে উপসর্গ বলা যায়।

কারক

কারক ছয় প্রকার ; কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ

কর্তা

যে করে সে কর্তা , কর্তায় প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা, দেবদত্তো গচ্ছতি, দেবদত্ত গমন করিতেছে। বালকো রোদিতি, বালক রোদন করিতেছে। মৃগো ধাবতি, মৃগ দৌড়িতেছে , মৃগৌ ধাবতঃ, দুই মৃগ দৌড়িতেছে ; মৃগা ধাবন্তি, অনেক মৃগ দৌড়িতেছে।

কর্ম

যাহা করা যায়, যাহা দেখা যায়, যাহা খাওয়া যায়, যাহা পান করা যায়, দান করা যায়, স্পর্শ করা যায় ইত্যাদিকে কর্মকারক বলে। কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, পাকং করোতি, পাক করিতেছে। পূজাং করোতি, পূজা করিতেছে। চন্দ্রং পশ্যতি, চন্দ্র দেখিতেছে। মুখং পশ্যতি, মুখ দেখিতেছে। অন্নং ভুঙ্‌ক্তে, অন্ন খাইতেছে। দুগ্ধং পিবতি, দুগ্ধ পান করিতেছে। ধনং দদাতি, ধন দান করিতেছে। গাত্রং স্পৃশতি, গাত্র স্পর্শ করিতেছে। শত্রুং জয়তি, শত্রু জয় করিতেছে। শাস্ত্রম্‌ অধীতে, শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে। পুষ্পং চিনোতি, পুষ্প চয়ন করিতেছে। গুরুং পৃচ্ছতি, গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতেছে। গ্রামং গচ্ছতি, গ্রামে যাইতেছে ইত্যাদি।

করণ

যাহা দ্বারা কর্ম নিষ্পন্ন হয় তাহাকে করণ কারক বলে। করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, হস্তেন গৃহ্নাতি, হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিতেছে। চক্ষুষা পশ্যতি, চক্ষুঃ দ্বারা দেখিতেছে। দন্তেন চর্বয়তি, দন্ত দ্বারা চর্বণ করিতেছে। দণ্ডেন তাড়য়তি, দণ্ড দ্বারা তাড়ন করিতেছে। জলেন অগ্নিং নির্বাপয়তি, জল দ্বারা অগ্নি নির্বাণ করিতেছে।

সম্প্রদান

যাহাকে দান করা যায় তাহাকে সম্প্রদান কারক বলে। সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা, দরিদ্রায় ধনং দীয়তাম, দরিদ্রকে ধন দাও। দীনেভ্যঃ অন্নং দেহী, দীনজনদিগকে অন্ন দাও। মহ্যং পুস্তকং দেহি, আমাকে পুস্তক দাও।

অপাদান

যাহা হইতে কোন বস্তু বা ব্যক্তি, চলিত, ভীত ও গৃহীত হয় তাহাকে অপাদান কারক বলে। অপাদন কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা, বৃক্ষাৎ পত্রং পততি, বৃক্ষ হইতে পত্র পতিত হইতেছে। ব্যাঘ্রাৎ বিভেতি, ব্যাঘ্র হইতে ভীত হইতেছে। সরোবরাৎ জলং গৃহ্লাতি, সরোবর হইতে জল গ্রহণ করিতেছে।

অধিকরণ

অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। অধিকরণ দুই প্রকার , কাল ও আধার। যে সময়ে কোন কর্ম হয় অথবা কোন কর্ম করা যায় তাহাকে কালাধিকরণ কহে। যথা, বর্ষাসু বৃষ্টির্ভবতি, বর্ষাকালে বৃষ্টি হয়। সায়ংকালে সূর্যোঽস্তংযাতি, সায়ংকালে সূর্য অস্ত যায়। রাত্রৌ চন্দ্র উদেতি, রাত্রিকালে চন্দ্র উদয় হয়। যাহার ভিতরে অথবা উপরে কোন বস্তু বা ব্যক্তি থাকে তাহাকে আধারাধিকরণ কহে। যথা, গৃহে তিষ্ঠতি, গৃহের ভিতর আছে। নদ্যাং স্নাতি, নদীতে স্নান করিতেছে। শয্যায়াং শেতে, শয্যায় শয়ন করিয়া আছে।

সম্বন্ধ

সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা, মম হস্তঃ, আমার হাত। তব পুত্রঃ, তোমার পুত্র। নদ্যাঃ জলম্, নদীর জল। বৃক্ষস্য শাখা, বৃক্ষের শাখা। কোকিলস্য কলরবং, কোকিলের কলরব। প্রভোরাদেশঃ, প্রভুর আদেশ।

সম্বোধনে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা, হে পিতঃ, হে ভ্রাতরৌ, হে পুত্রাঃ ইত্যাদি।

যে স্থলে কর্ম পদ ক্রিয়া পদ প্রভৃতি না থাকে, কেবল কোন বস্তু বা ব্যক্তি বুঝাইবার নিমিত্ত শব্দ প্রয়োগ করা যায়, সেখানে সেই শব্দের উত্তর প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা, বৃক্ষঃ, নদী, পুষ্পম্, জলম্ নরঃ, মহিষঃ, রাজা, গৃহম্, পুস্তকম্, অন্নম্, বস্ত্রম্ ইত্যাদি।

ধিক্ প্রতি ইত্যাদি কতকগুলি শব্দের যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, পাপিনং ধিক্, পাপিকে ধিক্। কৃপণং ধিক্, কৃপণকে ধিক্। প্রভো মাং প্রতি সদয়োভব, হে প্রভো আমার প্রতি সদয় হও। দীনং প্রতি দয়া উচিতা, দীনের প্রতি দয়া করা উচিত।

ক্রিয়ার বিশেষণে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, শীঘ্রং গচ্ছতি, শীঘ্র যাইতেছে। সত্বরং ধাবতি, সত্বর যাইতেছে। মধুরং হসতি, মধুর হাসিতেছে।

সহ, সার্দ্ধম্, অলম্ ইত্যাদি কতকগুলি শব্দের যোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, রামোলক্ষ্মণেন সহ বনং জগাম, রাম লক্ষ্মণের সহিত বনে গিয়াছিলেন। কেনাপি সার্দ্ধং বিরোধো ন কর্তব্যঃ, কাহারও সহিত বিরোধ করা কর্তব্য নহে। বিবাদেন অলম্, বিবাদে প্রয়োজন নাই।

নিমিত্ত অর্থে ও নমঃ শব্দের যোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা, জ্ঞানায় অধ্যয়নম্, জ্ঞানের নিমিত্ত অধ্যয়ন। সুখায় ধনোপার্জ্জম্, সুখের নিমিত্ত ধনোপার্জ্জন। পরোপকারায় সতাং জীবনম্, পরোপকারের নিমিত্ত সাধুদিগের জীবন। গুরবে নমঃ, গুরুকে প্রণাম। পিত্রে নমঃ, পিতাকে প্রণাম।

হেতু ও অপেক্ষা অর্থ বুঝিতে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা হর্ষাৎ নৃত্যতি, হর্ষ হেতু নৃত্য করিতেছে। দুঃখাৎ রোদিতি, দুঃখ হেতু রোদন করিতেছে। ধনাৎ বিদ্যা গরীয়সী, ধন অপেক্ষা বিদ্যার গৌরব অধিক।

অন্য, পৃথক্ ইত্যাদি কতকগুলি শব্দের যোগে পঞ্চমী হয়। যথা, মিত্রাদন্যঃ কঃ পরিত্রাতুং সমর্থঃ, মিত্র ভিন্ন অন্য কে পরিত্রাণ করিতে পারে। ইদম্ অস্মাৎ পৃথক্, ইহা হইতে ইহা পৃথক্।

বিনা শব্দের যোগে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও পঞ্চমী হয়। যথা, বিদ্যাং বিনা বৃথা জীবনম্, বিদ্যা বিনা বৃথা জীবন। যত্নেন বিনা কিমপি ন সিদ্ধ্যতি, বিনা যত্নে কিছুই সিদ্ধ হয় না। পাপাৎ বিনা দুঃখং ন ভবতি, পাপ না করিলে দুঃখ হয় না।

ঋতে শব্দের যোগে দ্বিতীয়া ও পঞ্চমী হয়। যথা, শ্রমম্ ঋতে বিদ্যা ন ভবতি, শ্রম না করিলে বিদ্যা হয় না। ধর্মাৎ ঋতে সুখং ন ভবতি, ধর্ম ব্যাতিরেকে সুখ হয় না।

সম, তুল্য, সমান, সদৃশ ইত্যাদি শব্দের যোগে তৃতীয়া ও ষষ্ঠী হয়। যথা, বিদ্যয়া সমং ধনং নাস্তি, বিদ্যার সমান ধন নাই। বিনয়স্য তুল্যো গুণো নাস্তি, বিনয়ের তুল্য গুণ নাই।

বিশেষ্য বিশেষণ

যাহা দ্বারা কেবল কোন বস্তু বা ব্যক্তি বোধ হয় তাহাকে বিশেষ্য পদ কহে। যথা, গৃহম্, জলম্, বৃক্ষ, লতা, নৌকা, বস্ত্রম্, পুস্তকম্, পৃথিবী, চন্দ্রঃ সূর্যঃ, নক্ষত্রম্ পুরুষঃ, শিশুঃ ইত্যাদি।

যাহা দ্বারা বিশেষ্যের গুণ ও অবস্থা প্রকাশ হয় তাহাকে বিশেষণ পদ কহে। বিশেষণ পদ প্রায় বিশেষ্যের পূর্বে থাকে। যথা নূতনং গৃহম্। নির্মলং জলম্। ফলবান্ বৃক্ষঃ।

পুষ্পিতা লতা। ভগ্না নৌকা। ছিন্নং বস্ত্রম্। উত্তমং পুস্তকম্। গোলাকারা পৃথিবী। শীতলঃ চন্দ্রঃ। প্রদীপ্তঃ সূর্যঃ। উজ্জ্বলং নক্ষত্রম্। ধার্মিকঃ পুরুষঃ। সুশীলঃ শিশুঃ। কতকগুলি বিশেষ্য শব্দ পুংলিঙ্গ, কতকগুলি স্ত্রীলিঙ্গ, কতকগুলি ক্লীবলিঙ্গ হয়। বিশেষণ শব্দের স্বতন্ত্র কোন লিঙ্গ হয় না। বিশেষ্য শব্দের যে লিঙ্গ, বিশেষণ শব্দেরও সেই লিঙ্গ হয়। যথা, সুন্দরঃ শিশুঃ, সুন্দরী কন্যা, সুন্দরং গৃহম্। উজ্জ্বলঃ চন্দ্রঃ, উজ্জ্বলং নক্ষত্রম্, উজ্জ্বলা দীপশিখা। বুদ্ধিমান্ পুরুষঃ, বুদ্ধিমতী স্ত্রী। নির্মলা বুদ্ধিঃ, নির্মলং জলম্। বিশেষ্য পদ যে বচনের, বিশেষণ পদও সেই বচনের হয়, অর্থাৎ বিশেষ্য পদ একবচনান্ত হইলে বিশেষণ পদও একবচনান্ত হয়। বিশেষ্য পদ বহুবচনান্ত হইলে বিশেষণ পদও বহুবচনান্ত হয়। যথা, বলবান সিংহঃ, বলবন্তৌ সিংহৌ, বলবন্তঃ সিংহাঃ। বেগবতী নদী বেগবত্যৌ নদ্যৌ, বেগবত্যঃ নদ্যঃ। নিবিড়িং বনম্, নিবিড়ে বনে, নিবিড়ানি বনানি। বিশেষ্য পদের যে বিভক্তি বিশেষণ পদেও সেই বিভক্তি হয। যথা, সুন্দরঃ শিশুঃ। সুন্দরং শিশুম্। সুন্দরেণ শিশুনা। সুন্দরায় শিশবে। সুন্দরাৎ শিশোঃ। সুন্দরস্য শিশোঃ। সুন্দরে শিশৌ। নির্মলং জলম্। নির্মলেন জলেন। নির্মলস্য জলস্য। নির্মলে জলে।

তিঙন্ত প্রকরণ

ভূ, স্থা, গম, দৃশ প্রভৃতিকে ধাতু বলে। এক এক ধাতুতে এক এক ক্রিয়া বুঝায় ধাতুর উত্তর নানা বিভক্তি হয়। ঐ সকল বিভক্তির নাম তিঙ্। এই নিমিত্ত ক্রিয়াবাচক পদকে তিঙন্ত বলে।

ক্রিয়া তিন কালে হয়, বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ। যাহা উপস্থিত আছে তাহাকে বর্তমান কাল বলে। যথা, পশ্যতি, দেখিতেছে; পশ্যামি, দেখিতেছি। করোতি, করিতেছে, করোমি করিতেছি। যাহা গত হইয়াছে তাহাকে অতীত কাল বলে। যথা, দদর্শ, দেখিল, দেখিয়াছে, দেখিয়াছিল। চকার, করিল, করিয়াছে, করিয়াছিল। আর যাহা পরে হইবেক তাহাকে ভবিষ্যৎ কাল বলে। যথা, গমিষ্যামি, যাইব, করিষ্যামি, করিব।

ক্রিয়ার তিন বচন, একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন। একবচনে একজনের ক্রিয়া বুঝায়

দ্বিবচনে দুজনের ক্রিয়া বুঝায়; বহুবচনে অনেক জনের ক্রিয়া বুঝায়। যথা, গচ্ছামি, আমি যাইতেছি; গচ্ছাবঃ, আমরা দুজন যাইতেছি; গচ্ছামঃ, আমরা অনেকে যাইতেছি। গমিষ্যতি, এক জন যাইবে; গমিষ্যতঃ, দুজন যাইবে; গমিষ্যন্তি, অনেক জন যাইবে।

প্রথম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও উত্তম পুরুষে ধাতুর উত্তর ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তি হয়; সুতরাং ক্রিয়াবাচক পদ সকলের রূপ ভিন্ন ভিন্ন। যুষ্মদ্ শব্দে মধ্যম পুরুষ বুঝায়; অস্মদ্ শব্দে উত্তম পুরুষ; তদ্ভিন্ন সমুদায় প্রথম পুরুষ। যথা, ত্বং গচ্ছসি, তুমি যাইতেছ। অহং গচ্ছামি. আমি যাইতেছি। রাজা গচ্ছতি, রাজা যাইতেছেন। শিশু গচ্ছতি, শিশু যাইতেছে। অশ্বো গচ্ছতি, অশ্ব যাইতেছে।

ধাতু অনেক। তন্মধ্যে কোন কোন ধাতুর উত্তর নব্বইটি বিভক্তি হয়; কোন কোন ধাতুর উত্তর এক শত আশী। সুতরাং সকল ধাতুর সকল বিভক্তিতে উদাহরণ দেখাইতে গেলে অনেক বাহুল্য হয়। অতএব স্থূল জ্ঞানার্থে কোন কোন ধাতুর কোন কোন বিভক্তিতে উদাহরণ দেখান যাইতেছে।

জিধাতু

বর্ত্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	জয়তি	জয়তঃ	জয়ন্তি
মধ্যম	জয়সি	জয়থঃ	জয়থ
উত্তম	জয়ামি	জয়াবঃ	জয়ামঃ

অতীত কাল

প্রথম	অজয়ৎ	অজয়তাম্	অজয়ন্
মধ্যম	অজয়ঃ	অজয়তম্	অজয়ত
উত্তম	অজয়ম্	অজয়াব	অজয়াম

ভবিষ্যৎ কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	জেষ্যতি	জেষ্যতঃ	জেষ্যন্তি
মধ্যম	জেষ্যসি	জেষ্যথঃ	জেষ্যথ
উত্তম	জেষ্যামি	জেষ্যাবঃ	জেষ্যামঃ

স্থাধাতু

বর্ত্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	তিষ্ঠতি	তিষ্ঠতঃ	তিষ্ঠন্তি
মধ্যম	তিষ্ঠসি	তিষ্ঠথঃ	তিষ্ঠথ
উত্তম	তিষ্ঠামি	তিষ্ঠাবঃ	তিষ্ঠামঃ
প্রথম	তিষ্ঠতু	তিষ্ঠতাম্	তিষ্ঠন্তু
মধ্যম	তিষ্ঠ	তিষ্ঠতম্	তিষ্ঠত
উত্তম	তিষ্ঠানি	তিষ্ঠাব	তিষ্ঠাম

দৃশধাতু

বর্ত্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	পশ্যতি	পশ্যতঃ	পশ্যন্তি
মধ্যম	পশ্যসি	পশ্যথঃ	পশ্যথ
উত্তম	পশ্যামি	পশ্যাবঃ	পশ্যামঃ
প্রথম	পশ্যতু	পশ্যতাম্	পশ্যন্তু
মধ্যম	পশ্য	পশ্যতম্	পশ্যত
উত্তম	পশ্যানি	পশ্যাব	পশ্যাম

অতীত কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	দদর্শ	দদৃশতুঃ	দদৃশুঃ
মধ্যম	দদর্শিথ, দদ্রষ্ঠ	দদৃশথুঃ	দদৃশ
উত্তম	দদর্শ	দদৃশিব	দদৃশিম

ভবিষ্যৎ কাল

প্রথম	দ্রক্ষ্যতি	দ্রক্ষ্যতঃ	দ্রক্ষ্যন্তি
মধ্যম	দ্রক্ষ্যসি	দ্রক্ষ্যথঃ	দ্রক্ষ্যথ
উত্তম	দ্রক্ষ্যামি	দ্রক্ষ্যাবঃ	দ্রক্ষ্যামঃ

গমধাতু

বর্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	গচ্ছতি	গচ্ছতঃ	গচ্ছন্তি
মধ্যম	গচ্ছসি	গচ্ছথঃ	গচ্ছথ
উত্তম	গচ্ছামি	গচ্ছাবঃ	গচ্ছামঃ
প্রথম	গচ্ছতু	গচ্ছতাম্	গচ্ছন্তু
মধ্যম	গচ্ছ	গচ্ছতম্	গচ্ছত
উত্তম	গচ্ছানি	গচ্ছাব	গচ্ছাম

অতীত কাল

প্রথম	জগাম	জগ্মতুঃ	জগ্মুঃ
মধ্যম	জগমিথ, জগন্থ	জগ্মথুঃ	জগ্ম
উত্তম	জগাম, জগম	জগ্মিব	জগ্মিম

ভবিষ্যৎ কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	গমিষ্যতি	গমিষ্যতঃ	গমিষ্যন্তি
মধ্যম	গমিষ্যসি	গমিষ্যথঃ	গমিষ্যথ
উত্তম	গমিষ্যামি	গমিষ্যাবঃ	গমিষ্যামঃ

শ্রুধাতু

বর্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	শৃণোতি	শৃণুতঃ	শৃণ্বন্তি
মধ্যম	শৃণোষি	শৃণুথঃ	শৃণুথ
উত্তম	শৃণোমি	শৃণ্বঃ, শৃণুবঃ	শৃণ্মঃ, শৃণুমঃ
প্রথম	শৃণোতু	শৃণুতাম্	শণ্বন্তু
মধ্যম	শৃণু	শৃণুতম্	শৃণুত
উত্তম	শৃণবানি	শৃণবাব	শৃণবাম

অতীত কাল

প্রথম	শুশ্রাব	শুশ্রুবতুঃ	শুশ্রুবু
মধ্যম	শুশ্রোথ	শুশ্রুবথুঃ	শুশ্রুব
উত্তম	শুশ্রাব, শুশ্রব	শুশ্রুব	শুশ্রুম

ভবিষ্যৎ কাল

প্রথম	শ্রোষ্যতি	শ্রোষ্যতঃ	শ্রোষ্যন্তি
মধ্যম	শ্রোষ্যসি	শ্রোষ্যথঃ	শ্রোষ্যথ
উত্তম	শ্রোষ্যামি	শ্রোষ্যাবঃ	শ্রোষ্যামঃ

বৃতধাতু

বর্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	বর্ত্ততে	বর্ত্তেতে	বর্ত্তন্তে
মধ্যম	বর্ত্তসে	বর্ত্তেথে	বর্ত্তধ্বে
উত্তম	বর্ত্তে	বর্ত্তাবহে	বর্ত্তামহে

সদধাতু

বর্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	সীদতি	সীদতঃ	সীদন্তি
মধ্যম	সীদসি	সীদথঃ	সীদথ
উত্তম	সীদামি	সীদাবঃ	সীদামঃ

যাধাতু

বর্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	যাতি	যাতঃ	যান্তি
মধ্যম	যাসি	যাথঃ	যাথ
উত্তম	যামি	যাবঃ	যামঃ

ভবিষ্যৎ কাল

প্রথম	যাস্যতি	যাস্যতঃ	যাস্যন্তি
মধ্যম	যাস্যসি	যাস্যথঃ	যাস্যথ
উত্তম	যাস্যামি	যাস্যাবঃ	যাস্যামঃ

অস্‌ধাতু

বর্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	অস্তি	স্তঃ	সন্তি
মধ্যম	অসি	স্থঃ	স্থ
উত্তম	অস্মি	স্বঃ	স্মঃ
প্রথম	স্যাৎ	স্যাতাম্	স্যুঃ
মধ্যম	স্যাঃ	স্যাতম্	স্যাত
উত্তম	স্যাম্	স্যাব	স্যাম
প্রথম	অস্তু	স্তাম্	সন্তু
মধ্যম	এধি	স্তম্	স্ত
উত্তম	অসানি	অসাব	অসাম

অতীত কাল

প্রথম	আসীৎ	আস্তাম্	আসন্
মধ্যম	আসীঃ	আস্তম্	আস্ত
উত্তম	আসম্	আস্ব	আস্ম

ইধাতু

বর্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	এতি	ইতঃ	যন্তি
মধ্যম	এষি	ইথঃ	ইথ
উত্তম	এমি	ইবঃ	ইমঃ
প্রথম	এতু	ইতাম্	যন্তু
মধ্যম	ইহি	ইতম্	ইত
উত্তম	অয়ানি	অয়াব	অয়াম

ভবিষ্যৎ কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	এষ্যতি	এষ্যতঃ	এষ্যন্তি
মধ্যম	এষ্যসি	এষ্যথঃ	এষ্যথঃ
উত্তম	এষ্যামি	এষ্যাবঃ	এষ্যামঃ

রুদধাতু

বর্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	রোদিতি	রুদিতঃ	রুদন্তি
মধ্যম	বোদিষি	রুদিথঃ	রুদিথ
উত্তম	রোদিমি	রুদিবঃ	রুদিমঃ

শীধাতু

বর্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	শেতে	শয়াতে	শেরতে
মধ্যম	শেষে	শয়াথে	শেধ্বে
উত্তম	শয়ে	শেবহে	শেমহে

ব্রূধাতু

বর্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	আহ, ব্রবীতি	আহতুঃ, ব্রূতঃ	আহুঃ, ব্রুবন্তি
মধ্যম	আত্থ, ব্রবীষি	আহথুঃ, ব্রূথঃ	ব্রূথ
উত্তম	ব্রবীমি	ব্রূবঃ	ব্রূমঃ

দাধাতু

বর্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	দদাতি	দত্তঃ	দদতি
মধ্যম	দদাসি	দত্থঃ	দত্থ
উত্তম	দদামি	দদ্বঃ	দদ্মঃ

অতীত কাল

প্রথম	দদৌ	দদতুঃ	দদুঃ
মধ্যম	দদিথ, দদাথ	দদথুঃ	দদ
উত্তম	দদৌ	দদিব	দদিম

ভবিষ্যৎ কাল

প্রথম	দাস্যতি	দাস্যতঃ	দাস্যন্তি
মধ্যম	দাস্যসি	দাস্যথঃ	দাস্যথ
উত্তম	দাস্যামি	দাস্যাবঃ	দাস্যামঃ

জনধাতু

বর্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	জায়তে	জায়েতে	জায়ন্তে
মধ্যম	জায়সে	জায়েথে	জায়ধ্বে
উত্তম		জায়াবহে	জায়ামহে

মুচধাতু

বর্ত্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	মুঞ্চতি	মুঞ্চতঃ	মুঞ্চন্তি
মধ্যম	মুঞ্চসি	মুঞ্চথঃ	মুঞ্চথ
উত্তম	মুঞ্চামি	মুঞ্চাবঃ	মুঞ্চামঃ
প্রথম	মুঞ্চতু	মুঞ্চতাম্	মুঞ্চন্তু
মধ্যম	মুঞ্চ	মুঞ্চতম্	মুঞ্চত
উত্তম	মুঞ্চানি	মুঞ্চাব	মুঞ্চাম

কৃধাতু

বর্ত্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	করোতি	কুরুতঃ	কুর্ব্বন্তি
মধ্যম	করোষি	কুরুথঃ	কুরুথ
উত্তম	করোমি	কুর্ব্বঃ	কুর্ম্মঃ
প্রথম	কুর্য্যাৎ	কুর্য্যাতাম্	কুর্য্যুঃ
মধ্যম	কুর্য্যাঃ	কুর্য্যাতম্	কুর্য্যাত
উত্তম	কুর্য্যাম্	কুর্য্যাব	কুর্য্যাম্
প্রথম	করোতু	কুরুতাম	কুর্ব্বন্তু
মধ্যম	কুরু	কুরুতম্	কুরুত
উত্তম	করবাণি	করবাব	করবাম

অতীত কাল

প্রথম	অকরোৎ	অকুরুতাম্	অকুর্ব্বন্
মধ্যম	অকরোঃ	অকুরুতম্	অকুরুত
উত্তম	অকরবম্	অকুর্ব্ব	অকুর্ম্ম

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	চকার	চক্রতুঃ	চক্রুঃ
মধ্যম	চকর্থ	চক্রথুঃ	চক্র
উত্তম	চকার, চকর	চকৃব	চকৃম

ভবিষ্যৎ কাল

প্রথম	করিষ্যতি	করিষ্যতঃ	করিষ্যন্তি
মধ্যম	করিষ্যসি	করিষ্যথঃ	করিষ্যথ
উত্তম	করিষ্যামি	করিষ্যাবঃ	করিষ্যামঃ

জ্ঞাধাতু

বর্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	জানাতি	জানীতঃ	জানন্তি
মধ্যম	জানাসি	জানীথঃ	জানীথঃ
উত্তম	জানামি	জানীবঃ	জানীমঃ

ভবিষ্যৎ কাল

প্রথম	জ্ঞাস্যতি	জ্ঞাস্যতঃ	জ্ঞাস্যন্তি
মধ্যম	জ্ঞাস্যসি	জ্ঞাস্যথঃ	জ্ঞাস্যথ
উত্তম	জ্ঞাস্যামি	জ্ঞাস্যাবঃ	জ্ঞাস্যামঃ

গ্রহধাতু

বর্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	গৃহ্নাতি	গৃহ্নীত	গৃহ্নন্তি
মধ্যম	গৃহ্নাসি	গৃহ্নীথঃ	গৃহ্নীথ
উত্তম	গৃহ্নামি	গৃহ্নীবঃ	গৃহ্নীমঃ

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	গৃহ্ণাতু	গৃহ্ণীতাম্	গৃহ্ণন্তু
মধ্যম	গৃহাণ	গৃহ্ণীতম্	গৃহ্ণীত
উত্তম	গৃহ্ণানি	গৃহ্ণাব	গৃহ্ণাম

অতীত কাল

প্রথম	জগ্রাহ	জগৃহতু	জগৃহুঃ
মধ্যম	জগ্রহিথ	জগৃহথুঃ	জগৃহ
উত্তম	জগ্রাহ, জগ্রহ	জগৃহিব	জগৃহিম

ভূধাতু

বর্তমান কাল

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	ভবতি	ভবতঃ	ভবন্তি
মধ্যম	ভবসি	ভবথঃ	ভবথ
উত্তম	ভবামি	ভবাবঃ	ভবামঃ
প্রথম	ভবেৎ	ভবেতাম্	ভবেয়ুঃ
মধ্যম	ভবেঃ	ভবেতম্	ভবেত
উত্তম	ভবেয়ম্	ভবেব	ভবেম
প্রথম	ভবতু	ভবতাম্	ভবন্তু
মধ্যম	ভব	ভবতম্	ভবত
উত্তম	ভবানি	ভবাব	ভবাম

অতীত কাল

প্রথম	অভবৎ	অভবতাম্	অভবন্
মধ্যম	অভবঃ	অভবতম্	অভবত
উত্তম	অভবম্	অভবাব	অভবাম

পুরুষ	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথম	অভূৎ	অভূতাম্	অভূবন্
মধ্যম	অভূঃ	অভূতম্	অভূত
উত্তম	অভূবম্	অভূব	অভূম
প্রথম	বভূব	বভূবতুঃ	বভূবুঃ
মধ্যম	বভূবিথ	বভূবথুঃ	বভূব
উত্তম	বভূব	বভূবিব	বভূবিম

ভবিষ্যৎ কাল

প্রথম	ভবিষ্যতি	ভবিষ্যতঃ	ভবিষ্যন্তি
মধ্যম	ভবিষ্যসি	ভবিষ্যথঃ	ভবিষ্যথ
উত্তম	ভবিষ্যামি	ভবিষ্যাবঃ	ভবিষ্যামঃ

সকর্মক ক্রিয়া

যে ক্রিয়ার সহিত কর্ম পদ থাকে তাহাকে সকর্মক অর্থাৎ কর্মযুক্ত ক্রিয়া কহে। গুরুঃ শিষ্যম্ উপদিশতি, গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিতেছেন। রামঃ রাবণং জঘান, রাম রাবণ বধ করিয়াছিলেন।

অকর্মক ক্রিয়া

যে সকল ক্রিয়ার কর্মপদ আবশ্যক করে না তাহাকে অকর্মক অর্থাৎ কর্মশূন্য ক্রিয়া কহে। যথা, অহং তিষ্ঠামি, আমি আছি। শিশুঃ শেতে, শিশু শুইয়া আছে। অশ্বো ধাবতি, অশ্ব দৌড়িতেছে। নদী বর্দ্ধতে, নদী বাড়িতেছে।

কর্তৃবাচ্য

যেখানে কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি ও কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় তাহাকে কর্তৃবাচ্য প্রয়োগ বলে। যথা কুম্ভকারঃ ঘটং করোতি, কুম্ভকার ঘট গড়িতেছে। দেবদত্তঃ গ্রামং গচ্ছতি, দেবদত্ত গ্রামে যাইতেছে। শিশুঃ পুস্তকং পঠতি, শিশু পুস্তক পড়িতেছে। অশ্বঃ জলং পিবতি, অশ্ব জল খাইতেছে।

কর্তৃবাচ্যে কর্তার যে বচন ক্রিয়াতেও সেই বচন হয়, অর্থাৎ কর্তা একবচনের হইলে ক্রিয়াতে একবচন; কর্তা দ্বিবচনের হইলে ক্রিয়াতে দ্বিবচন; কর্তা বহুবচনের হইলে

ক্রিয়াতে বহুবচন। যথা, কুম্ভকারঃ ঘটং করোতি। কুম্ভকারৌ ঘটং কুরুতঃ। কুম্ভকারাঃ ঘটং কুর্ব্বন্তি। শিশুঃ পুস্তকং পঠতি। শিশূ পুস্তকং পঠতঃ। শিশবঃ পুস্তকং পঠন্তি।

কর্মবাচ্য

যে স্থলে কর্তৃকারকে তৃতীয়া বিভক্তি ও কর্মকারকে প্রথমা বিভক্তি হয় তাহাকে কর্মবাচ্য প্রয়োগ বলে। যথা, কুম্ভকারেণ ঘটঃ ক্রিয়তে, কুম্ভকার ঘট নির্মাণ করিতেছে। শিষ্যেণ গুরুঃ পৃচ্ছ্যতে, শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতেছে। ময়া চন্দ্রো দৃশ্যতে, আমি চন্দ্র দেখিতেছি।

কর্তৃবাচ্যে যেমন কর্তৃকারকের বচনানুসারে ক্রিয়ার বচন হয়, কর্মবাচ্য প্রয়োগে সেরূপ নহে। কর্মবাচ্যে কর্মের যে বচন ক্রিয়ার সেই বচন হয়; অর্থাৎ কর্ম একবচনের হইলে ক্রিয়ার একবচন; কর্ম দ্বিবচনেব হইলে ক্রিয়ার দ্বিবচন; কর্ম বহুবচনের হইলে ক্রিয়ার বহুবচন। যথা, কুম্ভকারেণ ঘটঃ ক্রিয়তে, কুম্ভকারেণ ঘটৌ ক্রিয়েতে, কুম্ভকারেণ ঘটাঃ ক্রিয়স্তে। শিষ্যেণ গুরুঃ পৃচ্ছ্যতে, শিষ্যেণ গুরু পৃচ্ছ্যেতে, শিষ্যেণ গুরবঃ পৃচ্ছ্যস্তে।

ভাববাচ্য

যেখানে কর্তৃকারকে তৃতীয়া হয়, কিন্তু কর্ম পদ না থাকে, তাহাকে ভাববাচ্য প্রয়োগ বলে। ভাববাচ্যের ক্রিয়া সর্বদাই একবচনান্ত হয়। যথা ময়া স্থীয়তে, আমি আছি। আবাভ্যাং স্থীয়তে. আমরা দুজন আছি। অস্মাভিঃ স্থীয়তে, আমরা অনেকে আছি।

কৃদন্ত

ধাতুর উত্তর কতকগুলি প্রত্যয় হয়। সেই সকল প্রত্যয়কে কৃৎ বলে। কৃৎ প্রত্যয় নানা প্রকার; তন্মধ্যে তুম, ক্ত্বা, য, এই তিনের বিষয় লিখিত হইতেছে।

নিমিত্ত অর্থ বুঝিতে ধাতুম তুম্ প্রতায় হয়। যথা, দাধাতু—তুম্, দাতুম্; দিবার নিমিত্ত। স্থাধাতু—তুম, স্থাতুম্; থাকিবার নিমিত্ত। পাধাতু—তুম্, পাতুম্, পান করিবার নিমিত্ত হনধাতু—তুম্, হন্তুম্; বধ করিবার নিমিত্ত। গমধাতু—তুম্, গন্তুম্; যাইবার নিমিত্ত। গ্রহধাতু—তুম্, গ্রহধাতু—তুম্, গ্রহীতুম্, গ্রহণ কবিবার নিমিত্ত। কৃধাতু—তুম্, কর্তুম্; করিবার নিমিত্ত। বচধাতু—তুম্, বক্তুম্; বলিবার নিমিত্ত। জিধাতু—তুম্, জেতুম্; জয় করিবার নিমিত্ত। দৃশধাতু—তুম্. দ্রষ্টুম্; দেখিবার নিমিত্ত। জ্ঞাধাতু—

তুম্, জ্ঞাতুম্ ; জানিবার নিমিত্ত। চিন্তিধাতু—তুম্, চিন্তয়িতুম্ ; চিন্তা করিবার নিমিত্ত। ভুজধাতু—তুম্, ভোক্তুম্ ; খাইবার নিমিত্ত ইত্যাদি।

অনন্তর অর্থে ধাতুর উত্তর ক্ত্বা প্রত্যয় হয়। যথা, কৃধাতু—ক্ত্বা, কৃত্বা ; করিয়া, করণানন্তর। জিধাতু—ক্ত্বা, জিত্বা ; জয় করিয়া, জয়ানন্তর। গমধাতু—ক্ত্বা, গত্বা ; যাইয়া গমনানন্তর। ভুজধাতু—ক্ত্বা, ভুক্ত্বা ; খাইয়া ভোজনানন্তর। দৃশধাতু—ক্ত্বা, দৃষ্ট্বা ; দেখিয়া, দর্শনানন্তর। দাধাতু—ক্ত্বা, দত্ত্বা ; দিয়া, দানানন্তর। পাধাতু—ক্ত্বা, পীত্বা ; পান করিয়া পানানন্তর। চিন্তিধাতু—ক্ত্বা, চিন্তয়িত্বা ; চিন্তা করিয়া, চিন্তানন্তর। বচধাতু—ক্ত্বা, উক্ত্বা ; বলিয়া, কথনানন্তর। গ্রহধাতু—ক্ত্বা, গৃহীত্বা ; লইয়া, গ্রহণানন্তর ইত্যাদি।

যদি ধাতুর পূর্বে উপসর্গ থাকে তাহা হইলে তাহার উত্তর অনন্তর অর্থে য প্রত্যয় হয়। যথা, আ- দাধাতু—য, আদায় ; গ্রহণ করিয়া, গ্রহণানন্তর। আ—গমধাতু—য, আগম্য, আগত্য ; আসিয়া, আগমনানন্তর। আ—হনধাতু—য, আহত্য ; আঘাত করিয়া, আঘাতানন্তর। বি—জিধাতু—য, বিজিত্য ; জয় করিয়া, জয়ানন্তর। সং—স্মৃধাতু—য, সংস্মৃত্য ; স্মরণ করিয়া, স্মরণানন্তর। প্র—নমধাতু—য, প্রণম্য, প্রণত্য ; প্রণাম করিয়া, প্রণামানন্তর। আ—কৃষধাতু—য, আকৃষ্য ; আকর্ষণ করিয়া, আকর্ষণানন্তর।

সমাস

বিভক্তিহীন শব্দকে নাম কহে। ঐ নাম বিভক্তিযুক্ত হইলে তাহাকে পদ বলা যায়। বৃক্ষ, গিরি, পশু ভ্রাতৃ এই সকল শব্দে বিভক্তি যোগ হয় নাই ; ইহাদিগকে এই অবস্থায় নাম বলে। বৃক্ষঃ, বৃক্ষৌ, বৃক্ষাঃ ; গিরিঃ, গিরী, গিরয়ঃ, পশুঃ, পশূ, পশবঃ ; ভ্রাতা ভ্রাতরৌ, ভ্রাতরঃ ; এই সকল শব্দ বিভক্তিযুক্ত হইয়াছে, অতএব ইহাদিগকে এক্ষণে নাম না বলিয়া পদ বলে।

প্রত্যেক পদের অন্তেই এক এক বিভক্তি আছে। কিন্তু কখন কখন দুই তিন পদ একত্র করা যায় ; তখন কেবল শেষের পদটিতেই বিভক্তি থাকে, পূর্ব পূর্ব পদে বিভক্তি থাকে না। যথা, সুশীলবালকঃ। পূর্বে সুশীলঃ বালকঃ এই রূপ ছিল ; কিন্তু দুই পদ একত্র যোগ করাতে সুশীলবালকঃ হইল। যোগ হইল বলিয়া, সুশীল পদে বিভক্তি নাই, বালক পদ শেষে আছে বলিয়া কেবল তাহাতেই বিভক্তি রহিল। এইরূপ দুই অথবা অনেক পদ একত্র যোগ করাকে সমাস কহে। সমাস ছয় প্রকার কর্মধারয়, তৎপুরুষ, দ্বন্দ্ব, বহুব্রীহি, দ্বিগু, অব্যয়ীভাব।

কর্মধারয়

বিশেষণ ও বিশেষ্য পদের যে সমাস তাহার নাম কর্মধারয়। যথা, উন্নতঃ তরুঃ, উন্নত-তরুঃ। নীলম্ উৎপলম্, নীলোৎপলম্। গভীরঃ কূপঃ, গভীরকূপঃ। সুন্দরঃ পুরুষঃ, সুন্দরপুরুষঃ।

যদি বিশেষণ ও বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গ হয়, তাহা হইলে বিশেষণ শব্দ পুংলিঙ্গের মত হইয়া যায়; অর্থাৎ আকার ঈকার প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গের যে চিহ্ন তাহা থাকে না। যথা, দীর্ঘা যষ্টিঃ দীর্ঘযষ্টিঃ। জীর্ণা তরিঃ, জীর্ণতরিঃ। সতী প্রবৃত্তিঃ, সৎপ্রবৃত্তিঃ।

তৎপুরুষ

যেখানে পূর্বপদ দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী ইহার মধ্যে কোন বিভক্তি যুক্ত হয়, আর পর পদ প্রথমা বিভক্তিযুক্ত, তাহাকে তৎপুরুষ সমাস কহে। যথা, গৃহং গতঃ, গৃহগতঃ। লোভেন জিতঃ, লোভজিতঃ। ধনায় লোভঃ, ধনলোভঃ। সর্পাৎ ভয়ম্, সর্পভয়ম্। বৃক্ষস্য শাখা, বৃক্ষশাখা। পুরুষেষু উত্তমঃ, পুরুষোত্তমঃ।

দ্বন্দ্ব

পরস্পর বিশেষ্য বিশেষণ নয় এরূপ প্রথমা বিভক্তি যুক্ত দুই অথবা বহু পদের যে সমাস তাহার নাম দ্বন্দ্ব। যদি দুই পদে দ্বন্দ্ব সমাস হয়, তাহা হইলে শেষের পদ দ্বিবচনান্ত হয়। আর বহু পদে দ্বন্দ্ব হইলে শেষের পদ বহুবচনান্ত হয়। শেষের শব্দের যে লিঙ্গ দ্বন্দ্ব সমাস করিলে সেই লিঙ্গ থাকে। যথা, রামঃ লক্ষ্মণঃ রামলক্ষ্মণৌ। ভীম অর্জ্জুনঃ, ভীমার্জ্জুনৌ। নদী পর্ব্বতঃ, নদীপর্ব্বতৌ। ফলং পুষ্পং, ফলপুষ্পে। কন্দঃ মূলং ফলং কন্দমূলফলানি। রূপং রসঃ গন্ধঃ স্পর্শঃ শব্দঃ, রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দাঃ। ইহার নাম ইতরে-তর দ্বন্দ্ব।

কখন কখন দ্বন্দ্ব সমাস করিলে শেষের শব্দ, যে লিঙ্গের হউক না কেন, ক্লীবলিঙ্গ ও একবচনান্ত হইয়া যায়। ইহাকে সমাহার দ্বন্দ্ব কহে। যথা, হংসঃ কোকিলঃ, হংস-কোকিলম্। পানী পাদৌ, পাণিপাদম্।

বহুব্রীহি

যে কয়েক পদে সমাস করা যায় সেই কয়েক পদের যে অর্থ, তাহা না বুঝাইয়া অন্য বস্তু বা ব্যক্তি যেখানে বুঝায়, তাহাকে বহুব্রীহি সমাস কহে। সমাস কালে বহুব্রীহিতে যদ্ শব্দের এক পদ থাকে। যথা, দীর্ঘৌ বাহূ যস্য, দীর্ঘবাহুঃ। এই স্থলে দীর্ঘ দুই বাহু

না বুঝাইয়া দীর্ঘবাহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বুঝাইল। নির্ম্মলং জলং যস্যাঃ, নির্ম্মলজলা নদী। নির্মল জল না বুঝাইয়া নির্মল জল বিশিষ্ট নদী বুঝাইল।

যদি দুই স্ত্রীলিঙ্গ পদে বহুব্রীহি সমাস হয় তাহা হইলে প্রায় পূর্বপদ পুংলিঙ্গ হইয়া যায়; অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন আকার ঈকারাদি থাকে না। যথা, নির্ম্মলা মতির্যস্য, নির্ম্মল-মতিঃ। মৃদ্বী গতির্যস্য, মৃদুগতিঃ।

দ্বিগু

যাহাতে পূর্বপদ এক দ্বি ত্রি ইত্যাদি সংখ্যাবাচক শব্দ ও যাহাতে সমাহারথাকে অর্থাৎ এক কালে অনেক বস্তু বোধ হয় উহাকে সমাহার দ্বিগু বলে। সমাহার ভিন্ন অন্য অর্থেও দ্বিগু হয়। সমাহার দ্বিগু করিলে কোন কোন স্থলে স্ত্রীলিঙ্গ ও ঈ হয়; কোন কোন স্থলে ক্লীবলিঙ্গ হয়। যথা, ত্রয়াণাং লোকানাং সমাহারঃ, ত্রিলোকী। এস্থলে স্ত্রীলিঙ্গ ও ঈ হইল। ত্রিলোকী কহিলে এক কালে তিন লোকের বোধ হয়। ত্রয়াণাং ভুবনানাং সমাহারঃ, ত্রিভুবনম্।

অব্যয়ীভাব

সামীপ্য, বীপ্সা, অনতিক্রম, অভাব, পর্যন্ত ইত্যাদি অর্থে যে সমাস হয় তাহার নাম অব্যয়ীভাব। যে কয়েক পদে সমাস হয় তন্মধ্যে প্রথম পদ অব্যয়শব্দ। সমাস করিলে, শেষের শব্দ যদি অকারান্ত হয়, তাহার রূপ পঞ্চমী ভিন্ন সকল বিভক্তিতেই অকারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের প্রথমার একবচনের ন্যায় হয়; আর তদ্ভিন্ন সর্বত্র অব্যয় শব্দের ন্যায় হয়, অর্থাৎ কোন বিভক্তির চিহ্ন থাকে না। যথা, কূলস্য সমীপে, উপকূলম্। গৃহে গৃহে, প্রতিগৃহম্। শক্তিমনতিক্রম্য, যথাশক্তি। বিঘ্নস্য অভাবঃ, নির্ব্বিঘ্নম্। সমুদ্র-পর্য্যন্তম্ আসমুদ্রম্।

বিভিন্ন গ্রন্থের বিজ্ঞাপন

ঋজুপাঠ

প্রথম ভাগ

বিজ্ঞাপন

ঋজুপাঠের প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল। ইহাতে পঞ্চতন্ত্রের কয়েকটী উপাখ্যান ও মহাভারতের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গিয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের রচনাপ্রণালী দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। প্রাচীন বলিয়া ইহার রচনা অত্যন্ত সহজ। সংস্কৃত ভাষাতে এরূপ সহজ গ্রন্থ আর দৃষ্টিগোচর হয় না। এই নিমিত্ত, যাহারা প্রথম সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করে পঞ্চতন্ত্র তাহাদিগের অতি উপযুক্ত পুস্তক। কিন্তু মধ্যে মধ্যে অনেক দীর্ঘ সমাস আছে; অনেক অসার ও অসম্বদ্ধ কথা আছে; এবং কয়েকটী অতি অশ্লীল উপাখ্যান আছে। অধুনাতন গ্রন্থের ন্যায়, রচনার মাধুর্য্য নাই; কথাযোজনার চাতুর্য্য নাই। অধিকন্তু, লিপিকর প্রমাদ বশতঃ স্থানের স্থানের পাঠ এমত অপভ্রংশিত হইয়াছে যে অর্থবোধ ও তাৎপর্য্য গ্রহ হওয়া দুর্ঘট। এরূপ গ্রন্থ আদ্যন্ত পাঠ করা অনাবশ্যক ও অবিধেয় বোধ হওয়াতে, কয়েকটী উপাখ্যান মাত্র পরিগৃহীত হইল। অল্পবয়স্ক বালক দিগের অধ্যয়নোপযোগি করিবার নিমিত্ত ঐ কয়েকটী উপাখ্যানেরও কোন কোন অংশ পরিবর্জিত ও কোন অংশ পরিবর্ত্তিত হইল। মহাভারতেরও যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহারও কোন কোন ভাগ পরিত্যাগ ও কোন কোন স্থানে পরিবর্ত্ত করা গিয়াছে।

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ।

সংবৎ ১৯০৮। ১লা অগ্রহায়ণ।

ঋজুপাঠ

দ্বিতীয় ভাগ

বিজ্ঞাপন

ঋজুপাঠের দ্বিতীয় ভাগ রামায়ণ হইতে সংগৃহীত হইল। রচনাপ্রণালী দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে, রামায়ণ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। এই প্রাচীন গ্রন্থ মহর্ষি বাল্মকিপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কোন কোন আলঙ্কারিকেরা রামায়ণকে মহাকাব্যমধ্যে গণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা তাদৃশ কাব্যের যে সকল লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তৎসমুদায় কালিদাসাদিপ্রণীত রঘুবংশাদি অপেক্ষাকৃত নব্য কাব্যগ্রন্থসমূহে যেরূপ লক্ষিত হয়, প্রাচীন কাব্য রামায়ণে সেরূপ লক্ষিত হয় না। বাল্মীকিকাব্যে পৌনরুক্ত, প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অতি বিস্মৃত বর্ণনা প্রভৃতি কতিপয় গুরুতর দোষ আছে। যাহা হউক, অনায়াসে এই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, সংস্কৃত ভাষায় এরূপ প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট পদ্য গ্রন্থ আর নাই। রামায়ণের মধ্যে অযোধ্যাকাণ্ডের রচনা যেরূপ চমৎকারিণী ও চিত্তহারিণী, অন্যান্য কাণ্ডের রচনা সেরূপ নহে। এই নিমিত্ত ঋজুপাঠের দ্বিতীয় ভাগে অযোধ্যাকাণ্ডের কতিপয় উৎকৃষ্ট অংশ সঙ্কলিত হইল। সঙ্কলিত অংশ সকলের কোন কোন ভাগ অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ।
২২এ ফাল্গুন। সংবৎ ১৯০৮

ষষ্ঠ সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এই সংস্করণে শিক্ষাকার্য্যের সৌকর্য্যার্থে অপেক্ষাকৃত দুরূহ অংশসমূহের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিম্ন দেশে সন্নিবেশিত, এবং গ্রন্থকলেবরের অতিবিস্তৃতিদোষপরীহারার্থে মূলের শেষ কিয়দংশ পরিত্যক্ত হইল।

কলিকাতা
১লা চৈত্র। সংবৎ ১৯২১। 　　শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

ঋজুপাঠ

তৃতীয় ভাগ

বিজ্ঞাপন

ঋজুপাঠের তৃতীয় ভাগ হিতোপদেশ, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত, ভট্টিকাব্য, ঋতুসংহার ও বেণীসংহার এই কয়েক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইল। এই সকল গ্রন্থের যে যে স্থান উদ্ধৃত হইয়াছে, উহাদের কোন কোন ভাগ এক বারেই পরিত্যক্ত ও কোন কোন ভাগ কিয়দংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

হিতোপদেশকর্ত্তা গ্রন্থারম্ভে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, পঞ্চতন্ত্র ও অন্য এক গ্রন্থ হইতে আপন গ্রন্থ সংগ্রহ করিলেন। বাস্তবিক, হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্রের প্রতিরূপ-স্বরূপ। পঞ্চতন্ত্রের গুণ ও দোষের অধিকাংশই হিতোপদেশে লক্ষিত হয়। বিশেষ এই, পঞ্চতন্ত্র অপেক্ষা হিতোপদেশের রচনা কিঞ্চিৎ গাঢ় এবং প্রস্তুত বিষয়ের বৈশদ্য অথবা দৃঢ়ীকরণ বাসনায়, নানা প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে প্রমাণ, দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ-স্বরূপ উত্তম উত্তম শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তার সম্যক্ সহৃদয়তার অসদ্ভাবপ্রযুক্ত, অনেক স্থলেই উদ্ধৃত শ্লোক সকল অসংলগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। তত্তৎ স্থলে প্রকৃত বিষয়ের সহিত ঐ সকল শ্লোকের কোন সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। হিতোপদেশকর্ত্তা বালকদিগের নীতিশিক্ষার্থে এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন (১)। কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক একটি আদিরসঘটিত অতি অশ্লীল উপাখ্যান আছে। অতএব, আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যে বালকদিগের নিমিত্ত নীতিপুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়া, কি প্রকারে গ্রন্থকর্ত্তার ঐরূপ অশ্লীল উপাখ্যান সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্তি হইল। কোন্ ব্যক্তি হিতোপদেশ রচনা করিয়াছেন, আমরা তাহা অবগত নহি। অনেকে বিষ্ণুশর্ম্মাকে হিতোপদেশকর্ত্তা বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই। হিতোপদেশ চারি অংশে বিভক্ত; মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ, সন্ধি। তন্মধ্যে মিত্রলাভপ্রকরণমাত্র এই পুস্তকে পরিগৃহীত হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণ অতি প্রাঞ্জল ও পরিষ্কৃত গ্রন্থ, পাঠমাত্রেই অর্থপ্রতীতি হয়। পুরাণের যে পাঁচ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে (২), বিষ্ণুপুরাণ সেই পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত। এই পুরাণ অন্যান্য

১। কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে।

হিতোপদেশ।

২। সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥

যাবতীয় পুরাণ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। অন্যান্য পুরাণের ন্যায়, ইহাতে অপ্রাকরণিক কথা নাই। সকল পুরাণ অপেক্ষা বিষ্ণুপুরাণের রচনা প্রাচীন বোধ হয়। যাবতীয় পুরাণ বেদব্যাসপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু পুরাণ সকলের রচনা পরস্পর এত বিভিন্ন যে এক ব্যক্তির রচিত বলিযা বোধ হয় না। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ পাঠ করিলে, এই তিন গ্রন্থ এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত বলিয়া প্রতীতি হওয়া দুষ্কর। বিষ্ণুপুরাণ সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট বটে; কিন্তু ইহাতে বালকদিগের পাঠোপযোগী বিষয় অধিক নাই। যে কয়েক স্থান প্রকৃত বিষয়ের উপযোগী বোধ হইয়াছিল, তাহা পরিগৃহীত হইয়াছে।

মহাভারত বেদব্যাসবিরচিত বলিয়া কিংবদন্তী আছে, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতির সহিত মহাভারতের রচনার এত বিভিন্নতা যে তিনি বিষ্ণুপুরাণ, কিংবা ভাগবত, অথবা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ রচনা করিযাছেন, তাঁহার রচিত বোধ হয় না। মহাভারত পুরাণমধ্যে পরিগণিত নহে। ইহাকে ইতিহাস কহে। ইহাতে পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণে সৃষ্টি, প্রলয, মন্বন্তর, নানা রাজবংশ এবং নানাবংশীয নরপতিগণের চরিত কীর্ত্তন থাকে। মহাভারতে এক নির্দ্দিষ্ট রাজবংশের চবিত বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। কিন্তু ইহাতে, আনুষঙ্গিক, নানা পৌরাণিক বিষয়ও সঙ্কলিত হইযাছে। বিষ্ণুপুরাণের রচনা যেরূপ প্রাঞ্জল ও পরিষ্কৃত, মহাভারতের সেরূপ নয। আবৃত্তিমাত্র সকল স্থলের অর্থ বুঝিতে পাবা যায না। অনেক স্থল এরূপ দুরূহ অথবা অস্পষ্ট যে কোন ক্রমেই অর্থপ্রতীতি হয় না। মহাভাবতেব নীতিগর্ভ ও হিতোপদেশঘটিত প্রস্তাব অনেক আছে। তন্মধ্যে আদি ও বন পর্ব্ব হইতে কয়েকটি পরিগৃহীত হইয়াছে। তদ্ব্যতিরিক্ত ইহাতে এত উৎকৃষ্ট প্রস্তাব আছে যে সমস্ত উদ্ধৃত করিলে, একখানি বৃহৎ পুস্তক প্রস্তুত হইতে পারে।

ভট্টিকাব্যে রামের চরিত বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্য দ্বাবিংশতি সর্গে বিভক্ত। গ্রন্থকর্ত্তা স্বরচিত কাব্যের শেষে আপনার একপ্রকার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু নামনির্দ্দেশ করেন নাই। প্রামাণিক টীকাকার জয়মঙ্গল কহেন, এই কাব্য বলভীনগরনিবাসী ভট্টিনামক কবির রচিত। এবং ভট্টিকাব্য নাম দ্বারাও, ইহাই সম্যক্ প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু অধুনাতন টীকাকার ভরতমল্লিক, আপন মতের প্রতিপোষক প্রমাণপ্রদর্শন ব্যতিরেকেই, ভট্টিকাব্যকে ভর্ত্তৃহরি প্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভর্ত্তৃহরি. ও এই কাব্যের রচয়িতা, উভয়েই অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ ছিলেন, বোধ হয় এই সাদৃশ্য দর্শনেই ভরতমল্লিকের এই ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার ইহা বিবেচনা করা উচিত ছিল যে যেরূপ জনশ্রুতি আছে, তদনুসারে ভর্ত্তৃহরি স্বয়ং রাজা ছিলেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং রাজা হন তিনি, অমুক রাজার রাজধানীতে থাকিয়া

আমি এই গ্রন্থ করিলাম, আপন গ্রন্থে কদাচ এরূপ নির্দ্দেশ করেন না (৩)। ভট্টিকাব্যের রচনা স্থানে স্থানে অতি সুন্দর ; বিশেষতঃ, দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে যে শরদ্বর্ণনা আছে, তাহা এমন মনোহর যে তদ্দ্বারা গ্রন্থকর্ত্তার অসামান্য কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ব্যাকরণের উদাহরণপ্রদর্শন গ্রন্থকর্ত্তার যেরূপ উদ্দেশ্য, কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করা তাদৃশ উদ্দেশ্য ছিল না। এই নিমিত্ত ভট্টিকাব্যের অধিকাংশই অত্যন্ত নীরস ও অত্যন্ত কর্কশ। ফলতঃ, ভট্টিকাব্য কোন মতেই উৎকৃষ্ট কাব্যমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। এই কাব্যের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্গমাত্র পরিগৃহীত হইয়াছে।

ঋতুসংহার অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের রসময়ী লেখনীর মুখ হইতে বহির্গত। এই উৎকৃষ্ট কাব্য ছয় সর্গে বিভক্ত। এক এক সর্গে যথাক্রমে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হিম, শিশির, বসন্ত ছয় ঋতু বর্ণিত হইয়াছে। যে স্বভাবোক্তি কাব্যের প্রধান অলঙ্কার, ঋতুসংহার প্রায় আদ্যোপান্ত তাহাতে অলঙ্কৃত। কিন্তু রূপক, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি কতিপয় অলঙ্কার এতদ্দেশীয় লোকের অধিক প্রিয়, স্বভাবোক্তির চমৎকারিত্ব তাঁহাদের তাদৃশ মনোরম বোধ হয় না। এই নিমিত্ত, অনেকেই ঋতুসংহারকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলেন না। কেহ কেহ এই উৎকৃষ্ট কাব্যকে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রমোর্বশী এই সকল সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্যের রচয়িতা কালিদাসের প্রণীত বলিয়া অঙ্গীকার করিতে সম্মত নহেন। ঋতুসংহার, রঘুবংশাদি হইতে অনেক অংশে ন্যূন বটে। কিন্তু যে সমস্ত গুণ থাকাতে রঘুবংশাদির এত আদর ও এত গৌরব, কুসংস্কারবিবর্জ্জিত ও সহৃদয়পদবীতে অধিরূঢ় হইয়া অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলে, ঋতুসংহারে সেই সমস্ত গুণের সমুদয় লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। ঋতুসংহারে যেমন অনেক অসাধারণ গুণ আছে, তেমনই এক অসাধারণ দোষও আছে। ঋতুসংহারের অধিকাংশই আদিরসঘটিত। বিশেষতঃ, হিম, শিশির, বসন্তবর্ণনা আদিরসে এত পরিপূর্ণ, যে এই তিন সর্গ কোনক্রমেই বালকদিগের পাঠযোগ্য নহে। এই নিমিত্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ বর্ণনা মাত্র এই পুস্তকে পরিগৃহীত হইল। এই তিন সর্গেরও আদিরসঘটিত শ্লোক সকল পরিত্যক্ত হইয়াছে।

বেণীসংহারনাটক ভট্টনারায়ণবিরচিত। এরূপ কিংবদন্তী আছে, আদিশূর রাজা কান্যকুব্জ হইতে গৌড়দেশে যে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন ভট্টনারায়ণ তাঁহাদের একজন। এই নাটক নাটকের সমুদয় লক্ষণাক্রান্ত। সাহিত্যদর্পণে নাটকপরিচ্ছেদে নাটকসংক্রান্ত

৩। কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলাভ্যাং
শ্রীধরসূনুনরেন্দ্রপালিতায়াম্।
কীর্ত্তিরতো ভবতাং নৃপস্য তস্য
ক্ষেমকরঃ ক্ষিতিপো যতঃ প্রজানাম্॥ ২২ সর্গ ৩৫ শ্লোক।

বিষয়ের উদাহরণ প্রদর্শনার্থে বেণীসংহার হইতে যত উদ্ধৃত হইয়াছে, অন্য কোন নাটক হইতে তত নহে। কিন্তু এই নাটকের রচনা প্রাচীন কবিদিগের রচনার ন্যায় চমৎকারিণী ও মনোহারিণী নহে। ভট্টনারায়ণ নাটকের নিয়ম যত প্রতিপালন করিয়াছেন, কবিত্বশক্তি তত প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। বেণীসংহার, নাটকের সমুদয়লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও, কাব্যাংশে শকুন্তলা, রত্নাবলী, উত্তরচরিত প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক ন্যূন। নাটকের সংস্কৃত ভিন্ন প্রাকৃত, পৈশাচী, রাক্ষসী প্রভৃতি অনেক ভাষা থাকে। সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ না হইলে, সে সকল ভাষা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় না। এই নিমিত্ত, বেণীসংহারের যে অংশে ঐ সকল ভাষার সংস্রব নাই, তাহাই ঋজুপাঠের তৃতীয় ভাগে উদ্ধৃত করা গিয়াছে।

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ।
১৬ই পৌষ ; সংবৎ ১৯০৮। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এই সংস্করণে, শিক্ষাকার্য্যের সৌকর্য্যার্থে অপেক্ষাকৃত দুরূহ অংশসমূহের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিম্নদেশে সন্নিবেশিত, এবং গ্রন্থকলেবরের অতিবিস্তৃত দোষ পরীহারার্থে, মূলের শেষ কিয়দংশ পরিত্যক্ত হইল।

কলিকাতা।
১লা বৈশাখ। সংবৎ ১৯২২। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

THE
BYTAL-PACHEESEE
Or
The Twenty-Five Tales of the Demon

PREFACE

The Bytál Pacheesee is a collection of Legendary Stories relating to that celebrated character in Hindu Annals Rájá Vikramaditya. The work contains no traces of art or genius in its composition ; but on the contrary exhibits those clumsy attempts at the wonderful, sometimes bordering on childishness, which are so general in the Legends of a dark age. It is, however, very popular among the great mass of the people of this country and expresses accurately their ideas and feelings on many subjects. This fact, and the circumstance of the Hindee version being highly idiomatic and correct in its style, render this work an excellent Text book for students of the Hindee Language.
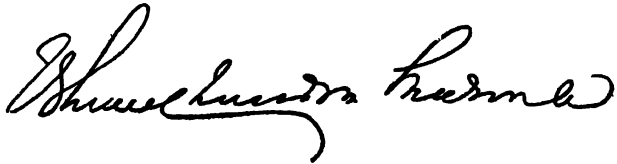
The Original of these tales is to be found in the Kathásaritságara, an ancient and voluminous collection of Tales and Legends in Sanskrit verse, by Somadeva Bhatta, under the title of Betálapanchavinsatiká. There exist also, under the same title, a Sanskrit prose version.

In the reign of Muhammad Sháha, Súrat Kabíshwar, by order of Rájá Jye Singh, translated the work from Sanskrit into Braj Bhákhá This version was translated, by direction of Dr. Gilchrist, in the time of Marquis Wellesley, into Hindoostanee by Muzhar Ali Khan, whose poetical name was Vilá, aided by Lallu Lál Kab, the elegant writer of Premságar, both Moonshees of the College of Fort William. This translation, of which the present is a new edition, was printed in 1805, having been revised, according to the instructions of Captain James Mouat, by Tárineecharan Mitra, the learned Head Moonshee of the above Institution.

A Bengali version of this translation was made by the Editor of the present edition, in the year 1847, by directions of Major G. T. Marshall, Secretary to the College of Fort William, and was adopted, under the title of Betál panchabinshati, as a Text book for the Students of that College. A poetical version in Bengali also exists and seems to have been taken from the Original Sanskrit.
In bringing out the edition now presented to the public, the Original Text of 1805 and the Agra Edition of 1843, have been carefully collated. The former has been generally adhered to; but the latter, though sometimes inferior in accuracy, has been occasionally followed in instances where in appeared judiciously modernised in its style of expression and orthography. The correct Sanskrit forms of the proper names, as far as they can be traced, have been inserted in the places where they occur, at the foot of the page. Some do not admit of Sanskrit equivalents; and it is evident that the Translators were not particular in this point, and adopted popular epithets at their own pleasure.

Calcutta,
15th
January,
1852

Ishwarchunder Surma

RAGHUVANSA

AN EPIC POEM

by

KALIDASA

EDITED

By

ESHWAR CHANDRA VIDYASAGAR

Principal of the Sanskrit College.

Calcutta

PRINTED AT THE SANSKRIT PRESS

1853

বিজ্ঞাপন

কিছু দিবস হইল সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মল্লিনাথ প্রণীত সঞ্জীবনীনামক সর্ব্বপ্রধান টীকা সমেত রঘুবংশ মুদ্রিত করিয়াছেন। এই মহাকাব্য যেরূপে মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যের প্রযত্নে ও পরিশ্রমে তাহাই হইয়াছে; তথাপি পুনর্ম্মুদ্রিত করিতে উদ্যত হইবার তাৎপর্য্য এই যে সটীক মুদ্রিত গ্রন্থ যে মূল্যে বিক্রীত হইতেছে সেই মূল্যে ক্রয় করিয়া অধ্যয়ন করিতে পারে সংস্কৃতবিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের অনেকেরই এরূপ অবস্থা নহে। এই নিমিত্ত মূল মাত্র মুদ্রিত হইল। আর যদিও এই সংস্কৃত ভাষার সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্যের আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বাংশই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তথাপি কোন কোন অংশ ও কোন কোন শ্লোক এরূপ আছে যে ছাত্রদিগের অধ্যয়নযোগ্য নহে। এই নিমিত্ত সেই সমস্ত বর্জ্জনীয় অংশ ও বর্জ্জনীয় শ্লোক পরিত্যক্ত হইয়াছে। রঘুবংশ যে প্রণালীতে মুদ্রিত হইল কুমারসম্ভব, কিরাতার্জ্জুনীয়, শিশুপালবধ, নৈষধচরিত প্রভৃতিও সেই প্রণালীতে মুদ্রিত হইবেক।

সংস্কৃতকালেজ
২৩এ জ্যৈষ্ঠ; ১৯১০ সংবৎ।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

BIBLIOTHECA INDICA

Collection of Oriental Works.

Published under the patronage of the

'Hon. Court of Directors of the East India Company.

And the Superientendence of the Asiatic Society of Bengal.

Nos, 63 and 142

SARVADARS'ANA SAÑGRAHA

OR AN

Epitome of the different systems of Indian Philosophy

by

MÁDHAVÁCHÁRYA

Edited by

PANDITA ISWARA CHANDRA VIDYASAGARA.

The sarvadarsanasangraha is a work by Mádhavácháraya, the well-known scholiast of the Vedas. It contains short notices of all the systems of Indian Philosophy, and as such is very valuable. It is natural to suppose that every Indian Sanskrit Scholar would have possessed a copy of a treatire of so much importance. But it is somewhat singular that manuscripts of the work are very rare, and that the great majority of the learned of this country are probably not even aware of its existence. If not printed now, the Sarvadarsanasangraha would, in all probability, share the common fate of many other valuable relics of Sanskrit learning. To prescrve the work from destruction I proposed to the Asiatic Society of Bengal to edit the work for them if they would undertake to print it. My offer was kindly accepted, and the work under their auspices, is printed and published.

When I first undertook to edit the work, I was under the impression that the task would be an easy one. There were two manuscripts in Calcutta, one in the Library of the Sanskrit

College, and the other in that of the Asiatic Society. On first reading the book I thought that the former manuscript was sufficiently correct. But scrutinizing it with the care necessary for publication, I collated it with the copy in the Society's Library and found that without the aid of more manuscripts, the readings in several passages in which the two manuscripts differ, could not be reconciled. No other manuscripts were however procurable in Bengal ; but by good fortune I procured three manuscripts from Benares. These were essential service to me, and it was only after carefully collating them with the Texts in Calcutta that I have been able to edit the work.

I feel it my duty here to express my great obligations to Mr. Edward Hall, late of the Benares College, through whose kind exertions the Benares Manuscripts were received. Without his timely aid it would have been impossible for me to execute the task I had undertaken with the accuracy requisite. My obligations are also due to Professors Jayanáráyana Tarkapanchánanà and Tára'na'tha Tarkava'chaspati of the Sanskrit College for the material assistance that they afforded to me in the undertaking.

Sanskrit College,
The 20th January, 1858.

ঘটনাপঞ্জী

ঘটনাপঞ্জী

১৮২০ খৃঃ অব্দ, ২৬শে সেপ্টেম্বর, সন ১২২৭, শকাব্দ ১৭৪২, ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার দিবা দ্বিপ্রহরে, মেদিনীপুর অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে পিতামাতার প্রথম সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পিতা—ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা —ভগবতী দেবী। ঈশ্বরচন্দ্র যখন জননীগর্ভে অবস্থান করিতেছিলেন তখন তাঁহার জননী উন্মাদিনীপ্রায়। ঈশ্বরচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইতে না হইতেই প্রসূতি আরোগ্য লাভ করেন। কথিত আছে উদয়গঞ্জ নিবাসী জ্যোতিষী ভবানন্দ শিরোমণি ভট্টাচার্য মহাশয় এই আসন্নপ্রসবা বধূর কোষ্ঠি গণনা করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরানুগৃহীত কোন মহাপুরুষ ইঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহারই তেজঃপ্রভাবে প্রসূতি অধীরা হইয়া পড়িয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ ধর্মনিষ্ঠ যোগী তীর্থপর্যটক প্রবাসী রামজয় তর্কভূষণ একদা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাঁহার বংশে এক শক্তিশালী অদ্ভুতকর্মা মহাপুরুষের আগমন ঘটিবে। স্বপ্নে তাঁহার প্রতি দেশে ফিরিয়া আসিতে, পরিবার পরিজনের সংবাদ লইতে এবং ঐ সু-সন্তানের শুভাগমন প্রত্যাশে অপেক্ষা করিতে আদেশ হয়। রামজয় গৃহে ফিরিয়া আসেন। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তিনি শিশুর জিহ্বার তলদেশে আল্‌তায় কিছু লিখিয়া দিয়া (কি লিখিয়াছিলেন তাহা কাহাকেও বলেন নাই) বলিয়াছিলেন, 'এ শিশু উত্তরকালে সকলকে পরাজয় করিবে, ইহার প্রতিজ্ঞার পরাক্রমে চারিদিক কম্পিত হইবে, ইহার দয়াদাক্ষিণ্যে সকলে মুগ্ধ হইবে। আমিই ইহার দীক্ষাগুরু হইলাম। আমার স্বপ্নদর্শন আজ সফল হইল। আমার বংশ পবিত্র হইল।'

১৮২৪ খৃঃ অব্দ, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১লা জানুয়ারী হইতে ৬৬নং বহুবাজারে পাঠারম্ভ হয়। পরে ১৮২৬ খৃঃ অব্দে ১লা মে সংস্কৃত কলেজ গোলদীঘির নূতন বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়।

১৮২৫ খৃঃ অব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাশিক্ষার্থে পাঁচ বৎসর বয়সকালে বীরসিংহ গ্রামের কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় প্রেরিত হন। তথায় এক-বৎসর কাল পাঠান্তে তিনি কঠিন জ্বররোগে আক্রান্ত হন। প্রায় এক বৎসর রোগভোগের পর সুস্থ হইয়া পুনরায় উক্ত পাঠশালায় পাঠারম্ভ করেন এবং আট বৎসর বয়স পর্যন্ত গুরুমহাশয়ের প্রিয় শিষ্যরূপে বিদ্যাভ্যাস করেন।

১৮১৮ খৃঃ অব্দে (সন ১২২৫) কার্তিক মাসে পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের দেহত্যাগের পরে ঈশ্বরচন্দ্র পিতার সহিত কলিকাতায় আসেন এবং বড়বাজারে দয়ে-হাটায় ভাগবতচরণ সিংহের পুত্র জগদ্দুর্লভ সিংহের বাটীতে বাস করেন। জগদ্দুর্লভবাবুর বাটীর অতি সন্নিকটে শিবচরণ মল্লিকের বাটীতে স্বরূপচন্দ্র দাসের একটি পাঠশালা ছিল। কলিকাতার উপস্থিতির পাঁচ-সাত দিন পরেই ঈশ্বরচন্দ্র ঐ পাঠশালায় প্রেরিত হন এবং অগ্রহায়ণ হইতে মাঘ এই তিনমাস তথায় শিক্ষালাভ করেন। ফাল্গুন মাসে তিনি রক্তাতিসার রোগে আক্রান্ত হন এবং দেশে ফিরিয়া যান।

১৮২৯ খৃঃ অব্দে (১২৩৬ সনে) জ্যৈষ্ঠ মাসে পুনরায় তিনি কলিকাতায় আসেন এবং ১লা জুন সোমবার নয় বৎসর বয়সে সরকারী সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে সহমরণ-সতীদাহপ্রথা আইনতঃ নিষিদ্ধ হয়।

১৮৩১ খৃঃ অব্দে মার্চ মাস হইতে ব্যাকরণ শ্রেণীতে প্রবেশ করিবার দেড় বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৮৩০-৩১ খৃঃ অব্দের বার্ষিক পরীক্ষার পর ঈশ্বরচন্দ্র মাসিক ৫৲ টাকা করিয়া বৃত্তি লাভ করেন। কৃতী ছাত্রদিগকে তৎকালে কলিকাতায় বাসা-খরচের জন্য এই বৃত্তি দেওয়া হইত। এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রের উপনয়ন সংস্কার হয়। তখন তাঁহার বয়স এগারো বৎসর।

১৮৩৩ খৃঃ অব্দে জানুয়ারী মাস পর্যন্ত, অর্থাৎ সাড়ে তিন বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এবং তিনটি বার্ষিক পরীক্ষায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া তিনবারই পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। এই বৎসর ২৭শে ডিসেম্বর বিদেশে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়।

১৮৩৪ খৃঃ অব্দ : সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগের ইংরাজী শিক্ষার সুবিধার্থে ১৮২৭ খৃঃ অব্দ হইতে ব্যবস্থা ছিল। ইহা আবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয় ছিল না। ব্যাকরণ শ্রেণী হইতেই ইংরাজী শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে হইত। ঈশ্বরচন্দ্রও ১৮৩০ খৃঃ অব্দ হইতে ইংরাজী শ্রেণীতে যোগ দেন। ১৮৩৩ ৩৪ খৃঃ অব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরাজীর ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্ররূপে ও ১৮৩৪-৩৫ খৃঃ অব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্ররূপে ঈশ্বরচন্দ্র পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। এই বৎসরেই চৌদ্দ বৎসর বয়সে ক্ষীরপাইনিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের কন্যা দিনময়ী দেবীর সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাহ হয়।

১৮৩৫ খৃঃ অব্দের নভেম্বর মাস হইতে সংস্কৃত কলেজের ইংরাজী শ্রেণী বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই বৎসরেই জুন মাসে কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়।

১৮৩৩ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে ১৮৩৫ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত এই দুই বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের নিকট সাহিত্য শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। এই সময়েও তিনি মাসিক ৫৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। এবং সাহিত্য শ্রেণীর দ্বিতীয় বৎসরের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হন ও পুরস্কার লাভ করেন। এই বৎসরেই (১৮৩৫ খৃঃ অব্দ) ফেব্রুয়ারী মাসে ঈশ্বরচন্দ্র অলঙ্কার শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। সংস্কৃত কলেজের প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট এক বৎসর অলঙ্কার শ্রেণীতে পাঠ করেন। ১৮৩৬-এ বার্ষিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার লাভ করেন।

১৮৩৬ খৃঃ অব্দের মে মাস হইতে দুই বৎসর কাল ঈশ্বরচন্দ্র শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির নিকট বেদান্ত শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

১৮৩৭ খৃঃ অব্দের মে মাস হইতে ঈশ্বরচন্দ্রের মাসিক বৃত্তি ৫৲ টাকা স্থলে ৮৲ টাকা হয়। বেদান্ত শ্রেণীতেও দ্বিতীয় বৎসরের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার ও পুরস্কার লাভ করেন।

১৮৩৮ খৃঃ অব্দে তিনি স্মৃতি শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। এই সময় স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন হরনাথ তর্কভূষণ। স্মৃতি শ্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্র এক বৎসর অধ্যয়ন করেন ও পূর্বের ন্যায় মাসিক ৮৲ টাকা বৃত্তি পান। কলেজ ব্যতিরেকে তিনি পণ্ডিত হরচন্দ্র ভট্টাচার্যের নিকটে যাইয়া স্মৃতি অধ্যয়ন করিতেন।

১৮৩৯ খৃঃ অব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া ৮০৲ টাকা ও সংস্কৃত গদ্য রচনার জন্য স্মৃতি শ্রেণীতে আরও একটি ১০০৲ টাকার পুরস্কার পান। এই বৎসরেই ২২শে এপ্রিল তিনি হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষা দেন। আদালতে জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হইতে হইলে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইত। ঈশ্বরচন্দ্র কৃতিত্বের সঙ্গে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, প্রশংসাপত্র পান এবং সেই সঙ্গে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত হন। প্রশংসাপত্রটি এইরূপ।

HINDOO LAW COMMITTEE FOR EXAMINATION.

We hereby certify that at an Examination held at the Presidency of Fort William on the 22nd (twenty-second) April 1839 by the Committee appointed under the provisions of Regulation XI 1826 Issur Chunder Vidyasagar was found and declared to be qualified by his Eminent knowledge of the Hindoo Law to hold the office of Hindoo Law Officer in any of the Established Courts of Judicature.

H. T. PRINSEP
President
J. W. OUSELY
Members of the Committee
of Examination.

This certificate has been granted to the said Issur Chunder Vidyasagur under the seal of the Committee this 16th Sixteenth day of May in the year 1839 corresponding with the 3rd Third Jaistha 1761 Sak.

J. C. C. SUTHERLAND
Secy. to the Committee

এই বৎসরের প্রথম দিকে ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায় শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। তখন এই শ্রেণীতে নিমাইচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় পড়াইতেন। ১৮৪১ খৃঃ অব্দে কিছুদিন জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের নিকটেও তিনি ন্যায়শাস্ত্র পড়েন। মে মাসে সংস্কৃত কলেজের সকল বিভাগের ছাত্রগণ কলেজে ইংরাজী বিভাগ পুনঃপ্রচলিত করিবার জন্য তৎকালীন সেক্রেটারী জি. টি. মার্শাল-এর নিকট আবেদন করেন। এই আবেদন-পত্রে ঈশ্বরচন্দ্রেরও স্বাক্ষর ছিল। ন্যায় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে ভূগোল ও খগোল বিষয়ে কতকগুলি শ্লোক লিখিয়া তিনি পুরস্কৃত হন।

১৮৪০-৪১ খ্রীঃ অব্দে ন্যায় শ্রেণীর পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম হন এবং অনেকগুলি পুরস্কার পান। এতদ্ব্যতীত তিনি প্রথম স্থান অধিকার করার জন্য ১০০৲ টাকা, পদ্য

রচনার জন্য ১০০৲ টাকা, দেবনাগরী হস্তলিপির জন্য ৮৲ এবং বাংলায় কোম্পানীর রেগুলেশান পরীক্ষায় ২৫৲ টাকা পুরস্কার লাভ করেন। সম্ভবতঃ স্থায় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তিনি জ্যোতিষ শ্রেণীতেও কিছুকাল পাঠ লইয়াছিলেন।

১৮৪১ খ্রীঃ অব্দ : দীর্ঘ বারো বৎসর পাঁচ মাস অধ্যয়নের পর ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতার সরকারী সংস্কৃত কলেজের প্রশংসাপত্র লাভ করেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গও মিলিতভাবে বিদ্যাসাগরকে প্রশংসা পত্র দেন। প্রশংসাপত্রটি এইরূপ :

অস্মাভিঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরায় প্রশংসাপত্রং দীয়তে। অসৌ কলিকাতায়াং শ্রীযুত কোম্পানীসংস্থাপিতবিদ্যামন্দিরে ১২ দ্বাদশ বৎসরান্ ৫ পঞ্চ মাসাংশ্চোপস্থায়াধোলিখিতশাস্ত্রাণ্যধীতবান্।

ব্যাকরণম্········ শ্রীগঙ্গাধর শর্মভিঃ
কাব্যশাস্ত্রম্·········শ্রীজয়গোপাল শর্মভিঃ
অলঙ্কারশাস্ত্রম্······ · শ্রীপ্রেমচন্দ্র শর্মভিঃ
বেদান্তশাস্ত্রম্·········শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্মভিঃ
ন্যায়শাস্ত্রম্.........শ্রীজয়নারায়ণ শর্মভিঃ
জ্যোতিঃশাস্ত্রম্·········শ্রীযোগধ্যান শর্মভিঃ
ধর্মশাস্ত্রঞ্চ·········শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্মভিঃ

সুশীলতয়োপস্থিতস্তৈস্তৈস্তেষু শাস্ত্রেষু সমীচিনা ব্যুৎপত্তিরজনিষ্ট। ১৭৬৩ এতচ্ছকাব্দীয় সৌরমার্গশীর্ষস্য বিংশতি দিবসীয়ং।

(Sd.) Rassomoy Dutt, Secretary,
10th December, 1842

এই বৎসরেই ২৯শে ডিসেম্বর হইতে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র বাংলা বিভাগের প্রথম পণ্ডিত বা সেরেস্তাদারের চাকুরী গ্রহণ করেন। ইহাই তাঁহার জীবনের প্রথম চাকুরী বেতন ৫০৲ টাকা। ১৮৪১ হইতে ৪৬ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত।

১৮৪৩, নবেম্বর, বাড়িতে আত্মীয়ের অসুস্থতা হেতু কর্মে উপস্থিত হইতে পারিবেন না —ইহা বাংলায় লিখিয়া মার্শাল সাহেবের কাছে পাঠান। পত্রখানি এইরূপ—

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং।

সবিনয় নিবেদনং—

অদ্য আমার পিতৃব্যপুত্রের প্রাতঃকালাবধি চারি বার ভেদ হইয়াছে। ২০ ড্রপ্ লডেনম্ দেওয়াতে আপ্যততঃ প্রায় এক ঘণ্টা ভেদ বন্ধ রহিয়াছে কিন্তু একেবারে নিবৃত্ত হইয়াছে এমত বোধ হয় না অতএব তাঁহার নিকটে থাকা অত্যাবশ্যক সুতরাং অদ্য যাইতে পারিলাম না ক্রটিমার্জনে আজ্ঞা হয়। কিমধিকমিতি ২৮শে নবেম্বর ১৮৪৩।

আজ্ঞাবর্ত্তিনঃ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

১৮৪৪ খৃঃ অব্দে অক্টোবর মাসে হেনরী হার্ডিঞ্জ দেশীয় লোকদের স্ব স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে ১০১টি পল্লী-পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সকল পাঠশালার জন্য শিক্ষক নির্বাচন করিতেন বিদ্যাসাগর এবং মার্শাল সাহেব।

১৮৪৬ খৃঃ অব্দে ঈশ্বরচন্দ্র ২৮শে মার্চ তারিখে সরকারি সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদের জন্য ইংরাজীতে আবেদনপত্র পাঠান। এই আবেদন পত্রের সহিত মার্শাল সাহেব এক প্রশংসাপত্রও দেন। প্রশংসাপত্রটি এইরূপ :

Certified that Iswar Chunder Vidyasagar has been Serishtader of the Bengallee Department of the College of Fort William for nearly five years. He was educated in the Government Sanskrit College and studied all the branches of Literature and Science taught there with the greatest success, and he has since by private study, acquired a very considerable degree of knowledge of the English Language. I have derived most satisfactory aid from his learning and intelligence in matters conected with his office—and I have also received much willing assistance in others of an extra nature, especially in the annual examination of candidates for scholarships in the Sanskrit College for the last four years, in

which I have been strongly impressed with his tact and intelligence and freedom from all bias or unworthy motives. On the whole, I consider, that he unites in an unusual degree, extensive acquirements, intelligence, industry, good disposition, and high respectability of character.

College of Fort William G. T. Marshall
28th March, 1846. Secretary, College.

৬ই এপ্রিল ১৮৪৬ খৃঃ অব্দ হইতে শিক্ষাপরিষদ মাসিক ৫০৲ টাকায় সংস্কৃত কালেজের সহকারী সম্পাদক পদে বিদ্যাসাগরকে নিযুক্ত করেন। তখন তাঁহার বয়স ২৬ বৎসর মাত্র। ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক রসময় দত্ত মহাশয়কে উন্নতপঠনব্যবস্থার রিপোর্ট দাখিল করেন।

১৮৪৭ খৃঃ অব্দে—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি প্রতিষ্ঠা :

এপ্রিল—প্রথম গ্রন্থ 'বেতালপঞ্চবিংশতি' প্রকাশ।

১৬ই জুলাই ঈশ্বরচন্দ্র সহকারী সম্পাদকের কর্ম পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় চতুর্থ সহোদর হরচন্দ্র বিসূচিকারোগে মাত্র বারো বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই ঘটনার অনতিকালপরেই, সংস্কৃত কালেজের কার্য-প্রণালী লইয়া সম্পাদক বাবু রসময় দত্তের সহিত তাঁহার বিশেষ মতান্তর ঘটে। স্বকীয় ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হইল দেখিয়া স্বাধীনচেতা ও পুরুষপ্রকৃতিসম্পন্ন ঈশ্বরচন্দ্র পদত্যাগ করেন। সম্পাদক বাবু রসময় দত্ত ও শিক্ষা সমিতির অধ্যক্ষ ময়েট সাহেব এত অনুরোধ করিলেন, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের পণ আর ভাঙ্গিল না।

১৮৪৯ খৃঃ অব্দ : মার্শাল সাহেব ঈশ্বরচন্দ্রের গুণমুগ্ধ ও হিতৈষী ছিলেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে এই বৎসর ১লা মার্চ হইতে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কোষাধ্যক্ষ ও হেডরাইটারের চাকরী দেন। মাসিক ৮০৲ টাকা বেতন।

জে. ই. ডি বেথুন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে কলিকাতায় বর্তমান স্ত্রী-শিক্ষার প্রথম সূত্রপাত ঘটে। সহস্র বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বেথুন ও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে যাঁহারা সহযোগিতা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, রামগোপাল

ঘোষ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার দুই কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে সর্বাগ্রে বিদ্যালয়ে পাঠান। বেথুনের অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যালয়ের সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই বৎসরেই ১৪ই নভেম্বর বাংলা ১২৫৬, ৩০ কার্তিক বিদ্যাসাগরের জ্যেষ্ঠ পুত্র নারায়ণচন্দ্রের জন্ম হয়। ইহার কিছুদিন পরে পঞ্চম ভ্রাতা হরিশচন্দ্র কলিকাতায় ওলাউঠা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সময়েই (১৮৪৮-৪৯) বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার 'সংস্কৃত যন্ত্র' নামক একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত করেন।

১৮৫০ খ্রী: অব্দের আগষ্ট—'সর্বশুভকরী পত্রিকা' প্রকাশ। ৮ঠা ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কালেজে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে উক্ত কলেজের প্রকৃত অবস্থা কি এবং কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে কালেজের উন্নতি হইতে পারে এই বিষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্য ভারপ্রাপ্ত হন। ১৬ই ডিসেম্বর এক বিস্তৃত রিপোর্ট বিদ্যাসাগর শিক্ষাপরিষদের সম্পাদক ডা: ময়েট-এর নিকট দাখিল করেন। রিপোর্টি এইরূপ—

সংস্কৃত কলেজ পুনর্গঠনে বিদ্যাসাগরের রিপোর্ট

To

F. J. MOUAT, ESQ., M. D.,

Secretary to the Council of Education.

SIR,

I have the honour to submit, for the information of the Council of Education, a report on the Sanscrit College, drawn up aggreeably to the instructions conveyed in your letter No. 3538 dated the 5th instant.

I beg leave to remark that it has long been in my contemplation to submit a report of the nature now furnished, but circumstances deterred me from such a step I am now, however,

happy to have an opportunity of carrying out my wishes, as a matter of duty, under the sanction of the Council.

Report

1. **Grammar Department.**—Under the present system this department consists of five classes.* The works studied are Mugdhabodha, Dhatupatha, Amarakosha and Bhatti Kavya; the fifth class studying 17 pages of Mugdhabodha; the fourth class, 42 pages of the same work; the third class, 100 pages; the second class, the remaining 90 pages of the same book, together with Dhatupatha; and the first class, a few books of Bhatti Kavya and a certain portion of Amarakosha.† Four years‡ are the prescribed period for continuing in this department; but five years are necessary to enable a student to pass through the five grades. For want of better system, the advantage gained is very little compared with the length of time spent by students in this department.

Mugdhabodha is a very short compendium of grammar. The author Vopadeva seems to have had brevity simply in view. Having had this for his object, he has, consequently, made his work extremely difficult. The Sanscrit is in itself a very difficult language, and to begin its study with a difficult grammar seems, in my opinion, not to be a well-chosen plan. Experience shows what difficulties one has to surmount when studying his grammar in this

*After the foundation of the college in 1824, there were only two Grammar classes, one of the Mugdhabodha and another of Panini. The second Mugdhabodha Grammar class was established in January 1825, the third in November 1825, the fourth in May 1846; and the fifth in January 1847. The Panini class was dropped in January 1828.

†At first the Mugdhabodha Grammar and a few books of the Bhatti Kavya, were read from the beginning to the end in all these classes. Though called first, second, third and fourth, the promotions from each of these classes, were to the Sahitya or Literature class. The present division of study of different parts in different classes, and the study of the Amarakosha and Dhatupatha were introduced by orders of the Council of Education, dated the 31st October 1846.

‡The original period for study was 3 years—extended to 4 years in 1840.

style. Young lads who begin to study Sanskrit, on account of the extreme difficulty of the Grammar Mugdhabodha, only learn by rote what their instructors say, without being able of themselves to understand the contents of the work they read. Thus 5 years pass in the study of grammar alone, without getting any essential introduction to the language itself. It seems to be an astounding fact that one should be studying a language for 5 years and scarcely understand a bit of it. Moreover, the Mugdhabodha, with all its voluminous commentaries, which last, however, are not read in the college, is an imperfect grammar. So, under the present system, the first 5 years of a student of the Sanskrit College, is almost lost to useless purposes. After all his toil and trouble his acquirements in grammar are very imperfect. Again, Dhatupatha, another of the works studied in this department, is a collection of Sanskrit roots in verse. Amarakosha, the third work of study is a dictionary also in verse. These two works when mastered, I admit, are of some assistance to the study of literary works But the advantage gained is not at all commensurate to the time and labour required to get them by heart. Besides, almost all the standard Sanskrit poetical works, which are the main part of Sanskrit literature, being accompanied by excellent commentaries by Mallinatha, supersede altogether the use of the study of the abovenamed two works, Dhatupatha and Amarakosha. I beg leave to say that this commentators is not like his brethren who "blanch the obscure places and discourse upon the plain." Under the above considerations, I do not think it a good plan to spend the first 5 years of study in the Sanskrit College in reading Mugdhabodha, Dhatupatha and Amarakosha. Bhatti Kavya, the fourth and last work of study in this department, is a poem, the theme of which is Rama and his adventures. This work was purposely written to exemplify the rules of grammar. It is not altogether ill-adopted for the grammar department.

After all these considerations, I beg leave to propose the following remodelled system of study for the grammar department Should the Council be pleased to adopt the suggestion, I do think, in my humble opinion, that in 4 years, the time prescribed now for grammar study, the students shall have a thorough knowledge

of grammar, and tolerable proficiency in literature besides, and they will not experience that difficulty in the Sahitya class which they do now, being made all at once, just after finishing an imperfect grammar, to begin with the standard works, without having had an insight into the language.

The system I would propose is this: The boys instead of beginning the grammar at once in the Sanskrit language, should learn some of the most fundamental rules dressed in the easiest Bengali; then they should go on with two or three Sanskrit "Readers" to be compiled. These "Readers" should consist of easy selections from the Hitopadesha, Panchatantra, Ramyana, Mahabharata and from other works suited for the purpose. This will take the students some two years. After this they should begin with Siddhanta Kaumudi, Bhattoji Dikhshita, the study of which they should continue to the highest class of the grammar department. Of all the Sanskrit grammars this is decidedly the best and the highest authority on the subject. It is at once complete and simple. Along with Siddhanta Kaumudi the students should also study Raghu Vansha and selections from Bhatti Kavya, Dashakumar Charita, etc., etc.* I beg leave also to propose that instead of five classes there should be four, and the fifth be considered as a section of the fourth, both studying the same books, and the promotions from both the classes being to the third. By this arrangement a year will be coveniently saved, and the period for the grammar department instead of being five shall be four years.

2. Sahitya or General Literrture.—The students coming from the grammar department have to study in this class for 2 years. Whilst here, they read the following works :—

(1) Raghuvansa.
(2) Kumarsambhava.
(3) Meghaduta.
(4) Kiratarjuniya.
(5) Shishupalabadha.
(6) Naisadha Charita.

*In a subsequent communication Pundit Eswar Chandra Sarma recommends the introduction into the first Grammar class of the "Vrittaratnakara", a highly esteemed work on prosody.

(7) Shakuntala.
(8) Vikramorvashi.
(9) Ratnavali.
(10) Mudrarakshasa.
(11) Uttara Charita.
(12) Dasakumara Charita.
(13) Kadambari.

They also practise translation from Bengali into Sanskrit and *vice versa*, and attend the mathematical class.

The first 6 of the 13 books above mentioned are the standard poetical works, the seventh, eighth, ninth tenth and eleventh are dramas, the last two are prose compositions. Raghu Vansha is an historical poem in 19 books. Its theme is the adventures of Rama, those of his four immediate ancestors, and the advantures of his descendants down to Agnivarna. Kumar Sambhava, from the name, would appear to be a poem all celebrating the birth of Kartikeya, the Mars of the Hindus. But the 7 books that are extent embrace a certain portion of the intended theme The poem, as it stands, describes the birth of Parvati, the mother of Kartikeya, the burning of Kamadeva, the god of love, by Shiva, the Tapasya (austerities) of Parvati and her marriage with Shiva. Meghaduta is a poem in 118 slokas. A Yaksha or demi-god, having excited the wrath of his master Kuvera, the god of wealth was doomed, by the curse of the master deity, to remain in a state of separation, away from his beloved wife, in a distant land, for the full length of one year. The lover in his distressed condition addresses a cloud, to bear his message to his wife at Alaka, the capital of Kuvera. The Shakuntala and Vikramorvashi are dramas; the first has for its subject the story of Shakuntala, the adopted daughter of a sage named Kanwa, and Dushmanta, a king; the plot of the second is the story of Pururava, a king, and Urvashi, a nymph. All these are very excellent productions. They are by the immortal Kalidasa. Every one of them bears the stamp of his great genius. Shishupalabadha, Kiratarjuniya and Naisadha Charita are epic poems, the first by Magha in 20 books, and the second by Bharavi in 17 books, the third by Shriharsha in 22 books. The death of Shishupala by the hand of Krishna, his cousin, is the theme of Magha's poem. The Kiratarjuniya contains the tapasya of Arjuna, his combat with Shiva in the disguise of a Kirata or barbarian, and finally his acquisition of certain weapons

as rewards from Shiva, who was pleased with his military prowess. The adventures of Nalaraja from the subject matter of Naisadha Charita. The first-mentioned two works possess all the attributes of good epics, only now and then there are some very tedious passages. The 7th, 8th, 9th, 10th and 11th books of Shishupala-badha, though the finest specimens of poetry, and the 7th, 8th, 9th and 10th books of Kiratarjuniya have in many places very obscene passages Naisadha Charita from the beginning to the end is bombástic and hyperbolical. Its style is neither elegant nor chaste ; there are occasional bursts, however, of fine passages. Uttara Charita by Bhavabhuti, is a drama, embracing the latter part of the career of Rama. Ratnavali is also a drama. Dhavaka is its author. He was paid by Rajah Shriharsha to write this work along with another, and attribute its authorship to him. The story of Rajah Udayana and Ratnavali is the plot of this drama. These two works are excellent in every respect. Mudrarakshasa, by Vishakhadatta, may be called a political drama. In its contents we find that Chanakya, the Prime Minister of Chandragupta, the Sandracottus of the Greeks, is applying his diplomatic skill to consolidate the newly acquired empire of his master, by baffling all the efforts of Rakshasa, the royal Prime Minister of subverted Nanda family, to subvert in turn the new dynasty. This also is a good piece of composition. Dasakumara Charita and Kadambari are in prose. In the first a certain number of friends are relating to each other the history of their travels. The style is pure and chaste. There are, however, some objectionable passages. Dandi is its author. Kadambari is a novel, or rather an epic poem in prose. It is in 2 parts. The first part is a masterpiece of Sanscrit composition. The author, Vanabhatta, did not live to complete his admirable work. His son wrote the second part. The production of the son is far inferior to that of the father.

Having laid all this before the Council, I beg leave to state there is not much alteration required in the purely literary studies of this class. With regard to mathematical studies I will speak hereafter, when I report on the Jyotisha class. The change I would propose is this ; Raghu Vansha, as I have proposed in my report of the grammar department, should be transferred to the first

grammar class, and the Dashakumara Charita, instead of being read entire here, be studied in selections in one of the grammar classes, and that Shishupalabadha, Kiratarjuniya, and Naisadha Charita, having many objectionable passages, as stated before, instead of being read entire, be studied in selections. The first part only of Kadambari should be read. All the other works should be read entire. In addition to this I beg leave to propose that two other works, Vira Charita and Santishataka, be studied in this class. The former is the first part of that drama of which Uttara Charita is the second, being in no way inferior to it. The Santishataka is an excellent didactic poem. The students should practise translating as before. They should also write essays in Sanscrit and Bengali.

3. **Alankara or Rhetoric Class**—After Sahitya the students come to this class and continue in it for two years * They read in this class the following works on rhetoric :—

(1) Sahitya Darpana. (3) Kavya Darshan.
(2) Kavya Prakasha. (4) Rasagangadhara.

They also read those poetical works which from want of time they cannot go on with in the Sahitya class. Besides this, they have for their exercise, translations and compositions. They also attend the mathematical class.

With regard to this class I beg leave to propose the following change. The text-books should be Kavya Prakasha and Dasharupaka. Generally Sahitya Darpana is the work read ; but I prefer Kavya Prakasha and Dasharupaka on the following grounds. Kavya Prakasha is a much more profound work than Sahitya Darpana, and is acknowledged to be the highest authority on the subject. The best commentators, such as Mallinatha, quote this work for their authority. The Sahitya Darpana only dilates in very diffuse style what the Kavya Prakasha contains in essence. Kavya Prakasha, however, speaks nothing of dramatical compositions. Dasharupaka treats of that portion of rhetoric. Besides this is the highest authority in its own department. Kavya Prakasha and Dasharupaka could be read in less time than Sahitya

*Formerly the period of study in this class was one year, which was extended to two years by order of the Council, dated the 28th November 1846.

Darpana. So the former two have every claim to be preferred to the latter, and after reading the two first, to read the last also would be waste of time. The purely literary works, should my suggestions regarding the studies of the grammar and Sahitya departments be adopted, will not require to be studied as class books in this (rhetoric) class. The hours that will thus be saved from the immediate objects of the class should be devoted to the study of mathematics and other works, of which I will make mention afterwards.

4. **Jyotisha or Mathematical Class.**—The students of the Sahitya and Alankara classes attend this class and study Lilavati and Vijaganita. Lilavati is a treatise on arithmetic and mensuration by Bhaskaracharya. Vijaganita is a treatise on Algebra by the same author. Both of these works are very meagre. They are in a great measure without any method, and do not contain all that is contained in similar English books. From a curious taste they have been rendered needlessly difficult. The rules and questions are all in verse. On account of this the students take so great a length of time as four years to study these two books. The examples are too few.*

Great changes are required in this branch of study. For the present cemplete treatises on Arithmetic, Algebra and Geometry should be compiled from the best English works on those subjects. After studying these, the students will be able to read Lilavati and Vijaganita with great facility. The higher branches of Mathematics

* The chair of mathematics was first created in June 1826, down to 1835, the students of the Sahitya and Alankara classes attended this class as at present. In 1835 it was made a separate class, i.e., instead of the Sahitya and Alankara class students attending this class, the students of Alankara were promoted to this class, and studied here for one year. In 1839 this arrangement was set aside, and the Smriti and Nyaya class students were required to attend certain set hours. This arrangement was again put aside in April 1846, and the students of the Sahitya and Alankara classes were again made to attend this class and that arrangement continues to the present day. From the very establishment of the class Lilavati and Vijaganita were the Text-books. Kshetratattwadipika, a Sanskrit translation of geometry, as contained in Hutton's Mathematics, was read in the class once for all in 1839. This book is not better than Lilavati and Vijaganita.

should be attempted to be translated afterwards, and when ready should be adapted as class books. I would now propose that a popular treatise on Astronomy, such a Herchel's, be compiled in Bengali, and be read in the mathematical class. These works might have been studied in English ; but their appearance in Bengali will be of great use also in the Vernacular schools. Beside the Sahitya and Alankara students, the students of the Smriti and Nyaya classes should attend the lectures of the Professor of Mathematics.

Here the junior department of the Sanscrit College is considered to terminate.

I beg leave to propose that the study of Bengali books, treating on useful and entertaining subjects, be introduced in the classes of the junior department. The works should treat of such subjects as the following :—

For the Fourth Grammar Class.—Pretty stories about animals.

For the Third Grammar Class.—Rudiments of knowledge, as in Chambers's Educational Course.

For the Second Grammar Class.—Moral Class Book, as in Chambers.

For the First Grammar Class.—Miscellaneous subjects, such as Art of Printing, Loadstone, Navigation, Earthquake, Pyramids, Chinese Wall, Honey Bee, etc.

For the Sahitya Class.—Biography, as in Chambers, and miscellaneous reading on useful and entertaining subjects, selected and translated from Telemachus, Rasselas, Mahabharata, etc.

For the Alankara Class.—Essays on Moral, Political, and Literary Subjects, and a popular treatise on the Elements of Natural Philosophy.

Should the Council be pleased to introduce these Bengali books, the students of the Sanscrit College will, with little difficulty, acquire great proficiency in Bengali, and, through the medium of that language, derive useful information, and thereby have their views expanded before they commence their English studies.

Of the abovementioned Bengali works, the biography is already published ; rudiments of knowledge and moral class book are in

the press, and almost all the other works are in the course of preparation. The adoption of these books will entail on the Council no expense whatsoever.

I beg also to state that the preparation and the publication of the rudiments of Sanscrit grammar in Bengali and that of the Sanscrit selections shall need no pecuniary assistance of the Council.

The preparation of the works for the Mathematical class, namely, Arithmetic, Algebra, Geometry and a popular treatise on Astronomy, suitable for the use of the Sanscrit College, will need the patronage of the Council of Education when the state of the education funds will admit of this being afforded.

5. **Smriti of Law Class.**—After the Alankara the students come to this class, and continue in it for three years. The works read are—

(1) Manusanhita.
(2) Mitakshara, 2nd Section.
(3) Vivada Chintamani.
(4) Dayabhaga.
(5) Dattaka Mimansa.
(6) Dattaka Chandrika.
(7) Ashtavinshati Tattwas.

The institute of Manu is the highest authority on the subject of Hindu Law. It treats of social, moral, political, religions and economical laws. It is in a manner an index of Hindu society in ancient times. Mitakshara, by Vijnaneshwara, is a commentary on Yajnavalkya's Code. The second section treats of civil and criminal laws, the former including the law of inheritance, Mitakshara is acknowledged to be the highest authority in the North-Western Province. Vivada Chintamani, by Vachaspati Mishra, is a compilation of civil and criminal laws. This work is the authority in the Province of Bihar. Dayabhaga, by Jimutavahana, is a treatise on inheritance. This work is the authority in Bengal. Dattaka Mimansa and Dattaka Chandrika are treatises on the adoption of children and their civil rights. The Mimansa is the authority in the North-Western Provinces and the Chandrika in Bengal. The Ashtavinshati Tattwas are by Raghunandana, With the exception of the Daya and Vyavahara Tattwas the former on the law of

inheritance, the latter on the court procedure, the other 26 Tattwas are treatises on the forms of religious ceremonies.+

With regard to this class I beg leave to observe that the study of the 28 Tattwas ought to be discontinued. Though they are of use to the Brahmans as a class of priests, they are not at all fitted for an academical course. The other works should be allowed to keep their place. Their study makes one conversant with the Hindu law of every part of India.*

6. **Nyaya Class.**—The Nyaya system of philosophy principally treats of Logic and Metaphysics, and occasionally touches upon subjects relating to Chemistry, Optics, Mechanics, etc. The same description applies more or less to the other systems, excepting Mimansa and Patanjala, which treat of religious ceremonies and abstract contemplation of the deity respectively. The years of study in this class are four. † the work studied are the following :—

(1) Bhashaparichchheda.
(2) Siddhanta Muktavali.
(3) Nyayasutras with Vritti or commentary.
(4) Kusumanjali.
(5) Anumana Chintamani and Didhiti.
(6) Shabdashaktiprakashika.
(7) Paribhasha.
(8) Tattwa Kaumudi.
(9) Khandana.
(10) Tattwa Viveka ‡

Bhashaparichchheda, by Vishwanatha Panchanana, is an elementary treatise on all the departments of Nyaya. Siddhanta

---

*The 28 Tattwas were introduced by order of the Council of Education, dated the 10th June 1846.

†From 1824 to 1835, students from the Alankara class were promoted at their option either to the Nyaya or Smriti class. For the remaining 5 or 6 years they studied in either of the classes, of such as liked, studying 1 or 2 years in the Nyay class, joined that of Smriti. In 1835, it was compulsory on every one to study 2 years in the Nyaya class and the remaining portion in Smriti. This continued up to 1846, when, by order of the Council of Education dated the 28th November, the period was extended to 4 years.

‡The books marked 5, 6, 7, 8, 9, 10 were introduced by order of the Council of Education dated the 17th February 1847.

Muktavali is a commentary on the Bhashaparichchheda by the author himself. Nyaya Sutras are by Goutama, the founder of this school of philosophy. Kusumanjali treats of the existence of the deity and that of a future state. The line of argumentation on the whole is similar to what is to be found in modern European works on the same subject. The author is Udayanacharya. Anumana Chintamani is work of the modern school of Nyaya Philosophy, on deduction, by Gangeshopadhyaya. His reasoning is similar to that of the schoolmen of the middle ages of Europe. The treatise is what Bacon would call a "cobweb of learning". In the study of this work insurmountable difficulties are to be met with. Anumana Didhiti is its commentary, by Raghunath Shiromani. He is the dictator in the modern Nyaya School of Philosophy. Shabdashaktiprakashika, by Jagadisha, is a treatise on the import of words. Paribhasha, by Dharmaraja, is a short treatise on the Vedantic doctrines. Tattwa Kaumudi, by Vachaspati Mishra, is a short but comprehensive treatise on the Sankhya system of philosophy. Khandana is by Shriharsha. The object of the author in this work is to refute all the then existing systems of philosophy, and to establish his favourite, the Vedantic. This work is of high repute. The author has handled the subject in the most abstruse style, and has actually made it what they call "muddy metaphysics". Tattwa Viveka, by Udayanacharya, aims at refuting the Bouddha or atheistical doctrine and proving the necessity of a maker of the universe. The style of this work has the opposite faults of being abstruse and diffuse.

After the above observations. I beg leave to suggest that this, class, instead of being called the Nyaya or Logic Class, be called the Darshana of Philosophy Class, and that the study of Anumana Chintamani and Didhiti, Khandana and Tattwa Viveka be discontinued, and in their place be studied the following works on the other systems of philosophy, excluding the Mimansa or rule of religious ceremonies :—

(1) Sankhyapravachana. (3) Panchadashi.
(2) Patanjala Sutra. (4) Sarvadarsanasangraha.

The period of study in the Sanskrit College is 15 years. One is expected to have a perfect knowledge of Sanscrit learning in so

long a period. But no one may be considered to have such knowledge who is not familiar with all the systems of philosophy prevelent in India. True it is that the most part of the Hindu systems of philosophy do not tally with the advanced ideas of modern times, yet it is undeniable that to a good Sanscrit scholar their knowledge is absolutely required. Should the Council be pleased to adopt the suggestions that I will submit in the succeeding part of my report regarding the English department, by the time that the students come to the Darshana or Philosophy class, their acquirements in English will enable them to study the modern Philosophy of Europe. Thus they shall have an ample opportunity of comparing the systems of Philosophy of their own, with the new Philosophy of the western world. Young men thus educated will be better able to expose the errors of ancient Hindu Philosophy than if they were to derive their knowledge of Philosophy simply from European sources. One of the principal reasons why I have ventured to suggest the study of all the prevelent systems of Philosophy in India, is that the student will clearly see that the profounders of different systems have attacked each other, and have pointed out each other's errors and fallacies. Thus he will be able to judge for himself. His knowledge of European Philosophy shall be to him an invaluable guide to the understanding of the merits of the different systems.

7. **English Department** *—The present mode in which this very useful department is conducted is very unsatisfactory. There is no rule as to what students are expected to study English, but it is entirely left to their own option. They commence the study when they please, leave it off at their own option, and commence again when it suits their purpose. Many students on being attached to the grammar classes, at their first admission, immediately commence English, but from difficulty of the first principles of both languages, the greater part being unable to carry on both at once, some after a short time neglect their English and others the Sanscrit.

* The English department was established in May 1827. It was abolished by the orders of the General Commitee of Public Instruction in November 1835. It has been re-established in October 1842 by the orders of the Council of Education.

It is the case with many to retire from the English class just before the examinations. The very same students come again to be admitted at the beginning of the next session. There is another circumstance which causes great confusion, which is that one English class is constituted of students of various Sanscrit classes. Take, for instance, the components of the third and fourth classes. The third class consist of 13 boys, 4 of whom belong to the Smriti class, 1 to the Nyaya, 1 to the Alankara, 3 to the third Grammar class, and 4 to the fourth Grammar class. The fourth class consists of 33 boys, 2 of whom belong to the Alankara class, 5 to the Sahitya, 2 to the first Grammar class, 6 to the second, 10 to the third, 6 to the fourth, and 2 to the fifth Grammar class. From the circumstance of students of various Sanscrit classes coming to attend the English class, it becomes altogether a difficult affair to secure regular attendance in the latter. Again, the study of English being optional, some portions only of each Sanscrit class are students in the English department. Such students, particularly those from the lower classes, cannot go on with their Sanscrit studies with that degree of attention which the non-English reading students can. But the studies of the class being the same with all, the progress in both the languages is greatly impeded.

The English department, if continued to be conducted in this irregular style, is not expected to be productive of any satisfactory results. After the creation of the English department in this institution a similar irregular mode of conducting in rendered it useless, which caused its abolition by the late General Committee of Public Instruction. If better arrangements be not made, the present English department will also become useless.

Under the above considerations, I beg leave to suggest the following arrangement, which, I am persuaded, if steadily pursued, will be productive of beneficial results. The arrangement I would propose is as follows :—

The students should not be allowed to commence English till they have acquired some proficiency in the Sanscrit language : the pupils of the same Sanscrit class shall go on with the same English studies : the study of English instead of being optional be·

compulsory ; should there be any one very unwilling to be taught in English, he be given to understand that he will not be allowed to commence English at any subsequent stage of his Sanscrit study, as to create for him alone a separate class is altogether out of the question.

Under the proposed system of Sanscrit study, the students of the Sahitya class, it is assumed, will be well acquainted with the Sanscrit language. Therefore I beg leave to propose that the study of English be commenced in the Alankara class. In that case the students will be able to devote to the study of English nearly double the time they do now ; and their minds, having received culture, they will not have to begin with such trite subjects as young beginners are obliged to commence with. From the Alankara class to the last year of study in the college is some 7 or 8 years and a diligent student in the course of that period will have ample opportunity of making himself familiar with English language and literature.

8. **Fifth Grammar Class.**—Another very important circumstance I beg to bring to the notice of the Council. The fifth Grammar Professor, Pundit Kasinath Tarkapanchannana, is not quite equal to discharge the duties of his class. He is an old Pundit and seems to be in his dotage. He is altogether unacquainted with that discipline which is absolutely required for so young a class as his. Being an old man, he will not bear to be directed, as is usual with all Pundits of his age.

From all these circumstances his class is the most irregular of all. Therefore, I beg leave to propose that he be placed in charge of the library with his present salary, rupees 40 a month and the present librarian, Pundit Girish Chundra Vidyaratna, a very distinguished ex-student of the institution, be appointed to the chair of the fifth Grammar Professor with his present salary rupees 30 a month, to be raised to rupees 40 when a favourable opportunity offers.

9. **Promotions.**—With regard to the promotion of boys from one class to another, the present practice of the college is to keep them in each class for the allotted number of years and send them

at the expiration of the time to the higher class, without any consideration as to the degree of their acquirements.

Under this arrangement it so happens that a student, notwithstanding he may have finished his course in the class, is not allowed to join the higher one if he has not finished his allotted years, whilst another, let him be how deficient soever in the studies of the class, is promoted to the higher class, simply if he has merely completed the prescribed time. Therefore, I beg leave to propose that promotions take place on the principle of merit, not years : only with this limitation, that no one will be allowed to remain in the college beyond the period prescribed by the scholarship rules. I am persuaded that under this arrangement all students above mediocrity will finish their collegiate course of study in less them the time now prescribed.
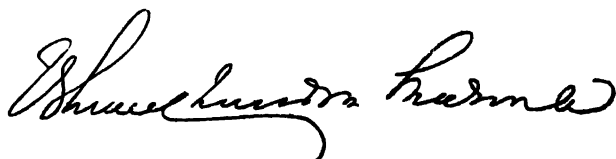
10. **Discipline.**—The laxity of general discipline in the institution at present is notorious. It is highly desirable that strict and steady attention should be paid to ensure regularity of attendance, to put a stop to students constantly leaving their classes on trivial pretences, and to prevent needless noise, talking and general confusion. There is no inherent cause whatever why the discipline in this college should not be equal to that which obtains in any English institution. The same methods require only to be enacted and enforced.

In conclusion, I beg leave to observe, that the changes now proposed by me in the system of the college are the results of a long and anxious consideration of the subject. They are extensive, but I have endeavoured to select only those which are absolutely necessary for the efficiency of the institution, and which are quite practicable. Should the Council be pleased to adopt these suggestions, I have sanguine hopes that the happy and speedy results, under an efficient and steady supervision, will be, that the college

will become a seat of pure and profound Sanscrit learning, and at the same time a nursery of improved vernacular literature, and of teachers thoroughly qualified to disseminate that literature amongst the masses of their fellow-countrymen.*

I have & c

SANSCRIT COLLEGE,
The 16th December, 1850.

Ishwarchunder Surma

Professor of Sahitya in the Sanscrit College.

বিদ্যাসাগরের হস্তলিপি

Awarded
to Jogindra Chunder Bose
at the close of his brilliant
Career as a Student
in the Metropolitan Institution
Iswarchundra Sarma
8th January 1875

* Approved by the Council, and ordered to be adopted in the next season of 1851-52.

ব্যাকরণ বিভাগ

(১) বর্তমান পদ্ধতি অনুসারে এই বিভাগ পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর দুইটিমাত্র ব্যাকরণের শ্রেণী ছিল। একটি মুগ্ধবোধ শ্রেণী ও অপরটি পাণিনি। দ্বিতীয় মুগ্ধবোধ বানান শ্রেণী ১৮২৫ খৃঃ জানুয়ারী মাসে খোলা হয়। তৃতীয়টি ১৮২৫ খৃঃ নভেম্বর, চতুর্থটি ১৮৪৬ খৃঃ মে, পঞ্চমটি ১৮৪৭ খৃঃ জানুয়ারী। পাণিনি শ্রেণী ১৮২৮ খৃঃ উঠিয়া যায়। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পঠিত হইয়া থাকে: মুগ্ধবোধ, ধাতুপাঠ, অমরকোষ, ভট্টিকাব্য। পঞ্চম শ্রেণীতে মুগ্ধবোধের ১৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পঠিত হয়। চতুর্থ শ্রেণীতে উক্ত পুস্তকের ৪২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাঠ হয়। তৃতীয় শ্রেণীতে ১০০ শত পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে উক্ত পুস্তকের অবশিষ্ট ৯১ পৃষ্ঠা ও ধাতুপাঠ। প্রথম শ্রেণীতে ভট্টিকাব্যের কয়েক সর্গ ও অমরকোষের কিয়দংশ অধীত হয়। এই বিভাগে অধ্যয়ন করিতে চারি বৎসরকাল নির্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু উপরোক্ত পঞ্চবিভাগে অধ্যয়ন করিতে হইলে পাঁচ বৎসর সময় অতিবাহিত করা প্রয়োজনীয় বোধ হয়। অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট প্রণালীর অভাবে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বালকের এই বিভাগে পাঠকালে যে সময় অতিবাহিত করে, সময়ের সহিত তুলনা করিলে, তাহাদিগের শিক্ষা যৎসামান্য বলিতে হইবে। মুগ্ধবোধ অতি সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ। ইহার প্রণেতা বোপদেব, সংক্ষিপ্ততার প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার এইরূপ অভিপ্রায় থাকাতে তিনি তাঁহার পুস্তককে অতিশয় দুরূহ করিয়াছেন। একে সংস্কৃত ভাষা অতিশয় কঠিন, তাহাতে একখানি দুরূহ ব্যাকরণ সহকারে ইহার শিক্ষা শুরু করা আমার বিবেচনায় সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এতাদৃশ ব্যাকরণে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে যেরূপ কষ্টে পতিত হইতে হয়, তাহা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। সুকুমার-মতি বালকবৃন্দ সংস্কৃত শিক্ষার আরম্ভ কালে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের কাঠিন্য প্রযুক্ত তাহাদিগের শিক্ষকগণের উচ্চারিত কথাগুলি কেবল মুখস্থ করিয়া রাখে। তাহারা যে পুস্তক পাঠ করে, তাহার বিন্দুবিসর্গও নিজে নিজে বুঝিতে পারে না। এইরূপে কেবল ব্যাকরণ অধ্যয়নেই পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হয়। কিন্তু ভাষায় কিঞ্চিন্মাত্রও প্রবেশাধিকার জন্মে না। ইহা নিতান্তই বিস্ময়কর যে এক ব্যক্তি ভাষাশিক্ষায় পাঁচ বৎসরকাল ব্যয় করিল, অথচ তাহার বিন্দুমাত্রও বুঝিতে সমর্থ হইল না। বিশেষতঃ মুগ্ধবোধের বৃহদাকার টিকা টিপ্পনী সত্ত্বেও উহা নিতান্তই অসম্পূর্ণ গ্রন্থ। সুতরাং বর্তমান পদ্ধতি অনুসারে সংস্কৃত কালেজের ছাত্রের প্রথম পাঁচ বৎসর বৃথা ব্যয় হয়। তাহার সমস্ত পরিশ্রম ও কষ্টের ফল এইমাত্র হয় যে, ব্যাকরণ শাস্ত্রে তাহার অধীতবিদ্যা নিতান্তই অসম্পূর্ণ।

এই বিভাগে ধাতুপাঠ নামে যে অপর পুস্তক অধীত হয়, তাহা ছন্দোবদ্ধ সংস্কৃত ধাতু-সংগ্রহ মাত্র। অমরকোষ একখানি ছন্দোনিবদ্ধ অভিধান। আমি স্বীকার করি যে, এই গ্রন্থ সম্যকরূপে আয়ত্ত হইলে সাহিত্যশাস্ত্র অধ্যয়ন কালে কিছু সুবিধা হইতে পারে ; কিন্তু গ্রন্থদ্বয় মুখস্থ করিতে যে সময় ও পরিশ্রম ব্যয়িত হয়, তাহার তুলনায় প্রাপ্ত উপকার অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ প্রচলিত উৎকৃষ্ট সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রের ভূষণস্বরূপ, প্রায়ই প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথের অত্যুৎকৃষ্ট ব্যাখ্যায় অলঙ্কৃত ; সুতরাং উক্ত পুস্তকদ্বয়ের অধ্যয়ন নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়। এস্থলে ইহার উল্লেখ আবশ্যক যে, উপরোক্ত টীকাকার তাঁহার অন্যান্য সহযোগীর ন্যায় নহেন। তাঁহার গ্রন্থের দুরূহ অংশগুলি পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত সরল অংশগুলি বিশেষভাবে ব্যাখ্যা কবেন। এই সকল বিষয় সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিশেষ প্রতীতি হইবে যে, মুগ্ধবোধ, ধাতুপাঠ ও অমরকোষ পাঠে পাঁচ বৎসর কাল অতিবাহিত কবা নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ। এই বিভাগে অপব পাঠ্যপুস্তক ভট্টিকাব্য। ইহা রাম ও তাঁহাব কার্যকলাপ সমন্বিত একখানি পদ্যগ্রন্থ। এই পুস্তক-খানি ব্যাকরণ শাস্ত্রের সূত্র সকলের উদাহরণ প্রদর্শনাভিপ্রায়েই লিখিত হইয়াছে। ইহা ব্যাকরণ-বিভাগে নিতান্ত অনুপযোগী বলিয়া বোধ হয় না।

এক্ষণে ব্যাকরণ-বিভাগে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার করিতে ইচ্ছা করি। আমার সামান্য বিবেচনায় ইহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় যে, চারি বৎসর ব্যাকবণ বিভাগে অতিবাহিত করা নির্ধাবিত আছে. উক্ত সময়েব মধ্যে যে ছাত্রেরা কেবল ব্যাকরণেই পারদর্শিতা লাভ করিবে, তাহা নহে, তাহাব সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ সাহিত্যেও কিঞ্চিত প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিবে। এক্ষণে তাহারা সাহিত্য বিভাগে যে ক্লেশ অনুভব করে, তাহাদিগকে আদৌ তাহা করিতে হইবে না। একখানি অসম্পূর্ণ ব্যাকরণ অধ্যয়নানন্তর তাহাদিগকে সাহিত্য বিভাগে প্রবেশ করিতে হয় এবং ভাষায় তাহাদিগের কিঞ্চিন্মাত্রও জ্ঞান জন্মে না।

আমি যে প্রণালী প্রচলনের পক্ষপাতী, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে। প্রথমতঃ বালকেরা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ব্যাকরণ পাঠ করিবার পরিবর্তে এদেশীয় ভাষায় রচিত ব্যাকরণের প্রধান প্রধান নিয়ম ও সূত্রগুলি পাঠ কবিবে। তৎপরে তাহারা দুই কিংবা তিনখানি সংস্কৃত পাঠ্য অধ্যয়ন করিবে। এই সকল গ্রন্থে হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ হইতে বালকদিগের পাঠোপযোগী উদ্ধৃত অংশ থাকিবে। এই সমস্ত পাঠে ছাত্রদিগের দুই বৎসরকাল অতিবাহিত হইবে। তৎপরে তাহারা সিদ্ধান্ত কৌমুদী আরম্ভ করিবে ও তাহা ব্যাকরণ বিভাগে উচ্চতম

শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করিবে। সমস্ত সংস্কৃত ব্যাকরণের মধ্যে এইখানি সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ও ব্যাকরণ শাস্ত্রে একমাত্র সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক। ইহা যেরূপ সম্পূর্ণ, তাদৃশ সরল। সিদ্ধান্ত কৌমুদীর সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রেরা রঘুবংশ ও ভট্টিকাব্য হইতে উদ্ধৃত অংশ ও দশকুমার চরিত পাঠ করিবে। আমার প্রস্তাব এই যে, পাঁচটি শ্রেণীর পরিবর্তে চারিটি মাত্র শ্রেণী থাকিবে পঞ্চমটি চতুর্থ শ্রেণীর একটি বিভাগ বলিয়া গণ্য হইবে। উভয় বিভাগেই একই পুস্তক অধীত হইবে। এই বন্দোবস্ত দ্বারা একটি বৎসর বাঁচিয়া যাইবে, এবং ব্যাকরণ-বিভাগে পাঁচ বৎসরের পরিবর্তে চারি বৎসর নির্ধারিত হইবে।

সাহিত্য-বিভাগ

ব্যাকরণ বিভাগ হইতে ছাত্রেরা এই শ্রেণীতে উন্নীত হইলে তাহাদিগকে এখানে দু বৎসর কাল পাঠ করিতে হয়। তাহারা এখানে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি অধ্যয়ন করে —(১) রঘুবংশ, (২) কুমার সম্ভব, (৩) মেঘদূত, (৪) কিরাতার্জুনীয়, (৫) শিশুপাল বধ, (৬) নৈষধ-চরিত, (৭) শকুন্তলা, (৮) বিক্রমোর্বশী, (৯) রত্নাবলী, (১০) মুদ্রারাক্ষস, (১১) উত্তর চরিত, (১২) দশকুমার চরিত ও (১৩) কাদম্বরী।

তাহারা এখানে বাঙ্গালা হইতে সংস্কৃত ও সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতে অভ্যাস করে ও গণিত শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে। উপরোক্ত ত্রয়োদশখানি পুস্তকের মধ্যে ছয়খানি প্রসিদ্ধ পদ্যগ্রন্থ। সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ নাটক; অবশিষ্ট দুখানি গদ্য। রঘুবংশ একখানি ঐতিহাসিক পদ্যগ্রন্থ ও উনবিংশ সর্গে বিভক্ত। রামচন্দ্র, তাঁহার উপরিতন তিনপুরুষ ও তাঁহার সন্তান-সন্ততিগণের কার্যকলাপ রঘুবংশের বর্ণিত বিষয়। ইহাতে রাজা অগ্নিবর্ণের বৃত্তান্ত পর্যন্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

'কুমার-সম্ভব' এই নামকরণেই ইহা প্রতীয়মান হয় যে, কার্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত ইহার বর্ণিত বিষয়। কিন্তু ইহার প্রচলিত সাত সর্গ পাঠে দৃষ্ট হইবে যে, ইহাতে বর্ণিত বিষয়ের কিয়দংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বটে; কিন্তু কার্তিকেয়ের মাতা পার্বতীর জন্ম, শিব কর্তৃক কামদেব ভস্ম, পার্বতীর তপস্যা ও তাঁহার সহিত শিবের বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারও ইহাতে বর্ণিত আছে।

মেঘদূত ১১৮ শ্লোকে রচিত একখানি পদ্যগ্রন্থ। কোন যক্ষ তাহার প্রভু ধনাধিপতি কুবেরের কোনও কারণে ক্রোধভাজন হওয়াতে তাহার প্রভু কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া, সুদূরবর্তী প্রদেশে প্রিয়াবিরহিত হইয়া, এক পূর্ণবৎসর কাল বাস করিতে বাধ্য হইয়া-

হইয়াছিলেন। প্রণয়ী যক্ষ এই বিপৎপাতে নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া, নিজ প্রিয়ার নিকট তাঁহার বার্তাবহনের জন্য একখণ্ড মেঘকে কুবেরের রাজধানী অলকা-নগরীতে যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

শকুন্তলা ও বিক্রমোর্বশী দুইখানি নাটক। প্রথমখানি কণ্বঋষি প্রতিপালিতা শকুন্তলা ও রাজা দুষ্মন্তের প্রণয় ব্যাপারে অবলম্বনে লিখিত; দ্বিতীয়খানি রাজা পুরু ও উর্বশীর বৃত্তান্ত-ঘটিত ব্যাপারে পরিপূর্ণ। এই সমস্ত অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, অমর কবি কালিদাসের রহস্যময়ী লেখনী প্রসূত। প্রত্যেক গ্রন্থে তাঁহাব অলৌকিক প্রতিভার সুস্পষ্ট পরিচয় দেদীপ্যমান আছে। শিশুপাল বধ, কিরাতার্জুনীয় ও নৈষধ-চরিত বীররস প্রধান কাব্য। প্রথমখানি মহাকবি মাঘ বচিত ও বিংশ সর্গে বিভক্ত। দ্বিতীয়, কবি ভারবি রচিত ও সপ্তদশ সর্গে বিভক্ত। তৃতীয়খানি শ্রীহর্ষ রচিত, দ্বাবিংশ সর্গে বিভক্ত। শ্রীকৃষ্ণের হস্তে শিশুপালের মৃত্যু কবি মাঘের পদ্যগ্রন্থেব বর্ণিত-বিষয়। কিরাতার্জুনীয় গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়, অর্জুনের তপস্যা, ছদ্মবেশধারী কিরাতরূপী শিবের সহিত তাঁহার যুদ্ধ ও অবশেষে তাঁহার বীরত্বেব পারিতোষিক স্বরূপ মহাদেবের নিকট হইতে তাঁহার পাশুপত অস্ত্র লাভ। রাজা নলের কার্যকলাপ নৈষধ-চরিতের বর্ণিত বিষয়। উপরোক্ত প্রথম দুইখানি পুস্তকে উৎকৃষ্ট বীবরসাত্মক কাব্যের সমস্ত গুণ লক্ষিত হয়। কেবল মধ্যে মধ্যে ক্লেশকব দুই একটি স্থান দৃষ্ট হয়। শিশুপাল বধের সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ সর্গ উন্নত ভাবগর্ভ কবিতায় পরিপূর্ণ, কিন্তু উহাতে কিরাতার্জুনীয়ের স্থানে স্থানে অশ্লীল শ্লোক দৃষ্ট হয়। নৈষধ চরিত আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত অনাড়ম্বর ও অত্যুক্তি বর্ণনায় পরিপূর্ণ। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ বা প্রাঞ্জল নহে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে শ্লোকসকল সুন্দর ভাবে পরিপূর্ণ। ভবভূতি প্রণীত উত্তরচরিত একখানি নাটক-বিশেষ। ইহাতে রামচন্দ্রের জীবনের শেষ অংশ বর্ণিত আছে। রত্নাবলী একখানি নাটক। ধাবক ইহার গ্রন্থকর্তা। রাজা শ্রীহর্ষ কর্তৃক অর্থদানে পুরস্কৃত হইয়া তিনি উক্ত পুস্তকখানি প্রণয়ন করেন। তিনি ঐরূপ আর একখানি পুস্তক রচনা করিয়া উভয় পুস্তক রাজা শ্রীহর্ষ চরিত বলিয়া প্রচারিত করেন। রাজা উদয়ন ও রত্নাবলী রচিত প্রণয় কাহিনী অবলম্বনে উক্ত নাটকখানি রচিত। এই উভয় পুস্তক সর্ববিষয়ে অতি উৎকৃষ্ট। বিশাখ-দত্ত প্রণীত মুদ্রারাক্ষস একখানি রাজনৈতিক নাটক নামে অভিহিত হইতে পারে। ইহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, গ্রীকদিগের বর্ণিত সান্দ্রকোটাসের (চন্দ্রগুপ্তের) প্রধানমন্ত্রী চাণক্য স্বীয় প্রভুর নূতন অধিকৃত রাজ্যের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য কূটনীতি-পূর্ণ কৌশল প্রয়োগ দ্বারা নন্দবংশোদ্ভব শেষ রাজার প্রভুভক্ত প্রধানমন্ত্রী রাক্ষসের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিতেছেন। ইহাও একখানি সুকৌশলসম্পন্ন সুন্দর গ্রন্থ।

দশকুমার চরিত ও কাদম্বরী গদ্যগ্রন্থ। প্রথমোক্ত গ্রন্থে কতকগুলি বন্ধু নিজ নিজ ইতিহাস বর্ণনা করিতেছেন। ভাষা বিশুদ্ধ ও সুন্দর; কিন্তু ইহাতে স্থানে স্থানে দোষপূর্ণ অংশ আছে। দণ্ডী ইহার গ্রন্থকর্তা। কাদম্বরী একখানি উপন্যাস বা গদ্যে মহাকাব্য। ইহা দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ সংস্কৃত রচনার একখানি আদর্শ গ্রন্থ। গ্রন্থকর্তা বানভট্ট এই সর্বজনপ্রশংসনীয় পুস্তকখানি সম্পূর্ণ করিবার পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয়ভাগ রচনা করেন। পুত্রের রচনা পিতার অপেক্ষা সর্বতোভাবে নিকৃষ্ট। এ সম্বন্ধে আর অধিক বক্তব্যের প্রয়োজন নাই।

গণিত শিক্ষা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য জ্যোতিষশিক্ষা-প্রকরণে প্রকাশ করিব।

আমি যে পরিবর্তনের প্রস্তাব করি, তাহা এই; ব্যাকরণ বিভাগ সংক্রান্ত রিপোর্টে আমি উল্লেখ করিয়াছি, রঘুবংশ প্রথম ব্যাকরণ শ্রেণীতে অধীত হউক ও দশকুমার চরিতের উদ্ধৃত অংশ সকল অপর একটি ব্যাকরণ-বিভাগে পঠিত হউক এবং শিশুপাল বধ, কিরাতার্জুনীয় ও নৈষধ চরিতে অনেক অশ্লীল শ্লোক থাকা প্রযুক্ত সমস্ত পঠিত হইবার পরিবর্তে ইহাদের উদ্ধৃত অংশসমূহ পঠিত হউক। কাদম্বরীর পূর্বপাঠ পাঠ্য-পুস্তকরূপে গণ্য হউক। অন্যান্য সমুদয় গ্রন্থ সমস্তই পঠিত হউক। আমি ইহাও প্রস্তাব করিতেছি যে, বীরচরিত ও শান্তিশতক এই শ্রেণীতে পাঠ্যপুস্তকরূপে গৃহীত হউক। বীরচরিত ও উত্তরচরিত একখানি নাটকরূপে পরিগণিত হইতে পারে। তন্মধ্যে বীরচরিত পূর্বার্ধ ও উত্তরচরিত অপরার্ধ। বীরচরিতও উত্তরচরিত অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। শান্তিশতক একখানি সুন্দর নীতিপূর্ণ গদ্যগ্রন্থ। ছাত্রেরা এ সময় অনুবাদ ও সংস্কৃত বঙ্গভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিতে অভ্যাস করিবে।

অলঙ্কার শ্রেণী

সাহিত্যচর্চার পর ছাত্রেরা এই শ্রেণীতে আসে ও এখানে দুই বৎসর কাল অধ্যয়ন করে। (পূর্বে এই শ্রেণীর পাঠকাল এক বৎসর ছিল। ১৮৪৬ খৃঃ-র ২৮শে নভেম্বর হইতে দুই বৎসর পড়িবার নিয়ম হয়।) তাহা এই শ্রেণীতে অলঙ্কার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি অধ্যয়ন করে :—

(১) সাহিত্য-দর্পণ (২) কাব্য-প্রকাশ।
(৩) কাব্য-দর্শন। (৪) রসগঙ্গাধর।

সাহিত্য শ্রেণীতে সময়াভাবে যে সমস্ত পদ্যগ্রন্থ পাঠ করিতে পারে না, এস্থলে তাহারা সেই পদ্যগ্রন্থ সমূহ পাঠ করে। এতদ্ব্যতীত তাহাদিগকে অনুবাদ ও রচনা শিক্ষা করিতে হয়। তাহাদিগকে আবার গণিতশ্রেণীতে গমন করিতে হয়।

এই শ্রেণী সম্বন্ধে আমি নিম্নলিখিত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। কাব্য-প্রকাশ ও দশরূপক পাঠ্যপুস্তক হওয়া উচিত। কিন্তু সচরাচর সাহিত্যদর্পণই পঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমি নিম্নলিখিত কারণে কাব্যপ্রকাশ ও দশরূপক গ্রন্থদ্বয়কে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করি। কাব্যপ্রকাশ, সাহিত্যদর্পণ অপেক্ষা সর্ব-বিষয়ে গাম্ভীর্যপূর্ণ গ্রন্থ এবং সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, অলঙ্কার শাস্ত্র বিষয়ে ইহাই শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ। মল্লিনাথের ন্যায় উৎকৃষ্ট টীকাকারগণ তাঁহাদিগের ব্যাখ্যায় পুনঃ পুনঃ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু কাব্যপ্রকাশে নাটকরচনা সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। দশরূপকে অলঙ্কার শাস্ত্রের উক্ত বিভাগের সবিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। বিশেষতঃ নিজ নিজ বিভাগে ইহা শ্রেষ্ঠতম বলিয়া পরিগণিত। সাহিত্য দর্পণ অপেক্ষা কাব্যপ্রকাশ ও দশরূপক অপেক্ষাকৃত অল্পসময়ে পঠিত হইতে পারে। তন্নিমিত্ত কাব্য প্রকাশ ও দশরূপক, সাহিত্য-দর্পণের স্থান অধিকার করিতে পারে। উক্ত গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিবার পর অপরটি অধ্যয়ন করা কেবল সময় নষ্ট মাত্র। যদি ব্যাকরণ শ্রেণী সংক্রান্ত আমার বক্তব্যগুলি গৃহীত হয়, তবে অলঙ্কার শ্রেণীতে কেবল সাহিত্য-বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠের আবশ্যকতা থাকে না। এ কারণে যে সময় উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা গণিত ও অন্যান্য বিষয়ে নিয়োগ করা যাইতে পারে। তাহার উল্লেখ পরে করিব।

জ্যোতিষ বা গণিতশ্রেণী

সাহিত্য ও জ্যোতিষ শ্রেণীর ছাত্রেরা এই শ্রেণীতেও অধ্যয়ন করে। এখানে তাহারা লীলাবতী ও বীজগণিত পাঠ করে। লীলাবতী ভাস্করাচার্য প্রণীত একখানি অঙ্ক ও পরিমিতিবিষয়ক গ্রন্থ। বীজগণিতও উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত। উভয় গ্রন্থই অতি সংক্ষিপ্ত। পুস্তকদ্বয়ের কোন প্রকার শৃঙ্খলা নাই ও ইংলণ্ডীয় ভাষায় রচিত তৎসদৃশ পুস্তকের ন্যায় উহাতে কিছু নাই। পুস্তকদ্বয় অকারণে অতিশয় কঠিন করিযা রচিত হইয়াছে। নিয়ম ও প্রশ্নাবলী ছন্দে নিবদ্ধ। এই দুইখানি পুস্তক শিক্ষা করিতে ছাত্রগণের চার বৎসর লাগে। অধ্যয়নের এই বিভাগে সবিশেষ পরিবর্তনের আবশ্যক। ইংলণ্ডীয় গ্রন্থকারগণের পুস্তক হইতে অঙ্ক, বীজগণিত, ও জ্যামিতি সম্বন্ধে পুস্তকাদি সংগ্রহ হওয়া উচিত। এই সকল পুস্তক অধ্যয়নের পর বালকেরা অতি সহজে লীলাবতী ও বীজগণিত পুস্তক শিক্ষা করিতে পারিবে। গণিত বিদ্যার উচ্চতর শাখাসমূহ পরে অনুবাদিত করার চেষ্টা এবং সেগুলিকে পাঠ্যপুস্তক করা উচিত। হার্শেল সাহেবকৃত জ্যোতিষ শাস্ত্রের ন্যায় পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ হওয়া উচিত ও গণিত শ্রেণীতে তাহার পাঠ হওয়া আবশ্যক। ঐ সমস্ত পুস্তক

ইংরেজী ভাষাতেই পাঠ্য হইতে পারে ; কিন্তু বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইলে, বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের বিশেষ উপযোগী হইবে। সাহিত্য ও অলঙ্কার শ্রেণীর ছাত্রগণ ব্যতীত স্মৃতি ও ন্যায় শ্রেণীর ছাত্রদিগেরও গণিতাধ্যাপকের উপদেশ শ্রবণ করা উচিত। এস্থলে সংস্কৃত কলেজের নিম্নশ্রেণীতে কাব্যের শেষ হইল, ইহা বিবেচিত হইতে পারে। এই বিভাগের শ্রেণীসমূহে মনোহর অথচ প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত বঙ্গভাষায় রচিত পুস্তক সকল অধীত হইবার প্রয়োজনীয়তা আমি অনুভব করি ; সুতরাং এই প্রস্তাব করি যে, উক্ত পুস্তক সমূহে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবিষ্ট থাকে।

ব্যাকরণের চতুর্থ শ্রেণীর জন্য—পশুসংক্রান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প।

তৃতীয় শ্রেণীর জন্য—রুডিমেণ্টস অব নলেজ ও চেম্বার্সকৃত গ্রন্থাবলী।

দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য—চেম্বার্স কৃত মরাল-ক্লাস বুক।

প্রথম শ্রেণীর জন্য—বিবিধ বিষয়। যথা—মুদ্রাঙ্কন, চুম্বকাকর্ষণ, নৌবিদ্যা, ভূমিকম্প, পিরামিড, চীনদেশীয় প্রাচীর, মধুমক্ষিকা ইত্যাদি।

সাহিত্য শ্রেণীর জন্য চেম্বার্সকৃত জীবনচরিত ও অন্যান্য মনোহর ও প্রয়োজনীয় বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ। যথা—টেলিমেক্স, রাসেলাস্, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অনুবাদ সমূহ।

অলঙ্কার শ্রেণীর জন্য—নৈতিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্য বিষয়ক পুস্তকাবলী ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদি।

যদি এডুকেশন কৌন্সিলের অধ্যক্ষ এই সকল ভাষায় রচিত গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দিষ্ট করেন, তবে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা অল্পায়াসে বঙ্গভাষায় সুন্দর পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিবে ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিবার পূর্বে অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞান উপার্জন করিতে সমর্থ হইবে ও চিত্তবৃত্তির বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিবে।

পূর্বোক্ত বাঙ্গালা গ্রন্থের মধ্যে জীবনচরিত মুদ্রিত হইয়াছে। বোধোদয় ও নীতিবোধ মুদ্রিত হইতেছে এবং অন্যান্য পুস্তকগুলি প্রস্তুত হইতেছে। এই সমস্ত পুস্তক প্রচলনের জন্য কৌন্সিলকে কোন অতিরিক্ত ব্যয় গ্রহণ করিতে হইবে না। এই স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্গভাষায় রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সঙ্কলনগুলি প্রস্তুত করিতে কোন আর্থিক আনুকূল্যের প্রয়োজন হইবে না।

সংস্কৃত কলেজের গণিত-শ্রেণীর ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাবলী, যথা—অঙ্কবিদ্যা, বীজগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতিষ শাস্ত্র। এই সকল গ্রন্থ রচনা করিবার জন্য কৌন্সিল অব এডুকেশনের সাহায্য নিতান্ত আবশ্যক ও কৌন্সিলের সঞ্চিত অর্থ হইতে এ বিষয়ে সহজেই সাহায্য করা যাইতে পারে।

স্মৃতি বা আইন শ্রেণী

অলঙ্কার শ্রেণী হইতে ছাত্ররা এই শ্রেণীতে উন্নীত হয় ও এখানে তিন বৎসর কাল অধ্যয়ন করে। পাঠ্যপুস্তকগুলি এই—মনুসংহিতা, মিতাক্ষরা দ্বিতীয় অধ্যায়, বিবাদ-চিন্তামণি, দায়ভাগ, দত্তকমীমাংসা, দত্তকচন্দ্রিকা, অষ্টবিংশতি তত্ত্ব।

হিন্দু আইন সম্বন্ধে মনুসংহিতাই সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহাতে সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মসংক্রান্ত ও অর্থশাস্ত্র বিষয়ক নিয়মাবলী সন্নিবিষ্ট আছে। প্রাচীনকালের হিন্দু সমাজের বিষয় ইহাতে বর্ণিত আছে। বিজ্ঞানেশ্বর বচিত মিতাক্ষরা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রণীত গ্রন্থের টীকা মাত্র। দ্বিতীয় অধ্যায় দেওয়ানী ও ফৌজদারী দায়সম্বন্ধীয় আইন-কানুন বিবৃত আছে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে মিতাক্ষবা সর্বসম্মত শ্রেষ্ঠ প্রমাণ গ্রন্থ। বিবাদচিন্তামণি বাচস্পতি মিশ্রপ্রণীত, ইহাতে দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিধি বিবৃত। বিহারে ইহা প্রমাণ গ্রন্থ। জীমূতবাহন দায়ভাগেব প্রণেতা, উত্তরাধিকারিত্ব ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। ইহা বাঙ্গালায় সর্বসম্মত প্রমাণ-গ্রন্থ, পোষ্যপুত্র গ্রহণ ও তাহাদের দেওয়ানি অধিকার বিষয় লইয়া দত্তকমীমাংসা ও দত্তকচন্দ্রিকা, মীমাংসা পশ্চিমোত্তরা-ঞ্চলে এবং চন্দ্রিকা বাঙ্গালায় প্রমাণ গ্রন্থ। অষ্টবিংশতিতত্ত্ব রঘুনন্দন প্রণীত। উত্তরা-ধিকার সম্বন্ধীয় দায় ও আদালতেব কার্যবিধি বিষয়ক ব্যবহার তত্ত্ব ব্যতিরেকে অন্য ২৬টি ধর্মানুষ্ঠান সংক্রান্ত। (১৮৪৬ খৃঃ ১০ই জুন হইতে পাঠ্যতালিকাভুক্ত।)

এই শ্রেণী সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে অষ্টবিংশতিতত্ত্বের অধ্যাপনা বন্ধ হওয়া উচিত। ইহা যাজন ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পুরোহিতদিগের শিক্ষোপযোগী, ওরূপ গ্রন্থাদি বিদ্যালয়ে অধীত হইবার সম্পূর্ণ অনুপোযোগী। অপর পুস্তকগুলি পাঠে কোন প্রতিবন্ধক নাই ও প্রচলিত থাকিতে পারে। উক্ত গ্রন্থাদির অনুশীলনে ভারতবর্ষস্থ যাবতীয় প্রদেশের হিন্দু-আইন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মে।

ন্যায়শ্রেণী

তর্কশাস্ত্র ও দর্শন বিদ্যাঘটিত ব্যাপার লইয়াই ন্যায়শাস্ত্র। মধ্যে মধ্যে রসায়ন, দৃষ্টি-বিজ্ঞান, গতিবিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধেও উল্লেখ আছে। মীমাংসা ও পাতঞ্জল ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্র সম্বন্ধেও ঐরূপ বলা যাইতে পারে। মীমাংসা ও পাতঞ্জল ধর্মানুষ্ঠান ও ঈশ্বর সম্বন্ধে চিন্তার বিষয় উল্লিখিত আছে। চারি বৎসর কাল অধ্যয়ন করিতে হয়। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দিষ্ট—ভাষা পরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, ন্যায়সূত্র, কুসুমাঞ্জলী, অনুমান চিন্তামণি, দীধিতি, শব্দশক্তি প্রকাশিকা, পরিভাষা

তত্ত্বকৌমুদী, খণ্ডনা ও তত্ত্ববিবেক। ভাষা-পরিচ্ছেদ শ্রীবিশ্বনাথ পঞ্চানন প্রণীত। ইহা ন্যায় শাস্ত্রের সকল শাখা সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ। গ্রন্থকার স্বরচিত ভাষা পরিচ্ছেদ সম্বন্ধে একখানি টীকা সংকলন করিয়াছিলেন, তাহার নাম সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী। ন্যায়সূত্র এই দর্শনশাস্ত্র স্রষ্টা গোতমঋষি প্রণীত। কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পরকাল সংক্রান্ত বিষয় উল্লেখিত আছে। ইহাতে যে তর্কপ্রণালীর অনুসরণ করা হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ আধুনিক ইউরোপীয়গণের গ্রন্থাবলীতে অবলম্বিত তর্ক প্রণালীতুল্য। ইহার গ্রন্থকর্তার নাম উদয়নাচার্য। অনুমান চিন্তামণি বর্তমান ন্যায়শাস্ত্র সম্প্রদায় সম্মত একখানি উপপত্তি (Deduction) বিষয়ক গ্রন্থ। ইহার গ্রন্থকর্তার নাম গঙ্গেশোপাধ্যায়। ইউরোপের মধ্যযুগের পণ্ডিতদের অবলম্বিত বিচার প্রণালী সদৃশ এই গ্রন্থকর্তার বিচার-প্রণালী। যাহাকে বেকন "বিস্তার উর্ণনাভ জাল" বলিয়াছেন, এই গ্রন্থ সেইরূপ। এই গ্রন্থের অধ্যয়নকালে বিস্তর কষ্ট অনুভব করিতে হয়। বর্তমান ন্যায় সম্প্রদায়ের অধিনায়ক রঘুনাথ শিরোমণি প্রণীত অনুমান দীধিত নামে ইহার একখানি টীকা আছে। শব্দশক্তি প্রকাশিকা বাক্যের অর্থসংক্রান্ত একখানি গ্রন্থ। ধর্মরাজ প্রণীত "পরিভাষা" গ্রন্থখানি বৈদান্তিক মতের সমর্থনকারী। বাচস্পতি মিশ্র প্রণীত তত্ত্বকৌমুদী গ্রন্থখানি সংখ্যাদর্শন সম্বন্ধে একখানি বিস্তীর্ণ পুস্তক। শ্রীহর্ষ প্রণীত গ্রন্থেব নাম খণ্ডনা। গ্রন্থ-কর্তার অভিপ্রায় এই যে, অন্যান্য সমুদয় দর্শন সম্প্রদায়ের মতগুলি খণ্ডন করিয়া নিজের প্রিয় বৈদান্তিক মতের প্রতিষ্ঠা করা। গ্রন্থখানি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। গ্রন্থকর্তা বর্ণিত বিষয় অতি দুর্বোধ্য ভাষায় অবতারণা করিয়াছেন। উদয়নাচার্য প্রণীত তত্ত্ববিবেকে নাস্তিকতার বিরুদ্ধে তর্কসকল উত্থাপিত ও সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের এক-জন সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভাষা যেরূপ দুরূহ, তেমনই অসংলগ্ন।

এক্ষণে আমার নিবেদন এই যে, উক্ত শ্রেণীকে ন্যায়শ্রেণী নামে অভিহিত না করিয়া, দর্শনশ্রেণী নামে অভিহিত করা উচিত। অনুমান-চিন্তামণি, দীধিত, খণ্ডনা ও তত্ত্ব-বিবেকের অধ্যাপনা বন্ধ হউক ও তাহার পরিবর্তে মীমাংসা ও ধর্মানুষ্ঠান সম্বলিত নিম্নলিখিত দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলি অধীত হউক,

(১) সাঙ্খ্য প্রবচন (২) পঞ্চদশী

(৩) পাতঞ্জল (৪) সর্বসার সংগ্রহ

সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার কাল ১৫ বৎসর মাত্র। তাহাতে এরূপ আশা করা যাইতে পারে যে এক ব্যক্তি এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে সংস্কৃত বিদ্যায় উত্তম পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে। ভারতবর্ষে প্রচলিত সমস্ত দর্শন শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে, কেহই সংস্কৃত বিদ্যায় পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ইহা

অতি সত্য কথা যে, হিন্দু দর্শন শাস্ত্রের অধিকাংশের সহিত আধুনিক সময়ের উন্নত চিন্তার সৌসাদৃশ্য অল্পই লক্ষিত হয়। তথাপি ইহা কখনই অস্বীকার করা যাইতে পারে না যে, একজন সংস্কৃতাভিজ্ঞের পক্ষে উক্ত দর্শন শাস্ত্রের জ্ঞান নিতান্তই প্রয়োজনীয়। ইংরেজী বিভাগ সম্বন্ধে মন্তব্যগুলি রিপোর্টের স্থানান্তরে উল্লেখ করিব। যদি কৌন্সিল অব্ এডুকেশন আমার মন্তব্যগুলি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে যে সময়ের মধ্যে ছাত্রেরা দর্শন শ্রেণীতে উন্নীত হইবে, সেই সময়ের মধ্যে তাহাদিগের শিক্ষিত ইংরেজী ভাষাজ্ঞান অনায়াসেই, তাহাদিগকে ইউরোপ খণ্ডের দর্শনশাস্ত্রের জটিল বিষয়সমূহ প্রণিধান করিতে সমর্থ করিবে। তাহারা পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের সহিত তাহাদিগের স্বদেশীয় দর্শনশাস্ত্রের তুলনা করিতে সহজেই পারগ হইবে। যুবকেরা এই পদ্ধতি অনুসারে শিখিত হইলে সহজেই প্রাচীন হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের ভ্রম-প্রমাদাদি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে; কিন্তু যদি তাহাদিগকে হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের জ্ঞান ইউরোপীয়দিগের নিকট শিক্ষা করিতে হয়, তবে উপরোক্ত সুবিধা তাহাদিগের কখনই ঘটিয়া উঠিবে না। ভারতবর্ষে প্রচলিত যাবতীয় দর্শনশাস্ত্র শিক্ষার ফলে ছাত্রেরা সহজেই অনুভব করিতে পারিবে যে ভিন্ন ভিন্ন দর্শনশাস্ত্র সম্প্রদায়ের প্রবর্তকগণ পরস্পরের ভ্রম-প্রমাদাদি প্রদর্শন করিবার ত্রুটি করেন নাই। ছাত্রের পক্ষে এ সম্বন্ধে স্বাধীন ভাবে বিচার করিয়া তথ্য নির্ণয় করিবার যথেষ্ট সুবিধা রহিয়াছে। তাহার ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্র জ্ঞান বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায়ের দোষগুণ বিচারের পক্ষে প্রকৃষ্ট পথ-প্রদর্শক হইবে।

ইংরেজী বিভাগ*

যে পদ্ধতি অনুসারে এই বিভাগটি অধুনা গঠিত, তাহা অতীব অসন্তোষকর। এ বিভাগে কি শিক্ষা করিতে হইবে, তাহা ছাত্রের ইচ্ছাধীন। যখন ইচ্ছা সে তাহার পাঠ আরম্ভ করে ও ইচ্ছানুসারে তাহা পরিত্যাগ করে। অনেক ছাত্র বিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার পরেই ব্যাকরণ শ্রেণীতে পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু একেবারে দুইটি নূতন ভাষা শিক্ষা করিতে তাহাদিগকে বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই অধিকাংশ ছাত্রই, ইংরেজী কিংবা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় অবহেলা প্রদর্শন করে, প্রায়ই পরীক্ষার পূর্বে অধিকাংশ ছাত্র ইংরেজী বিভাগ হইতে

*ইংরেজী বিভাগ হইতে প্রথমতঃ ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ১৮৩৫ খৃঃ নভেম্বর মাসে সাধারণ শিক্ষক ক্লেনাবেল-কমিটির আদেশানুসারে ইহা উঠিয়া যায়। পুনরায় ১৮৪২ খৃঃ অক্টোবর মাসে উক্ত কমিটির আদেশানুসারে ইহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

পলাইয়া আইসে। সেই ছাত্রগণই পরবৎসরারম্ভে ভর্তি হইতে আইসে। অন্য একটি কারণে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়। একটি ইংরেজী বিভাগের শ্রেণীতে অনেক সংস্কৃত বিভাগের শ্রেণীর ছাত্রেরা অধ্যয়ন করে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রগণের বিষয় দেখা যাউক। তৃতীয় শ্রেণীতে ত্রয়োদশটি ছাত্র পাঠ করে; তন্মধ্যে চারিটি স্মৃতি শ্রেণীর ছাত্র, একটি ন্যায়শ্রেণীর, একটি অলঙ্কারশ্রেণীব, তৃতীয় ব্যাকরণ শ্রেণীর ও অবশিষ্ট চারিটি চতুর্থ ব্যাকরণ শ্রেণীর ছাত্র। চতুর্থ শ্রেণীতে ৩৩টি বালক অধ্যয়ন করে। তন্মধ্যে ২টি অলঙ্কার শ্রেণীর, ৫টি সাহিত্য শ্রেণীর, ২টি প্রথম ব্যাকরণ-শ্রেণীর, ৬টি দ্বিতীয়, ১০টি তৃতীয়, ৬টি চতুর্থ এবং ২টি পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র।

বিভিন্ন সংস্কৃত শ্রেণী হইতে ছাত্রেরা ইংরেজী-বিভাগে পাঠ করিতে আইসে। ইহাতে এই কু-ফল উৎপন্ন হয় যে, ছাত্রগণ উক্ত শ্রেণীতে নিয়মমত উপস্থিত হইতে পারে না, বিশেষতঃ ইংরেজী শিক্ষা ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে, সুতরাং সংস্কৃত শ্রেণীর একাংশ মাত্র ছাত্রই ইংরেজী বিভাগে অধ্যয়ন করে। এই ছাত্রগণ, বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর ছাত্রেরা উভয়বিধ শিক্ষায় একসময়ে মনোযোগ দিতে অক্ষম; সুতরাং শিক্ষা বিষয়ে তাহাদিগের তাদৃশ উন্নতি দৃষ্ট হয় না।

যদি ইংরেজী বিভাগ এমন অনিয়মে পরিচালিত হয়, তবে ইহার ফল যে নিতান্তই অসন্তোষজনক হইবে, তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই। ইংরেজী বিভাগ প্রতিষ্ঠীত হওয়া অবধি ঈদৃশ নিয়মে পরিচালিত হওয়াতেই উহা নিতান্ত মন্দ ফল উৎপন্ন করে ও অবশেষে সাধারণ শিক্ষার জেনারেল কমিটির আদেশে একেবারে উঠিয়া যায়। যদি অপেক্ষাকৃত সুবন্দোবস্ত না করা হয়, তবে পূর্বের ন্যায় ইহা হইতে মন্দ ফল ফলিবে। তজ্জন্য আমি যে কয়েকটি বন্দোবস্তের অবতারণা করিতেছি, তাহা কার্যে পরিণত হইলে নিশ্চয়ই সু-ফল উৎপন্ন হইবে। আমার মন্তব্যগুলি এই যে, নিম্নশ্রেণীতে পাঠরত এইসব ছাত্রেরা সংস্কৃত ভাষায় কিছু পারদর্শিতা না দেখাইতে পারিলে তাহাদিগকে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিতে দেওয়া উচিত নয়। সংস্কৃত শ্রেণীর ছাত্রেরা সেই সঙ্গে তাহাদিগের নিজের শ্রেণীতে ইংরেজী ভাষাও শিক্ষা করিবে। ইংরেজী শিক্ষা ইচ্ছাধীন না হইয়া অন্যান্য পাঠের ন্যায় অবশ্য পাঠ্য হইবে। কোন ছাত্র যদি ইংরেজী শিক্ষা করিতে নিতান্তই অনিচ্ছা প্রদর্শন করে, তবে তাহার পক্ষে এই নিয়ম বলবান্ হইবে যে, পরে কোন সময়েই সে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাকালীন ইংরেজী শিক্ষার শ্রেণী সৃষ্টি করা একেবারে অসম্ভব। সংস্কৃত শিক্ষার প্রস্তাবিত প্রণালী অনুসারে সাহিত্য শ্রেণীর ছাত্রগণ সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে। আমি তজ্জন্য প্রস্তাব করিতেছি যে, অলঙ্কার-শ্রেণীতেই ইংরেজী শিক্ষার আরম্ভ হউক। তাহা হইলে ছাত্রগণ ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষা করিতে অন্যূন দ্বিগুণ সময় প্রদান করিতে সমর্থ হইবে

এবং তাহাদিগের চিত্ত একণে সুমার্জিত হওয়াতে তাহাদিগকে সামান্য বিষয় হইতে আরম্ভ করিতে হইবে না। অলঙ্কার শ্রেণী হইতে কলেজের শেষ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ করিতে ৭।৮ বৎসর লাগে। সুতরাং উক্ত সময়ের মধ্যে একজন বুদ্ধিমান্ ও শ্রমশীল ছাত্র অনায়াসেই ইংরেজী ভাষায় ও সাহিত্যে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিবে।

পঞ্চম ব্যাকরণ শ্রেণী

আমি আর একটি বিশেষ ঘটনা কৌন্সিলেব সমক্ষে আনয়ন করিতে ইচ্ছা করি—ব্যাকরণের পঞ্চম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন তাঁহাব শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতে বিশেষ সমর্থ বলিয়া বোধ হয না। তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং নিজের কর্তব্য কর্মগুলি সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে অপারগ। অল্পবয়স্ক বালকগণের শ্রেণীতে সুন্দররূপে কাব্য পডাইতে হইলে, যে কার্যতৎপরতা ও দৃঢতার প্রয়োজন, তাহা তাঁহার নাই। প্রাচীন বলিযা তিনি কাহারও উপদেশের বশবর্তী হইয়া চলিতে অনিচ্ছুক, সুতরাং তাঁহার শ্রেণীতেই বিশেষ গোলযোগেব প্রভাব। তন্নিমিত্ত আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, তাঁহার বর্তমান বেতন মাসিক ৪০৲ টাকা দিয়া তাঁহাকে লাইব্রেরির ভার দেওযা হয ও লাইব্রেবির বর্তমান অধ্যক্ষ, এই বিদ্যালযের একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে ৩০৲ টাকা বেতনে ব্যাকরণের পঞ্চম শ্রেণীর অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করা হয। পরিশেষে সুবিধা ঘটিলে তাহার বেতন ৪০৲ টাকায় বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়।

শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে উন্নয়ন

বালকগণের এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে উন্নয়ন সম্বন্ধে কলেজের বর্তমান পদ্ধতি এই যে, তাহারা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এক শ্রেণীতে পাঠ করে। পরে সময় অতীত হইলেই, তাহাদিগের বিদ্যার পারদর্শিতা লাভ হইল কিনা সে বিষয় দৃষ্টি না করিয়া, তাহা-দিগকে অন্য শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়।

এই পদ্ধতি হইতে এই কু-ফল উৎপন্ন হয় যে, কোন শ্রেণীতে কেহ পাঠ শেষ করিলেও তাহাকে নির্দিষ্ট সময় অতীত না হইলে উপরকার শ্রেণীতে পাঠ করিতে দেওয়া হয় না। কিন্তু যদি অপর কোন ছাত্র, সকল বিষয়ে অনুপযুক্ত হইয়াও কোন শ্রেণীতে নির্দিষ্ট সময় সমাপ্ত করে, তবে তাহাকে উপরকার শ্রেণীতে পাঠ করিতে

দেওয়া হয়। আমি তজ্জন্য প্রস্তাব করি যে, গুণানুসারে উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হউক। আরও এই নিয়ম প্রচলিত হউক যে, বৃত্তিসংক্রান্ত নিয়মানুযায়ী সময়ের অতিরিক্ত কাল কেহই কলেজে পাঠ করিতে পারিবে না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, এরূপ বন্দোবস্ত প্রচলিত হইলে, মন্দবুদ্ধি ছাত্রাপেক্ষা বুদ্ধিমান ছাত্রেরা নির্দিষ্ট সময়ের কমেও নিজ নিজ পাঠ্য শেষ করিতে সমর্থ হইবে।

শৃঙ্খলা রক্ষা

বর্তমান সময়ে বিদ্যালয়ে সুবন্দোবস্তে অভাব সকলেরই বিশেষ পরিচিত। বালকগণের উপস্থিতি, সামান্য কারণে শ্রেণী পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে যাওয়া ও অনাবশ্যক গোলমাল ও কথাবার্তা এবং সর্বপ্রকার গোলযোগ সম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। অন্যান্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে যেরূপ নিয়মান্বিত সুশৃঙ্খলা দৃষ্ট হয়, এই বিদ্যালয়ে কেন যে তাহা প্রবর্তিত হইবে না, তাহার কারণ বুঝিতে পারি না, সেইরূপ প্রণালী ও বিদ্যালয়েও প্রতিষ্ঠিত হওয়া নিতান্ত উচিত।

অবশেষে নিবেদন এই যে, কলেজের সুবন্দোবস্তের নিমিত্ত আমি যে প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি, তাহা বহু দিবসের প্রগাঢ় চিন্তা ও বিবেচনার ফল। আমার বিবেচনায় যে প্রণালীর অনুষ্ঠান বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে নিতান্তই প্রয়োজনীয়, আমি কেবল তাহারই উল্লেখ করিয়াছি ও আশা করি যে, যদি কৌন্সিল আমায় প্রস্তাবিত পরামর্শগুলি কার্যে পরিণত করেন, তবে অল্পদিনের মধ্যেই অতি সু-ফল উৎপন্ন হইবে ও বিদ্যালয়টি পবিত্র ও প্রকৃত সংস্কৃত বিদ্যার আগারস্বরূপ হইবে। বিশেষতঃ ইহা হইতে জাতীয় সাহিত্যের উৎপত্তি ও সুশিক্ষকের সংঘটন হইতে থাকিবে ও এই বিদ্যালয় হইতে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সুদক্ষ শিক্ষকগণ সাধারণের মধ্যে জাতীয় বিদ্যা প্রচার করিয়া দেশের সর্বোতোভাবে মঙ্গলসাধন করিতে থাকিবেন।*

সংস্কৃত কালেজ (স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

১০ই ডিসেম্বর ১৮৫৬ সাল।

* সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের ইংরাজী রিপোর্টের বিহারিলাল সরকারের অনুবাদ অবলম্বনে বাংলা অনুবাদ মুদ্রিত করা হইল।

শ্রীহরিঃ—

সহায়—

বৎস চন্দ্রনাথ—

সে দিন তোমায় দেখিয়া ও
তোমার সহিত কিছু কথা বার্তা সম্পাদন
করিয়া, আমি তার পর হইতেই আনন্দিত
হইয়াছি। তুমি সুস্থ শরীরে দীর্ঘ-
জীবী হইয়া সুখে কালহরণ কর,
এবং স্বজনবর্গের আনন্দদায়ী ও
সজ্জনসমাজে প্রীতিভাজন হও, এই
আমার আন্তরিক অভিলাষ ও ঐকান্তিক
প্রার্থনা।

এই সমভিব্যাহারে ১০ কাণ্ড
সেক্সপিয়র (Shakespeare's Works)
প্রেরিত হইতেছে, সাদরে গৃহীত হইলে
নিরতিশয় চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইব।
কিমধিকমিতি ১০ অগ্রহায়ণ ১২৯৬ সাল

শুভানুধ্যায়িনঃ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্রশর্ম্মণঃ

ইহার কয়েকদিন পর ডিসেম্বর মাসেই সংস্কৃত কালেজের সেক্রেটারী রসময় দত্ত মহাশয় পদত্যাগপত্র দেন। পদত্যাগপত্র গৃহীত হয় এবং বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত কালেজের সম্পাদক ও অধ্যক্ষের জন্য শিক্ষাপরিষদ গবর্মেণ্টের কাছে সুপারিশ করেন।

ডিসেম্বর মাসেই বিদ্যাসাগর বীটন সাহেব প্রতিষ্ঠিত "বেথুন নারী বিদ্যালয়" এর অবৈতনিক সম্পাদক হন। বেথুন বিদ্যালয়ের যে গাড়িতে বালিকারা পড়িতে আসিত, তাহার গাত্রে—**"কন্যাপেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"** এই শাস্ত্রবচন লেখা থাকিত।

১৮৫১ খৃঃ অব্দে শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক ডাঃ মোয়েট সংস্কৃত কালেজের সম্পাদক রসময়বাবুর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন ও তাঁহাকে দায়িত্ব বুঝাইয়া দিতে বলেন। পত্রখানি এইরূপ :

No. 70

From

The Secretary, Council of Education.

To

Rassomoy Dutt, Esq.
Secretary, Sanscrit College
Fort William, 4th Jan. 1851.

Sir,

I am directed by the Council of Education to accept your resignation of the office of Secretary of the Sanscrit College and to return for the thanks for the long period during which you have conducted its duties. As the Council are anxious to relieve you at once from the duties of your late office, they will feel obliged by your making over charge upon receipt of this communication to Pundit Ishwur

Chunder Shurma pending the sanction of Govt. to the permanent changes proposed and adopted by the council.

I have & c.
Sd./ F. J. Mouat, M. D.
Secretary, Council of Education.

"No. 71.

Copy forwarded to Pundit Ishwur Chunder Shurma with directions to receive charge from Babu Rassomoy Dutt of the office of Secretary to the Sanscrit College and to conduct its duties, pending the receipt of further orders.

By order
Sd./ F. J. Mouat, M. D.
Secretary, Council of Education.

ইহার কিছুকাল পরে সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদকের পদ অবলোপ করা হয় এবং ইহাদের পরিবর্তে মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতনে অধ্যক্ষের-পদ সৃষ্ট হয়। তৎকালীন সরকারী আণ্ডার সেক্রেটারী ডব্লু সিটন-কার মহাশয় ১৮৫১ খৃঃ অব্দের ২০শে জানুয়ারী তারিখের ৩৭নং পত্র দ্বারা বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করেন। পত্রটি এই :

No. 37

From

The Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

To

Pundit Ishwur Chunder Sharma
Dated Fort William, the 22nd January, 1851.

Sir,

I am directed by the Deputy Governor of Bengal to inform you that His Honour has been pleased this day to appoint you to be Principal of the Sanscrit College on a salary of Rs. 150 per mensem.

I have & c
Sd./ W. Seton Karr

অতএব জানুয়ারী হইতে মাসিক ১৪০৲ টাকা বেতনে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কালেজের প্রথম অধ্যক্ষ ও কালেজের সংস্কার, পুনর্গঠন, পরিবর্তন ইত্যাদির পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। এই বৎসর বেথুনের মৃত্যু হয়। বিদ্যাসাগর প্রিন্সিপাল হইয়াই কলেজের পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করিলেন। অষ্টমী ও প্রতিপদে ছুটি বন্ধ করিয়া সপ্তাহান্তে রবিবারে ছুটির দিন স্থির হইল। এবং সর্বপ্রথম গ্রীষ্মকালীন ছুটির প্রবর্তন করা হইল। পূর্বে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণই সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়নের অধিকারী ছিলেন। বিদ্যাসাগর এই রীতি পরিবর্তন করিয়া ১৮৫৩ সালের জুলাই মাসে কায়স্থদিগের ও পরে ১৮৫৪ সালের ডিসেম্বর হইতে যে কোন সম্ভ্রান্ত হিন্দুকেই সংস্কৃত কালেজে প্রবেশের অবাধ অধিকার দিলেন।

১৮৫২ খৃঃ অব্দ: সংস্কৃত কালেজ প্রতিষ্ঠা হইতেই অবৈতনিক ছিল। ইহার ফলে ছাত্রগণ নিয়মিত হাজিরা দিত না। ফলে নানারূপ বিশৃংখলার সৃষ্টি হইত। এই সকল অসুবিধা দূরীকরণের জন্য এই বৎসর আগষ্ট মাস হইতে দুই টাকা প্রবেশ-দক্ষিণা ধার্য করা হইল। পরে ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দের জুন মাস হইতে মাসিক এক টাকা বেতন নির্দিষ্ট হইল।

১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে নভেম্বর মাস হইতে ইংরাজী বিস্তৃত ও সুনিয়ন্ত্রিত করা হইল। এই বৎসর জুলাই-আগষ্ট মাসে ডাঃ জে. আর. ব্যালাণ্টাইন সংস্কৃত কালেজে পরিদর্শনে আসিয়া বিদ্যাসাগরের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে প্রশংসা করিয়া শিক্ষা পরিষদের নিকট রিপোর্ট পেশ করেন।

এই বৎসরেই বিদ্যাসাগর তাঁহার জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

এই বৎসর বঙ্গভাষার অনুশীলনের জন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি—বিদ্যাসাগর বোর্ড-অব-একজামিনার্সের সদস্য হন।

১লা মে ছোটলাটের পদ সৃষ্টি হয় এবং প্রথম ছোটলাট হন ফ্রেডারিক জে. হ্যালিডে.।

১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দের ১ মে, অতিরিক্ত ইন্‌সপেক্টর নিযুক্ত করিয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহার উপর নদীয়া, হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুর এই চার জেলার নানাস্থানে বিদ্যালয়

স্থাপন ও তাহাদিগের পরিদর্শনভার অর্পণ করেন। বেতন-বৃদ্ধি—মাসিক ২০০৲ টাকা। ১৭ জুলাই—নর্মাল স্কুল স্থাপন ও অক্ষয়কুমার দত্তকে প্রধান শিক্ষকরূপে গ্রহণ। আগস্ট-সেপ্টেম্বর—নদীয়ায় পাঁচটি মডেল স্কুল স্থাপন। আগস্ট-অক্টোবর—বর্ধমানে পাঁচটি মডেল স্কুল স্থাপন। আগস্ট সেপ্টেম্বর, নবেম্বর—হুগলীতে পাঁচটি মডেল ইস্কুল স্থাপন। অক্টোবর-ডিসেম্বর—মেদিনীপুরে চারটি মডেল ইস্কুল স্থাপন। অক্টোবর—বিধবাবিবাহ-বিধির জন্য সরকারের নিকট আবেদনপত্র। ২৭ ডিসেম্বর—বহুবিবাহ রহিত করণের জন্য সরকারের নিকট আবেদনপত্র।

১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দের ১৪ই জানুযারী—মেদিনীপুরে আর একটি মডেল স্কুল স্থাপন। ২৬শে জুলাই তারিখে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রচেষ্টায় ভারত গভর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপক সভায় বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য জে. পি. গ্রাণ্ট মহোদয়ের সবিশেষ আগ্রহ ও পরিশ্রমে বিধবাবিবাহ-লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। এই বিধবা-বিবাহ বিধি নামঞ্জুর করিবার জন্য রাজা রাধাকান্ত দেব যে স্বতন্ত্র আবেদন-পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে অন্যূন ত্রিশসহস্র ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল। বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহ বিধবা-বিবাহের পক্ষে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির স্বাক্ষর যুক্ত একখানি আবেদনপত্র ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণ করিতে সহযোগিতা করেন।

১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের প্রারম্ভে ব্যারাকপুরে সিপাহী বিদ্রোহ সুরু হয়।
এই বৎসর নবেম্বর-ডিসেম্বর—হুগলী জেলায় সাতটি ও বর্ধমানে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন।

১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি হইতে মে মাসে হুগলী জেলায় আরও তেরটি তন্মধ্যে বীরসিংহের একটি, বর্ধমানে দশটি, মেদিনীপুরে (ভাঙ্গাবন্ধ, বদনগঞ্জ ও শান্তিপুরে) তিনটি এবং নদীয়ায় একটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন।
তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক হন এবং ৩রা নভেম্বর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতা ত্যাগ করেন।
১৫ নভেম্বর—'সোমপ্রকাশ' পত্র প্রকাশ হয়।

এই বৎসর ২২-এ মার্চ গদাধর শেঠের বাড়িতে রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত প্রথম সামাজিক নাটক 'কুলীনকুলসর্বস্ব' তৃতীয় অভিনয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। ২৫-এ মার্চ তারিখের সংবাদ প্রভাকরে এই সংবাদ উল্লিখিত আছে।

৩১-এ জুলাই শনিবার বেলগাছিয়া নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত, নাটক রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' অবলম্বনে 'রত্নাবলী'-র অভিনয়ে দর্শকরূপেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ—প্রভাকর, ৪ঠা আগষ্ট।

১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দের ১ এপ্রিল—কাঁদি (মুর্শিদাবাদ) ইংরেজী বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা।

১৬ই এপ্রিল রামগোপাল মল্লিকের সিঁদুরিয়াপটীর বাটীতে উমেশচন্দ্র মিত্র প্রণীত 'বিধবাবিবাহ' নাটকের মহড়া এবং ২৩-এ এপ্রিল মেট্রোপলিটান থিযেটারে প্রথম অভিনয় হয। এই নাটকেব অভিনয় একাধিকবার বিভিন্ন সময়ে বিদ্যাসাগর দেখেন।

মে—তত্ত্ববোধিনী সভা রহিত হওয়ায সম্পাদকেব পদত্যাগ।

সন ১২৬৩, ২৩শে অগ্রহাযণ রবিবার প্রথম বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। পাত্র—খাটুরা গ্রামনিবাসী রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। পাত্রী—বর্ধমান জেলার অন্তঃপাতী পলাশডাঙ্গানিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশমবর্ষীয়া বিধবা কন্যা কালীমতি দেবী। বিবাহ বাসর—১২নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটী। পাত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যাবত্ন কলিকাতায় আসিযা রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে উঠিযাছিলেন।

ববযাত্রার সময় সুকিয়া ষ্ট্রীট এবং যেখানে বর আসিবে সে পথে, প্রত্যেক দুই হস্ত অন্তর পুলিশ পাহারা রাখা হয়—সাবা পথ জনতায় পরিপূর্ণ ছিল। বরের দক্ষিণে ও বামে পাল্‌কি ধরিয়া উৎসাহ ও আনন্দ বর্ধন করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন বিদ্যাসাগরের বন্ধুমণ্ডলী, রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি। বিবাহ-সভায় সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ও অন্যান্য অধ্যাপকগণের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

পরদিন ১২৬৩ সাল, ২৪ অগ্রহায়ণ সোমবার দ্বিতীয় বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। পাণিহাটী গ্রামনিবাসী কায়স্থ কুলীন বংশোদ্ভব হরকালী ঘোষের ভ্রাতা কৃষ্ণকালী ঘোষের পুত্র মধুসূদন ঘোষের সহিত কলিকাতা-নিবাসী নিমাইচরণ মিত্রের পৌত্র ঈশানচন্দ্র মিত্রের দ্বাদশবর্ষীয়া বিধবা কন্যার বিবাহ হয়। ইহা কায়স্থকুলের নির্দিষ্ট কুলাচার অনুসারে সম্পন্ন হয়।

এই বৎসরেই ১৯ই ফাল্গুন তারিখে চব্বিশপরগণার অন্তর্গত বোড়াল নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পিতৃব্যপুত্র দুর্গানারায়ণ বসু ও সহোদর মদনমোহন বসু ক্রমান্বয়ে এক একটি বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই উভয় বিবাহেই বিদ্যাসাগরমহাশয়ের প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়াছিল।

১৮৬১, এপ্রিল—কলিকাতা ট্রেনিংস্কুলের সেক্রেটারী। ডিসেম্বরে হিন্দু পেট্রিয়টের পরিচালন-ভার গ্রহণ।

১৮৬৩, নভেম্বর—ওয়ার্ডস্ ইন্‌ষ্টিটিউশনের পরিদর্শক।

১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে বিদ্যাসাগর মহাশয় জার্মানীর অন্তর্গত লিপজিগ নগরে সমবেত মনস্বিমণ্ডলীর প্রদত্ত সম্মানচিহ্নে সম্মানিত হয়। সে বহু সম্মানের পরিচায়ক পত্রখানি জার্মাণ ভাষায় লিখিত। এই বৎসরেই ফরাসী-প্রবাসী অমর কবি মধুসূদন দত্তকে বিদ্যাসাগর ঋণগ্রস্ত হইয়াও ১৫০০৲ টাকা দান করেন।

'কলিকাতা ট্রেনিংস্কুল' নামের পরিবর্তে মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশন নামকরণ। ও ৪ঠা জুলাই—বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির অনারারি সদস্য নির্বাচিত।

১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটি ১৮৬৫ সনের ১৫ই জুলাই হিন্দু-মহিলাগণের দুরবস্থা এবং পল্লীগ্রামস্থ জমিদারগণের অত্যাচার এই দুইটি বিষয়ে উৎকৃষ্ট সামাজিক নাটকের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন। ইতিপূর্বে 'বহুবিবাহ' সম্পর্কেও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। বিদ্যাসাগর এই কমিটির অন্যতম সদস্য ও বিচারক ছিলেন।

১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি—বহুবিবাহ রহিত করণের জন্য দ্বিতীয়বার ভারত-বর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় আবেদনপত্র পাঠান হয়।

এই বৎসরে বিদ্যাসাগরের সহিত পরহিতৈষিণী মিস্ কার্পেণ্টারের আলাপ হয়। বৃস্টলে মিস্ কার্পেণ্টারের পিতা পাদরী কার্পেণ্টার সাহেবের গৃহে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়। তখন ইনি বালিকা। এই বৎসরেই ১৬ ডিসেম্বর রবিবার উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন হইতে প্রত্যাবর্তনকালে বগিগাড়ী উল্টাইয়া গুরুতর আঘাতে বিদ্যাসাগর সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। এই ঘটনাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুস্থ শরীরে রোগ, সবল শরীরে দুর্বলতা এবং শান্ত চিত্তে অশান্তির সূত্রপাত হয়।

১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে (সন ১২৭২) শেষ ভাগে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন বাংলা দেশে মন্বন্তর হয়।

১৮৭০, জানুয়ারী—ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান-সভায় সহস্র মুদ্রা দান।

১১ই আগষ্ট (সন ১২৭৭, ২৭শে শ্রাবণ) ঈশ্বরচন্দ্রের একমাত্র পুত্র দ্বাবিংশ-বর্ষীয় নারায়চন্দ্রের সহিত খানাকুলকৃষ্ণনগর নিবাসী শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চতুর্দশবর্ষীয়া বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর বিবাহ হয়।

১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে ১২ই এপ্রিল বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবীর কাশীতে মৃত্যু হয়।

এই বৎসর ৩ (তিন) আইন পাশ হয়।

১৮৭২ খ্রীঃ অব্দ ১৫ই জুন – হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফণ্ডের ট্রাস্ট।

১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দ জানুয়ারী—মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপন।

নভেম্বর—মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের শ্যামপুকুর শাখা উদ্বোধন।

১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দ ৩১ মে—সম্পত্তির উইলকরণ।

১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দ ২১ ফেব্রুয়ারি—হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফণ্ডের ট্রাস্টি-পদ ত্যাগ।

১২ এপ্রিল—পিতা ঠাকুরদাসের মৃত্যু।

—কলিকাতা বাদুড়বাগানের বাটী নির্মাণ।

১-২ আগষ্ট—চকদীঘির জমিদার সারদাপ্রসাদ রায়ের উইলের মামলায়, উইল প্রকৃত নয় বলিয়া জমিদারপত্নী রাজেশ্বরী দেবীর সপক্ষে বর্ধমানে এজাহার দান।

১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দ এপ্রিল—গোপাললাল ঠাকুরের বাটীতে বড়লোকের ছেলেদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা-ছাত্রদের বেতন মাসিক ৫০৲ টাকা।

১৮৮০ খ্রীঃ অব্দ ১ জানুয়ারী—সি. আই. ই. উপাধি লাভ।

১৮৮৩ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত।

১৮৮৫ —মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের বউবাজার-শাখা স্থাপন।

১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দ জানুয়ারী—শঙ্কর ঘোষ লেনে নবনির্মিত বাটীতে মেট্রোপলিটান কালেজের গৃহপ্রবেশ।

১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দ ১৩ আগষ্ট—পত্নী দিনময়ী দেবীর মৃত্যু।

১৮৯০ খ্রীঃ অব্দ ১৪ এপ্রিল—বীরসিংহে ভগবতী বিদ্যালয় স্থাপন।

১৮৯১ খ্রীঃ ২৯ জুলাই—কলিকাতায় মৃত্যু। (১৩ শ্রাবণ ১২৯৮, রাত্রি প্রায় ২॥০ টা)

১। হরিশ্চন্দ্র বিসূচিকা রোগে ৭।৮ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়।

২। ঠাকুরদাসের এই সর্বকনিষ্ঠ পুত্রটি অতি শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

৩। হরচন্দ্র ১৩/১৪ বৎসর বয়সে গত হয়।

ঈশ্বরচন্দ্রের বন্ধুমণ্ডলী

কালীকৃষ্ণ মিত্র, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, শ্যামাচরণ দে, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, কালীচরণ ঘোষ, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রামতনু লাহিড়ী, ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু এবং আনন্দকৃষ্ণ বসু প্রভৃতি।

ভক্তি ও শ্রদ্ধার্ঘ্য

১। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে একটি রৌপ্যনির্মিত পানপাত্রে নিম্নলিখিত শ্লোকটি অংকিত করিয়া উপহার দিয়াছিলেন :—

পানপাত্রমিদং দত্তং বিদ্যাসাগর শর্ম্মণে।
স্বর্গকামনায়া মাতুর্গুরুদাসেন শ্রদ্ধয়া॥

২। কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয় (মাইকেল মধুসূদনের ব্যারিস্টার থাকা কালের প্রধান কর্মচারী) বিদ্যাসাগরের একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিয়া তন্নিম্নে নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটি সন্নিবিষ্ট করিয়া স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন :—

শ্রীমানীশ্বরচন্দ্রোহয়ং বিদ্যাসাগর-সংজ্ঞকঃ।
ভূদেবকুলসম্ভূতো মূর্ত্তিমদ্দৈবতং ভূবি॥

৩। মাইকেল মধুসূদন "বীরাঙ্গনা কাব্য" রচনা করিয়া তাহার মঙ্গলাচরণে লিখিয়া রাখিয়াছেন :—

মঙ্গলাচরণ—বঙ্গকুলচূড়া—শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিরস্মরণীয় নাম—এই অভিনব কাব্যশিরে শিরোমণিরূপে-স্থাপিত করিয়া কাব্যকার ইহা উক্ত মহানুভবের নিকট—যথোচিত সম্মানের সহিত—উৎসর্গ করিল, ইতি সন ১২৬৮ সাল, ১৬ই ফাল্গুন।

৪। দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তাঁহার রচিত "দ্বাদশ কবিতা" নামক গ্রন্থের শিরোভাগে নিম্নে প্রদত্ত উৎসর্গপত্র স্থাপন করিয়াছেন :—

স্বদেশানুরাগী দীনপালক বিদ্যাবিশারদ
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়
পরমারাধ্যবরেষু।

মহাশয়,

কল্পনা-কাননে প্রবেশপূর্বক যত্ন সহকারে কয়েকটি কবিতাকুসুম চয়ন করিয়া "দ্বাদশ কবিতা" নামে একছড়া মালা সংকলন করিয়াছি। আপনি বর্তমান বঙ্গভাষার জনক, বঙ্গভাষা আপনার তনয়া। ভক্তিসহকারে মালা ছড়াটি মহাশয়ের হস্তে 'অর্পণ করিলাম। যদি যোগ্য বিবেচনা করেন, আপন তনয়ার করে দিয়া আমাকে চরিতার্থ করিবেন। ইতি

স্নেহাভিলাষী
শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।

৫। "পলাশীর যুদ্ধ" নামক কাব্যশিরে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন বলিয়াছেন :

দয়ার সাগর—পূজ্যতম—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

দেব!—যে যুবক দুঃখের সময়ে অশ্রুজলে একদিন আপনার চরণ অভিষিক্ত করিয়াছিল, আজি সেই যুবক আপনার শ্রীচরণে উপস্থিত হইল; কিন্তু আপনার আশীর্বাদে, ততোধিক আপনার অনুগ্রহে, আজি তাহার বদন প্রসন্ন, হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ। আপনার দয়ার সাগরের বিন্দুমাত্র সিঞ্চনে দরিদ্রতা-দাবানল হইতে যেই মানস-কানন রক্ষা পাইয়াছিল, আজি সেই কানন-প্রসূত একটি ক্ষুদ্র কুসুম আপনার শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত হইল; এই কারণ তাহার এত আনন্দ। বঙ্গকবিরত্নগণ স্বীয় মানসউদ্যানজাত যে চিরসুবাসিত কুসুমরাশির দ্বারা আপনার ভারতপূজ্য পবিত্র নাম পূজা করিয়াছেন, আমি তদ্রূপ পবিত্র পরিমলবিশিষ্ট কুসুম কোথায় পাইব? আমার হৃদয়—কানন, আমার উপহার—বনফুল। কিন্তু মহর্ষিগণ পারিজাত কুসুমে যেই দেবপদ অর্চনা করেন, দরিদ্র ভক্তের ক্ষুদ্র অপরাজিতাও সেই পদে সমাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। আমার এইমাত্র সাহস—এইমাত্র ভরসা।

১লা মাঘ সন ১২৮২।

আপনার চিরানুগত
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

৬। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত "সীতার বনবাস" শীর্ষক কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গপত্রে লিখিত হইয়াছে :

উৎসর্গপত্র—পূজনীয় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্রীচরণেষু।—গুরুদেব—দীননাথ!—মাতৃভাষা জানি না বলা, ভাল নয় মন্দ, মহাশয়ের "বেতাল" পাঠে বুঝিলাম। আচার্য! আমার পরীক্ষা গ্রহণ করুন। আমি চিরদিন মহাশয়কে মনে মনে বন্দনা করি।

কলিকাতা, বাগবাজার, মাঘ ১২৮৮। সেবক

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ

৭। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে প্রদত্ত সম্মান চিহ্নস্বরূপ প্রশংসাপত্রে তৎকালীন গভর্নর রিচার্ড টেম্পল :

ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামে, রাজপ্রতিনিধি ও গভর্নর জেনারেল বাহাদুরের আদেশে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বিধবাবিবাহপক্ষীয় দলের অগ্রণী এবং সমাজসংস্কারপ্রিয় হিন্দু-গণের পরিচালক বলিয়া এই প্রশংসাপত্র দেওয়া যাইতেছে।

(সাক্ষর) রিচার্ড টেম্পল

(To Pundit Isvara Chandra Vidyasagar in recognition of his earnestness as leader of the widow-marriage movement, and position as leader of the more advanced portion of the Indian Community.—Richard Temple.)

৮। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী তারিখে গভর্নমেণ্ট কর্তৃক সি. আই. ই. উপাধি প্রদান।

Grant of the dignity of a companion of the Order of the Indian Empire. To Pundit Isvara Chandra Vidyasagara.

ঈশ্বরচন্দ্রের পরলোকগমন উপলক্ষে একটি কবিতা

এ কিরে সহসা স্বরগ হইতে নামিয়া আসিল পুষ্পকরথ!
পারিজাতফুল করি বরিষণ ঢাকিল কে যেন গগন পথ!
বিজলী চমকে রথের চাকায়, চুড়ায় স্বর্গীয় কেতন দুলে!
আশেপাশে শোভে মণিমুক্তাচয়, বিমল স্বর্গীয় বিভাস খুলে!
চারিধারে তার, চারিটি বালিকা, বিষাদ বদনে আবৃত দেহ!
কেহ আনিয়াছে মন্দাকিনী বারি, কেহবা চামর চন্দন কেহ!
অপরা বালার সুকোমল করে স্বর্ণপটে লেখা কি জানি কথা!
ধীরে ধীরে তাবা নামি পথ হতে দাঁড়াল প্রাচীন তাপস যথা!
চরণ কমলে নোয়াইয়া শির স্বর্গীয় বীণায় তুলিল তান,
কি জানি কহিল সবে সমস্বরে স্বর্গীয় ভাষায় গাহিয়া গান!

হে তাপসবর! সাধনা তোমার হইযাছে শেষ চলহে তবে,
নিতে ইষ্টবর চল দেব পুরে দাঁড়ায়ে দুয়ারে দেবতা সবে!
নিজে কীর্তিদেবী গাঁথি ফুলমালা করিছে প্রতীক্ষা আকুল মনে,
বসাবে তোমারে যতন করিয়া বসে নাই কেহ যে সিংহাসনে।

চল চল দেব ত্বরা করে যাই করো না করো না বিলম্ব আর,
মন্দাকিনী জলে ধৌত করি দেহ ঘুচাও ধরার দুঃখের ভার।
এ দিব্য চন্দন দেই মাখাইয়ে চরণরাজীবে আমরা সবে।
উঠ উঠ দেব! ত্বরা করে রথে বৃথা এ বিলম্ব কাজ কি তবে?
এই স্বর্ণপটে রয়েছে লিখিত তোমার জলদক্ষরে,
আছে অনুমতি পরম পিতার তোমায় স্বরগে নিবার তরে।
মিলিয়ে অমনি চারটি ধরিয়ে তাপসে তুলিয়া রথে
আবার কুসুম প্রসন্ন অন্তরে বরষে দেবতা গগন পথে!
অগ্রসর হয়ে আপনি চন্দ্রিমা বরণ করিয়া লইল তায়,
আনন্দ স্বরূপে অমৃত কিরণ অমর নগরে ভাসিয়া যায়।
একবিন্দু প্রাণ অনন্তের সনে মিলিয়া লভিল অনন্তপ্রাণ
বাজিল স্বরগে বিজয় দুন্দুভি গাইল দেবতা বিজয় গান!*

* মহীন্দ্রমোহন চন্দ প্রণীত "দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর" নামক পুস্তিকা।

বিদ্যাসাগর-রচনাপঞ্জী

স্বনামে ও বেনামে প্রায় অর্দ্ধশত পুস্তকের রচয়িতা, সঙ্কলক ও সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনাবলীর অধিকাংশই যদিও অনুবাদ, ভাবানুবাদ বা পাঠ্যপুস্তক, তথাপি এইরূপ উৎকৃষ্ট সর্বগুণসম্পন্ন রচনা, বিশেষতঃ পাঠ্য-পুস্তকের অভাব বর্তমানকালেও আছে—একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

বিদ্যাসাগরের পুস্তকসমূহের প্রথম সংস্করণ দেখিবার সুযোগ পাওয়া দুঃসাধ্যপ্রায়। আমাদের পক্ষ হইতে সে চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। সুতরাং, বিদ্যাসাগর রচনাবলীর তালিকা নির্মাণে প্রথম প্রকাশের তারিখের জন্য পূর্ব্বসূরীদের অনুসরণ করিতে হইয়াছে। এবং এ ব্যাপারে একবাক্যে সকলেই যাঁহাকে স্বীকার করিয়া থাকেন—শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছি।

(১) রচিত ও সঙ্কলিত

১৮৪৭ | সংবৎ ১৯০৩ — **বেতাল পঞ্চবিংশতি**

ফোর্টউইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত হিন্দী-পুস্তক "বৈতাল পচ্চীসী" গ্রন্থের অনুবাদ।

১৮৪৮ | সংবৎ ১৯০৪ — **বাঙ্গালার ইতিহাস**—দ্বিতীয় ভাগ

মার্শম্যানরচিত ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। সিরাজউদ্দৌল্লার সিংহাসনারোহণ হইতে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিকের অধিকার পর্যন্ত।

১৮৪৯ | শকাব্দ ১৭৭১ — **জীবনচরিত**

চেম্বর্স সংগৃহীত ইংরেজী পুস্তক অনুসারে।

১৮৮১ | সংবৎ ১৯০৬ — **বোধোদয়** (শিশুশিক্ষা ৪র্থ ভাগ)

Rudiments of Knowledge—Chambers-এর ইংরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত।

১৮৫১ | সংবৎ ১৯০৮ — **সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা**

১৮৫১ / সংবৎ ১৯০৮	**ঋজুপাঠ** ১ম ভাগ পঞ্চতন্ত্রের উপাখ্যান ও মহাভারতের কিছু অংশের গল্প। নাগরী হরফে ছাপা। বাংলা ভূমিকা।
১৮৫১ | সংবৎ ১৯০৮	**ঋজুপাঠ** ৩য় ভাগ হিতোপদেশ, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত, ভট্টিকাব্য, ঋতুসংহার ও বেণীসংহার গ্রন্থগুলি হইতে সংগৃহীত।
১৮৫২ | সংবৎ ১৯০৮	**ঋজুপাঠ** ২য় ভাগ রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের অংশ-বিশেষ সঙ্কলিত।
১৮৫৩ | সংবৎ ১৯১০	**সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত-সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব** এই প্রস্তাব কলিকাতাস্থ বীটন সোসাইটি নামক সমাজে প্রথম পঠিত হয় ১৮৫১ খৃঃ-এ। অনেকের অনুরোধে বীটন সোসাইটির তৎকালীন সভাপতির অনুমতি লইয়া গ্রন্থকার, দুইশত পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন। সংবৎ ১৯১৩, ১৩ই চৈত্র এই প্রস্তাব সর্বসাধারণের জন্য পুনর্মুদ্রিত হয়।
১৮৫৩ |	**ব্যাকরণ কৌমুদী** ১ম ভাগ
১৮৫৩ |	**ব্যাকরণ কৌমুদী** ২য় ভাগ
১৮৫৪ |	**ব্যাকরণ কৌমুদী** ৩য় ভাগ
১৮৫৪ | সংবৎ ১৯১১	**শকুন্তলা** মহাকবি কালিদাসপ্রণীত 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকের উপাখ্যানভাগ।
১৮৫৫ | সংবৎ ১৯১১	**বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব** বিধবাবিবাহের সপক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ।
১৮৫৫ | সংবৎ ১৯১২	**বর্ণপরিচয়** ১ম ভাগ
১৮৫৫ | সংবৎ ১৯১২	**বর্ণপরিচয়** ২য় ভাগ

১৮৫৫। সংবৎ ১৯১২	**বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব। দ্বিতীয় পুস্তক।** বিধবাবিবাহ প্রস্তাবের প্রতিবাদকারীদের প্রতি উত্তর। ১৮৫৬ খ্রীঃ বিধবাবিবাহ পুস্তক দুখানি Marriage of Hindu Widows নামে ইংরেজীতে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। এবং ১৮৬৫ খ্রীঃ বিষ্ণু পরশুরাম শাস্ত্রী কর্তৃক মারাঠী ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়।
১৮৫৬। সংবৎ ১৯১২	**কথামালা** Aesops Fables পুস্তকের নির্বাচিত কয়েকটি গল্পের অনুবাদ।
১৮৫৬। সংবৎ ১৯১৩	**চরিতাবলী** ডুবাল, রস্কো প্রভৃতি কতকগুলি মহানুভবের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত।
১৮৬০। সংবৎ ১৯১৬	**মহাভারত** (উপক্রমণিকাভাগ)
১৮৬০। সংবৎ ১৯১৭	**সীতার বনবাস** এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অধিকাংশ ভবভূতি প্রণীত উত্তরচরিত নাটকের প্রথম অঙ্ক হইতে গৃহীত। অবশিষ্ট রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বন পূর্বক সঙ্কলিত।
১৮৬২। সংবৎ ১৯১৮	**ব্যাকরণ কৌমুদী** ৪র্থ ভাগ
১৮৬৩। সংবৎ ১৯২০	**আখ্যানমঞ্জরী** কতিপয় ইংরেজী পুস্তক অবলম্বন পূর্বক সঙ্কলিত।
১৮৬৪।	**শব্দমঞ্জরী** বাংলা অভিধান। 'অ' হইতে 'নিবৃত্তি' পর্যন্ত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বিদ্যাসাগর সংগ্রহে (বি সং ২৯০ সংখ্যক পুস্তক) রক্ষিত আছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১২।
১৮৬৮। সংবৎ ১৯২৪	**আখ্যান মঞ্জরী** ১ম ভাগ
১৮৬৮। সংবৎ ১৯২৪	**আখ্যান মঞ্জরী** ২য় ভাগ

১৮৬৯। সংবৎ ১৯২৬ **ভ্রান্তিবিলাস**

শেক্সপীয়রের Comedy of Errors অবলম্বনে রচিত।

১৮৭১। সংবৎ ১৯২৮ **বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার**

বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে শাস্ত্রী প্রমাণ।

১৮৭৩। সংবৎ ১৯২৯ **বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার** দ্বিতীয় পুস্তক

বহুবিবাহ সমর্থনকারীদের মতখণ্ডন।

১৮৭৩। শকাব্দ ১৭৯৫ **বামনাখ্যানম্**

মধুসূদন তর্কপঞ্চানন রচিত ১১৭টি শ্লোকের বিদ্যাসাগরকৃত বাংলা অনুবাদ।

১৮৮৮। সন ১২৯৫ **নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস**

মদনমোহন তর্কালঙ্কার রচিত শিশুশিক্ষা ১ম—৩য় ভাগের অধিকার লইয়া তাঁহার জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বিদ্যাসাগরকে পরস্বাপহারী বলিয়া দোষারোপ করেন। তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য এই পুস্তিকা রচিত।

১৮৮৯। সন ১২৯৬ **সংস্কৃত রচনা**

বাল্যকালে রচিত কতকগুলি সংস্কৃত-রচনা।

১৮৯০। সন ১২৯৭ **শ্লোকমঞ্জরী**

কতকগুলি উদ্ভট শ্লোক সংগ্রহ

১৮৯১। সংবৎ ১৯৪৮ **বিদ্যাসাগর চরিত**

বিদ্যাসাগর পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন পিতার মৃত্যুর পর এই আত্মজীবনচরিত পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ ও তৎপূর্ববর্তী ঘটনাগুলি বিবৃত আছে।

* ১৮৯২। সন ১২৯৯ **ভূগোলখগোলবর্ণনম্**

পশ্চিম অঞ্চলের এক সিবিলিয়ান জন মিয়রের প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর পুরাণ, সূর্যসিদ্ধান্ত ও য়ুরোপীয়

মত অনুযায়ী ভূগোল ও খগোল বিষয়ে শ্লোক লিখিয়াছিলেন। শ্লোকগুলি বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইতেছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। ইহাতে ৪০৮টি শ্লোক আছে।

১৯০৯। সন ১৩১৫

রামের রাজ্যাভিষেক

রামের রাজ্যাভিষেক একটি অপ্রকাশিত ও অসম্পূর্ণ রচনা। ইহা নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্নমহাশয় রচিত 'রামের অধিবাস' নামক গ্রন্থের ৬৮-৮৬ পৃষ্ঠা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৬৯ খ্রীঃ বিদ্যাসাগর এই রচনায় হস্তক্ষেপ করেন, কিন্তু ঐ সময় শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'রামের রাজ্যাভিষেক' প্রকাশিত হওয়ায় বিদ্যাসাগর স্ব রচনা হইতে বিরত হন।

(২) **সম্পাদিত**।

১৮৫২।

বৈতাল পচ্চীসী (হিন্দী)

ইংরাজী ভূমিকা সহ হিন্দী বেতালপঞ্চবিংশতি।

১৮৫৩-৫৮

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহঃ

ইহা এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত হয়। ভূমিকা ইংরাজীতে লিখিত।

১৮৫৩। সংবৎ ১৯১০

রঘুবংশম্

ইহার "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ 'মূলমাত্র মুদ্রিত হইল। বর্জনীয় অংশ ও বর্জনীয় শ্লোক পরিত্যক্ত হইয়াছে। রঘুবংশ যে প্রণালীতে মুদ্রিত হইল কুমারসম্ভব, কিরাতার্জুনীয়, শিশুপালবধ, নৈষধচরিত, প্রভৃতিও সেই প্রণালীতে মুদ্রিত হইবেক।'

১৮৫৩। সংবৎ ১৯১০

কিরাতার্জ্জুনীয়ম্

১৮৫৭।

শিশুপালবধ

১৮৬১ ।	**কুমারসম্ভব** মল্লিনাথ-কৃত টীকা সহ। বাংলা ভূমিকা।
১৮৬২ । সংবৎ ১৯১৯	**কাদম্বরী** মূল। সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত, কিন্তু আখ্যানপত্রে বিদ্যাসাগরের নাম নাই। **বাল্মীকিরামায়ণ**—সটীক। বিদ্যাসাগরের উইলে এই পুস্তকের উল্লেখ আছে। ১৮৬০ সনে প্রকাশিত 'সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তক বিক্রয়ের নিয়ম। সন ১২৬৭' পুস্তিকায় যন্ত্রস্থিত সংস্কৃত পুস্তক তালিকায় 'রামায়ণ সটীক' এই উল্লেখ আছে।
১৮৬৯ । সংবৎ ১৯২৫	**মেঘদূতম্** মল্লিনাথ-কৃত টীকা সহ। বাংলা ভূমিকা।
১৮৭০ । সংবৎ ১৯২৭	**উত্তরচরিতম্**
১৮৭১ । সংবৎ ১৯২৮	**অভিজ্ঞানশকুন্তলম্**
১৮৮৩ । সংবৎ ১৯৩৯	**হর্ষচরিতম্**
১৮৪৭ শকাব্দ ১৭৬৯	**অন্নদামঙ্গল** ১ম ও ২য় খণ্ড কৃষ্ণনগরের রাজবাটীর মূল পুস্তক অবলম্বনে পরিশোধিত।
১৮৮৮ ।	**পদ্যসংগ্রহ** কৃত্তিবাস প্রণীত রামায়ণ হইতে সঙ্কলিত।
১৮৯০ ।	**পদ্যসংগ্রহ** ২য় ভাগ মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় প্রণীত অন্নদামঙ্গল হইতে সঙ্কলিত। **Selections from Writings of Goldsmith** **Selections from English Literature** **Poetical Selections.**

(৩) বেনামী রচনা

১৮৭৩। সন ১২৮০ — **অতি অল্প হইল**

কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত।
বহুবিবাহের স্বপক্ষে তারানাথ তর্কবাচস্পতি যাহা লেখেন তাহার প্রত্যুত্তর।

১৮৭৩। সন ১২৮০ — **আবার অতি অল্প হইল**

কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত।

১৮৮৪। সন ১২৯১ — **ব্রজবিলাস**—যৎকিঞ্চিৎ অপূর্ব মহাকাব্য কবি-কুলতিলকস্য কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত।
বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিবার জন্য, যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভার ৪র্থ সাংবাৎসরিক অধিবেশনে ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় যে বক্তৃতা করেন—তাহারই উত্তর।

১৮৮৪। সন ১২৯১ — **বিধবাবিবাহ ও যশোহরহিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা** কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণঃ।
১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে এই পুস্তিকার নামকরণ হইয়াছে **বিনয় পত্রিকা**।

১৮৮৬। সন ১২৯৩ — **রত্নপরীক্ষা** অর্থাৎ শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, এই তিন পণ্ডিতরত্নের প্রকৃত পরিচয়প্রদান। কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোসহচরস্য প্রণীত। বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনকারীদের সমালোচনা।

(৪) বিদ্যাসাগর-রচিত কয়েকটি প্রবন্ধ

১৮৫০। শকাব্দ ১৭৭২, ভাদ্র। — **বাল্যবিবাহের দোষ**

"সর্বশুভকরী" ১ম সংখ্যা।

১৮৫১। সংবৎ ১৯০৮ — **নীতিবোধ**

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নীতিবোধ" পুস্তকের পশুগণের প্রতি ব্যবহার, পরিবারের প্রতি ব্যবহার, প্রধান ও নিকৃষ্টের প্রতি ব্যবহার, পরিশ্রম, স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব,

বিনয়—এই কয়টি প্রস্তাব বিদ্যাসাগর রচিত। প্রত্যেক প্রস্তাবের উদাহরণ স্বরূপ রচনা মধ্যে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির কথা ও তাঁহার রচনা।

১৮৯২। ১২৯৯ সাল, বৈশাখ — **প্রভাবতী সম্ভাষণ**
"সাহিত্য" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সখা—ছোটদের পত্রিকা। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর ১৮৯৩ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে **"মাতৃভক্তি"** (জর্জ ওয়াশিংটনের কথা) ও ১৮৯৪ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে **"ছাগলের বুদ্ধি"** প্রকাশিত হয়।

শব্দ-সংগ্রহ। বাংলা প্রাদেশিক শব্দসংগ্রহ। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর প্রকাশিত। ১৩০৮ সন, ২য় সংখ্যা পৃঃ ৭৪-১৩০ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা

বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী—নারায়ণচন্দ্র শর্মা ১৮৯৫ খ্রীঃ ১ম ও পরে ২য় খণ্ড।

বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী— সিদ্ধেশ্বর প্রেস ডিপজিটারী—অবনীকান্ত রায় ১ম খণ্ড ১৯১১ খ্রীঃ, মূল্য বারো আনা—বাঁধাই ১ টাকা; ২য় খণ্ড ১৯১৩ খ্রীঃ সূর্যকান্তনাথ-দের একটি সংস্করণ।

বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। সাহিত্য ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ, সমাজ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, বিবিধ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ। এই তিন খণ্ডে প্রকাশিত।

গ্রন্থপঞ্জী

গ্রন্থপঞ্জী

অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ—বিদ্যাসাগর

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য

ইন্দ্র মিত্র—সাজঘর

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য—পুরাতন প্রসঙ্গ

গোপিকামোহন ভট্টাচার্য—History of Sanskrit College Part II (1858-1895)

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর

জীবেন্দ্র সিংহ রায়—সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ (প্রথম পর্ব)

ত্রিপুরাশঙ্কর সেন—উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—জীবন চরিত

নগেন্দ্রনাথ সোম—মধুস্মৃতি

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—অবিস্মরণীয় মুহূর্ত

প্রমথনাথ বিশী ও বিজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত—বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক

প্রিয়দর্শন হালদার—বিদ্যাসাগর জননী ভগবতী দেবী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—উত্তর চরিত (বিবিধ প্রবন্ধ)

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস ১ম খণ্ড (১৮২৪-১৮৫৮)

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (সাহিত্যসাধক চরিতমালা)

—বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ (মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত ভূমিকাসহ)

—বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

বিনয় ঘোষ—বিদ্যাসাগর ও সমাজ (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড)

বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত—ভারতকোষ (১ম খণ্ড)

মণি বাগচী—বিদ্যাসাগর

মন্মথনাথ ঘোষ—মহাত্মা কালিপ্রসন্ন সিংহ

মোহিতলাল মজুমদার—মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত

যোগীন্দ্রনাথ বসু—মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত

যোগেশচন্দ্র বাগল—বিদ্যাসাগর পরিচয়

রজনীকান্ত গুপ্ত—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
রমেশচন্দ্র দত্ত—প্রবন্ধ সংকলন
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বিদ্যাসাগর চরিত
রাজনারায়ণ বসু—আত্মচরিত
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার—জীবনীকোষ (ভারতীয়-ঐতিহাসিক)
শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন—বিদ্যাসাগর জীবন-চরিত
শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ
—আত্মচরিত
শিবরতন মিত্র—বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক
শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য—বিদ্যাসাগর প্রবন্ধ
শ্যামল কুমার চট্টোপাধ্যায়—বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ
সুবলচন্দ্র মিত্র—**Pandit Isvar Chandra Vidyasagar (Story of his life and works) with an Introduction by R. C. Dutt.**
সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড)
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত—হরপ্রসাদ রচনাবলী (১ম সম্ভার)
সুশীল রায়—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—বিবেকানন্দ চরিত
সজনীকান্ত দাস—বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস
সুধাকর চট্টোপাধ্যায়—কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র

পত্রপত্রিকা

আর্য্যাবর্ত (মাসিক) সম্পাদক—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

পুরাতন প্রসঙ্গ—কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য কথিত ও বিপিনবিহারী গুপ্ত লিখিত ১ম বর্ষ, ১৩১৭ পৌষ, ১৩১৭ মাঘ, ১৩১৭ চৈত্র। ২য় বর্ষ, ১৩১৮ বৈশাখ, ১৩১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮ আশ্বিন। ৪র্থ বর্ষ, ১৩২০ মাঘ।

বর্তমান বঙ্গসাহিত্য, মাঘ ১৩১৭

কিশোরীচাঁদ মিত্র—মন্মথনাথ ঘোষ, অগ্রহায়ণ ১৩২০

শরৎকুমার লাহিড়ী, ৪র্থ বর্ষ ১৩২০ চৈত্র

বিহারীলাল সরকার প্রণীত বিদ্যাসাগর সমালোচনা, ১৩১৮ জ্যৈষ্ঠ

জন্মভূমি (মাসিক)

দ্বিতীয় ভাগ, ২য় বর্ষ। ১২৯৮ পৌষ—১২৯৯

ধ্রুব—আষাঢ়—১৩১৯।

নব্যভারত—বিদ্যাসাগর সংখ্যা। ১২৯৮ ভাদ্র।

পরিচয়—বৈশাখ ১৩৬২। বর্ণপরিচয় শতবার্ষিকী স্মরণে প্রকাশিত।

প্রবাসী

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, ১৩৩৮ পৌষ

সেকালের সংস্কৃত কলেজ—হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন, ১৩৩২ ভাদ্র, আশ্বিন

বঙ্গদর্শন

বাঙ্গালার সাহিত্য—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১২৮১ ফাল্গুন

বসুমতী (শারদীয়া) ১৩৫৬

সেকালের ছাত্র জীবন—বিপিনচন্দ্র পাল (সুনীল ঘোষ অনূদিত)

শরতে যাঁরা জন্মেছেন—দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

বঙ্গবাণী

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস—পূর্ণচন্দ্র দে, ১ম বর্ষ, ১৩২৯ শ্রাবণ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যবিবরণী, ১ম বর্ষ, ১৩২৯ আশ্বিন

ভারতবর্ষ

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

মুকুল—চৈত্র ১৩১৬

শনিবারের চিঠি—সম্পাদক—সজনীকান্ত দাস

বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলীর সমালোচনা—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, বৈশাখ ১৩৪৫
বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্তিক ১৩৪৫
বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দির—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৌষ ১৩৪৬
রামমোহন রায় ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ—"প্রত্নকম্র", পৌষ ১৩৫৫

সমকালীন—সম্পাদক—আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

"হিউম্যানিষ্ট" পণ্ডিত বিদ্যাসাগর—বিনয় ঘোষ, ভাদ্র ১৩৬৪
বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শ—বিনয় ঘোষ, আশ্বিন ১৩৬৪

সখা ১৮৯৩ এপ্রিল ও ১৮৯৪ জানুয়ারী

সাহিত্য—সম্পাদক—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

১২৯৯ বৈশাখ, ১৩০৭ পৌষ, ১৩১২ আষাঢ়, ১৩১৯ আষাঢ়

সাধনা—ভাদ্র ১৩০২

Modern Review—Sept, October. 1927.